

নেক্সাস
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

নেক্সাস
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
(বেগ-বাস্টার্ড ৩)

প্রথম প্রকাশ:
ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ: সিরাজুল ইসলাম নিউটন

মুদ্রণ: একুশে প্রিন্টার্স,
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন
সিংটোলা,সূত্রাপুর
ঢাকা ১১০০

গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট
৩৭/১ বাংলা বাজার,
ঢাকা ১১০০।

প্রকাশক: বাতিঘর প্রকাশনী
৩৭/১ বাংলা বাজার,
বর্ণমালা মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা ১১০০।

তিন'শ টাকা

উৎসর্গ :

পার্থ সরকারকে...
নেমেসিস এবং কন্ট্রাক্ট-এর ভক্ত,
সিনেমা পাগল এক তরুণ।
একদিন নিশ্চয় সিনেমা বানাবে সে।

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথম দিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

সাধারণত ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

মুখ বন্ধ

শীতের পড়ন্ত বিকেল, নরম হয়ে আসছে রোদের প্রকোপ কিন্তু নাফি হাজ্জাদের গা পুড়ে যাচ্ছে। উত্তাপে নয়, তার গা পুড়ে যাচ্ছে ঈর্ষায়। উদভ্রান্তের মতো বলটা বার বার বাস্কেটে ছুঁড়ে মারছে কিন্তু একবারও পড়ছে না। রাগে ক্ষোভে শরীর কাঁপতে না থাকলে দশ বারের মধ্যে আটবারই বাস্কেটে পড়তো বলটা। এই স্কুলের সবাই সেটা জানে। সেন্ট অগাস্টিনের সেরা বাস্কেটবল খেলোয়াড় সে। কিন্তু একটু আগে তার সেই স্বীকৃতিটা মারাত্মক হোঁচট খেয়েছে। সবার আরাধ্য যে অ্যাঞ্জেলস টিম, তার কোচ তাকে বাদ দিয়ে বেছে নিয়েছে এমন একজনকে যার সাথে তার কোনো তুলনাই চলে না। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে একটা ঘাপলা আছে-নাফি একদম নিশ্চিত। কিন্তু সেটা কী, কাউকে বলে বোঝাতে পারছে না।

অন্যসব দিনের মতো স্কুল শেষে তারা বাস্কেটবল কোর্টে প্র্যাকটিস করছিলো, হঠাৎ লক্ষ্য করে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ত্রিশোর্ধ এক ভদ্রলোক বেশ আগ্রহভরে তাদের খেলা দেখে যাচ্ছে। তাদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটা খুবই অভিজাত, এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই কড়া, বাইরের লোকজন সহজে ঢুকতে পারে না। একটু অবাক হয়েছিলো নাফি। তার সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু শুভকে ইশারা করে জানতে চেয়েছিলো লোকটা কে। শুভ কাঁধ তুলে অপারগতা জানায় কিন্তু পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি হবার পরও তাদের দলে সবচাইতে বেটে আর পরিশ্রমী হিসেবে পরিচিত ইফতি আগ বাড়িয়ে বলে ঐ লোকটা অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ।

অ্যাঞ্জেলস!

বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের কাছে এই টিমের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। পর পর দু'বার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন তারা। কথাটা শুনেই নাফি সচেতন হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায় তার খেলার ভঙ্গি। যতরকম গিমিক আর কৌশল আছে দেখাতে শুরু করে সে। বেশ দূর থেকে বল থ্রো করে বাস্কেটেও ফেলতে সক্ষম হয় বার কয়েক। বুঝুক, এই স্কুলের সেরা খেলোয়াড়টা কে। তার বন্ধুদের মধ্যেও উৎসাহের কমতি ছিলো না। তারাও সচেতন হয়ে ওঠে। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরই দেখতে পায় তুর্য নামের ছেলেটাকে ডেকে ঐ কোচ ভদ্রলোক কথা বলছে।

তুর্য!

আজব!

তুর্যও বাস্কেটবলটা ভালো খেলে কিন্তু কোনোভাবেই নাফির সাথে তুলনা করা যায় না তাকে। নাফি তো নাফি, এমন কি শুভর সাথেও তাকে তুলনা করাটা অন্যায়। বাস্কেটবল সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা আছে যার সে এ কাজ করবে না। কি উচ্চতায় কি টেকনিকে, তুর্য তাদের স্কুলে প্রথম তিনজনের মধ্যেও আসে না। অথচ অ্যাঞ্জেলস টিমের মতো চ্যাম্পিয়ন একটি দলের কোচ কিনা তাকে ডেকে নিয়ে কথা বলছে!

তার অন্য সঙ্গিরাও ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখে নি। তাদেরও রাগ হয়। তবে দশ মিনিট পর সেই রাগ বিস্ময়ে পরিণত হয় যখন তুর্য এসে জানায় অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ তাকে দলে নিতে চাচ্ছে। আজই তাকে সাইন করাবে। এসএসসি পরীক্ষা দেবার আগেই এরকম একটা সুযোগ পেয়ে গেলো ছেলেটা! এই সুযোগ তো পাবার কথা ছিলো তার নিজের।

তুর্যের চোখেমুখে অহংকারের যে ছটা দেখতে পেয়েছে সেটা আরো বেশি পীড়াদায়ক। ছেলেটা এমন ভাব করলো, যেনো সবাই তাকে হিংসা করুক। হিংসা করতে করতে কয়েক রাত নিদ্রাহীন থাকুক তারা।

এরপর মন খারাপ করা বিকেলে একে একে সবাই নিজেদের বাড়িতে চলে গেলেও নাফি বাস্কেটবল কোর্টে একা রয়ে গেলো। যাবার আগে তার বন্ধু দিপ্রো সান্ত্বনা দেবার

ভঙ্গিতে বলে গেছে, আজকে যখন অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ এসেছে, এরপর নিশ্চয় ওদের রাইভাল টিমের কোচও আসবে প্লেয়ার হান্ট করার জন্য। বাস্কেটবলের খেলোয়াড় তো আর সবখানে পাওয়া যায় না। হাতে গোনা কয়েকটি অভিজাত স্কুল ছাড়া খেলোয়াড় পাবে কোথায়? নাফি অবশ্য অভিমানের সুরে বলেছে, সে কোনো রানার্সআপ টিমের হয়ে খেলবে না। সে খেলবে চ্যাম্পিয়ন টিমের হয়ে। দিপ্রো তারপরও দমে যায় নি। বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বলেছে, রানার্সআপ টিম যে কখনও চ্যাম্পিয়ন হবে না সেটা কে বলেছে। আজব। মন খারাপ করার কী দরকার। এভরিথিং উইলবি ওকে, দিপ্রো যাবার আগে বলে গেছিলো।

দিপ্রোর অকাট্য যুক্তি শুনে গেছে নাফি, কিছুই বলে নি। তারপরও কিছুই ভালো লাগছে না তার। একা একা সারা কোর্ট দাবড়ে বেড়াচ্ছে। বাস্কেটে অনবরত বল ফেলছে, বাড়ি যাবার নাম নেই। একটু আগে দারোয়ান আজগর এসে অনেকটা বিরক্ত হয়ে বলে গেছে তাকে এখন চলে যেতে হবে। শালার অজগরের বাচ্চা, আমাকে ঝাড়ি মারে!

বিকেল গড়িয়ে এখন প্রায় সন্ধ্যা। ক্লান্ত শ্রান্ত নাফি বলটা হাতে তুলে নিলো। স্কুলের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে রওনা দিলো বাড়ির দিকে। অন্যসব দিন হলে বলটা মাটিতে ড্রপ করতে করতে চলে যেতো কিন্তু এখন মাথা নীচু করে স্কুল থেকে বের হয়ে গেলো সে।

আজকের দিনটা তার জন্যে পরাজয়ের। স্কুলে সবাই জানে বাস্কেটবলের সেরা খেলোয়াড় সে, কিন্তু স্কুলের ছোট্ট গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতিটা পেয়ে গেলো এমন একজন যাকে দুচক্ষেও দেখতে পারে না সে। সহপাঠী হলেও তুর্য নামের বদমাশটার সাথে তার কখনও বনে না। এই ছেলে সব সময় তার ক্ষমতাবান বাপের গরম দেখায়।

মাত্র ষোলো বছর বয়সেই নাফি হাজ্জাদ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যে, এই দেশে সত্যিকারের প্রতিভার কোনো মূল্যায়ন হয় না। ফালতু লোকজন বসে আছে গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গায়। তাদের নিজেদেরই যোগ্যতা নেই, তারা কী করে যোগ্য লোক খুঁজে বের করবে?

স্কুলের বড় গেটটার মধ্যে ছোটো যে গেটটা আছে সেটা দিয়ে উপুড় হয়ে মাথা নীচু করে বের হবার সময় নিজেকে আরো বেশি পরাজিত মনে হলো তার।

অধ্যায় ১

আজ আবারো দেরি করে ফেলেছে লালা। কাল রাতে একটু বেশিই পান করে ফেলেছিলো। পান করার ব্যাপারে কোনো সময়ই তার লাগাম থাকে না। তবে পূর্ণিয়ার সাথে সারা রাত কাটানোর সময় মাত্রাজ্ঞান ঠিক রাখতে পারে নি। অকেজো স্বামীকে ঘরে রেখে মেয়েটা যখন চিরকুমার লালার ঘরে এসে ঢুকলো তখনই বুঝতে পেরেছিলো আজ রাতে ঘুমের বারোটা বাজবে।

রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত সজাগ ছিলো তারা। পূর্ণিয়া যে তাড়নায় এসেছিলো সেটা চরিতার্থ হবার পর তাড়ি খেয়ে দুজনে গল্প করেছে সারা রাত। এখন এই সকালবেলায় বাধ্য হয়েই কাজে ছুটে আসতে হয়েছে। ভেবেছিলো শরীর খারাপের কথা বলে ডিউটি থেকে নাগা দেবে কিন্তু সেটা করা সম্ভব হয় নি। এই মাসে দুবার এই অজুহাতে নাগা করেছে সে।

আজ শুক্রবার হলেও তাকে কাজ করতে হবে কারণ সুইপারদের কোনো ছুটি নেই। মানুষ তো আর ছুটির দিনে হাগা-মুতা বন্ধ রাখে না। যদিও তাদের স্কুলটা এদিন বন্ধই থাকে, সেদিক থেকে দেখলে শুক্রবারটা তার জন্যে ছুটির দিন হতে পারতো কিন্তু পরিহাসের বিষয় হলো এই দিনেই সবচাইতে বেশি কাজ থাকে। অন্যসব দিনে মোটামুটি সাফ সুতরো হলেই চলে কিন্তু শুক্রবারে পুরো স্কুল-কম্পাউন্ডের সবগুলো টয়লেট পরিস্কার করে মেনহোলগুলোতে বাখারি মেরে ক্লিয়ার করে রাখতে হয়।

স্কুলের মেইন গেট দিয়ে ঢুকতেই মুখোমুখি হলো দারোয়ান আজগর মিয়াঁর। তাদের মধ্যে সখ্যতা আর খুনসুটি দুটোই চলে। অম্ল-মধুর সম্পর্ক।

তার দিকে ভুরু কুচকে চেয়ে আছে আজগর।

"আরে, ঢাকার নওয়াব লালা বাহাদুর যে," আজগর মিয়াঁ টিটকারি মেরে বললো। "আরেকটু দেরি কইরা আইতেন, সমস্যা কি! নওয়াবগো তো একটু আরাম-উরাম করনই লাগে, নাকি?"

লালা কিছু বললো না। চুপ থাকাই ভালো। কোমর থেকে বিড়ির প্যাকেটটা বের করে একটা বিড়ি তুলে দিলো আজগর মিয়াঁর হাতে। তার মুখটা অন্তত কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকুক।

"নিজে তো সারা রাইত মাল টানছো আর আমারে দিতাছো বালের এই হুগনা বিড়ি!"

লালা কিছু না বলে চুপচাপ চলে গেলো স্কুল কম্পাউন্ডের ভেতর।

"আর বিড়ি-ফিরি দিয়া কাম অইবো না...এইরহম দেরি করলে আমি কিন্তু প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে বিচার দিমু, অ্যাঁ!"

পেছন থেকে আজগর জোরে জোরে বললেও লালা ফিরেও তাকালো না। "তুমি ছিড়বা আমার বাল", বিড়বিড় করে বললো সে। পরনের লুঙ্গিটা হাটু অবধি তুলে গিট দিয়ে নিলো। কাজে নামার সময়ে লুঙ্গিটা এভাবেই পরে থাকে। তার ফ্যাকাশে লাল রঙের টি-শার্টের বাম বুকের দিকটায় যে লিপস্টিকের দাগ লেগে রয়েছে সেটা দেখে মুচকি হাসলো। পুর্ণিয়া কালরাতে খুব সাজগোজ করে এসেছিলো। সাজলে খুব সুন্দর দেখায় তাকে। লালার এতো ভালো লেগেছিলো যে বলে বোঝাতে পারবে না। খুশির চোটে মেয়েটাকে অনেক আদর করেছে। পুর্ণিয়াও বেশ ক্ষেপে গিয়েছিলো। পাগলের মতো তাকে মহব্বত করেছে।

ভাগ্য ভালো আজগর এটা খেয়াল করে নি, করলে তার মুখে খিস্তির ফোয়ারা ছুটতো। টয়লেটের ভেতর ঢোকার আগেই টের পেলো মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে। পা দুটোও স্বাভাবিকভাবে ফেলতে পারছে না। এক হাড়ি তাড়ি খাওয়ার ফল!

ছিপছিপে শরীরের লালাকে স্কুল কম্পাউন্ডের ভেতর চলে যেতে দেখে আজগর মিয়াঁ বিড়িতে আগুন ধরালো। এই হারামজাদার বয়স বাড়ে না ক্যান! মনে মনে বললো সে। এটা ঠিক, লালা নামের এই সুইপারের বয়স পঞ্চাশের উপরে হলেও তাকে অনেক কম বয়স্ক

দেখায়, এমন কি সবেমাত্র চল্লিশে পা দেয়া আজগরের চেয়েও তাকে তরুণ বলে মনে হয়। ব্যাপারটা সবার কাছেই বিস্ময়কর ঠেকে। প্রথম প্রথম অনেকে মনে করতো লালা তার বয়স বাড়িয়ে বলে। কিন্তু বহু পুরনো একটা গ্রুপ ছবিতেও লালাকে যখন ঠিক এখনকার মতোই দেখা গেলো তখন সবাই বুঝতে পারলো, এই লোকের দৈহিক গড়নটাই এমন। বয়স ধরে রাখার এই রহস্য কী করে সম্ভব সেটা একদিন কথাচ্ছলে, লালাকে জিজ্ঞেস করেছিলো আজগর। পান চিবোতে চিবোতে লালা বলেছিলো, সে নাকি জীবনে কখনও দুশ্চিন্তা করে না। এটাই তার চিরতারুণ্যের রহস্য।

আজগর মিয়াঁও জানে দুশ্চিন্তা হলো বয়সের এক নাম্বার শত্রু। লালার সেই শত্রু নেই। তাই পঞ্চাশোর্ধ এই তরুণকে ঈর্ষা করে সে। এখনও মাথার চুল পাকে নি। সুন্দর করে তেল মেখে ব্যাকব্রাশ করে রাখে লালা, পাতলা গোঁফটা দেখে একেবারে ষাটের দশকের কোনো নায়কের মতোই লাগে। গায়ের রঙ ফর্সা হলে সত্যিকারের নায়কের মতোই লাগতো তাকে। মানুষ হিসেবেও লালা খুব ভালো। কারো সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করে না। কারো বদনাম বা খারাপ কথা তার মুখে কখনও কেউ শোনে নি। একটু চুপচাপ স্বভাবের লালা খুবই সাহসী একজন মানুষ। ভয়ডর বলতে কিছু নেই তার মধ্যে। আজগর মিয়াঁকে সে বলেছে, অমাবস্যা রাতেও বিরান গোরস্তানের ভেতর একা একা হেঁটে যেতে তার ভয় করে না।

তবে দোষের মধ্যে একটাই দোষ-সারা রাত সুইপার কলোনিতে বসে মাল খাবে। একদিন আজগরকেও নাকি সেই মাল খাওয়াবে, বলেছিলো লালা, কিন্তু সেই দিন আর আসে না।

আজগর মিয়াঁ বিড়ি টানতে টানতে মেইন গেটের কাছে বড়সড় একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে টুলের উপর বসে পড়লো। মেইনগেটের পাশে ছোটো গেটটা দিয়ে বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে রইলো সে। রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা। শুক্রবারের সকাল ৭টা বাজে কে আর বাইরে বের হতে যাবে। ঢাকা শহরের লোকজন এখন নিজেদের বিছানায় আরাম করছে। তার মতো পোড়া কপালের লোকজনই শুধু আরাম আয়েশ বাদ দিয়ে ডিউটি করে যাচ্ছে এ সময়। তাদের জীবনে ছুটি বলতে তেমন কিছু নেই। দুই ঈদে মোট এক সপ্তাহের ছুটি জোটে কপালে। সেই ছুটি যে কিভাবে কতো দ্রুত শেষ হয়ে যায় বুঝতেই পারে না।

উদাস হয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইলো আজগর। বিড়িতে জোরে জোরে আরো কয়েকটা টান মেরে যেই না ধোঁয়া ছাড়তে যাবে অমনি স্কুলের ভেতর থেকে ভয়ার্ত এক চিৎকার শোনা গেলো। চমকে উঠলো সে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। চিৎকারটা যে লালা দিয়েছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কী এমন ঘটনা ঘটলো যে লালার মতো সাহসী একজন, গগনবিদারি চিৎকার দিতে যাবে!

স্কুল কম্পাউন্ডের মেইন বিল্ডিংয়ের টয়লেটের দিকে ছুটে গেলো আজগর মিয়াঁ। লালার চিৎকারটা ওখান থেকেই এসেছে। সেই চিৎকারে মিশে আছে এক জান্তব ভীতি।

টয়লেটের খুব কাছে আসতেই উদভ্রান্ত লালার মুখোমুখি হলো আজগর মিয়াঁ। আরেকটু হলে দুজনের মধ্যে ধাক্কা লেগে গেছিলো।

"হায় ভগবান!" ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো লালা।

"এটা আমি কি দেখলামরে!"

অধ্যায় ২

জেফরি বেগ জানে চারপাশে কোনো আলো নেই, একেবারে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। তবে এমন পরিবেশেও সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে, আর সেটা সম্ভব হচ্ছে অত্যাধুনিক নাইটভিশন গগল্‌স পরে থাকার কারণে।

চুপিসারে আরো একবার চারপাশটা দেখে নিলো। জনমানুষের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। তার হাতে অদ্ভুত একটা অস্ত্র। আগে কখনও এটা ব্যবহার করে নি। ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না। সে ব্যবহার করে ওয়াল্টার লুথার নাইন এমএম পিস্তল। অদ্ভুত এই অস্ত্রটা একটু আগেই হাতে পেয়েছে।

এখন পরিত্যাক্ত এক ভবনের নীচতলার পাকিংলটে আছে। কোনো গাড়ি পার্ক করা নেই। কিছু কার্ডবোর্ড বাক্স রয়েছে এখানে সেখানে। তবে সে জানে কমপক্ষে সাতজন ‘দুষ্কৃতিকারী’ আছে আশেপাশে। ওৎ পেতে রয়েছে তারা। তাদের নোংরা বুলেট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কভার নেয়ার জন্যে বড় বড় কয়েকটা কাগজের কার্টনবাক্স পড়ে আছে সামনে। সেটাই যথেষ্ট। এক দৌড়ে বাক্সগুলোর দিকে ছুটে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারটা ভোতা শব্দ গর্জে উঠলো।

তার গায়ে কটকটে রঙের প্লাস্টিকের যে জ্যাকেটটা আছে সেটার দিকে তাকালো। সে জানে একটা নোংরা বুলেটও তাকে ‘হিট’ করতে পারে নি। বুকের দিকে তাকিয়ে কোনো রঙ দেখতে পেলো না। না, লাগে নি! মনে মনে বললো সে। যদি বুলেট তার গায়ে লাগতো নাইটভিশন গগল্‌সে হালকা সবুজ তরল দেখতে পেতো। এই গগলস পরলে চারপাশটা কেমন যেনো অচেনা হয়ে ওঠে। এক ধরণের ভীতিকর সবুজাভ হয়ে ওঠে সবকিছু।

বাক্সের আড়াল থেকে এই প্রথম দেখতে পেলো তার ঠিক দশ গজ দূরে, একটা পিলারের পেছনে একজন দাঁড়িয়ে আছে। গুলিটা তাহলে সে-ই করেছে! জেফরি বেগ পিস্তলটা তুলে নিলো চোখ বরাবর। অন্যদের চেয়ে তার একটি বাড়তি সুবিধা আছে : এই ঘন অন্ধকারেও বেশ ভালোমতো দেখতে পাচ্ছে চারপাশটা। তবে বাড়তি সুবিধা কাজে লাগানোর জন্যে তাকে খুব দ্রুত কাজ করতে হবে মাত্র পাঁচ মিনিটে। এটাই একমাত্র চ্যালেঞ্জ। হাতঘড়িটার রেডিয়াম ডায়ালের দিকে তাকালো। ইতিমধ্যে দুই মিনিট সময় পেরিয়ে গেছে। ভবনের ভেতর প্রবেশ করার জন্যে মাত্র দেড় মিনিট সময় ভেবে রেখেছিলো। হাতে আছে তিন মিনিট। ঠিক আছে, দ্রুত বাকি কাজগুলো করে ফেলতে হবে। জেফরি বেগ আস্তে করে উঠে দাঁড়ালো কার্ডবোর্ডবাক্সগুলোর পেছন থেকে। বেড়ালের মতো চুপিসারে এগোতে লাগলো সামনের দিকে। ভালো করেই জানে। শব্দ হলেই দুষ্কৃতিকারীরা টের পেয়ে এলোপাতারি ফায়ার করবে। তার একটা সমস্যা আছে, এলোপাতারি ফায়ার করা যাবে না। সুতরাং যতোদূর সম্ভব শব্দহীন পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো সামনের মোটা পিলারটার দিকে। এখানে একজন আছে। পিলারের ঠিক কাছে এসেই ডান দিকে সরে গেলো সে। ঘাপটি মেরে থাকা ‘দুষ্কৃতিকারী’ পিলারের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। জেফরি বেগ এখন তার ঠিক পেছনে। লোকটা একদম টের পায় নি। এটাই সে চেয়েছিলো। লোকটাকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করেই দ্রুত সরে গেলো আরো ডান দিকে। গুলিবিদ্ধ লোকটা বেশ জোরে শব্দ করতেই, সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটা গুলির শব্দ হলো ভবনটার ভেতর।

জেফরি আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলো, পাল্টা ফায়ার করলো যেখান থেকে দুস্কৃতিকারীরা গুলি করেছে। স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সামনের দশ গজ দূরে, সিঁড়ি আর লিফটের কাছ থেকে দুজন গুলি করেছে। আরেকটা বড় পিলারের আড়ালে তারা কভার নেবার আগেই জেফরি গুলি করলো। সে নিশ্চিত দুজনকেই ঘায়েল করেছে। কারণ কোনো রকম পাল্টা গুলি করা হচ্ছে না। আবারো নিশ্চিত হয়ে নিলো সে নিজে গুলিবিদ্ধ হয় নি।

তিনজন। তার মানে আরো চার জন রয়েছে এখন। হাতে সময় বোধহয় দুমিনিটও নেই। এই সময়ের মধ্যে তাকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আরো কয়েকজনকে মোকাবেলা

করতে হবে। আস্তে আস্তে পা টিপে সিঁড়ির কাছে এসে প্রথম তিনটি ধাপের উপর শরীরটা ফেলে দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো। হাতের অস্ত্রটা সামনের দিকে তাক করা।

স্পষ্ট দেখতে পেলো সিঁড়ির উপরের ল্যান্ডিংয়ে একজন অস্ত্রধারীর আর্বিভাব ঘটেছে। গুলি চালালো না জেফরি। যদিও টার্গেট একেবারে 'সিটিং ডাক পজিশনে আছে। শিকারীর ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করলো সে। লোকটা ল্যান্ডিংয়ের উপর থেকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করছে নীচে কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে কিনা। জেফরি জানে বেশি সময় নেয়া যাবে না। লোকটার চোখ অন্ধকার সয়ে উঠলে আবছা আবছা দেখতে পাবে, তার পজিশনটাও চাউর হয়ে যাবে তার কাছে। তারপরও আরেকটু অপেক্ষা করলো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর।

হঠাৎ করে ল্যান্ডিংয়ের উপর আরেকজন অস্ত্রধারীর উদয় হতেই পর পর চারটা গুলি চালালো জেফরি। তার সাইলেন্সার পিস্তলের কোনো শব্দ হলো না। অস্ত্রধারী দু'জন 'নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। জেফরি তবুও উঠে দাঁড়ালো না। হামাগুড়ি দিয়েই সিঁড়ির উপর উঠে এলো কিছুটা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ল্যান্ডিংয়ে পড়ে রয়েছে দু'জন। তাদের চোখ খোলা। কিছুটা নড়ছে। তবে জেফরি আর গুলি চালালো না। দরকারও নেই। ল্যান্ডিংয়ের উপর এসে উঠে দাঁড়ালো সে। বাকি সিঁড়িটুকু আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ভেঙে এগিয়ে গেলো। ডান দিকের দরজাটা খোলা। সেই খোলা দরজার কাছে এসে সতর্কভাবে ভেতরে উঁকি দিলো। ভেতরে দু'জন অস্ত্রধারী ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে। সে জানে তারা তাকে দেখতে পাচ্ছে না। লোকগুলো একে অন্যের কাছ থেকে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে জেফরি বেগ একটু সময় নিলো। খোলা দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে ঠিক করে নিলো সামনের পাঁচ সেকেন্ড কি করবে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে এক ঝটকায় ঘরের ভেতর ঢুকেই হাটু গেড়ে বসে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে চালালো গুলি। একেকজনকে লক্ষ্য করে দুটো গুলি করবে সে-এটা আগে থেকেই ঠিক করে নিয়েছিলো, কিন্তু দ্বিতীয় জনের বেলায় এসে বুঝতে পারলো তার গুলি শেষ। ধ্যাত্!

হঠাৎ চারপাশের রঙ আচমকা বদলে গেলো। নাইটভিশন গগল্‌সটা খুলে ফেললো জেফরি, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আলোয় চোখ কুচকে ফেললো সে।

"ওভার!" ভারি একটা কণ্ঠ গর্জে উঠলো।

একটু আগে বুক ভরে যে নিঃশ্বাস নিয়েছিলো তার সবটাই আক্ষেপের সাথে বের করে দিলো জেফরি বেগ। "সরি..."

মাথায় সানক্যাপ পরা মোটা মতো এক লোক এগিয়ে এলো তার দিকে, সেই সাথে দু'জন লোকের মধ্যে যে লোকটা গুলিবিদ্ধ হয়েছে সেও উঠে দাঁড়ালো।

"গুলির হিসেব রাখাটা জরুরি, মি. বেগ, সানক্যাপ পরা লোকটি বললো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। "আসলে যে অস্ত্রটা আমি সব সময় ব্যবহার করি তাতে দশটা বুলেট থাকে আর এটাতে ছিলো নয়টা," হাতের অদ্ভুত অস্ত্রটা তুলে ধরে বললো সে।

"নো এক্সকিউজ।"

'সরি," জেফরি বেগ কথাটা বলেই ক্যাপ পরা লোকটার হাতে নাইটভিশন গগলটা তুলে দিলো। "ভালো জিনিস...বেশ ভালো।"

গগল্‌সটা হাতে নিয়ে ক্যাপ পরা লোকটি মুচকি হাসি দিলো। "তবে অভ্যস্ত হতে হয়, নইলে যে বাড়তি সুবিধা পাবেন সেটা কাজে লাগানো যাবে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি।

"রেজাল্ট একেবারে খারাপ না, খুব অল্প সময় বেধে দেয়া ছিলো। হিটম্যানের সংখ্যাও একজনের পক্ষে মোকাবেলা করা বেশিই বলতে পারেন। তবে সবটাই করা হয় একটু বেশি দক্ষতা তৈরি করার জন্যে। বাস্তবে হয়তো আপনি এরচেয়ে বেশি সুবিধা পাবেন...আবার এমনও হতে পারে এরেচেয়ে, কঠিন পরিস্থিতিতেও পড়ে গেলেন...কে জানে?"

"তা ঠিক, শমসের ভাই," বললো জেফরি।

"আপনাকে কেউ হিট করতে পারেনি সেটাই অনেক বড় ব্যাপার। বেঁচে থাকার চেয়ে বড় সাফল্য আর নেই।" কথাটা বলেই শমসের নামের লোকটা হেসে ফেললো।

এবার জেফরির মুখেও ফুটে উঠলো চওড়া হাসি।

শুটিং অ্যান্ড অ্যামুনিশন ইন্সট্রাক্টর শমসের হাবিব ঘরের সবাইকে চলে যাবার ইশারা করলে দুজন লোক চলে গেলো ঘর থেকে। জেফরি লক্ষ্য করলো তাদের একজনের পরনে প্লাস্টিকের জ্যাকেটের বুকের কাছে হলুদ রঙ লেগে আছে। তার অব্যর্থ নিশানার নির্দশন। তার হাতে যে অদ্ভুত অস্ত্রটা আছে সেটা ডামি গান। এর বুলেট থেকে এক ধরণের হলুদ রঙের তরল বের হয়। এটা মার্কার হিসেবে কাজ করে।

শমসের হাবিবের সাথে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো সে। এই ভবনটা শুটিংরেঞ্জেরই অংশ। ভবন, গলি, সিঁড়ি, রাস্তা এবং ঘরের ভেতর শুটিং প্র্যাকটিস করার জন্যে এটা বানানো হয়েছে। শুধু হোমিসাইড নয়, এ দেশের বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অফিসারদের শুটিং প্র্যাকটিসের জায়গা হিসেবে এটা ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে শুটিং প্রাকটিস করা হলে ভালো কাজে দেয়। অফিসারদের শুটিং দক্ষতা এবং নিজের আত্মরক্ষা দুটোই শেখা যায় এখানে।

কিছুদিন আগে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট অত্যাধুনিক নাইটভিশন গগলস নিয়ে এসেছে। তবে অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তিতে অফিসারদের অভ্যস্ত হবার জন্যে প্রচুর প্র্যাকটিসের দরকার। আজই প্রথম জেফরি বেগ এই জিনিসটা ব্যবহার করে প্র্যাকটিসে অংশ নিলো। তাকে আরো পাঁচটি সেশনে অংশ নিতে হবে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচের পাকিং এরিয়ায় আসতেই দেখতে পেলো সহকারী জামান দাঁড়িয়ে আছে। শমসের হাবিবই সবার আগে জামানকে দেখতে পেয়েছে। শুটিংরেঞ্জে জামানের আসার কথা নয়। তার মতো জুনিয়রদের সেশন হবে আরো পরে।

"মনে হচ্ছে আরেকটা খুনখারাবি ঘটে গেছে," জেফরির দিকে ফিরে বললো ইন্সট্রাক্টর।

জেফরি কিছু না বলে প্লাস্টিকের জ্যাকেটটা খুলতে খুলতে জামানের দিকে এগিয়ে গেলো। "কি ব্যাপার?"

কাঁধ তুলে ঠোঁট উল্টালো জামান। "ক্রাইম-সিনে যেতে হবে, স্যার।"

প্লাস্টিকের জ্যাকেটটা সামনে থাকা কার্ডবোর্ডের বাক্সের উপর রেখে দিলো জেফরি। "কোথায়?"

"সেন্ট অগাস্টিন স্কুলে।"

একটু অবাক হলো সে। সেন্ট অগাস্টিন ঢাকা শহরের সবচাইতে অভিজাত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল।

"স্টুডেন্ট?"

"না। এক জুনিয়র ক্লার্ক।"

একটু থেমে জামানের দিকে চেয়ে রইলো। "আজকাল দেখছি স্কুলেও খুনখারাবি শুরু হয়ে গেছে।"

জামান কিছু বললো না।

"কখন হয়েছে?"

"মনে হচ্ছে গতকাল...আজ সকালে টয়লেটের ভেতরে লাশটা দেখতে পেয়েছে সুইপার।"

আনমনে একটু মাথা দুলিয়ে জেফরি বেগ তার সহকারী জামানকে ইশারা করলো ভবন থেকে বের হবার জন্যে।

জেফরি হাতঘড়িতে সময় দেখে নিলো : সকাল দশটা বেজে ছয় মিনিট। আরেকটা খুন, আরেকটা ইনভেস্টিগেশন। তার জন্যে আরেকটা নতুন চ্যালেঞ্জ। জেফরি বেগ সেই চ্যালেঞ্জ নেবার জন্যে এগিয়ে চললো ।

আজ শুক্রবার। ছুটির দিন। দুপুরে রেবার সাথে লাঞ্চ করবে বলে ঠিক করে

রেখেছিলো, এখন মনে হচ্ছে সেটা পিছিয়ে দিয়ে বিকেলে নিয়ে যেতে হবে।

আপাতত ডেটিংয়ের চিন্তা বাদ দিয়ে কাজে মনোযোগ দাও, গাড়িতে উঠতে উঠতে নিজেকে বললো হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ।

অধ্যায় ৩

স্বল্প পরিসরের টয়লেটের হাই কমোডটার পাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা, কিন্তু তার জমাটবদ্ধ চোখ সরাসরি জেফরি বেগের দিকে নিবদ্ধ।

বীভৎস একটি দৃশ্য। প্রথমে দেখে বোঝা যাবে না কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। লোকটার ঘাড় এমনভাবে মটকে দেয়া হয়েছে যে, সেটা প্রায় একশ' আশি ডিগ্রি ঘুরে গেছে। ফলে উপুড় হয়ে পড়ে থাকলেও তার মাথাটা বেঁকে চলে এসেছে সামনের দিকে। স্থির হয়ে থাকা খোলা চোখ দুটো ঘোলাটে দেখাচ্ছে এখন। নাকের কাছে কিছু মাছি ভন ভন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হাসান নামের লোকটা সেন্ট অগাস্টিন স্কুলের একজন ক্লার্ক। বয়স আনুমানিক ত্রিশের মতো হবে। বেশ পরিপাটী শার্ট-প্যান্ট আর কালো পাম সু পরা। গায়ের পোশাক এতোটা অক্ষত থাকার কারণ সম্ভবত খুনি কিংবা খুনিদের সাথে তার কোনোরকম ধস্তাধস্তি হয় নি, যদিও লোকটা শারিরীকভাবে বেশ শক্ত-সামথ্য। পড়ে থাকা অবস্থায়ই জেফরি আন্দাজ করতে পারলো ভিকটিমের উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির নীচে হবে না। তার মানে যে বা যারা খুন করেছে তারা শারীরিকভাবে আরো বেশি শক্তিশালী ছিলো।

অথবা অনেক বেশি দক্ষ!

গতকালই হয়তো শেভ করেছিলো হাসান নামের ক্লার্কটি। মুখ একদম পরিস্কার। মাথার তালুর দিকে কিছু জায়গা ছাড়া চুলগুলো সুন্দর করে আচড়ানো। দৃশ্যটা কল্পনা করতে পারলো জেফরি বেগ : মাথার তালুর চুলগুলো শক্ত কোনো হাত খামচে ধরেছিলো; তারপর অন্য হাতটা দিয়ে হয়তো থুতনীটা ধরে সজোরে মোচড় মেরে কাজটা সম্পন্ন করা হয়েছে। লাশের সুরতহাল দেখে তার আরো ধারণা হলো, এ কাজটা করা হয়েছে লোকটার পেছন থেকে। ভিকটিমের মুখটা অল্প একটু হা হয়ে আছে। মুখের চোয়াল ডান দিক থেকে বাম দিকে খানিকটা বেঁকে আছে সেজন্যে। একটু কাছে এসে চোয়ালটা ভালোমতো দেখে নিলো। হ্যাঁ। তার ধারণাই ঠিক। লোকটার ডান চোয়ালের থুতনীর উপরে দুটো আঁচড়ের দাগ বেশ স্পষ্ট।

হোমিসাইডের ফটোগ্রাফার অনেকটা নিঃশব্দেই লাশের ছবি তুলে যাচ্ছে। শুধুমাত্র ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দ আর ফ্ল্যাশের ঝলকানি ছাড়া কিছু শোনা যাচ্ছে না। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে অনেকগুলো ছবি তোলা হবে। পরে এইসব ছবি দেখে তারা বিশ্লেষণ করবে। অনেক সময় শুধুমাত্র ছবি বিশ্লেষণ করেও দুর্দান্ত ক্লু পাওয়া যায়।

জেফরি টের পেলো ফটোগ্রাফার তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। ছবি তুলছে না। বুঝতে পেরে সরে গেলো একটু।

"স্যার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট টিম কাজ শেষ করে ফেলেছে," পাশে থেকে সহকারী জামান বললো। "আপনার কি কোনো ইন্সট্রাকশন আছে?"

"টয়লেটের সবখানে প্রিন্ট নেয়া হয়েছে?" লাশের দিকে চেয়েই বললো জেফরি বেগ।

"জি, স্যার।"

"টয়লেটের মেইনগেটে?"

"জি, স্যার।"

"টয়লেটের ভেতরটা চেক করে দেখেছো?"

"জি, স্যার, একদম ক্লিন। শুধু একটি আধখাওয়া সিগারেট পাওয়া গেছে গেটের কাছে। ওটা কালেক্ট করেছি।"

"গুড।" সন্তুষ্ট হলো জেফরি। তার এই সহকারী ছেলেটা এখন বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছে। খুব বেশি কিছু বলতে হয় না। তদন্ত কাজের প্রসিডিংগুলো সে ভালোই রপ্ত করে ফেলেছে।

"ভিক্টিমের পকেট চেক করে মানিব্যাগ, মোবাইল যা যা আছে সব কালেক্ট করে

ফেলো।”

“লাশটা কি মর্গে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবো, স্যার?”

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি বেগ। টয়লেটটা ভালো করে আরেকবার দেখে নিলো। সরকারী স্কুলের মতো নয়, বেশ আধুনিক আর পরিস্কার। টয়লেটে ঢুকলে প্রস্রাবের যে কটু গন্ধ নাকে আসে সেটা আসছে না। খুব বেশি হলে পাঁচ-ছয় বছর আগে এটা নির্মাণ করা হয়েছে। বিশাল বড় একটা ঘর, তাতে সারি সারি কিউবিকল সদৃশ্য টয়লেট। আয়তনে চার ফুট বাই আট ফুট করে হবে একেকটা। কোনো ছাদ নেই। গুনে দেখলো মোট দশটা আছে এরকম দরজা সংবলিত টয়লেট। অন্য পাশে প্রস্রাবের জন্যে একসারি ইউরিনাল-প্যান। আরেক দিকে বেশ কয়েকটা বেসিন। ফ্লোরে টাইলস লাগানো হয় নি তবে বেশ পরিস্কার আর মসৃণ। টয়লেটের দরজাটা বেশ বড়, ভেতরে কোনো জানালা নেই। আট-নয় ফুট উপরে শক্ত গ্রিলের ছোটো ছোটো ভেন্টিলেটর আছে বেশ কয়েকটা।

ফটোগ্রাফার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট টিম আর এভিডেন্স ভ্যানের কর্মীদের রেখেই চুপচাপ টয়লেট থেকে বের হয়ে গেলো জেফরি বেগ।

স্কুল কম্পাউন্ডে তিন-চারটা পুলিশের জিপ এলোমেলোভাবে পার্ক করা। আছে। প্রায় দশ বারোজন পুলিশের লোক জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে মূল ভবনের সামনে। হোমিসাইডের এভিডেন্স ভ্যানটাকে স্কুলের পার্কিংলটে দেখতে পেলো জেফরি।

সকালবেলায় লালা নামের যে সুইপার টয়লেটের ভেতর লাশটা আবিষ্কার করেছে সে হাটু মুড়ে মাটিতে বসে আছে মূল ভবনের সামনে খোলা জায়গায়। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্কুলের দারোয়ান। এখানে ঢোকার সময় জেফরির সাথে লোক দুটোর পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এখন সময় এসেছে তাদের সাথে কথা বলার।

“সালাম সাব,” সুইপার লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বললো।

“তোমার নামটা যেনো কি?”

“সাব, লালা।”

“আর তোমার?” পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ানের দিকে চেয়ে বললো জেফরি।

“আজগর।”

“স্কুলের নাইটগার্ড কে?”

“হাকিম,” ছোট্ট করে বললো আজগর নামের দারোয়ান লোকটা।

“সে এখন কোথায়?”

“ঐ যে, স্যার।” দারোয়ান একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কালোমতো এক লোককে দেখিয়ে বললো।

“তাকে ডাকো।” দারোয়ান লোকটা হাত নেড়ে ইশারা করে হাকিমকে ডাকলো।

স্কুলগুলোতে নাইটগার্ডরা সাধারণত কম্পাউন্ডের ভেতরেই বসবাস করে। সেন্ট অগাস্টিনও এর ব্যতিক্রম নয়। নাইটগার্ডের কাছ থেকে কিছু তথ্য জানা দরকার।

“স্কুলের অফিসে যারা কাজ করে তাদের ডিউটি শেষ হয় কখন?”

জেফরির প্রশ্নটা শুনে আজগরের দিকে তাকালো লালা।

“স্যার, বিকাল পাঁচটায়।”

“হাসান সাহেবকে বের হতে দেখেছিলে তুমি?”

দারোয়ান একটু আমতা আমতা করলো। “স্যার, হাজার হাজার ছাত্রশিক্ষক যাওয়া আসা করে...আমি খেয়াল করি নাই।”

জেফরি জানে স্কুলের দারোয়ান কারোর ঢোকার সময় যতোটা সতর্ক থাকে বের হবার সময় ততোটা থাকে না। প্রায় সব জায়গাতেই এমনটি ঘটে। ঢোকার সময় চেকিং, পাস কিংবা টিকেট দেখা হয়, আর বের হবার সময় এসবের কোনো বালাই নেই। সিনেমাহলগুলোর কথা মনে পড়ে গেলো তার। এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া এখানে এতো বেশি সংখ্যক লোক আসা যাওয়া করে যে কে এলো আর কে বের হয়ে গেলো সেটা মনে

রাখা সত্যি কঠিন। অবশ্য এ বিষয়টা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। সে নিশ্চিত, খুনটা হয়েছে বিকেলের দিকে। কেরাণী লোকটা ডিউটি শেষ করে বাড়ি যাবার সময়ই এটা ঘটেছে। সুতরাং এটা বিকেলের কোনো এক সময়ের ঘটনা। তারপরও জেনে নিতে হবে।

হাসান নামের কেরাণী লোকটা স্কুল কম্পাউন্ড থেকে বের হয় নি। বের হবার আগেই সে মারা পড়েছে। সমস্যা হলো আজ শুক্রবার, স্কুল বন্ধ। তাকে কথা বলতে হবে স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক আর কর্মচারিদের সাথে।

“তোমার নাম কি?” নাইটগার্ড জেফরির সামনে এসে দাঁড়ালে প্রশ্ন করলো সে।

“হাকিম,” লোকটার দু'চোখ জুড়ে ঘুম ভর করেছে। তবে চোখেমুখে ভয়টাই বেশি।

“তুমি ক'টা থেকে ডিউটি দাও?”

“সন্ধ্যা সাতটার পর থিইকা।”

“সন্ধ্যার পর কি তুমি টয়লেটে গেছিলে?”

হাকিম এবার ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো যেনো। ঢোক গিলে তাকালো আজগরের দিকে। একটা অভয় পেতে চাচ্ছে সে।

“স্যার, টয়লেটে তো যাইতেই অয়...আমিও তো ডিউটি শেষ কইরা গেছি,” বললো আজগর মিয়াঁ।

“তুমি টয়লেটে কিছু দেখো নি তখন?”

“আমি পেচ্ছাব করতে গেছিলাম...ছোটো ঘরগুলার ভিতরে ঢুকি নাই...”

মাথা দোলালো জেফরি। “তুমিও গেছিলে, তাই না?”

হাকিম মাথা নেড়ে সায় দিলো।

“কিছু দেখো নি?”

“না, স্যার। যেইটাতে লাশ পাওয়া গেছে সেইটাতে ঢুকি নাই...অইন্যটাতে ঢুকছিলাম।”

এটা ঠিক, টয়লেটের সবগুলো দরজা খুলে চেক করে না দেখলে লাশটা দেখার কথা নয়। কাকতালীয়ভাবে ঐ নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে কেউ ঢুকলেই কেবল লাশটা আবিষ্কৃত হতো। যেটা সকালবেলা লালা নামের সুইপার করেছে।

“রাতের বেলায় কোনো অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছিলো তোমার?”

“না, স্যার,” দৃঢ়ভাবে জবাব দিলো হাকিম।

“তুমি কখন ডিউটি শেষ করেছো?” এবার প্রশ্নটা করা হলো আজগরকে।

“আমার ডিউটি শেষ অয় সন্ধ্যা সাতটার পর।”

একটু চুপ থেকে জেফরি আবার বললো, “স্কুল থেকে সবার শেষে কে বের হয়েছিলো?”

“কিছু ছাত্র...”

“কয়জন?”

“উমমম...সাত-আটজন অইবো?”

“তারা কেন সবার শেষে স্কুল থেকে বের হলো?”

“ওরা রোজই বাস্কেটবল কোর্টে পেকটিস করে, স্যার।”

“ও,” কথাটা বলেই জেফরি তাকালো স্কুলের ভেতরে থাকা বাস্কেটবল কোর্টের দিকে। ভাবলো, কতোদিন বাস্কেটবল খেলা হয় না! আপন মনে মুচকি হাসলো সে। “তারপর তুমি কি করলে?”

“প্রতিদিন যা করি, স্যার। সবগুলা রুমের দরজা তালা মাইরা বারিন্দার বাত্তি জ্বালাইয়া দিই। তারপর হাকিম আইলে আমি আমার ঘরে চইলা আসি।”

“তুমি কি টয়লেটটাও চেক করেছিলে?”

“না, স্যার...টয়লেট তো চেক করি না। ওইটা খোলাই থাকে সব সময়।”

জেফরি এবার ফিরলো সুইপারের দিকে। “লালা, তুমি কি স্কুলেই থাকো?”

“না, সাব। সুইপার কলোনিতে থাকি,” লালা বললো।

"ক'টা থেকে তোমার ডিউটি?"

"সকাল ছয়টা থিকা, সাব।"

"তাহলে তুমি সকাল ছ'টার সময় লাশটা দেখতে পেয়েছো?" মাথা চুলকালো লালা। "না, সাব...সাতটার পরে হইবো।"

"স্যার, ওই তো শুক্কুরবারে দেরি কইরা আসে," আগ বাড়িয়ে বললো আজগর।

"ও," জেফরি বললো। লালা নামের সুইপারের দিকে ভালো করে তাকালো সে। লোকটার দু'চোখ লাল টকটকে। চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে ফেললো। হালকা একটা দুর্গন্ধ এসে লাগলো তার নাকে। বুঝতে পারলো, এটা বাংলা মদের গন্ধের মতো।

"তুমি মদ খেয়েছো?"

লালা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। ভয়ে ঢোক গিললো সে।

"স্যার, ওই প্রতিদিন রাইতে একটু তাড়ি খায়," আজগর আবারো এগিয়ে এসে লালার হয়ে কথা বললো।

লজ্জায় কাচুমাচু লালা নামের হরিজন সম্প্রদায়ের লোকটা।

জেফরি বেগ লক্ষ্য করলো লালার ফ্যাকাশে লাল টি-শার্টের বুকের কাছে, লালচে একটা ছোপ। মেয়েমানুষের লিপস্টিকের দাগ? হতে পারে।

রেবার সাথে তার প্রেম হবার শুরুর দিকে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেলো তার। ক্লাস শেষে ক্যাম্পাসে ডেটিং করতো তারা। সন্ধ্যার দিকে রিক্সা নিয়ে ফুলার রোডে খামোখাই চক্কর দিতো আর পাগলের মতো চুমু খেতো দু'জনে। রেবার প্রিয় একটা কাজ ছিলো জেফরির বুকে মুখ ঘষা। এক পহেলা ফাল্গুনের সন্ধ্যায় তারা রিক্সায় করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘুরে বেড়াচ্ছিলো আর ফাঁকে ফাঁকে চলছিলো চুম্বন। হলুদ শাড়ি পরে বেশ সেজেগুজে এসেছিলো রেবা। খোপায় ছিলো বেলি ফুলের মালা। তো ডেটিং শেষে সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলে তাদের বাপ-ছেলের যে বাড়ি ছিলো সেখানে ফিরে যেতেই মুখোমুখি হলো ফাদার হোবার্টের। ফাদার বাই-ফোকাল লেন্সের চশমার উপর দিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। জেফরি প্রথমে বুঝতে পারে নি। সে তো বাড়ি ফেরার আগে ভালো করে রুমালে মুখ মুছে এসেছে, রেবার প্রেমের কোনো স্মারকচিহ্ন বয়ে আনার প্রশ্নই ওঠে না!

একটু পরই তার ভুল ভাঙলো। ফাদার জেফরি হোবার্ট তাকে ডেকে শার্টের বাম বুকের কাছে ছোপ ছোপ লাল রঙের দাগ দেখিয়ে গম্ভীর মুখে বলেছিলো, "হু ডিড ইট, জেফ?" দারুণ ভড়কে গেছিলো জেফরি বেগ। তবে কিছু বলার আগেই ফাদার মুচকি হেসে বলেছিলো, "আই ওয়ান্ট টু মিট দ্যাট ক্রেজি লিটল লেডি!" কথাটা বলেই জেফরির বুকে আলতো করে একটা পাঞ্চ মেরে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিলো ফাদার।

"স্যার?"

জামানের কথায় বাস্তবে ফিরে এলো জেফরি বেগ।

"স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল আপনার সাথে কথা বলতে চাইছেন।"

অধ্যায় ৪

সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যাল অরুণ রোজারিও নিজের অফিসে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। দুশ্চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়ে গেছে ভদ্রলোকের, যেনো এই মুহূর্তে কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। দেখতে মোটাসোটা হলেও মনের দিক থেকে একেবারেই দুর্বল একজন মানুষ। জেফরি আর জামান তার

অফিসে ঢুকতেই ভদ্রলোক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

"উনি আমাদের চিফ ইনভেস্টিগেটর," প্রিন্সিপ্যালের উদ্দেশ্যে বললো জামান। খেয়াল করলো প্রিন্সিপ্যাল ভদ্রলোক জেফরির দিকে চেয়ে আছেন একদৃষ্টে।

"আমি-"

"আরে জেফ...তুমি!" হাত বাড়িয়ে নিজের নামটা বলার আগেই জেফরিকে অবাক করে দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল বলে উঠলেন।

প্রিন্সিপ্যালের বয়স চল্লিশের বেশি হবে না, তবে ভুড়ি আর মাথর চুল কমে যাওয়ার কারণে তাকে আরো বেশি বয়স্ক দেখায়। জেফরিকে সরাসরি তুমি বলায় সে কিছুটা অবাক হলো। পত্রপত্রিকার বদৌলতে তাকে অনেকেই চেনে কিন্তু তাই বলে তুমি সম্বোধন করবে!

"আমাকে চিনতে পারো নি?" প্রিন্সিপ্যাল এবার হেসে বললেন।

"সরি?" জেফরি চিনতে পারছে না।

"আমি!...তোমার অরুণদা!" কথাটা বলেই জেফরির হাত ধরে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিলেন তিনি, যেনো ঝাঁকুনি দিয়ে তার ঘুমন্ত স্মৃতিটা জাগিয়ে তুলতে চাইছেন। "এইটি-সিক্স ব্যাচ...ডিবেটিংক্লাবের প্রেসিডেন্ট...তোমাকে সাইকেল চালানো শিখিয়েছিলাম?"

চট করে স্মৃতির পাতা ভেসে উঠলো জেফরির চোখের সামনে। হালকা পাতলা গড়নের এক তরুণ; মাথা ভর্তি ঘন কোকড়া চুল; স্কুলের সিনিয়র ভাই; বেশ ভালো ছাত্র; ডিবেটিংক্লাবের প্রেসিডেন্ট...আরো কতো কি। তাকে স্কুল কম্পাউন্ডে সাইকেল চালানো শিখিয়েছিলেন। খুব স্নেহ করতেন। তার বাবা ফাদার জেফরি হোবার্টের প্রিয় ছাত্র।

"কিন্তু আপনাকে দেখে তো চেনাই যাচ্ছে না, অরুণদা!" এবার জেফরির মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

"কী করে চিনবে?...এতো বছর পর দেখা...আগের চেয়ে কতো মোটা হয়ে গেছি, মাথার সব চুলও পড়ে গেছে। আমার বন্ধুরাই তো আমাকে চিনতে পারে না প্রথম দেখায়!" বলেই হেসে ফেললেন অরুণদা নামের প্রিন্সিপ্যাল লোকটা।

এরপর নিজের চেয়ারে বসলেন প্রিন্সিপ্যাল, জেফরি আর জামান বসলো তার বিপরীতে। টানা দশ মিনিট ধরে চললো দু'জনের কথাবার্তা। সেইসব কথাবার্তার বেশীরভাগ জুড়েই থাকলো পুরনো স্মৃতি রোমন্থন। জেফরি দু'বছরের জন্যে দেশের বাইরে ছিলো, তারও প্রায় পাঁচ বছর আগে থেকে অরুণদার সাথে তার কোনো যোগাযোগ হয় নি। তিনিও দীর্ঘদিন মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে শিক্ষকতা করেছেন। জেফরির বাবা, ফাদার জেফরি হোবার্টের মৃত্যুর কথা দেশে এসেই শুনেছিলেন; খুব কষ্ট পেয়েছেন; ফাদার কতো ভালো মানুষ ছিলেন সেসব কথা বলতে লাগলেন তিনি।

জামান চুপচাপ শুনে গেলো তাদের কথাবার্তা। প্রিন্সিপ্যাল লোকটাকে প্রথমে দেখে গুরুগম্ভীর মনে হয়েছিলো তার কিন্তু এখন মনে হচ্ছে লোকটা বেশ প্রাণখোলা। কিছুক্ষণ পরই তাদের কথাবার্তা মোড় নিলো বর্তমান সঙ্কটের দিকে।

"আমি ভাবতেই পারছি না আমার স্কুল কম্পাউন্ডে আমারই একজন কর্মচারি এভাবে খুন হলো...মাইগড!" এবার হাসি হাসি ভাবটা উধাও হয়ে গেলো প্রিন্সপ্যালের মুখ থেকে। "ঢাকা শহরে যতোগুলো স্কুল আছে তার মধ্যে আমার স্কুলের নিরাপত্তাই সবচেয়ে কড়া। এখানে হুটহাট করে কেউ ঢুকতে পারে না।"

“আমিও সেরকমই জানি। ভিআইপি লোকজনের সন্তানেরা পড়াশোনা করে। নিরাপত্তাও বেশ ভালো, জেফরি সায় দিয়ে বললো।

“এই স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে গতকাল পর্যন্ত ছোটোখাটো কোনো ঘটনাও ঘটে নি। সামান্য মারামারি পর্যন্ত না। বোঝো এবার, কি সমস্যায় পড়েছি!”

“হুম,” জেফরি আর কিছু বললো না। ক্রাইমসিনে পরিচিত লোকের দেখা পেলে তার মধ্যে একধরণের অস্বস্তি তৈরি হয়। কারণ পরিচিত লোকজন তার কাছ থেকে বাড়তি আনুকূল্য পাবার আশা করে। এদিকে নিজের প্রফেশনের ব্যাপারে কোনো আপোষকামীতা জেফরির মধ্যে দেখা যায় না, ফলে একটা টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়।

“বাইরে থেকে যারা আসে, আই মিন, ভিজিটরদের কি রেজিস্টার করার ব্যবস্থা আছে এখানে?” জেফরির পাশে বসা জামান প্রশ্নটা করলো প্রিন্সিপ্যালকে। এরকম পরিস্থিতিতে জেফরি বেগ যে অস্বস্তিতে পড়ে সেটা তার সহকারী ভালো করেই জানে।

“আহা, এটা তো কোনো অ্যাপার্টমেন্ট না...এখানে প্রায় দু’হাজারের মতো ছাত্র আছে, আরো আছে একশ’র মতো শিক্ষক, কর্মচারির সংখ্যাও ত্রিশের নীচে হবে না। তারপর ধরো গার্জিয়ানরা তো আছেই...” প্রিন্সিপ্যাল অরুণ রোজারিও দু’পাশে মাথা দোলালেন।

জামানের মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। এই লোকটা তাকেও তুমি করে সম্বোধন করছে! তার স্যারের সাথে না হয় আগে থেকে পরিচয় আছে, তার সাথে তো নেই। যাকে তাকে যখন তখন তুমি বলতে অভ্যস্ত এই লোক, বুঝতে পারলো জামান।

“তাহলে স্কুলে ঢোকার সময় কিভাবে চেকিং করা হয়?” আস্তে করে বললো জেফরি।

“সবার কাছেই আইডি-কার্ড থাকে,” বললেন অরুণ রোজারিও।

“ছাত্রদেরও?” জামান বললো।

“সাবার কাছেই আইডি-কার্ড থাকে। কার্ড না থাকলে কাউকে স্কুলে ঢুকতে দেয়া হয় না। এ ব্যাপারে আমি খুব কড়া। আমার আগের প্রিন্সিপ্যাল এসব খুব একটা তোয়াক্কা করতেন না কিন্তু আমি অনেক স্ট্রিক্ট।” চোখেমুখে কাঠিন্য ভাব চলে এলো প্রিন্সিপ্যালের।

“ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারি আর গার্জিয়ান ছাড়া অন্য কোনো লোক কি স্কুলে ঢুকতে পারে না?” জানতে চাইলো জেফরি বেগ।

“উমমম...পারে, তবে সেক্ষেত্রে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসতে হয়।”

“গতকাল কি এরকম কেউ এসেছিলো?” জামানের কথার জবাবে প্রিন্সিপ্যাল চট করে জবাব দিলেন, “না।”

“কোনো শিক্ষক কিংবা কর্মচারির সাথে তাদের পরিচিত লোকজন দেখা করতে হলেও কি আপনার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিতে হয়?”

জেফরি বেগের এই প্রশ্নটা শুনে প্রিন্সিপ্যাল অরুণ রোজারিও চুপ মেরে গেলেন। এটা তার মাথায়ই ছিলো না। ভেবে পাচ্ছেন না কী বলবেন।

“এটা মনে হয় এর আগে ভাবেন নি, অরুণদা?” ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যাল।

এটাই হয়, মনে মনে বললো জেফরি। নিরাপত্তার বিষয়টা এতো সহজ না। এটার জন্যে এক্সপার্টদের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু এ দেশের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বিষয়ক ব্যাপারগুলো কর্তাব্যাক্তিরাই ঠিক করে দেন, ফলে অনেক ফাঁকফোকর থেকে যায় সেই ব্যবস্থায়। সেন্ট অগাস্টিনের মতো অভিজাত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বেলায়ও সেটাই ঘটেছে। এখানকার কর্তাব্যক্তি, তার গ্রেগোরিয়ান ভাই নিজেই ঠিক করেছিলেন কি ধরণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হবে। হয়তো খুনি কিংবা খুনিরদল এই ফাঁকফোকর ব্যবহার করেই এখানে ঢুকে পড়েছে।

“হাসান সাহেব লোক হিসেবে কেমন ছিলেন?” জেফরি জানতে চাইলো।

“খুব ভালো...চুপচাপ স্বভাবের...স্কুলের সবাই তাকে পছন্দ করতো।”

“স্কুলের কারো সাথে কি তার কোনো ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিলো কখনও?”

"না।" ছোট্ট করে বললেন প্রিন্সিপ্যাল। বুঝতে পারলেন না মিথ্যেটা বলে ভুল করলেন কিনা।

"তার পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলতে হবে," জেফরি আনমনে বললো কথাটা।

"কলিগদের সাথেও।"

অনেকক্ষণ চুপ থেকে প্রিন্সিপ্যাল জানতে চাইলেন, "খুনটা কে করতে পারে বলে মনে করছো?"

"এখনও তদন্ত শুরুই করি নি, এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়। আগে তদন্ত করে দেখি..." বললো হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ।

"তবে আমি নিশ্চিত, বাইরে থেকে কেউ ভেতরে ঢুকে এ কাজ করে নি। দারোয়ান দের সাথেও কথা বলেছি। তারাও আমাকে জানিয়েছে গতকাল কোনো বহিরাগত এখানে ঢোকে নি।" বেশ জোর দিয়ে বলে গেলেন প্রিন্সিপ্যাল অরুণ রোজারিও।

তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো জেফরি বেগ। "তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন খুনটা করেছে স্কুলের ভেতরের কেউ?"

প্রিন্সিপ্যাল যেনো ভিমরি খেলেন। নিজের চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। "না, না। স্কুলের কেউ এ কাজ করতে যাবে কেন?"

"আপনিই তো বললেন গতকাল কোনো বহিরাগত এখানে প্রবেশ করে নি। তাহলে কাজটা নিশ্চয় ভেতরের কেউ করেছে?"

"না, না। আমার স্কুলে খুনখারাবি করার মতো কোনো লোক থাকবে এটা অবিশ্বাস্য! প্রশ্নই ওঠে না।"

"তাহলে খুনটা কে করলো?"

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারলেন না।

"এটা নিয়ে আপনি ভাববেন না, আমরা দেখি তদন্ত করে...খুনি অবশ্যই ধরা পড়বে।"

"কিন্তু আমার স্কুলের রেপুটেশনের কী হবে, ভাই?" অসহায়ের মতো বললেন প্রিন্সিপ্যাল।

এটা একটা বিরাট সমস্যা। জেফরি জানে এই খুনের ঘটনা আগামীকাল পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হবার আগেই স্কুলের সুনাম মারাত্মকভাবে হোঁচট খাবে। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকেরা ছুটে আসবে এখানে। বিকেল কিংবা সন্ধ্যার খবরে সবাই জেনে যাবে সেন্ট অগাস্টিন স্কুলের ভেতরে তাদেরই এক কর্মচারি ভয়ঙ্করভাবে খুন হয়েছে।

"অরুণদা, মিডিয়ার ব্যাপারটা আমার হাতে নেই। ওদেরকে কিভাবে সামলাবেন আপনিই ঠিক করে নিন," জেফরি বললো।

"তুমি বুঝতে পারছো আমার স্কুলের কি হবে? ঐ সেনসেশন-মঙ্গার জর্নালিস্টরা এই স্কুলের বারোটা বাজিয়ে দেবে!"

জেফরি নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। সেও জানে কথাটা ঠিক। কিন্তু সাংবাদিক সামলানোর মতো কাজ সে নিজেও ভালোমতো করতে পারে না।

"আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, আমাদের হোমিসাইডের পক্ষ থেকে মিডিয়ার কাছে কিছু বলা হবে না," আস্তে করে বললো জেফরি বেগ।

দু'পাশে মাথা দোলাতে লাগলেন প্রিন্সিপ্যাল।

"আই অ্যাম ফিনিশড!"

"অরুণদা, একটা কথা বলি?" জেফরির দিকে মুখ তুলে তাকালেন ভদ্রলোক। "এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমাদেরকে সর্বোচ্চ সহযোগীতা করুন...খুনটা কে বা কারা করেছে সেটা বের করতে দিন...তাহলেই মনে হয় ড্যামেজ কন্ট্রোল করা সম্ভব হবে। ভুলেও কয়েক দিনের জন্যে স্কুল বন্ধ করার মতো বোকামি করবেন না। একেবারে স্বাভাবিক আচরণ

করুন।” একটু চুপ থেকে আবার বললো সে, “এছাড়া আর কোনো সহজ পথ দেখছি না।”

“তুমি যা বললে তাই হবে। আমি তোমাকে সব ধরণের সহযোগীতা করবো, জেফ,” বললেন প্রিন্সিপ্যাল।

“আজ তো স্কুল বন্ধ, আমি আগামীকাল আসবো, এখানকার সমস্ত কর্মচারি আর ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে কথা বলবো।”

অরুণ রোজারিওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

“ছাত্র?!” অস্থির হয়ে বললেন তিনি, “ছাত্রদের আবার এরমধ্যে টেনে আনার কী দরকার? এমনিতেই স্কুলের রেপুটেশন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার উপর এখানকার অল্পবয়সী ছাত্রদের যদি খুনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাহলে কী হবে বুঝতে পারছো?”

জেফরি চুপ মেরে রইলো। কথাটা ঠিক। এই স্কুলে পড়াশোনা করে সমাজের সবচাইতে ধনী আর ক্ষমতাবানদের সন্তানেরা। তারা নিজেদের অল্পবয়সী সন্তানদেরকে এমন অবস্থার মুখোমুখি করতে চাইবে না।

“দয়া করে আমার ছাত্রদের কি এসব থেকে দূরে রাখা যায় না?”

অরুণ রোজারিওর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে জেফরির মায়া লেগে গেলো। “ঠিক আছে, তাদেরকে আপাতত জিজ্ঞেস করবো না কিন্তু তদন্ত করতে গিয়ে যদি আমার কাছে মনে হয় কিছু ছাত্রকেও জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার আছে তখন...?”

কপালের ডান পাশটা চুলকে নিলো প্রিন্সিপ্যাল অরুণ রোজারিও। “এরকম কিছুর দরকার হবে না, আমি নিশ্চিত। আর যদি হয়, সবার আগে আমাকে জানাবে। আমার সামনে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তুমি।”

একটু ভেবে নিলো জেফরি। কথাটার প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলো সে কিন্তু আগেভাগে এ নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। প্রয়োজন পড়লে জেফরি যে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, এরজন্যে কারোর কোনো অনুমতি নেবার দরকার নেই।

“ঠিক আছে, যখন প্রয়োজন পড়বে তখন দেখা যাবে,” বললো সে। “তবে আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, তদন্ত কাজটা এমনভাবে করবো যেনো স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত না হয়। কোনো রকম ভীতি ছড়াক সেটা আমিও চাইবো না। এই তদন্ত কাজটা করার সময় আমার কাছে এই স্কুলের দু’হাজার ছাত্রের স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে, এটা আমি আপনাকে বলতে পারি।”

“থ্যাঙ্কস, ভাই,” প্রিন্সিপ্যাল কিছুটা আশ্বস্ত হলেন।

“এখন আপনাকে একটা কথা বলি, মন দিয়ে শুনুন। মিডিয়া এবং গার্জিয়ানদের কাছে বলবেন, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও এখানে একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। সেটা হত্যা নাকি আত্মহত্যা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। স্কুলের ছাত্রদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনো আশংকা নেই। আগের চেয়ে আরো কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার সাথে স্কুল কর্তৃপক্ষ সর্বাত্মক সহযোগীতা করে যাচ্ছে আসল ঘটনা বের করার জন্যে। এ কাজে সবাই যেনো সহযোগীতা করে।”

এক নিঃশ্বাসে বলে গেলো জেফরি। যেনো পুরোটাই তার মুখস্ত করা ছিলো। পাশে বসা সহকারী জামানের কাছে মনে হলো তার বস কোনো প্রেসরিলিজ পড়ে শোনাচ্ছে।

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সায় দিলেন প্রিন্সিপ্যাল অরুণ রোজারিও।

“ভুলেও বলবেন না খুন হয়েছে। ঠিক আছে?”

“ঠিক আছে, জেফ।”

“তাহলে আমরা এখন উঠি?”

নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে করমর্দন করলেন প্রিন্সিপ্যাল অরুণ রোজারিও। বিদায় দেবার আগে নিজেদের মধ্যে ফোন নাম্বার বিনিময় করে নিলো তারা।

.

পাঁচ মিনিট পর জেফরি আর তার সহকারী জামান সেন্ট অগাস্টিন স্কুলের বাইরে এসে দাঁড়ালো। জুম্মার নামাজের আজান দেয়া হচ্ছে। রাস্তায় ইতিমধ্যেই কিছু মুসল্লিকে দেখা যাচ্ছে মসজিদের দিকে যেতে। এরা মসজিদে গিয়ে খুতবা শোনার জন্যে আগেভাগে রওনা হয়েছে।

"স্যার, এখন কি অফিসে যাবেন?"

সহকারী জামানের দিকে ফিরে তাকালো জেফরি।

"না। আমি বাসায় যাবো। শুটিংরেঞ্জ থেকে তো এখানে চলে এসেছি, গোসল করা হয় নি।"

"তাহলে আপনি বাসায় চলে যান, আমি লাশ নিয়ে মর্গে যাই, ডাক্তারকে কিছু ইন্সট্রাকশন দিয়ে আমিও বাড়িতে চলে যাবো। আজ বোধহয় জুম্মার নামাজ কাজা হয়ে যাবে।"

জেফরি জানে জামান নিয়মিত নামাজ না পড়লেও জুম্মার নামাজ ঠিকই পড়ে। "এক কাজ করো, অফিসের গাড়িটা তুমি নিয়ে যাও। তাহলে তাড়াতাড়ি কাজ করে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে, হয়তো নামাজ পড়ারও সময় পাবে। কাল অফিসে আলাপ হবে, ওকে? "

"স্যার, আপনি কিভাবে যাবেন?"

"আমি একটা রিক্সা নিয়ে চলে যাবো।"

জামান আর কিছু বললো না। সে জানে তার বস্ একবার এরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে সেটা আর পাল্টায় না। এর আগে অনেকবারই এরকম হয়েছে। চুপচাপ অফিসের গাড়িতে উঠে বসলো সে।

জামানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে চার রাস্তার মোড়ে চলে এলো জেফরি। একটা খালি রিক্সা পেয়ে তাতে উঠে বসতেই পকেটে থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে রেবাকে একটা মেসেজ পাঠালো সে।

প্রোগ্রাম চেঞ্জ। ৪টা বাজে। ওকে?...এল.ইউ!

রিক্সাটা কিছুদূর যেতেই তার মোবাইলটা বিপ্ করে উঠলো। রেবার রিপ্লাই!

আই হেইট ইউ!

অধ্যায় ৫

অরুণ রোজারিও স্মরণ করতে পারলেন না ঠিক কতো দিন পর চার্চে এলেন। কাকরাইলের ক্যাথলিক চার্চের ভেতর ঢুকেই তার মনটা প্রশান্তিতে ভরে উঠলো। মনে মনে ভাবলেন, নিয়মিত চার্চে আসা উচিত ছিলো তার। অন্তত মনের প্রশান্তির জন্যে হলেও।

চার্চের তরুণ ব্রাদার এরিক গোমেজ বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে ঝাড়ামোছার কাজ তদারকি করছিলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন চার্চের প্রধান দরজা দিয়ে কেউ ঢুকছে। ফিরে তাকাতেই অবাক হলেন ব্রাদার।

অরুণ রোজারিও!

কিছুদিন আগে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে ভদ্রলোকের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন, সেইসূত্রে নিজের এক ভাগ্নেকে সেন্ট অগাস্টিনে ভর্তি করানোর জন্যে তার সাথে দেখাও করেছিলেন, ফলে লোকটাকে তিনি ভালোমতোই চেনেন। তবে তাকে কখনও চার্চে দেখেন নি। মনে করেছিলেন আজকালকার অনেক শিক্ষিত খৃস্টানের মতো অরুণ রোজারিও ঈশ্বরবিমুখ একজন মানুষ।

"কেমন আছেন, স্যার?" অরুণ রোজারিওকে চার্চের বেদীর সামনে আসতে দেখে ব্রাদার এরিক নিজেই এগিয়ে এসে বললেন।

"ভালো না, ব্রাদার," বিমর্ষ হয়ে বললেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব। তার কথা শুনে ভুরু কুচকালেন এরিক গোমেজ।

"মনে হচ্ছে আপনার ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রয়োজন আমার।"

"আমার ঈশ্বর আপনারও ঈশ্বর, স্যার। তিনি আমাদের সবার প্রভু," বুকের কাছে দু'হাত জোর করে স্মিত হেসে বললেন ব্রাদার।

"আমাদের সবারই তার আশীর্বাদের প্রয়োজন রয়েছে।"

"কিন্তু আমার এখন ভীষণ প্রয়োজন," দৃঢ়ভাবে বললেন অরুণ রোজারিও।

প্রিন্সিপ্যালের সাথে করমর্দন করে তাকে একটা বেঞ্চিতে বসতে দিলেন ব্রাদার। "কি হয়েছে, স্যার?"

তার স্কুলে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনাটা সংক্ষেপে জানালেন তিনি। দুপুরের পর থেকে কমপক্ষে বিশটা ফোন পেয়েছেন বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকদের কাছ থেকে। তারপর থেকেই অস্থির হয়ে উঠেছেন। একেবারে মুষড়ে পড়েছেন তিনি। এমন আপদের সময় মনটা একটু ধীরস্থির করার জন্যে বৌয়ের পরামর্শে চলে এসেছেন চার্চে, সেটাও বললেন ব্রাদারকে।

"ভালো করেছেন, স্যার," অভয় দিয়ে বললেন ব্রাদার এরিক। "মনের প্রশান্তির জন্যে প্রভুর কাছে আত্মসমর্পনের কোনো বিকল্প নেই। আশা করি তিনি আপনার সমস্ত অশান্তি আর দূর্যোগ দূর করে দেবেন।"

"ব্রাদার, আমি একটা কনফেশন করতে চাই," বেশ শান্তকণ্ঠে বললেন। অরুণ রোজারিও।

এরিক গোমেজ একটু অবাক হলেন। কনফেশন করতে চাইলে চুপচাপ কনফেশনাল বুথে চলে গেলেই তো হয়। তাকে কেন জিজ্ঞেস করছে! "আমাদের ফাদার আছেন, আপনি কনফেশনাল বুথে গিয়ে তার কাছে-"

"না, না। আমি আপনার কাছেই কনফেশন করতে চাই," ব্রাদারের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন অরুণ রোজারিও। "ব্যাপারটা ওরকম আনুষ্ঠানিক কিছু না। শুধু আপনার কাছে কথাটা বলে মনের ভার কিছুটা লাঘব করতে চাইছি।"

একটু চুপ থেকে ব্রাদার এরিক বললেন, "ঠিক আছে, বলুন কী বলবেন।"

"ব্রাদার, আজকের খুনের ঘটনায় তদন্তকারী অফিসারের কাছে আমি একটা মিথ্যে বলে ফেলেছি।"

ব্রাদার এরিক একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আপনি কি জানেন খুনটা কে করেছে?"

“আরে না, না। ব্যাপারটা সেরকম কিছু না। অফিসার আমার স্কুলের এক জুনিয়র ভাই। তার নানান প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে একটু মিথ্যে বলতে হয়েছে আমাকে…কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেই মিথ্যেটা আমার জন্যে বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে। এটা ভেবে আমার মন অস্থির হয়ে উঠেছে।”

মাথা নেড়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন ব্রাদার। “এটার তো খুব সহজ সমাধান আছে…” অরুণ রোজারিও কপালে ভুরু তুললেন। “…যার কাছে। মিথ্যেটা বলেছেন তাকে গিয়ে সত্যটা বলে দিন। আশা করি তিনি ব্যাপারটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই দেখবেন।”

আক্ষেপে নিঃশ্বাস ফেললেন সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যাল। “ব্রাদার, দু’ঘণ্টা আগেও এই কাজটা করা আমার জন্যে খুব সহজ ছিলো কিন্তু এখন সেটা সম্ভব নয়।”

“কারণটা কি আমি জানতে পারি?”

স্থিরচোখে ব্রাদারের দিকে চেয়ে রইলেন অরুণ রোজারিও। কিছুক্ষণ ভেবে দু’পাশে মাথা দুলিয়ে অবশেষে বললেন, “না, ব্রাদার…আপনি শুধু আমার জন্যে আশীর্বাদ করতে পারেন। রাইট নাও, দ্যাট ইস দ্য অনলি থিং ইউ ক্যান ডু ফর মি…জাস্ট প্রে ফর মি, ব্রাদার।”

অধ্যায় ৬

পেপের জুসে স্ট্র দিয়ে একটা ঘূর্ণি সৃষ্টি করে যাচ্ছে রেবা। তার মুড অফ। জেফরি বুঝতে পারছে না, তাদের ডেটিংয়ের সময়টা সামান্য পিছিয়ে দেয়ার কারণে রেবা এতোটা মনোক্ষুণ্ণ হচ্ছে কেন। শাড়ি পরে আসার কথা ছিলো, সেটাও পরে নি। একেবারে সাধারণ সালোয়ার-কামিজ পরে চলে এসেছে। জেফরি বুঝতে পারছে না ঠিক কী কারণে রেবা এমন করছে। দেখা হবার পর থেকেই তাকে অন্যমনস্ক লাগছে।

"সরি।"

রেবা কিছুটা চমকে উঠলো কথাটা শুনে। তারা বসে আছে একটা দোতলা রেস্টুরেন্টের এককোণে। বিশাল কাঁচের দেয়াল দিয়ে নীচের রাস্তার যানবাহনের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। রেস্টুরেন্টের ভেতরে ধীরে ধীরে বাড়ছে। লোকজনের আনা গোনা।

"সরি কেন?" অবাক হয়ে জানতে চাইলো রেবা।

"আসলে হঠাৎ করে খবর এলো একটা খুন হয়েছে, তাই...বুঝতেই পারছো..."।

"কোথায় খুন হয়েছে, অনেকটা নির্লিপ্তভাবে জানতে চাইলো রেবা। তার চোখ আবার নিবদ্ধ জুসের গ্লাসের দিকে।

"সেন্ট অগাস্টিন স্কুলে।"

"ও।" জুসের গ্লাসের দিকে তাকিয়েই বললো সে।

অবাক হলো জেফরি। সাধারণত নতুন কোনো কেসের ব্যাপারে রেবার খুব আগ্রহ থাকে। অনেক কিছু জানতে চায়। কিন্তু আজকে তার আচরণ মোটেও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

"কোনো কারণে কি তোমার মুড অফ?" আস্তে করে মাথা নেড়ে সায় দিলো রেবা, এখনও সে চোখ তুলে তাকালো

"কি হয়েছে?"

এবার চোখ তুলে তাকালো রেবা কিন্তু সেই চোখ আদ্র।

"আহা, এরকম কোরো না, প্লিজ। আমাকে বলল কি হয়েছে," রেবার একটা হাত ধরে বললো জেফরি।

"বাবা..."

একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। "আবার কোনো ঝামেলা করেছেন?"

দু'পাশে মাথা দোলালো রেবা।

"তাহলে?"

"বাবার ডায়াগনোসিসের রেজাল্টে খুব খারাপ একটা..." রেবার কণ্ঠটা ধরে এলো।

"খারাপ কি?" চিন্তিত হয়ে উঠলো জেফরি।

"থ্রোট ক্যান্সার ধরা পড়েছে।" রেবার আদ্র চোখ এবার পাবিত হলো। ওহ! "কখন জানতে পারলে?"

"রিপোর্টটা বাবা পেয়েছিলেন আরো তিন-চার দিন আগে...আমাদের কিছু বলেন নি। লুকিয়ে রেখেছিলেন।"

"তারপর?"

"দুপুরের খাওয়া-দাওয়া করার কিছুক্ষণ পরই রিপোর্টটা মা খুঁজে পান। এখন তো মনে হচ্ছে বাবার চেয়ে মা-ই বেশি অসুস্থ হয়ে পড়বেন।"

রেবাকে কাছে টেনে এনে রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে দিলো জেফরি। অনেক শান্ত্বনা দিয়ে বোঝালো এমন সময় রেবাকে ভেঙে পড়লে চলবে না। তাকে শক্ত হতে হবে। ভালো চিকিৎসা পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তার বাবার এখন বেটার ট্রিটমেন্টের দরকার।

এভাবে চলে গেলো দশ মিনিট। জুসের গ্লাস দুটো পড়ে রইলো টেবিলের উপর। নতুন কোনো খাবারের অর্ডারও দেয়া হলো না আর। অনেকক্ষণ কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে রইলো তারা দুজন।

শনিবার দিন হোমিসাইডে আসার আগেই জেফরি বেগ সকালের পত্রিকা পড়ে জেনে গেছে সেন্ট অগাস্টিন স্কুলের হত্যাকাণ্ড নিয়ে মিডিয়া কি রকম প্রতিক্রিয়া করেছে। অবাক হয়েছে সে, গতকাল সন্ধ্যার পর কোনো টিভি চ্যানেলে খবরটা দেখানো হয় নি। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এমন খবর মিস্ করলো কি করে, ভেবে পায় নি। তবে শেষ রাতে টিভিতে একটা খবর দেখে সবটাই বুঝতে পেরেছিলো।

গতকাল শুক্রবার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তার কারারুদ্ধ স্বামীকে ডিভোর্স দিয়েছেন। সবাই জানে এর আগেরবার ক্ষমতায় থাকার সময় স্ত্রীর নাম ভাঙিয়ে তার স্বামী যে দুর্নীতি করেছে, যার কারণে জনগনের কাছে ধিকৃত হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আর তার দল, সে কারণেই এই ডিভোর্স। কিন্তু আসল সত্যিটা হাতেগোনা কয়েকজন লোকই জানে, আর জেফরি বেগ জানে তারচেয়েও বেশি।

একটি জঘন্য রাজনৈতিক হত্যার ষড়যন্ত্র।

এই লোকের দুর্নীতির কারণে দল আর সরকারের ভরাডুবি ঘটে, পরের নির্বাচনে বিরোধীদল চলে আসে ক্ষমতায়। তারপর থেকেই দুর্নীতির অভিযোগে জেল খাটতে শুরু করে মি: টেন পার্সেন্ট খ্যাত প্রধানমন্ত্রীর স্বামী হায়দার আলী। অনেকে অবশ্য তাকে বাবর আলী নামেও ডাকতো।

অবৈধ পথে অর্জিত হাজার কোটি টাকার মালিক হায়দার আলী দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর জেল খাটার পর যখন বুঝতে পারে তার স্ত্রী তাকে ডিভোর্স করার চিন্তাভাবনা করছে এবং সামনের নির্বাচনে ভদ্রমহিলা জয়লাভ করতে পারবে না, তখনই ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র ফেঁদে বসে।

গত নির্বাচনের ঠিক আগে, জেলে বসে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে কুখ্যাত সন্ত্রাসী ব্ল্যাক রঞ্জুকে দিয়ে। এরফলে স্ত্রীকে যেমন সরিয়ে দেয়া যেতো সেইসাথে জনগনের আবেগকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে জয় লাভও করা সম্ভব হতো। কিন্তু সবটাই ভণ্ডুল হয়ে যায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর এক ঘনিষ্ঠ লোকের পাল্টা এক ষড়যন্ত্রে। দৃশপটে আর্বিভূত হয় ঠাণ্ডা মাথার এক পেশাদার খুনি বাস্টার্ডের। সেই খুনি ব্ল্যাক রঞ্জুর দলকে একাই বিনাশ করতে শুরু করে। বেশ কয়েকটি খুনের ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে জেফরি বুঝতে পারে এরমধ্যে কিছু একটা আছে। তবে শেষ পর্যন্ত সে নিজেও ঢুকে পড়ে বিরাট সেই ষড়যন্ত্রের ভেতরে।

শেষ পর্যন্ত সফলভাবে ব্ল্যাকরঞ্জু আর সেই পেশাদার খুনি বাস্টার্ডকে জীবিত ধরতে সক্ষম হয় জেফরি বেগ। কিন্তু কয়েক মাস জেল খাটার পরই পেশাদার খুনি বাস্টার্ড ক্ষমতাসীন দলের আনুকূল্য পেয়ে জামিনে মুক্ত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। জেফরির ধারণা বিদেশে চলে গেছে সে। তবে চলতে ফিরতে অক্ষম ব্ল্যাক রঞ্জু এখন জেলে, হুইলচেয়ার তার নিত্যসঙ্গি, বিচারের অপেক্ষায় দিন গুনছে।

বাস্টার্ডের মুক্তিতে ভীষণ চটে গেছিলো জেফরি বেগ। এক পর্যায়ে চাকরি ছেড়ে দেবারও সিদ্ধান্ত নেয়। যাইহোক, হোমিসাইডের মহাপরিচালক তাকে সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য করে।

বর্তমান সরকারপ্রধান নিজের স্বামীকে সেই মামলায় না জড়িয়ে বহুল আলোচিত দুর্নীতির মামলায় বিচার করার চেষ্টা করছে। কোনো সিটিং প্রাইমমিনিস্টার নিজের স্বামীকে ডিভোর্স দেয়ার ঘটনা ইতিহাসে এর আগে হয়েছে কিনা জেফরি জানে না, তবে খবরটা গতকাল সবচাইতে আলোচিত ঘটনা ছিলো। টিভি চ্যানেলগুলো এই সংবাদ নিয়ে এতোটাই ব্যস্ত ছিলো যে, সেন্ট অগাস্টিনের টয়লেটে হতভাগ্য এক কেরাণীকে কে বা কারা হত্যা করলো সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় নি কেউ। অরুণদার ভাগ্য ভালো, ভাবলো জেফরি।

এমন কি আজকের প্রধান প্রধান তিন-চারটি পত্রিকায় সেন্ট অগাস্টিনের হত্যাকাণ্ড নিয়ে যে খবর বের হয়েছে সেটাও খুব একটা গুরুত্ব পায় নি। সবগুলো পত্রিকায় ভেতরের

পৃষ্ঠায় এক কলামে ঠাঁই পেয়েছে সেটা। তারচেয়ে বড় কথা, কোনো রিপোর্টারই এটিকে সরাসরি হত্যাকাণ্ড বলে নি, সম্ভাব্য আত্মহত্যা হিসেবেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সকালে নাশতা করার সময় এই খবরগুলো পড়ে জেফরির মুখে এক চিলতে হাসি দেখা দিয়েছিলো। কোনো রকম পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ছাড়াই সে জানে, হাসান নামের কেরাণীকে বেশ দক্ষতার সাথেই হত্যা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ নেই।

অফিসে ঢুকে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইলো জেফরি। গতকাল বিকেলে রেবার কাছ থেকে তার বাবার অসুখের কথা শুনে মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। যদিও রেবাকে সে শক্ত হতে বলেছে, ভালো কোথাও চিকিৎসা করার পরামর্শ দিয়েছে, তারপরও সে জানে, ভদ্রলোকের সেরে ওঠাটা একদমই অনিশ্চিত। থ্রোট ক্যান্সারের কিছু স্টেজ থাকে, ভাগ্য ভালো থাকলে আর সুচিকিৎসা দেয়া হলে রোগী সেরে উঠতে পারে। তবে রেবার বাবা নাকি ফোর্থ স্টেজে আছেন। দেশে চিকিৎসা করা প্রায় অসম্ভব। হয়তো সিঙ্গাপুর কিংবা ব্যাঙ্কক যাবে।

ডেস্কের উপর পেপার ওয়েটটা নিয়ে আনমনে নাড়াচাড়া করার সময় সহকারী জামান এসে ঢুকলো ঘরে। সালাম দিয়ে জেফরির বিপরীতে একটা চেয়ারে বসলো সে।

"স্যার, আপনি কি সেন্ট অগাস্টিনে এখনই যাবেন?

একটু ভেবে বললো জেফরি, "না। দুপুরের পর যাবো..." তারপর আনমনা ভাবটা কাটিয়ে উঠে বললো, "ফিঙ্গারপ্রিন্টের কি অবস্থা?"

"টয়লেটের ভেতর অসংখ্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছিলো, স্যার...আমার ধারণা ওগুলোর বেশিরভাগই ছাত্রদের। কয়েকটা ট্রাই করে দেখা গেছে...রেজাল্ট জিরো।"

মাথা দোলালো জেফরি। স্কুলের ছাত্রদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ করবে না, কারণ হোমিসাইডের ডাটাব্যাঙ্কে শুধু ভোটার আইডি কার্ডধারীদের আঙুলের ছাপ আর যাবতীয় তথ্য রাখা আছে। আঠারো বছরের নীচে এবং ভোটার আইডিকার্ড নেই এরকম লোকের আঙুলের ছাপ ম্যাচ করবে না।

"কিউবিকলের দরজায় কোনো প্রিন্ট পাওয়া যায় নি?"

"ওখানেও অনেকগুলো পাওয়া গেছে...কিছু প্রিন্ট ম্যাচিং করে দেখা হয়েছে, স্যার," বললো জামান। "একটা ভিকটিমের সাথে ম্যাচ করেছে, অন্য একটা ওই সুইপারের, বাকিগুলো মনে হয় ছাত্রদের।"

আবারো মাথা দোলালো জেফরি।

"সবগুলো ম্যাচিং করবো, স্যার?"

"দরকার নেই।"

"আমারও তাই তো মনে হচ্ছে, স্যার।"

"যেভাবে কেরাণী ছেলেটার ঘাড় মটকে দিয়েছে, সেটা কোনো সাধারণ লোকের কাজ না," বললো জেফরি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জামান।

"আঙুলের ছাপ যেনো না পড়ে সে ব্যাপারেও সতর্ক ছিলো মনে হচ্ছে।"

"প্রফেশনাল কেউ হবে, স্যার," জামান বললো।

"হুমমম...এটাই সমস্যা। ওইরকম একটা স্কুলে, ওরকম সাধারণ একজন কেরাণীকে খুন করার জন্য পেশাদার লোক ব্যবহার করা হলো কেন?"

"আমার মনে হচ্ছে এটা ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতার কারণে হয়েছে, জামান নিজের অভিমত প্রকাশ করলো।

"তাই যদি হয় তাহলে স্কুলের ভেতর কাজটা করা কি বেশি কঠিন না?...হোয়াই নট আউটসাইড অব দি স্কুল কম্পাউন্ড?"

জামান মাথা নেড়ে সায় দিলো। "হয়তো স্কুলের ভেতরে কেউ জড়িত আছে..."

জেফরি নিজেও এরকম সন্দেহ করছে। একটু চুপ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলো।

"পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট কবে পাবো?"

"আগামী সোমবারের আগে না।"

"ভিকটিমের কাছে থাকা মানিব্যাগ, মোবাইল ফোন, এসব চেক করে দেখেছো?"

"জি, স্যার। মানিব্যাগে কিছু টাকা, একটা লাইটার, একগোছা চাবি আর লোকটার বউয়ের ছবি ছাড়া তেমন কিছু পাওয়া যায় নি। একেবারে ক্লিন। মোবাইল ফোনটা চেক করে দেখা হচ্ছে।"

"তার মানে লোকটা বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছিলো?" জেফরি বললো।

"জি, স্যার।"

অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানে, পরিস্কারপরিচ্ছন্ন লোকজন নিজেদের মানিব্যাগ বেশ পরিস্কার রাখে। খুব বেশি কাগজপত্র, নোট কিংবা অন্য কিছু রাখে না। তাদের মানিব্যাগই বলে দেয় ব্যক্তি হিসেবে তারা যথেষ্ট পয়পরিস্কার থাকতে পছন্দ করে।

"মোবাইল ফোন থেকেও কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আমি কিছুটা চেক করে দেখেছি। ফোনবুকে মাত্র বারোটি নাম্বার। তার মানে লোকটার পরিচিত লোকজনের সংখ্যা কম। গত এক সপ্তাহে কল করেছে মাত্র এগারোটি...তার মধ্যে সাতটাই তার বউকে। বাকি চারটা কলের মধ্যে স্কুলের হেডক্লার্ক নামে সেভ করা নাম্বারে করেছে তিনটি। আর লিটু নামে সেভ করা নাম্বারে একটি। এই লিটু হলো হাসানের শ্যালক।"

একনাগারে বলে যাওয়া জামানের কথাগুলো চুপচাপ শুনে গেলো জেফরি। সে ভালো করেই জানে এই কেসটা কঠিন হবে। তার অভিজ্ঞতা বলে, বিরাট হোমরাচোমরাদের খুনখারাবির কেস খুব সহজে সমাধান করা যায়, সবচাইতে কঠিন হয় হাসানের মতো সাধারণ লোকজনের হত্যাকাণ্ড নিয়ে। তাদের শত্রু কে সেটা বের করাই কঠিন হয়ে ওঠে। খুবই নিরীহগগাছের লোকজন খুন হয় তখনই যখন বিরাট কোনো ঘটনায় মধ্যে তারা অজ্ঞাতসারে কিংবা ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়ে। তাহলে কি সেন্ট অগাস্টিনের হত্যাকাণ্ড বিরাট কোনো ঘটনার সূচনা?

কে জানে!

অন্যমনস্কভাব কাটিয়ে উঠে জামানকে জিজ্ঞেস করলো জেফরি, "ঢাকায় ভিক্টিমের পরিবার কোথায় থাকে? কারা কারা আছে?"

জামান অফিসে আসার আগেই পুলিশের কাছ থেকে এ বিষয়ে জেনে নিয়েছে। "আরামবাগে, স্যার। বউ আর এক শ্যালকসহ।"

"মুরুব্বি টাইপের কেউ নেই?"

"হাসান সাহেবের শ্বশুর থাকেন রাজশাহীতে...স্কুল শিক্ষক। উনি খবর পেয়েছেন। আজ বিকেলে লাশ দাফন করার আগেই এসে পড়বেন।" জেফরিকে কিছু বলতে না দেখে জামান আবার বললো, "আপনি কি আজ ঐ বাড়িতে যাবেন?...ওদের সাথে কথা বলবেন?"

মাথা দোলালো জেফরি। "অবশ্যই যাবো তবে এখন না। লাশ দাফন হবার পর।

অধ্যায় ৮

মিডিয়া যতোই তুচ্ছ করে দেখাক না কেন, সেন্ট অগাস্টিনে যে একটা খুন হয়েছে সেটা বোঝা গেলে ভেতরে ঢুকেই। মেইন গেটের বাইরেই কিছু পুলিশ বসে আছে কাঠের বেঞ্চে। তাদের মধ্যে কোনো সিরিয়াস ভঙ্গি নেই। অলস সময় পার করছে। কারো কারো অভিব্যক্তিতে বিরক্তিও দেখতে পেলো জেফরি বেগ। গেটের দারোয়ান আজগর দায়িত্বে থাকলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ এখন আর তার উপর পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারছে না বোধহয়। সঙ্গে এক কনস্টেবলকে দিয়ে দিয়েছে তাকে সাহায্য করার জন্য।

জামানকে নিয়ে ঢোকার সময় জেফরিকে থামানোর চেষ্টা করলো সেই কনস্টেবল। সঙ্গে সঙ্গে আজগর বাধা দিয়ে তার পরিচয় জানিয়ে দিলো তাকে। কনস্টেবল কাচুমাচু খেলো একটু। যদিও জেফরি ব্যাপারটা আমলেই নিলো না। সে চলে গেলো প্রিন্সিপ্যালের রুমের দিকে। স্কুলের ভেতরে ছাত্রছাত্রী দের থমথমে মুখ দেখে তার একটু খারাপ লাগলো। মাঠে কেউ খেলছে না। জায়গায় জায়গায় ছোটো ছোটো দলে জোটবদ্ধ হয়ে চাপা কণ্ঠে কথা বলছে তারা। কী নিয়ে কথা বলছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হলো না তার।

কিছু ছাত্রী জেফরিকে আপাদমস্তক মেপে নিলো। মনে মনে হাসলো সে। বয়সের তুলনায় একটু বেশিই পেকে গেছে এরা। নাকি বখে গেছে?

এর আগে কো-এডুকেশন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ঢোকে নি, বিশেষ করে স্কুল চলাকালীন সময়ে। তার নিজের স্কুল সেন্ট গ্রেগোরি একটি বয়েজ স্কুল, তাই কো-এডুকেশন স্কুল কেমন সেটা তার অভিজ্ঞতায় নেই।

তিন-চারজন ছাত্রী, বয়স চৌদ্দ-পনেরো হবে, জটলা বেধে ফিসফাস করছে মেইন বিল্ডিংয়ের কাছে, জেফরি আর জামান তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় একেবারে ছেলেদের মতো করে নিখুঁত শিষ বাজালো তদের মধ্যে কেউ। এরকম দক্ষতা কে প্রদর্শন করলো সেটা দেখার জন্য ফিরে তাকালো জেফরি। সঙ্গে সঙ্গে এক মেয়ের সাথে তার চোখাচোখি হয়ে গেলো। মেয়েটা ভুরু নাচিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করলো যে ভিমরি খাবার জোগাড় হলো তার। পেছনে থাকা জামানও ব্যাপারটা খেয়াল করেছে। তার চোখ কপালে উঠে গেলো।

এতোদিন জেফরির ধারনা ছিলো এডামটিজিং শব্দটা নিছক কাগুজে ব্যাপার। এখন অবশ্য বুঝতে পারলো, ঘটনা না ঘটলে, অস্তিত্ত্ব না থাকলে সেটাকে প্রকাশ করার জন্য কোনো শব্দের জন্ম হয় না। চোখ নামিয়ে সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো সে।

অরুণ রোজারিও একজন শিক্ষকের সাথে কথা বলছিলেন, জেফরিকে ঢুকতে দেখে নিজেই উঠে এলেন।

“কি অবস্থা, অরুণদা?” জানতে চাইলো জেফরি। যদিও জানে অবস্থা বেশি ভালো না হবারই কথা।

“আর অবস্থা...” কথাটা বলেই জেফরি আর জামানকে বসতে বললেন। সামনে বসে থাকা শিক্ষককে ইশারা করতেই ঘর থেকে চলে গেলো ভদ্রলোক।

জেফরির কাছে মনে হলো একরাতেই অরুণ রোজারিওর ওজন পাঁচ কেজি কমে গেছে। চোখের নীচে কালচে আভা।

“বাইরে পুলিশ দেখলাম,” চেয়ারে বসে বললো জেফরি।

“আমি আনতে চাই নি কিন্তু বাধ্য হয়েই আনতে হয়েছে,” অরুণ রোজারিও বললেন।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো জেফরি বেগ।

“গার্জেনদের চাপে,” ছোট্ট করে বললেন সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যাল।

“খবরটা কিন্তু কমই গুরুত্ব পেয়েছে, সেদিক থেকে দেখলে আপনার ভাগ্য ভালোই বলতে হয়।”

জেফরির কথাটা শুনে খুশি হতে পারলেন না অরুণ রোজারিও। “হুমম...আমিও সেরকমই ভেবেছিলাম কিন্তু গার্জেনরা যেভাবে রিঅ্যাক্ট করা শুরু করেছে, মনে হচ্ছে এখানে টুইন টাওয়ারের মতো কোনো ঘটনা ঘটে গেছে।”

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। “ভিআইপি লোকজনের ছেলেমেয়ে পড়ে...তাই একটু বাড়াবাড়ি করছে হয়তো।”

“সেটাই,” কথাটা বলেই কেমন জানি উদাস হয়ে গেলেন অরুণ রোজারিও।

“ছাত্রছাত্রী দের মধ্যে এই ঘটনার কী রকম প্রভাব পড়েছে?”

জেফরির দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন প্রিন্সিপ্যাল। “দে আর প্যানি...”

“কয়েক দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে, এ নিয়ে চিন্তা করবেন না।

অরুণ রোজারিও আস্তে করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। “তাই যেনো হয়।”

জেফরি বুঝতে পারছে, ভদ্রলোকের মানসিক অবস্থা মোটেও ভালো নয়। পাশে বসে থাকা জামানের দিকে তাকালো সে। ছেলেটা চুপচাপ বসে আছে। এখানে ঢোকার পর থেকে কোনো কথা বলে নি।

“অরুণদা,” আস্তে করে বললো জেফরি।

“কি?” অনেকটা সম্বিত ফিরে পেলেন যেনো।

“হাসানের ঘনিষ্ঠ কলিগদের সাথে একটু কথা বলতে চাই।”

“হুম, “ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ডেস্কের উপর থেকে ইন্টারকমটা তুলে সন্যাল বাবু নামের কাউকে আসতে বলে দিলেন। “ছেলেটা খুব লাজুক আর চুপচাপ স্বভাবের ছিলো, কারো সাথে তেমন মিশতো না। আমি জানি না এই স্কুলে তার সে রকম ঘনিষ্ঠ কেউ আছে কিনা।”

“তার পরিবারের কারো সাথে কথা হয়েছে আপনার?”

“হুম...ওর এক শ্যালক...কলেজে পড়ে। সেই ছেলেটার সাথে কথা হয়েছে।”

“ও,” জেফরি আর কিছু বললো না। অরুণ রোজারিওর দিকে চেয়ে রইলো। হাসানের লাশটা যেদিন সকালে আবিষ্কার করা হলো তারচেয়ে আজকে অনেক বেশি বিমর্ষ আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে তাকে।

“আপনি খুব টেনশনে আছেন মনে হচ্ছে।”

“তা তো আছিই...আসলে এরকম পরিস্থিতিতে পড়ি নি কখনও। এটা আমার জন্য একদমই নতুন সমস্যা। বুঝতে পারছি না কিভাবে সব সামলাবো।”

“আপনি যতোটা স্বাভাবিক থাকবেন পরিস্থিতি ততো দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।”

মাথা নেড়ে সায় দিলেন অরুণ রোজারিও কিন্তু কিছু বলার আগেই রুমে ঢুকলো মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। পরিপাটি শার্ট-প্যান্ট আর পাম-সু পরা। মাথার আধপাকা চুল ব্যাক ব্রাশ করে রেখেছে। মাঝারি উচ্চতার লোকটির মুখে চাপ দাড়ি। চোখে মোটা চশমা।

“বসুন,” ভদ্রলোককে বললেন সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যাল। তারপর জেফরির দিকে ফিরে পরিচয় করে দিলেন। “জেফ, এ হলো বিশ্বজিৎ সান্যাল, আমাদের হেডক্লার্ক।”

বিশ্বজিৎ সান্যাল নামের লোকটা জেফরির দিকে তাকিয়ে দু'হাত জোড় করে বললো, “নমস্কার।” অরুণ রোজারিও ইশারা করলে জেফরি আর জামানের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো ভদ্রলোক।

“আর এ হলো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। আমার স্কুলের ছোটো ভাই,” কথাটা বলেই একটু থামলেন অরুণ রোজারিও।

“হাসান তার সহকারী ছিলো। বাবুর রুমেই বসতো ছেলেটা।”

“আপনি ভালো আছেন?” সৌজন্যতার খাতিরে বললো জেফরি।

“হ্যা...আপনি ভালো আছেন?” সৌজন্যতার জবাব দিলো বিশ্বজিৎ সান্যাল ।

“বাবু, হাসানের ব্যাপারে আপনার সাথে জেফরি একটু কথা বলবে।”

জেফরির কাছে মনে হলো বিশ্বজিৎ সান্যাল একটু ভয় পেয়ে গেছে। এটাই স্বাভাবিক। একে তো পুলিশের লোক তার উপরে খুনের কেসে জিজ্ঞাসাবাদ।

“হাসানকে আপনি কতোদিন ধরে চিনতেন?” একেবারে হালকা চালে বললো কথাটা।

“দুতিন বছর তো হবেই।”

“আপনার সাথে তার কেমন সখ্যতা ছিলো?”

“বয়সে আমার অনেক ছোটো ছিলো, আমাকে খুব শ্রদ্ধা করতো, সখ্যতা বলতে যা বোঝায় সেটা বোধহয় ছিলো না, শুধু ওয়ার্কিং রিলেশন, বিশ্বজিৎ সান্যাল আস্তে আস্তে বলে গেলো।

“তাহলে এই স্কুলের এমন কেউ নেই যার সাথে তার সখ্যতা ছিলো?”

“সেরকম কেউ বোধহয় নেই।”

জেফরি একটু অবাক হলে তার এই অভিব্যক্তি দেখে অরুণ রোজারিও এগিয়ে এলেন।

“আসলে ছেলেটা একেবারে চুপচাপ আর শান্তশিষ্ট ছিলো। খুব বেশি কথা বলতো না।”

“হ্যাঁ, স্যার ঠিকই বলেছেন,” বললো বিশ্বজিৎ সান্যাল।

“একেবারে নিরীহ একটা ছেলে ছিলো। স্কুলের কারো সাথে আড্ডা মারতেও দেখি নি কখনও।”

“এই স্কুলের কারো সাথে কি তার কখনও কোনো ঝামেলা হয়েছিলো?”

জেফরি লক্ষ্য করলো কথাটা শুনে বিশ্বজিৎ সান্যাল, অরুণ রোজারিওর দিকে চোরা চোখে তাকালো। তাদের দুজনের মধ্যে কিছু একটা ভাব বিনিময় হলো যেনো। কিন্তু কেন সেটা বুঝতে পারলো না সে।

“না, আস্তে করে বললো হেডক্লার্ক। “এরকম কথা কখনও শুনি নি। তাই না, স্যার?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই। হাসানের মতো নিরীহ ছেলের সাথে কার ঝামেলা হতে যাবে?” অরুণ রোজারিওর ভাবভঙ্গি জেফরির কাছে একটু খটকা লাগলো। তার এই সিনিয়র ভাই খুব ভালো অভিনয় জানে না। অভিব্যক্তি লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে একদম আনাড়ি।

“অদ্ভুত,” জেফরি বললো। জামানের দিকে তাকালো এবার। “এরকম নির্বিবাদি একটা ছেলে বীভৎসভাবে খুন হয়ে গেলো!”

জামান শুধু চেয়ে রইলো, কিছু বললো না।

এবার বিশ্বজিৎ সান্যালের দিকে ফিরলো আবার।

“হাসান সাহেবকে ঐদিন ঠিক ক'টা বাজে শেষবারের মতো দেখেছিলেন?”

একটু মনে করার চেষ্টা করলো হেডক্লার্ক।

“পাঁচটার পরই তো চলে গেলো। এরপর আর দেখা হয় নি।”

“চলে গেলো মানে স্কুল কম্পাউন্ড থেকে বের হয়ে যাবার কথা বলছেন?”

“হ্যাঁ।”

“কিন্তু হাসান সাহেব তো ঐ দিন স্কুল কম্পাউন্ড থেকে বেরই হয় নি। কোনো কারণে হয়তো টয়লেটে গেছিলো। সেখানেই খুন হয়।”

“আসলে আমাদের অফিসটা দোতলায়, সেখান থেকে পাঁচটার পর হাসান চলে গেলে আমি আরো আধঘণ্টা কাজ করার পর অফিস থেকে বাসায় চলে যাই। সুতরাং হাসান আমার রুম থেকে বের হয়ে কোথায় গেছে সেটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব না। আমি ধরে নিয়েছিলাম সে বাসায় চলে গেছে।”

“হুম,” একটু ভেবে বললো জেফরি, “ঐ দিন কাজ করার সময় তার মধ্যে কোনো রকম টেনশন খেয়াল করেছেন? মানে অস্বাভাবিক কিছু?”

বিশ্বজিৎ সান্যাল ভুরু কুচকে একটু ভেবে দৃঢ়ভাবেই বললো, “হ্যাঁ। একটু টেনশনে ছিলো।”

“টেনশনে ছিলো কেন?”

“আমি জিজ্ঞেস করলে সে বললো তার শেয়ারের দাম নাকি অনেক পড়ে গেছে।”

“শেয়ার?...হাসান সাহেব কি শেয়ার বিজনেস করতো?”

“হ্যাঁ। তবে তেমন কিছু না। একটু বাড়তি ইনকামের জন্য টুকটাক করতো আর কি। একটা ব্যাঙ্কের কিছু শেয়ার ছিলো তার। ঐ শেয়ারটার প্রাইস পড়ে যাওয়াতে টেনশনে ছিলো।”

"আচ্ছা, একটু ভেবে আবার বললো জেফরি, "আর কিছু?"

"না। আর কোনো কিছু মনে পড়ছে না। অন্যসব দিনের মতো যেমন থাকে তেমনি ছিলো।"

পাশে বসা জামানের দিকে চেয়ে আবার অরুণ রোজারিওর দিকে ফিরলো জেফরি।

"অরুণদা, হাসান সাহেব যে রুমে বসে কাজ করতো সেটা একটু দেখতে চাই।"

"ওকে ফাইন," কথাটা বলেই বিশ্বজিৎ সান্যালের দিকে তাকালো।

"বাবু, ওকে আপনার রুমে নিয়ে যান। যা যা দেখতে চায় দেখাবেন। নো প্রবলেম। আই মিন, ফুললি কোঅপারেশন করবেন।"

বিশ্বজিৎ সান্যাল উঠে দাঁড়ালো। "ঠিক আছে, স্যার।" এবার জেফরির দিকে ফিরে বললো, "আসুন আমার সাথে।"

সেন্ট অগাস্টিনের মূল ভবনের পাশে আরেকটা ছোটো ভবনে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অফিস। এর পাশেই খেলার মাঠটি অবস্থিত। বিশ্বজিৎ সান্যালের সাথে সেখানে চলে এলো জেফরি বেগ আর জামান। হেডক্লার্কের রুমটি বড়জোর পনেরো বাই পনেরো ফুটের একটি ঘর। বিশ্বজিৎ সান্যালের ডেস্কের একটু কাছেই ছোটো একটা ডেস্কে বসতো হাসান নামের ক্লার্ক।

অফিসঘরে ঢুকে জেফরি ভালো করে চেয়ে দেখলো। একেবারে ছিমছাম। তিন-চারটি ফাইল ক্যাবিনেট ছাড়া তেমন কোনো আসবাব নেই। অন্যান্য অফিসের সাথে এর পার্থক্য বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে, তার কারণ সেন্ট অগাস্টিনের অফিশিয়ালি কাজকর্ম কম্পিউটারাইজ করা হয়েছে। হাসানের ডেস্কে একটি পিসি থাকলেও বিশ্বজিৎ সান্যালের ডেস্কে কোনো পিসি দেখতে পেলো না।

"আপনি কম্পিউটার ব্যবহার করেন না?"

জেফরির প্রশ্নটা শুনে বিশ্বজিৎ সান্যাল একটু বিব্রত হলো। "না।"

ভদ্রলোক এতো আস্তে কথা বলে যে শুনতে বেগ পেলো জেফরি। "কেন?" ঘরের ভেতরে ঢুকে হাসানের ডেস্কের কাছে চলে এলো সে। "আপনারা তো কম্পিউটারেই সব কাজকর্ম করেন, নাকি?"

"আসলে আমরা পুরোপুরি কম্পিউটারাইজড হই নি," বিশ্বজিৎ সান্যাল বললো। "বলতে পারেন সেমি-কম্পিউটারাইজড। এখনও অনেক কিছু হয় কাগজে কলমে।"

জেফরি বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। বেশিরভাগ বয়স্ক লোকের মতো বিশ্বজিৎ সান্যাল েরও কম্পিউটারের ব্যাপারে এক ধরণের অনীহা আছে। নতুন করে কিছু শেখার ব্যাপারে পঞ্চাশোর্ধ লোকজনের অনাগ্রহ একটু বেশিই থাকে।

চট করে জামানের দিকে ফিরলো জেফরি। "আচ্ছা, হাসানের ডেস্কটার চাবি নিশ্চয় ওর পকেটে ছিলো?"

"জি, স্যার," কাছে এগিয়ে এসে বললো সে। "উনার পকেটে যেসব জিনিস ছিলো তার মধ্যে একগোছা চাবিও আছে। খুব সম্ভবত এই ডেস্কের চাবিই হবে।"

"চাবিটা তোমার সাথে আছে?"

"জি, স্যার।"

সান্যালবাবুর দিকে ফিরলো জেফরি।

"এই ডেস্কটার ড্রয়ারগুলো খুলে একটু চেক করতে হবে। এই কম্পিউটারটাও ওপেন করে দেখতে চাই।"

বিশ্বজিৎ সান্যাল কয়েক মুহূর্ত ভেবে জবাব দিলো, "অফিশিয়াল ডকুমেন্ট আছে... প্রিন্সিপ্যাল স্যারের অনুমতি নিয়ে করলে ভালো হতো না?"

জেফরি মুচকি হাসলো। "মি: সান্যাল, অরুণদা আপনাকে বলেছে ফুললি কো-অপারেট করতে...সুতরাং ধরে নিন উনার অনুমতি আছে।"

সান্যালবাবু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

“জামান,” সহকারীর দিকে ফিরলো জেফরি। “চেক করো।”

কাজে লেগে গেলো জামান।

বিশ্বজিৎ সান্যাল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে জেফরি বেগ আস্তে করে হাসানের ডেস্কের পেছনে যে জানালাটা আছে সেখানে চলে এলো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো খেলার মাঠটা বিরান পড়ে আছে। অন্য দিন হলে হয়তো ছাত্রছাত্রী রা খেলায় মেতে থাকতো। কিন্তু খুনের মতো ঘটনা ঘটে যাওয়াতে স্কুলের পরিবেশ একটু থমথমে।

অন্যসব মিশনারি আর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের মতো সেন্ট অগাস্টিনেও একটি বাস্কেটবল কোর্ট আছে। একটু স্মৃতিকাতর হয়ে পড়লো জেফরি বেগ। সেন্ট গ্রেগোরিজ স্কুলের বাস্কেটবল কোর্টে কতো দাপাদাপি করেছে। কতো বিকেল কাটিয়ে দিয়েছে বাস্কেটবল খেলতে খেলতে। তখন দু'চোখে স্বপ্ন ছিলো বড় হয়ে একদিন ম্যাজিক জনসন হবে। শৈশবে অনেক কিছুই হতে ইচ্ছে করে। যতো বড় হতে থাকে ততোই অপশন কমতে থাকে। এক পর্যায়ে এটা সর্বনিম্নে চলে যায়। মুচকি হাসলো সে।

“আপনারা দেখতে থাকুন, আমি একটু টয়লেট থেকে আসি।”

বিশ্বজিৎ সান্যালের কথাটা শুনে জেফরি জানালা থেকে ফিরে তাকালো। মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

সান্যালবাবু একটা ফাইল কেবিনেটের পাশে ছোট্ট দরজা খুলে ঢুকে পড়লো। ঘরে ঢোকার পর এর আগে এই দরজাটা জেফরির চোখেই পড়ে নি।

একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো টয়লেটের দরজার দিকে, কিন্তু জানে না কেন।

ড্রয়ারটা চেক করার পর জামান এখন কম্পিউটার ওপেন করে দেখছে। সেও ব্যাপারটা খেয়াল করলো। চেয়ে রইলো টয়লেটের দরজার দিকে।

“স্যার?”

জেফরি অনেকটা সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকালো জামানের দিকে। “এখানে অ্যাটাচড টয়লেট আছে দেখছি।”

জামান আবারো টয়লেটের দরজার দিকে তাকালো। “জি, স্যার।”

“হাসান এখান থেকে পাঁচটা বাজার পর পরই অফিসের কাজ শেষ করে চলে যায়। অবশ্য সে স্কুল কম্পাউন্ডের বাইরে যেতে পারে নি...নীচের টয়লেটের একটি কিউবিকলে তাকে হত্যা করা হয়, তাই না?”

“জি, স্যার,” জামানও কৌতূহলী হয়ে উঠলো। সে বুঝতে পারছে তার বসের চোখে কিছু একটা ধরা পড়েছে।

“হাসান সাহেব নীচের টয়লেটে কেন গেলো?”

জামান সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা ধরতে পারলো। যার নিজের অফিসে অ্যাটাচড টয়লেট আছে সে কেন অফিস থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হবার পর নীচ তলার কমন টয়লেট ব্যবহার করতে যাবে?

“বুঝতে পেরেছি, স্যার,” বললো জামান। কম্পিউটারটা শাট-ডাউন করে দিলো সে। স্কুলের ডকুমেন্ট ছাড়া তেমন কিছু নেই।

“হাসান সাহেব নীচের টয়লেটে কেন গেলো?”

কম্পিউটার ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়ালো জামান। “জি, স্যার। তার তো নীচের টয়লেটে যাবার কোনো দরকারই ছিলো না।”

“কিন্তু সে গেছে,” কথাটা বলেই কপালের বাম পাশটা চুলকালো জেফরি। “আর সেটাই হয়েছে তার জন্যে কাল।”

টয়লেটের দরজা খুলে গেলে বিশ্বজিৎ সান্যাল বেরিয়ে এলো।

“মি: সান্যাল, জেফরি বললো। “ঐদিন হাসান যখন অফিসের কাজ শেষ করে চলে গেলো তার দশ মিনিট আগে সে কি করেছিলো, আপনার মনে আছে?”

বিশ্বজিৎ সান্যাল একটু মনে করার চেষ্টা করলো। বুঝতে পারলো জেফরি, বয়সকালে

লোকটির স্মৃতিশক্তি হয়তো কিছুটা দুর্বল হয়ে গেছে। "সব কিছু গোছগাছ করলো ... কম্পিউটারটা অফ করলো ...আর যেনো কী করলো...?" স্মৃতি হাতরে বলতে লাগলো বিশ্বজিৎ সান্যাল ।

"হাসান কি অফিস থেকে চলে যাবার আগে টয়লেট ব্যবহার করেছিলো?" প্রশ্নটা করলো জামান।

"হ্যাঁ।"

জামান আর জেফরি একে অন্যের দিকে তাকালো। কিন্তু বিশ্বজিৎ সান্যাল বুঝতে পারলো না টয়লেট ব্যবহার করার কথা শুনে এই দুই ইনভেস্টিগেটর ইঙ্গিতপুর্ণভাবে দৃষ্টি বিনিময় করছে কেন।

"আমিও অফিস থেকে বের হবার আগে সব সময় টয়লেট সেরে বের হই ...হাসানও তাই করতো," কথাটা বলে ভদ্রলোক অনেকটা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

"সেটাই তো স্বাভাবিক," বললো জেফরি বেগ।

"তাহলে জিজ্ঞেস করলেন যে?" বিশ্বজিৎ সান্যাল এখনও বুঝতে পারছে না।

"মি: সান্যাল, হাসান নীচের টয়লেটের ভেতরে খুন হয়েছে।"

"হ্যাঁ, সেটা তো সবাই জানে।"

"তার মানে সে টয়লেটে গেছিলো ...আর ওখানেই তাকে কেউ খুন করে," জেফরি বললো।

"ওহ্, বিশ্বজিৎ সান্যাল এবার বুঝতে পারলো।

"আপাত দৃষ্টিতে ব্যাপারটা হয়তো অস্বাভাবিক মনে নাও হতে পারে, কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে এটা অবশ্যই স্বাভাবিক না।"

"তাই তো মনে হচ্ছে এখন," অনেকটা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে বললো বিশ্বজিৎ সান্যাল।

"আচ্ছা মি: সান্যাল, ঐ সময়, মানে হাসান যখন অফিস থেকে বের হলো তখন এই কম্পাউন্ডে কতোজন কর্মকর্তা-কর্মচারি ছিলো?"

জামানের প্রশ্নটা শুনে ভদ্রলোক চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। "সেটা তো বলতে পারবো না, তবে মনে হয় না আর কেউ ছিলো।"

"হাসান পাঁচটার পর পরই বের হয়ে থাকলে অনেকেরই তো থাকার কথা, তাই না?" জেফরি জানতে চাইলো।

"পরীক্ষা কিংবা অ্যাডমিশনের সিজন বাদে আমাদের এখানকার কর্মচারিরা সাড়ে চারটার পর থেকে চলে যেতে শুরু করে। হাসান বের হয়েছিলো পাঁচটার পর পর। সুতরাং আমি ছাড়া অন্য কারো থাকার কথা নয়।"

"আচ্ছা," জেফরি বললো। "তাহলে বাকিরা সবাই সাড়ে চারটার পর পরই চলে যায়?"

"সাড়ে চারটার পর থেকে যাওয়া শুরু করে আর কি...তবে পাঁচটার আগেই সবাই চলে যায়।"

"হাসান সাহেব দেরি করে যেতো?" জামান জানতে চাইলো।

"না। কাজ না থাকলে সাড়ে চারটার পরই চলে যেতো।"

"তাহলে ঐদিন দেরি করলো কেন?" জেফরি তাদের কথার মধ্যে ঢুকে পড়লো।

"ওর কম্পিউটারটায় কী যেনো প্রবলেম হচ্ছিলো, ওটা ঠিক করতে করতে দেরি হয়ে যায়। তবে অন্য সময় সেও সাড়ে চারটার দিকেই চলে যেতো।"

"আর আপনি কয়টার দিকে যান?"

জেফরির প্রশ্নটা শুনে ভদ্রলোক ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। "আমি ...মানে, আমি একটু দেরি করেই বাসায় যাই।"

"সেটাই তো জানতে চাচ্ছি...কেন দেরি করে যান?"

একটু যেনো বিব্রত হলো বিশ্বজিৎ সান্যাল। জেফরি লক্ষ্য করলো তার সহকারী জামান ভদ্রলোকের দিকে রীতিমতো সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।– "আপনার কি বলতে অসুবিধা

আছে?” জেফরি আস্তে করে বললো তাকে।

“না, বলতে অসুবিধা হবে কেন,” একটু ইতস্তত করলো হেডক্লার্ক। “আসলে এমনি এমনি আমি দেরি করে বাসায় ফিরি।” জেফরির সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখে বললো, “আমার স্ত্রী বছরখানেক আগে মারা গেছে, বাড়িতে কেউ নেই। একটা মেয়ে ছিলো, বিয়ে হয়ে গেছে... আগেভাগে বাড়িতে যাবার কোনো তাড়া আমার নেই।”

জেফরি লক্ষ্য করলো জামান খুব আশাহত হয়েছে কথাটা শুনে। সে হয়তো অন্য কিছু শোনার প্রত্যাশা করেছিলো। অবশ্য সে নিজেও যে কিছুটা আশাহত হয়েছে সেটা প্রকাশ করলো না।

“আচ্ছা, ঠিক আছে,” অনেকটা আপন মনে বললো জেফরি বেগ। বিশ্বজিৎ সান্যাল ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। “আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

“ঠিক আছে,” বললো বিশ্বজিৎ সান্যাল ।

জামানকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

অধ্যায় ৯

সেন্ট অগাস্টিনের জুনিয়র ক্লার্ক হাসানের লাশ দাফন হবার পরদিন তার বাড়িতে গেলো জেফরি বেগ আর জামান। ইচ্ছে করেই একটু দেরিতে যাওয়ার কারণ, হাসানের অল্পবয়সী স্ত্রীর শোক যেনো কিছুটা প্রশমিত হয়ে আসে। কিন্তু নিহতের বাড়িতে এসে বুঝতে পারলো দু'তিন দিনে শোকের প্রকোপ তেমন একটা কমে নি।

হাসানের স্ত্রী মলির বয়স আনুমানিক একুশ কি বাইশ হবে। মাত্র দু'বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর রাজশাহীতেই ছিলো, ঢাকায় এসেছে তিন মাস আগে। মলির এক ছোটো ভাই লিটুও থাকে তাদের সাথে। মলি, হাসান আর লিটু-এই ছিলো তাদের পরিবার। এখানে আসার আগেই সহকারী জামানের কাছ থেকে এসব তথ্য জেনে নিয়েছে জেফরি বেগ।

আরামবাগের অলিগলির ভেতরে একটা চার তলা বাড়ির দোতলায় ছোটো ছোটো দুটো ঘর নিয়ে থাকে তারা। প্রতি তলায় দুটো করে ইউনিট। একটা বড়, অন্যটা ছোটো। সিঁড়ি দিয়ে উঠলে হাতের ডান দিকের ছোটো ইউনিটটি হাসানের।

জেফরি আর জামান বসে আছে লিটু নামের ছেলেটির ঘরে, কারণ এদের কোনো ড্রইংরুম নেই। সবেমাত্র ঢাকার একটি সরকারী কলেজে ভর্তি হওয়া লিটু ঘরের এককোণে চুপচাপ বসে আছে। তার পাশে আছে তার বৃদ্ধ বাবা।

ভদ্রলোক একজন স্কুল শিক্ষক। মেয়ের এই সর্বনাশের কথা শুনে রাজশাহী থেকে ছুটে এসেছেন। জেফরিকে বার বার বলে যাচ্ছেন, কে এমন ঘটনা ঘটালো? এরকম নিরীহ একটা ছেলেকে কে খুন করলো? যে এরকম জঘন্য কাজ করেছে আল্লাহ্ তার বিচার করবে।

জেফরি আর জামান অপেক্ষা করছে হাসানের স্ত্রী মলির জন্য। এইমাত্র তাকে ঘুম থেকে তোলা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো চলে আসবে।

জেফরি শুরু করলো লিটুকে দিয়ে।

“হাসান সাহেবের সাথে কারো কোনো সমস্যা ছিলো?” একেবারেই সহজ আর সাদামাটা প্রশ্ন।

“না। ভায়ের সাথে কারো কোনো সমস্যা ছিলো না,” ছেলেটা বিমর্ষ চোখেই জবাব দিলো।

জেফরি বুঝতে পারলো লিটু তার বোন জামাইকে ভাই বলে সম্বোধন করে। দুলাভাই বলার রেওয়াজ কি তাহলে কমে আসছে? যাইহোক চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে পরের প্রশ্ন করলো।

“তোমরা তো এখানে এসেছো দু'তিন মাস হবে, তাই না?”

“জি, ভাই আর আপা এসেছে তিন মাস আগে...আমি এসেছি দু'মাস হলো।”

“তার আগে হাসান সাহেব কোথায় থাকতেন?”

"পুরানা পল্টনের একটা মেসে," বললো লিটু।
"তুমি জায়গাটা চেনো?"
"জি, আমি বেশ কয়েকবার ওখানে গেছি।"
জামানের দিকে ফিরে বললো জেফরি, "ওর কাছ থেকে ঠিকানাটা নিয়ে নাও। এটা আমাদের দরকার হতে পারে।"
হাসানের শ্বশুর, বৃদ্ধ স্কুলশিক্ষক পিটপিট করে চশমার ভারি কাঁচের ভেতর দিয়ে জেফরিকে দেখে যাচ্ছেন।
"আচ্ছা, স্যার, জেফরি এবার হাসানের শ্বশুরকে বললো, "হাসান তো আপনার এলাকারই ছেলে ছিলো, তাই না?"
"আমার আপন ফুপাতো বোনের ছেলে, ওদের বাড়ি আমাদের পাশের গ্রামেই," বৃদ্ধ বেশ স্পষ্ট উচ্চারণে কথাগুলো বললেন।
"ও," জেফরি একটু ভেবে আবার বললো, "গ্রামে কি তার কোনো শত্রু ছিলো?" যদিও জানে গ্রামের শত্রু ঢাকা শহরের সেন্ট অগাস্টিনের মতো স্কুলে এসে হাসানকে খুন করার কথা স্বপ্নেও ভাববে না, তারপরও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে। সবগুলো সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা দরকার।
"না। মলি ঢাকায় আসার আগে মাসে-দুমাসে দুএকদিনের জন্য গ্রামে যেতো হাসান কিন্তু ঘর থেকে বেরই হতো না। সারাদিন বাড়িতেই থাকতো। তাছাড়া ও ছিলো শান্তশিষ্ট একটা ছেলে। কারো সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদ হয়েছে এরকম কথা কখনও শুনি নি।"
জেফরি আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। এরা থাকে রাজশাহীতে। হাসানের ব্যাপারে তেমন তথ্য দিতে পারবে না সেটাই স্বাভাবিক। হাতঘড়িতে সময় দেখে নিলো। এখানে আসার পর পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে। হাসানের স্ত্রী মলির এখনও দেখা নেই।
লিটুকে কিছু বলতে যাবে অমনি দরজা দিয়ে আস্তে করে অল্পবয়সী এক মেয়ে ঘরে ঢুকলো। সালোয়ার-কামিজ পরা। মাথায় ওড়না দিয়ে রেখেছে। চোখমুখ এখনও ফোলা ফোলা। চেহারা দেখেই বোঝা যায় স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে অবিরাম কেঁদে চলেছে। মেয়েটাকে দেখে জেফরির খুব মায়া হলো। এতো অল্প বয়সে স্বামীহারা হতে হয়েছে তাকে।
জেফরিকে সালাম দিলো মলি। লিটু নামের ছেলেটা উঠে তার বোনকে বসতে দিলো নিজের চেয়ারে। ঘরে আর কোনো চেয়ার নেই। লিটু ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকলো চুপচাপ।
জেফরি লক্ষ্য করলো বৃদ্ধ স্কুলশিক্ষক সদ্য বিধবা হওয়া মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
"আপনার মানসিক অবস্থা কেমন সেটা আমরা জানি, কিন্তু খুনটার তদন্ত করতে হলে আপনার সাথে কথা বলতেই হবে, না বলে উপায় নেই। জানি এ মুহূর্তে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে আপনার ভালোও লাগবে না। তবে আমাদেরকে যদি সহযোগীতা করেন, হাসান সাহেবের হত্যাকারীদের ধরতে খুব সাহায্যে আসবে।"
মলি ফোলা ফোলা চোখে তাকালো জেফরির দিকে। গায়ের রঙ শ্যামলা হলেও মেয়েটা দেখতে ভারি মিষ্টি। এখনও চোখেমুখে সরলতার ছাপ মুছে যায় নি। "আপনার যা জিজ্ঞেস করার বলেন, আমি চেষ্টা করবো জবাব দিতে," আস্তে করে বললো সে। নিজের শোককে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করলো যেনো।
"ধন্যবাদ," কথাটা বলেই জেফরি একটু থেমে আবার বলতে লাগলো, "এই খুনের ব্যাপারে আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?"
মলি চেয়ে রইলো জেফরির দিকে। "না। সন্দেহ করার মতো কেউ নেই। এরকম কিছু ঘটেও নি। ও খুবই নিরীহ একটা ছেলে ছিলো।"
"পরিচিত কেউ, কিংবা বন্ধুবান্ধবের সাথে ঝামেলার কথা জানেন?"
"না," দুপাশে মাথা দুলিয়ে বললো মলি। "ওর তো কোনো বন্ধুই ছিলো না।"

আজব কথা, ভাবলো জেফরি বেগ। ঢাকা শহরে একটা ছেলে চাকরিবাকরি করে, বউ নিয়ে সংসার করে, তার কোনো বন্ধুবান্ধব নেই? যেখানে সে চাকরি করতো সেই স্কুলেও তার কোনো ঘনিষ্ঠ কলিগ নেই। অদ্ভুত!

"ঐ দিন কি হাসান সাহেবের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছিলেন?"

মলি একটু ভেবে জবাব দিলো। "খুব টেনশনে ছিলো।"

"কি জন্যে?"

"ওর কিছু শেয়ার ছিলো। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মোবাইলফোনে শেয়ার মার্কেটের খোঁজখবর নিতো সব সময়। ঐদিনও তাই করেছিলো। ওর শেয়ারের দাম নাকি অনেক পড়ে গেছে, তাই খুব দুশ্চিন্তায় ছিলো সকাল থেকেই।"

আশাহত হলো জেফরি। বিশ্বজিৎ সান্যাল ও একই তথ্য দিয়েছে।

"সকালে স্কুলে চলে যাবার পর আপনার সাথে তার কোনো কথা হয় নি?"

"হয়েছে," আস্তে করে কথাটা বলেই স্কুল শিক্ষক বাবার দিকে আড়চোখে তাকালো। "দুপুরের খাবারের সময় আমি ফোন করেছিলাম।"

"কেন ফোন করেছিলেন?"

মাথা নীচু করে বললো, "লাঞ্চ করেছে কিনা জানতে।"

"ও।"

"হাসান সাহেবের সাথে পরিচয় ছিলো, মানে কথাবার্তা হতো এমন কারোর কথা কি জানেন?" জেফরিকে চুপ থাকতে দেখে জামান প্রশ্নটা করলো।

"না।" ছোট্ট করে জবাব দিলো মলি।

"আমি যতোটুকু জানি, হাসান ঢাকা শহরে কারো সাথে মিশতো না। অফিস থেকে বাড়ি চলে আসতো সোজা," কথাটা বললেন হাসান সাহেবের শ্বশুর।

"জি, আব্বা ঠিকই বলেছেন," ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে থাকা লিটু সমর্থন করলো তার বাবাকে।

"আড্ডাবাজি তো দূরের কথা, ছেলেটা এমন কি বিড়ি-সিগারেটও খেতো না," স্কুল শিক্ষক শ্বশুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।

কথাটা শুনে চেয়ে থাকলো জামান। জেফরিও কিছু একটা ধরতে পেরে জামানের দিকে তাকালো।

"হাসান সাহেবের পকেটে যেসব জিনিস পেয়েছে তার মধ্যে একটা লাইটার ছিলো না?" জেফরির কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলো জামান।

"আপনি নিশ্চিত, হাসান সাহেব স্মোকার ছিলেন না?"

বৃদ্ধ স্কুলশিক্ষকের হয়ে জবাবটা দিলো মলি। "না। ও সিগারেট খেতো না।"

"তাহলে পকেটে লাইটার ছিলো কেন?"

জেফরির এ কথায় কেউ কোনো জবাব দিলো না।

"ব্যাপারটা কেমন জানি হয়ে গেলো না," সবার দিকে তাকিয়ে বললো জেফরি। "যে লোক সিগারেট খায় না তার পকেটে লাইটার কেন থাকবে!"

"কিরে মা, জামাই কি মাঝেমধ্যে সিগারেট খেতো নাকি?"

বাবার প্রশ্নে মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো মলি। "খেতো না, বাবা। তবে..."

"তবে কি?" জেফরি বললো।

"ঢাকায় আসার পর একদিন বুঝলাম টয়লেটে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খায়। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে একটু কাচুমাচু খেয়ে আমাকে বলে মাঝেমধ্যে সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে করলে দুএকটা খায়...কিন্তু নিয়মিত না।"

"আচ্ছা," বললো ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। "তাহলে মাঝেমধ্যে সিগারেট খেতেন?"

"না। ওই ঘটনার পর আমি খুব নিষেধ করি তাকে...আমাকে কথা দেয় আর কখনও

সিগারেট খাবে না। তারপর থেকে কোনোদিন সিগারেট খেতে দেখি নি।"

কপালের বাম পাশটা চুলকালো জেফরি বেগ। জামান জানে, এর মানে তার বস্ বুঝতে পারছে না এরপর কী বলবে। তার কাছেও এই কেসটা কেমন জানি দুর্বোধ্য ঠেকছে। হাসান নামের নিরীহ গোবেচারা একজনকে সেন্ট অগাস্টিনের মতো অভিজাত স্কুলের ভেতর কে বা কারা খুন করতে গেলো-জামান অনেক ভেবেছে, কোনো সম্ভাব্য উত্তরও তার মাথায় আসে নি। হাইপোথেটিক্যালি কিছু দাঁড় করাতেও ব্যর্থ হয়েছে সে। তার ধারনা, জেফরি বেগের অবস্থাও তার মতোই।

তবে জামানের এই ভাবনাটি পুরোপুরি ঠিক নয়। জেফরি বেগের অবস্থা তারচেয়ে খারাপ। এই কেসের ব্যাপারে একটা সামান্য ক্লু হাতে পেয়েছিলো বিশ্বজিৎ সান্যালের অফিস ঘরের টয়লেটটা দেখতে পেয়ে। ভেবেছিলো এটা নিয়ে কাজ করলে অনেক কিছু বের করা যাবে। কেন একজন লোক নিজের অফিসের অ্যাটাচড টয়লেট থাকার পরও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের টয়লেটে যাবে-এই প্রশ্নের উত্তর পেলে হয়তো অনেক কিছু জানা যেতো। সেই উত্তরটা এখন পেয়ে গেছে। আর সেটাই তাকে হতাশায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। কারণ, সেন্ট অগাস্টিনের টয়লেটে একটা আধ খাওয়া সিগারেটের টুকরো পেয়েছিলো তারা। এভিডেন্স হিসেবে সেটা জব্দ করা হয়েছে। জেফরি এখন প্রায় নিশ্চিত, হাসান নামের ক্লার্ক ছেলেটি সিগারেট খাওয়ার জন্যেই নীচের ঐ টয়লেটে গেছিলো। এর মধ্যে আর কোনো রহস্য নেই। জটিলতা নেই।

"স্যার?"

জামানের কথায় সম্বিত ফিরে পেলো সে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে।

"তাহলে কি হাসান সাহেব সিগারেট খাওয়ার জন্যই নীচের টয়লেটে গেছিলেন?"

জামানের প্রশ্নটা শুনে জেফরি খুশিই হলো। তার এই সহকারী বেশ উন্নতি করেছে। ঠিক তার মতো করেই ভাবতে পারে এখন। এই হতাশার মধ্যে এটাই একমাত্র আশার কথা।

"হুম...তাই তো মনে হচ্ছে," মলি আর তার বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলো তারা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে তার দিকে। "সান্যালবাবু অনেক সিনিয়র মানুষ, সরাসরি তার বস, সেজন্যে হয়তো হাসান সাহেব নীচের টয়লেটে গেছিলেন সিগারেট খেতে..."।

"ও লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেতো!" বিস্ময়ে বললো মলি। "আমি বিশ্বাস করি না।"

"ভুলে যাবেন না, উনার পকেট থেকে একটা লাইটার পাওয়া গেছে," বললো জামান। "উনি হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে মাঝেমধ্যে দুএকটা সিগারেট খেতেন?"

"না। আমার তা মনে হয় না।"

মলির দৃঢ়তায় অবাক হলো জেফরি। "কেন মনে হচ্ছে না, আপনার?"

"কারণ ও আমার মাথা ছুঁয়ে কসম খেয়েছিলো আর সিগারেট খাবে না।"

জেফরি কী বলবে বুঝতে পারলো না। সে নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একটু আধটু সিগারেট খেতো, রেবা একদম পছন্দ করতো না। সিগারেটের গন্ধ তার কাছে অসহ্য লাগতো। রেবা তাকে দিয়ে কম করে হলেও পঞ্চাশ বার কসম খাইয়েছে সিগারেট ছাড়ার জন্য কিন্তু সে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিকই খেতো। শুধু গভীরভাবে চুমু খাওয়ার সময় ধরা পড়ে যেতো রেবার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতো তাকে। আবার নতুন করে প্রতীজ্ঞা করার খেলা শুরু হতো। সিগারেট সে ঠিকই ছেড়েছিলো তবে সেটা রেবার কারণে নয়। মৃত্যুশয্যায় ফাদার যেদিন তার হাত ধরে বললো এই ফালতু জিনিসটা কি না খেলেই নয়, সেদিন থেকে আর সিগারেট খায় নি জেফরি।

মলির গভীর বিশ্বাস, তার মাথা ছুঁয়ে যেহেতু কসম খেয়েছে তাই হাসানের পক্ষে সিগারেট খাওয়া একেবারেই অসম্ভব। মেয়েটার সরলতায় মুগ্ধ হলো সে। কিন্তু জেফরি জানে, বেশিরভাগ পুরুষ মানুষ এরকম প্রতীজ্ঞা ভাঙতে বিন্দুমাত্রও পরোয়া করে না।

"তবে আমি নিশ্চিত, হাসান সাহেব মাঝেমধ্যে সিগারেট খেতেন।"

জেফরির কথাটা শুনে মাথা দোলাতে লাগলো মলি। সে কোনোভাবেই এটা বিশ্বাস

করতে পারছে না।

ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে থাকা লিটু তার বোনকে উদ্দেশ্য করে বললো, "আপা, উনি ঠিকই বলেছেন। ভাইয়া মাঝেমধ্যে সিগারেট খেতেন।"

একটু বিস্মিত হলো মলি। "তুই জানলি কি করে?"

"ছাদে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেতেন ভাইয়া। আমি কয়েকবার দেখেছি। আমাকে দিয়েও একবার সিগারেট আনিয়ে পাশের ফ্ল্যাটের মিলন সাহেবের সাথে সিগারেট খেয়েছিলেন।"

"এ কথা আমাকে কেন বলিস নি?"

"ভাইয়া বলেছিলেন কথাটা যেনো তোমাকে না বলি..." লিটু অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে ফেললো।

"ওয়েট অ্যা মিনিট, জেফরি বেগ বললো লিটুকে।

"তুমি হাসান সাহেবকে পাশের ফ্ল্যাটের মিলন নামের একজনের সাথে সিগারেট খেতে দেখেছিলে?"

"জি," মুখ তুলে বললো লিটু।

"তার মানে ঐ মিলনের সাথে হাসান সাহেবের ভালোই খাতির ছিলো?"

"ইয়ে মানে, খাতির ছিলো কিনা জানি না, তবে দুএকবার উনার সাথে ভাইয়াকে সিগারেট খেতে দেখেছি, কথাবার্তা বলতেও দেখেছি..."

"কিন্তু আমি তো কখনও দেখি নি," অবাক হয়ে বললো মলি।

লিটু কিছু বললো না।

"তুমি বলেছো, এখানে তুমি এসেছো দু'মাস আগে...তাহলে এটা কবে দেখেছো?"

"আমি আসার পর পরই।"

"তুই কি ঠিক বলছিস?" মলি জানতে চাইলো তার ভায়ের কাছে। "আমি তো কখনও দেখি নি মিলন সাহেবের সাথে কথা বলতে।"

"আমিও খুব একটা দেখি নি...বললাম না, ছাদে দুএকবার দেখেছি...ভাইয়ার সাথে সিগারেট খেতে খেতে কী নিয়ে যেনো কথা বলছিলো।"

"কী জানি, আমি এসবের কিছু জানি না। হাসান আমাকে কখনও বলে নি। ও কখনও ছাদে গেছে কিনা তাও আমি জানি না।"

ব্যাপারটা জেফরি বুঝতে পারলো। হাসান সাহেব লুকিয়ে লুকিয়ে যেহেতু সিগারেট খেতেন তাই এই ব্যাপারটা মলিকে বলেন নি।

"আচ্ছা, ঐ মিলন সাহেব কি বাসায় আছেন?" প্রশ্নটা করলো লিটুকে।

"তা তো বলতে পারবো না। দুএকদিন ধরে তাকে দেখি নি। অবশ্য মাঝেমধ্যেই তিনি ঢাকার বাইরে যান।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা তাহলে আজ উঠি," কথাটা বলেই জেফরি উঠে দাঁড়ালো। "পরে কখনও দরকার পড়লে আবার আসবো।"

হাসান সাহেবের ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়ালো জেফরি।

"এটাই তো মিলন সাহেবের ফ্ল্যাট, তাই না?" পাশের ফ্ল্যাটের দরজা দেখিয়ে জামানকে বললো সে।

"জি, স্যার...ওরা তো তাই বললো।"

"ভদ্রলোক আছে কিনা দেখি..."

মিলন সাহেবের দরজায় কোনো কলিংবেল নেই তাই টোকা দিলো জেফরি। বেশ কয়েক বার টোকা দেবার পরও কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেলো না। অথচ ভেতরে মানুষজন আছে এটা নিশ্চিত, কারণ চড়া ভলিউমে হিন্দি সিনেমার গান বাজছে।

জামান এগিয়ে এসে দরজায় বেশ কয়েক বার জোরে জোরে ধাক্কা দিলে ভেতর থেকে

একটা নারী কণ্ঠ বাজখাই গলায় জবাব দিলো এবার : "কে?!"

জামান আবারো জোরে জোরে ধাক্কা দিলো।

"আরে গেট তো দেহি ভাইঙ্গা হালাইবো!" বাজখাই নারী কণ্ঠটা রেগেমেগে বললো। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করে খুলে গেলো দরজাটা।

প্রথমেই নজরে পড়লো মহিলার বিশাল বক্ষ। সালোয়ার-কামিজ পরে থাকলেও বুকে ওড়না নেই। বেশ নাদুসনুদুস শরীরের মহিলা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভুরু কুচকে।

জেফরি আর জামানকে আপাদমস্তক দেখার পর মহিলার ভাবভঙ্গি পাল্টে গেলো। চোখেমুখে ফুটে উঠলো অদ্ভুত এক ভঙ্গি।

"কি চাই?" কথাটা টেনে টেনে বললো মহিলা।

"মিলন সাহেব বাসায় আছেন?" বললো জামান।

মহিলা একবার জামানের দিকে আরেকবার জেফরির দিকে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে। "মিলন সাহেব!" কথাটা বলেই শরীর দোলাতে লাগলো। "হেরে চাইতাছেন?"

"জি।"

"ক্যান?"

"একটু দরকার ছিলো।"

"আমারে কওন যায় না?"

মহিলার ভাবভঙ্গি দেখে জেফরির মনে হলো খুব একটা সুবিধার নয়। দু দু'জন অপরিচিত পুরুষ মানুষের সামনে বিশাল বক্ষা উঁচিয়ে শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে কথা বলছে।

"আপনি মিলন সাহেবের কি হন?"

"বউ!" কথাটা এমনভাবে বললো যেনো বাতাসে কিছু ফুঁ দিলো।

"ও," বললো জামান।

"ও কি?" মহিলার ভাবভঙ্গি জেফরি আর জামানের জন্য খুবই বিব্রতকর ঠেকছে এখন।

"কিছু না...মিলন সাহেবের সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম...উনি কি বাড়িতে আছেন?" দ্রুত বললো জামান।

"নাই," মহিলা শরীর দুলিয়ে জবাব দিলো, কিন্তু তার চোখের পলক পড়ছে না। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে জেফরি আর জামানের দিকে।

"কে এসেছে, আপা?" ভেতর থেকে আরেকটা মেয়েলী কণ্ঠ বলে উঠলো। তবে এই কণ্ঠটা শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলে।

মিলনের স্ত্রী পেছন ফিরে বাজখাই গলায় জবাব দিলো, "আমি কার লগে কথা কই তা দিয়া তুমার কাম কি..." তারপর গজগজ করতে করতে চাপাকণ্ঠে বললো, "ব্যাটা মানুষের গন্ধ পাইলে আর হুঁশ থাকে না!"

জেফরি আর জামান মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

খোলা দরজার সামনে এক তরুণীর আবির্ভাব ঘটলো এ সময়। লম্বা ছিপছিপে, বেশ আধুনিক সাজগোজ। জিন্সের প্যান্ট আর টি-শার্ট পরা। তরুণীটি দেখতে বেশ সুন্দরী আর স্মার্ট।

দরজার কাছে এসে জেফরি আর জামানকে ভালো করে দেখে নিলো সেই তরুণী। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মিলন সাহেবের স্ত্রীকে আমলে না নিয়ে প্রশ্ন করলো, "কাকে চান?"

মিলন সাহেবের স্ত্রী দরজার সামনে থেকে একটু সরে জায়গা করে দিলো তরুণীর জন্য। তবে তার চোখেমুখে বিরক্তি। রাগে গজগজ করছে এখনও। যেনো এই তরুণীর উপস্থিতি সহ্য হচ্ছে না।

এবার জেফরি জবাব দিলো, "মিলন সাহেবকে একটু চাচ্ছিলাম।"

"কোত্থেকে এসেছেন?"

“আপনি কে?” বললো জামান।
“আমি ওর ওয়াইফ।”
“কি?!” অবাক হয়ে বলে উঠলো জামান।
জেফরি দেখতে পেলো, পাশে দাঁড়ানো মিলন সাহেবের স্ত্রী মুখ বেঁকিয়ে অন্য দিকে চেয়ে আছে। থ বনে গেলো জেফরি আর জামান। মিলন সাহেবের স্ত্রী পরিচয় দেয়া মহিলা মুখ বেঁকিয়ে বিড়বিড় করে কী যেনো বলতে বলতে ভেতরে চলে গেলো।
“আপনিও মিলন সাহেবের স্ত্রী?” জামান বললো তরুণীকে।
“জি।” স্বাভাবিকভাবে বললো তরুণীটি।
“তাহলে উনি যে বললেন...” দরজার ভেতরে ইশারা করলো জামান।
“উনি প্রথমজন...”।
“আপনাদের স্বামী মিলন সাহেব তাহলে বাসায় নেই?” জিজ্ঞেস করলো জামান।
“না, নেই।”
“উনি কখন ফিরবেন?” জানতে চাইলো জেফরি বেগ।
“ঠিক করে বলতে পারবো না,” কথাটা বলেই পেছন ফিরে ভেতরের দিকে তাকিয়ে বললো, “আপা, ও কোথায় গেছে তুমি জানো?”
আবার দরজার কাছে চলে এলো মিলনের প্রথম স্ত্রী। তার আগে কন, হেরে ক্যান দরকার?”
সহকারীর দিকে তাকালো জেফরি।
“পাশের ফ্ল্যাটে হাসান সাহেব খুন হয়েছেন, জানেন নিশ্চয়?” বললো জামান।
মিলনের দুই স্ত্রী অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।
“হ, জানি,” প্রথমজন বললো।
“আমরা সেই মার্ডার কেসের তদন্ত করছি...”
“আপনেরা পুলিশ!” একটু ভড়কে গেলো প্রথমজন। দ্বিতীয়জন আস্তে করে ভেতরের ঘরে চলে গেলো।
“জি, পুলিশ,” কথাটা বলেই দাঁত বের করে কৃত্রিমভাবে হাসলো জামান। “আমরা দুজনেই পুলিশ। ইনি আমার স্যার।”
প্রথমজন জেফরির দিকে হা করে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। “মিলনরে ক্যান খুঁজতাছেন?” একটু নরম সুরে জানতে চাইলো অবশেষে।
“উনার সাথে একটু কথা বলতে হবে হাসান সাহেবের কেসের ব্যাপারে,” জামান উত্তর দিলো।
মহিলা একটু চুপ থেকে বললো, “হে তো বাসায় নাই।”
“জি, এটা আমরা এরইমধ্যে জেনে গেছি। এখন বলুন, কখন বাসায় ফিরবেন?”
“কখন ফিরবো সেইটা তো জানি না। কইয়া গেছে ঢাকার বাইরে যাইতাছে। কবে ফিরবো কিছু কয় নাই।”
“উনি কি করেন?” জেফরি জিজ্ঞেস করলো।
ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো মহিলা।
“আপনার স্বামী মিলন সাহেব কি করেন?” জামান তাড়া দিলো তাকে।
“বিজনিস করে,” বললো মিলনের স্ত্রী।
“কিসের বিজনেস করে?” একটু রেগে বললো জামান।
“সেইটা তো জানি না,” মহিলা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো জেফরি আর জামানের দিকে।
“হোয়াট!” জামান ফিরে তাকালো তার বস্ জেফরি বেগের দিকে।
এই স্টুপিড মহিলা বলে কী! নিজের স্বামী কি করে সেটা জানে না! আজব! এমন কথা কেউ বাপের জনমে শুনেছে?

“বিশ্বাস করেন, আসলেই জানি না হে কি করে।”

জামান আবারো তাকালো তার বসের দিকে। তাকে হাত তুলে থামিয়ে জেফরি বেগ মহিলাকে বললো, “আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনার স্বামীর ফোন নাম্বারটা আমাদেরকে দিন।”

ঢোক গিললো মিলনের স্ত্রী।

মহিলার এমন আচরণে জামান অধৈর্য হয়ে বললো, “আপনি নিশ্চয় বলবেন না, হাজবেন্ডের ফোন নাম্বারটাও আপনার কাছে নেই?”

ঢোক গিলে বললো মহিলা। “নাই তো?”

অধ্যায় ১০

জেফরি বেগ নিজের অফিসে বসে আছে। তার সামনে চুপচাপ বসে আছে জামান। কিছুক্ষণ আগে নিহত হাসানের বাড়ি থেকে তারা বলতে গেলে শূন্য হাতে ফিরে এসেছে। তবে পাশের ফ্ল্যাটের মিলন সাহেবের দুই স্ত্রীর কর্মকাণ্ডে তারা যারপরনাই বিস্মিত। দুই মহিলার আচরণ শুধু অদ্ভুতই না, একেবারে বেখাপ্পা।

নিজের স্বামী কোথায় গেছে সেটা না জানাটা অস্বাভাবিক ঘটনা নাও হতে পারে কিন্তু স্বামী কি করে সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাটা কি করে বিশ্বাস করা যায়? তারচেয়ে বড় কথা মিলন সাহেবের ফোন নাম্বার পর্যন্ত তার স্ত্রীদের কাছে নেই। মহিলা অবশ্য জানিয়েছে তার স্বামী ফোন ব্যবহার করে। তাহলে স্ত্রীদের কাছে সেই ফোন নাম্বার থাকবে না কেন?

মাথা থেকে মিলন সাহেবের স্ত্রীদের রহস্যময় আচরণ আর কার্যকলাপের ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলে দিলো। এই ব্যাপারটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে।

এখন অন্য একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করলো জেফরি। হাসান সাহেবের বাড়ি থেকে চলে আসার সময়ই এই ব্যাপারটা তার মাথায় চট করে এসেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে আবারো হাসান সাহেবের বাসায় চলে যায় তারা দু'জন। নিহত হাসানের শ্যালক লিটুর কাছ থেকে ছোট্ট একটা তথ্য জেনে নেয় জেফরি। আর সেই তথ্যটাই তাকে নতুন করে ভাবাচ্ছে এখন, বিশেষ করে তার টেবিলে রাখা একটা জিনিস দেখার পর থেকে।

জামান চুপচাপ বসে আছে। তার সামনে একটা এভিডেন্স ব্যাগ।

সেন্ট অগাস্টিনের টয়লেটে হাসান সাহেবের মৃতদেহ ছাড়াও একটা আধ খাওয়া সিগারেট পাওয়া গেছিলো। এভিডেন্স হিসেবে ওটা কালেক্ট করেছে জামান। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করার জন্য দেয়া হয়েছিলো, সিগারেটটা নিহত হাসানের ছিলো কিনা ম্যাচ করে দেখার জন্য। সেটার ফলাফল হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই পাওয়া যাবে। কিন্তু জেফরি প্রায় নিশ্চিত, এটা নিহত হাসানের সিগারেট নয়। অন্য কারোর। সম্ভবত খুনির। হতে পারে।

হাসানের বাড়িতে দ্বিতীয়বারের মতো গিয়ে তার শ্যালক লিটুর কাছ থেকে শুধু জানতে চেয়েছিলো, তার বোনজামাই কোন ব্র্যান্ডের সিগারেট খেতো। ছেলেটা যে ব্র্যান্ডের কথা বলেছে সেটা আর তাদের কালেকশানে থাকা এই আধখাওয়া সিগারেটের ব্র্যান্ড এক নয়।

একজন স্মোকার সাধারণত নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের সিগারেটই খেয়ে থাকে। খুব কমই এর ব্যত্যয় ঘটে। তবে শতভাগ নিশ্চিত হতে হলে ফরেনসিক পরীক্ষার ফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাদেরকে।

"আমি নিশ্চিত, এটা হাসানের সিগারেট না," জামানকে বললো জেফরি।

"তাহলে আমরা আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবো, স্যার," জামান অনেকটা খুশি হয়েই বললো।

"হ্যাঁ।"

"তখন আবারো প্রশ্ন উঠবে, হাসান সাহেব টয়লেটে গেছিলেন কি জন্যে?"

জামানের এ কথায় জেফরি মাথা নেড়ে সায় দিলো। আমি মনে মনে আশা করছি ফরেনসিক পরীক্ষার রেজাল্টটা যেনো এরকমই হয়।"

"আমারও ধারণা এটা হাসান সাহেবের সিগারেট না।"

"হাসান অন্য কোনো কারণে টয়লেটে গেছিলো তাহলে।"

"কি কারণে হতে পারে, স্যার?"

মাথা দোলালো জেফরি। "অনেক কিছুই হতে পারে...প্রাথমিক অবস্থায় কোনো কিছুই জোর দিয়ে বলা যাবে না। তবে এটা নিশ্চিত হাসানকে যারা খুন করেছে তারাই তাকে সেখানে নিয়ে গেছিলো। তাদের সাথে হয়তো ছেলেটার দেখা হয় নীচে," একটু থেমে আবার বললো, "খুনের ধরণ দেখে প্রফেশনাল কারোর কাজ বলে মনে হয়েছে। সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে খুনি এক বা একাধিক যাইহোক না কেন, সে স্কুলের বাইরের কেউ।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো জামান।

"স্কুলের ভেতরে যারা আছে তাদের মধ্যে ওরকম প্রফেশনাল খুনি থাকাটা বলতে গেলে অসম্ভব ব্যাপার...আপাতত সেরকম কিছু ভাবছি না আমি।"

জামান এবার বুঝতে পারলো। "আমরা কি ধরে নেবো স্কুলের কেউ এ কাজে সাহায্য করেছে?"

"সম্ভবত করেছে। আরেকটা কথা কি জানো, মনে হচ্ছে আমার ঐ বিগব্রাদার আমার কাছ থেকে কিছু একটা লুকিয়েছেন। উনার আচরণে সন্দেহজনক কিছু আছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জামান। "তাহলে আমরা এখন কি করবো, স্যার?"

"হাসান সাহেব ঠিক যে সময়টাতে সেন্ট অগাস্টিন স্কুলে খুন হয়েছে আমি সেই সময়টাতে ওখানে যেতে চাই। আমার মনে হচ্ছে এটা করা খুবই দরকার।"

"আপনি একা যাবেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো কেবল।

"আসতে পারি, স্যার?"

একটা মিষ্টি নারীকণ্ঠ শুনে জেফরি আর জামান দরজার দিকে তাকালো। এডলিন ডি কস্টা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

"আসুন," বললো জেফরি বেগ।

মেয়েটা ভেতরে ঢুকতেই পারফিউমের গন্ধে ভরে গেলো সারা ঘর। এতো পারফিউম মেখে অফিসে আসার কোনো মানে হয়? ভাবলো জেফরি।

এডলিন চুপচাপ জামানের পাশের চেয়ারে বসে পড়লো।

"কিছু বলবেন?" জেফরি জিজ্ঞেস করলো এডলিনকে।

পাশে বসে থাকা জামানের দিকে চকিতে তাকালো মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে জামান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

"স্যার, আমি এখন যাই।"

জেফরি কিছু বলার আগেই তার সহকারী চুপচাপ ঘর থেকে চলে গেলো। একটা অস্বস্তি জেঁকে বসলো তার মধ্যে। এই মেয়েটা তার সামনে এলেই এমনটি হয়। এটা এজন্যে নয় যে, মেয়েটির প্রতি জেফরির কোনো গোপন আর্কষণ আছে। সত্যি বলতে, মেয়েটি তার সামনে এমন ভঙ্গি করে, এমন কিছু রহস্যময় চাহনি দেয় যেটা তার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

"বলুন, কি বলবেন?"

এডলিন একটা এ-ফোর সাইজের কাগজ বাড়িয়ে দিলো জেফরির দিকে। "সিগারেটের সালিভা ম্যাচিং করা হয়েছে।"

যথারীতি 'স্যার' বলা বন্ধ। এই মেয়েটা একান্তে জেফরিকে স্যার সম্বোধন করে না। ব্যাপারটা বাতিকের পর্যায়ে চলে গেছে।

কাগজটা হাতে তুলে নিলো সে। এই জিনিস জামানের সামনে দিতে কী এমন অসুবিধা ছিলো? আজব!

'সাবের কামাল না এসে রিপোর্টটা আপনি নিয়ে আসলেন যে?" রিপোর্টে চোখ বুলাতে বুলাতে বললো জেফরি বেগ।

"কেন, আমি নিয়ে আসাতে কি কোনো সমস্যা হয়েছে?" এডলিন অপলক চোখে চেয়ে রইলো জেফরির দিকে।

"না, সমস্যা হবে কেন, এমনি বললাম।" আবারো চোখ রাখলো রিপোর্টে।

"সাবের ভাইয়ের এক গেস্ট এসেছে, তাই আমি নিজেই নিয়ে এলাম, ভাবলাম রিপোর্টটা আপনার জন্য খুব জরুরি..."

জেফরি কিছু বললো না। সে ভালো করেই জানে, এই মেয়ে তার সাথে দেখা করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। সেটারই সদ্ব্যবহার করেছে এখন।

রিপোর্টটা ডেস্কে রেখে দিলো সে।

“ভিক্টিমের সাথে সালিভা ম্যাচিং করে নি,” এডলিন বলতে শুরু করলো।

“হুম, আমি জানতাম এরকমই হবে।”

“আপনি জানতেন?” কৃত্রিম বিস্ময় নিয়ে বললো এডলিন। “ওয়াও!”

জেফরি কিছু বললো না। এই মেয়েটা তার অফিস থেকে যতো তাড়াতাড়ি চলে যায় ততোই ভালো। নইলে ডিপার্টমেন্টের গসিপপ্রিয় লোকজনের হাতে এক্সকুসিভ খোরাক তুলে দেয়া হবে।

“তো আপনার কাজকর্ম কেমন চলছে?” এমনি এমনি জিজ্ঞেস করলো জেফরি বেগ।

“ভালো।”

“ব্যস্ততা কেমন?”

“খুব বেশি ব্যস্ততা নেই,” পরক্ষণেই হাসিমুখে বললো, “এক কাপ চা কিংবা কফি খাওয়ার মতো সময় আছে।”

ওহ, মনে মনে বললো জেফরি।

“চা খাবেন?”

“খাওয়া যায়, আপনি যখন বলছেন।”

আমি আবার কখন বললাম? জেফরি ঠিক করলো এড়িয়ে যেতে হবে। “ঠিক আছে, আপনি চা খেতে থাকেন আমি একটু স্যারের রুম থেকে আসছি।” কথাটা বলেই ইন্টারকম হাতে তুলে নিতে যাবে অমনি এডলিন বাধা দিলো।

“থাক তাহলে,” মেয়েটার মুখ কালো হয়ে গেছে মুহূর্তে। “আমি এখন উঠি। আপনি স্যারের রুমে যান।”

বিব্রত হয়ে রুম থেকে চলে গেলো এডলিন।

চুপচাপ নিজের ডেস্কে বসে রইলো জেফরি। মেয়েটার জন্য তার মায়া লাগছে। তাকে কষ্ট দেয়ার কোনো ইচ্ছে তার ছিলো না।

মোবাইল ফোনটা বের করে রেবার নাম্বারে ডায়াল করলো এডলিন সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য। কলটা রিসিভ করা হলে তার মুখে ফুটে উঠলো হাসি।

“কি করছো?”

অধ্যায় ১১

শূন্য বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু চোখ বন্ধ করতে পারছে না। আজ তিনদিন ধরে রাতে তার ঘুম হয় না। দিনের বেলায় ক্লান্তিতে দুচোখ বন্ধ হয়, ঘুমের ওষুধ খেয়ে কিছুক্ষণ বেঘোরে পড়ে থাকে। ছোটো ভাই আর বাবার কারণে দিনের বেলাটা কোনো রকম পার করে দেয়া যায় কিন্তু রাত একদমই অসহ্য হয়ে উঠেছে। রাত নেমে এলেই নিজেকে প্রচণ্ড একা মনে হয় তার। মনে হয় অন্ধকার সমুদ্রে ছোট্ট একটা ভেলায় করে ভেসে যাচ্ছে। কোথায় ভেসে যাচ্ছে তাও তার জানা নেই।

ঘুমের ওষুধ খেলেও রাতে ঘুম আসে না। একটু আগে পর পর দুটো পিল খেয়েছে, কোনো কাজ হয় নি।

বিছানার যেখানটায় হাসান ঘুমাতো সেখানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলো মলি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করলো। মাত্র কয়েক দিন আগেও হাসান এখানে শুয়ে থাকতো। তাকে জড়িয়ে ধরে রাখতে সারা রাত। আদর করতো, গল্প করতো। মলি বার বার বলতো ঘুমিয়ে পড়ার জন্য, সকালে স্কুলে যেতে হবে, তাড়াতাড়ি উঠতে হবে না? কিন্তু হাসান শুনতো না। এমনিতে স্বভাবে চুপচাপ হলেও মলির সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে যেতো। আজ সেই মানুষটি নেই। নেই মানে চিরতরের জন্যে নেই হয়ে গেছে। আর কখনও ফিরে আসবে না। তাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো আব্দার করে বলবে না, "আরেকবার, জান...প্লিজ?"

মলির চোখের জল বিছানায় গড়াচ্ছে এখন। তাদের বিয়েটা প্রেমের বিয়ে ছিলো না। কিন্তু সেটেলড ম্যারেজও বলা যাবে না। হাসান ছিলো তার মায়ের মামাতো ভায়ের ছেলে। মাঝেমধ্যে দেখা হতো, কথা হতো কিন্তু প্রেম ভালোবাসা বলতে যা বোঝায় সেটা হবার আগেই একদিন হাসানের বাপ তার মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে। প্রস্তাব দেবার পরের সপ্তাহেই তাদের কাবিন হয়ে যায়। এইচএসসি পাশ করে তখন ডিগ্রি পাস কোর্সে পড়ছে সে। মাত্র দু'বছর আগের কথা।

বিয়ের পর মলি গ্রামেই ছিলো। ডিগ্রি পাস করার পরই তিন মাস আগে ঢাকায় নতুন সংসার জীবন শুরু করে তারা। এর আগে মাসে দুএকবার হাসান বাড়ি যেতো। সবচেয়ে বেশি কাছে পেতো ঈদের সময়টাতে। তাও তিন চারদিনের বেশি হবে না। একজন আরেকজনকে পাবার ব্যাকুলতা ছিলো। দিন দিন সেই ব্যাকুলতা বাড়তে থাকে। বছরখানেক আগেই হাসান জানায়, তাকে ঢাকায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সে। ঢাকায় বাড়ি ভাড়া এতো বেশি, তার মাইনের টাকায় চলবে? মলির এ কথায় হাসান তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলো, সে টুকটাক শেয়ারের ব্যবসা শুরু করেছে। চিন্তার কোনো কারণ নেই। দুজনে মিলে কষ্ট করে হলেও একসাথে থাকবে। এভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতে আর ভালো লাগে না। কষ্ট করলে একসাথেই করবে।

কথাটা শুনে মলি যারপরনাই খুশি হয়েছিলো। তার নিজেরও কি ভালো লাগতো? কতো রাত একা একা ছটফট করে কাটিয়ে দিয়েছে। কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে নি। হাসান যখন বাড়িতে আসতো তখন অভিমানের সুরে, কপট রাগ দেখিয়ে প্রকাশ করতে নিজের ব্যাকুলতা, হাহাকার।

সেই কষ্টের দিন শেষ হয়ে যায় তিন মাস আগে। ঢাকা শহরে ছোট্ট সংসার শুরু করে তারা। দিনগুলো কাটছিলো স্বর্গের মতো। শান্তশিষ্ট হাসান অফিস থেকে সোজা চলে আসতো বাসায়। মলিই ছিলো তার দুনিয়া। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো খুব জলদি।

সকালে হাসান বেরিয়ে যায় স্কুলের কাজে। ফিরে আসে বিকেলে। সারাদিন মলি থাকে একা একা। এই ঢাকা শহরে তার মতো গ্রাম থেকে আসা মেয়ের জন্য কঠিন একটি ব্যাপার। কিন্তু এর সহজ সমাধান বের করে হাসান নিজেই। মলির ছোটো ভাই লিটু মাত্র এসএসসি পাশ করেছে, সদরের একটা সরকারী কলেজে ভর্তি হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন। হাসান তার শ্বশুরকে প্রস্তাব দিলো, লিটু ঢাকায় চলে আসুক। এখানকার ভালো কোনো

কলেজে ভর্তি হোক। শ্বশুর আর না করে নি। মেয়ের এবং ছেলের দুজনেরই ভালো হবে। সুতরাং আপত্তি জানানোর কিছু ছিলো না।

দু'মাস আগে তার ছোটো ভাই লিটু চলে আসে তাদের সাথে থাকার জন্য। হাসান তার শ্যালককে ভালো একটি কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়। দিনগুলো ভালোই কাটছিলো। দুপুরের মধ্যে লিটু ফিরে আসতে কলেজ থেকে। তারপর বোনের জন্য এটা ওটা কিনে আনার কাজ করতো, তাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতো। বিকেলে হাসান ফিরে এলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তো টিউশনি করতে। হাসানই টিউশনিটা জোগাড় করে দিয়েছিলো লিটুর হাত খরচের জন্য।

টিউশনি শেষে কিছু না কিছু মুখরোচক খাবার কিনে আনতো তার এই ছোটো ভাইটি। তারপর একসঙ্গে বসে টিভি দেখা, গান শোনা, গল্পগুজব চলতো রাত অবধি।

হায়, সেই সুখের দিনগুলো এতো দ্রুত ফুরিয়ে যাবে কে ভেবেছিলো!

কোত্থেকে এক ঝড় এসে মলির ছোট্ট সংসারটাকে এলোমেলো করে দিয়ে। গেলো এক লহমায়।

জোর করে কান্না চেপে রাখলো মলি। পাশের ঘরেই তার বাবা আর ভাই আছে। সে জানে, তার বাবার চোখে ঘুম নেই। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বৃদ্ধ বয়সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। দু'চোখে অন্ধকার দেখছেন। কান্নার শব্দ যাতে পাশের ঘর থেকে শোনা না যায় সেজন্যে মুখ চেপে রাখলো সে।

ঘণ্টাখানেক এভাবে বোবা কান্নায় ডুবে থেকে বিছানায় উঠে বসলো মলি। আলমিরা খুলে হাসানের শার্ট-প্যান্ট বের করে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলো কিছুক্ষণ। এখনও হাসানের গন্ধ লেগে রয়েছে তার জামা-কাপড়ে, শুধু মানুষটা নেই।

হাসান যে শার্টটা বেশি পরতো সেটা বের করলো-সাদা রঙের একটি সূতির শার্ট। নাকে-মুখে ঘষে শার্টটার গন্ধ নিলো মলি। বুক ফেটে কান্না বের হয়ে আসতে চাইলো। জোর করে দমন করলো সেই কান্না। তবে নিঃশব্দ কান্নার জলে ভিজে গেলো শার্টটা।

মলির ভেতরে তীব্র হাহাকার, হাসান এসে তাকে জড়িয়ে ধরুক। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে তাকে গ্রাস করুক। শুধু গন্ধ না, রক্তমাংসের হাসানকে পেতে চাইছে সে। তার বুকে মুখ লুকাতে চাইছে। কিন্তু ভালো করেই জানে, হাসান আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। অসাধারণ কোনো সঙ্গমের পনেরো মিনিট পরই তার কানে কানে আব্দারের সুরে বলবে না, আরেকবার, জান...প্লিজ!

এভাবে শার্টটা বুকে জড়িয়ে কতোক্ষণ বসেছিলো সে জানে না, সম্বিত ফিরে পেলো ভোরের আজানের চড়া শব্দে। বাড়ির কাছেই একটি মসজিদ আছে। ভোরবেলায় সেই মসজিদের আজান কান ফাটিয়ে দেবার উপক্রম করে। চোখ মুছে শার্টটা আলমিরায় রাখতে গেলো মলি। ওজু করে নামাজ পড়বে। হাসান মারা যাবার পর থেকে সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছে। এর আগে কখনও নিয়মিত নামাজ পড়ে নি।

ভোরের আলো খোলা জানালা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছে। কিছুটা আলোকিত করে ফেলেছে ঘরটা। শার্টটা আলমিরায় রাখার সময় সেই আলোতে দেখতে পেলো হাসানের কাপড়চোপড়গুলো এলোমেলো হয়ে আছে। খুব যত্ন করে কাপড়গুলো গুছিয়ে রাখতে গিয়ে একটা জিনিস তার নজরে পড়লো।

শোকে মুহ্যমান থাকার কারণে এটার কথা তার মনেই ছিলো না। এখন দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাতে তুলে নিলো।

একটা ছোট্ট ডায়রি।

অধ্যায় ১২

সেন্ট অগাস্টিনে আজ একাই চলে এসেছে জেফরি বেগ। স্কুলের ছাত্রছাত্রী রা যেনো বুঝতে না পারে হোমিসাইডের একজন ইনভেস্টিগেটর তাদের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। এ কারণে অরুণদাকেও কিছু জানায় নি।

জেফরি যখন স্কুলে ঢুকলো তখনও ক্লাস চলছে। ছুটি হতে আর বেশি সময় বাকি নেই। দারোয়ান আজগর আর তার সঙ্গে থাকা কনস্টেবল বেশ সমীহ করে সালাম দিলো তাকে। এবার কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলো না। তাদের সাথে কোনো কথা না বলে সোজা চলে গেলো সেই টয়লেটের দিকে।

চারপাশটা ভালো করে দেখলো। মেইনগেট থেকে একটা ড্রাইভওয়ে চলে গেছে প্রশাসনিক ভবনের সামনে। সেখানে একটি গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা রয়েছে। কম করে হলেও আট-নয়টি গাড়ি পার্ক করা আছে। আরো চার পাঁচটি গাড়ি পার্ক করা যাবে। জেফরি জানে এখানে শুধুমাত্র শিক্ষক আর কর্মকর্তাদের গাড়ি রাখার অনুমতি দেয়া হয়। ছাত্রছাত্রী দের জন্যে যেসব গাড়ি আসে সেগুলো স্কুলের বাইরে, মেইনগেটের দুদিকে পার্কিংলটে রাখা হয়। বলা বাহুল্য, প্রায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী র জন্যেই গাড়ি আসে। গাড়ি নেই এরকম কোনো লোকের সন্তান এ স্কুলে পড়ে না। স্কুল আওয়ারে, ছুটির সময় পুরো এলাকায় জ্যাম লেগে যায় শত শত গাড়ির আনাগোনার কারণে।

পার্কিংলটের পাশেই স্কুলের মূল ভবনটি অবস্থিত। ছয় তলার এই ভবনটির বিভিন্ন রুমই ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মূল ভবনের সিঁড়ির পাশে বিশাল টয়লেটটি অবস্থিত। প্রতি তলায়ই এরকম টয়লেট রয়েছে।

জায়গাটা ভালো করে দেখলো জেফরি। পুরো স্কুল কম্পাউন্ডটি আট ফিট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালের উপর রয়েছে আরো তিন-চার ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। নিরাপত্তা বেশ ভালো। বাইরে থেকে কারো পক্ষে এখানে এসে খুন করে চলে যাওয়াটা খুবই কঠিন কাজ।

কিন্তু খুনটা যদি ভেতরের কেউ করে থাকে তাহলে একটা সমস্যা তৈরি হয়-কারণ সেই সম্ভাব্য খুনিকে হতে হবে পেশাদার কেউ। একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পেশাদার খুনি? ব্যাপারটা খুব বেশি কষ্টকল্পিত হয়ে যায়।

জেফরি ঠিক করলো বিশ্বজিৎ সান্যালের সাথে আবারো দেখা করবে। তার সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছে, ভদ্রলোকের স্মৃতিশক্তি একটু দুর্বল। গতকালের করা প্রশ্নগুলো থেকে কথারছলে আবারো দুয়েকটা প্রশ্ন করবে। দেখবে, লোকটা একই জবাব দেয় কিনা। জেফরি ভালো করেই জানে, মিথ্যে কথা তারাই ভালো বলতে পারে যাদের স্মৃতিশক্তি প্রখর। দুর্বল স্মৃতির লোকজনের মিথ্যে ধরার জন্য সামান্য একটি কৌশল খাটাতে হয়। এখন সেই কৌশলটাই খাটাবে বিশ্বজিৎ সান্যালের সাথে।

গতকাল যখন বিশ্বজিৎ স্যান্যালকে জেফরি প্রশ্ন করেছিলো হাসান সাহেবের সাথে স্কুলের কারো কোনো ঝামেলা হয়েছিলো কিনা তখন প্রিন্সিপ্যাল অরুণ রোজারিও আর স্যান্যালবাবুর মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিলো। ব্যাপারটা জেফরির চোখে ঠিকই ধরা পড়ে।

প্রশাসনিক ভবনের দোতলায় উঠে গেলো জেফরি বেগ।

বিশ্বজিৎ সান্যাল গভীর মনোযোগের সাথে কিছু কাগজপত্র দেখছে। জেফরি যে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেটা খেয়ালই করে নি ভদ্রলোক।

"কেমন আছেন, মি: সান্যাল।"

কথাটা শুনেই দরজার দিকে চমকে তাকালো হেড ক্লার্ক। জেফরিকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালো। "আপনি?"

ঘরে ঢুকে সান্যাল বাবুর সাথে হাত মেলালো জেফরি। এবার নমস্কার দেবার সুযোগ পেলো না ভদ্রলোক।

“কাছেই অন্য একটা কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম আপনাদের সাথে দেখা করে যাই,” একটু থেমে আবার বললো সে, “ব্যস্ত নাকি?”

“না, ইয়ে মানে...একটা পুরনো ফাইল দেখছিলাম।” জেফরিকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললো বাবু, “বসুন।”

চেয়ারে বসে পড়লো জেফরি। “আপনার কাজে ব্যঘাত ঘটালাম না। তো?”

“না, না...সমস্যা নেই,” মলিন হাসি দিয়ে বললো বিশ্বজিৎ সান্যাল ।

স্কুল ছুটির ঘণ্টা শোনা গেলো এ সময়। কিছুক্ষণ পরই ছাত্রছাত্রী দের কোলাহল।

“ড্রয়ার আর কম্পিউটার চেক করে কিছু পাওয়া যায় নি?” জিজ্ঞেস করলো সান্যাল বাবু।

“না।”

“এই কম্পিউটার আর অফিস ড্রয়ারে গুরুত্বপূর্ণ কী আর পাবে?” বিশ্বজিৎ সান্যাল আস্তে করে বললো।

“তদন্ত করতে গেলে সবকিছুই খতিয়ে দেখতে হয়। আমিও জানতাম কিছু পাওয়া যাবে না। শুধু কনফার্ম হলাম আর কি।

ভারি কাঁচের ভেতর দিয়ে জেফরির দিকে চেয়ে রইলো বিশ্বজিৎ সান্যাল। “ছেলেটাকে কে মারলো, বলুন তো?” দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইলো বাবু।

“এখনও তদন্তের প্রাথমিক অবস্থায় আছি, নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, তবে...” একটু থেমে বাবুর দিকে স্থিরচোখে তাকালো জেফরি বেগ। “মনে হচ্ছে খুনটা স্কুলের কেউই করেছে।”

বাবুর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। ঢোক গিলে বললো, “এরকম নিরীহ একটা ছেলেকে স্কুলের কে খুন করতে যাবে? ওকে খুন করে কার কী লাভ হবে, বলুন?”

“হুম,” মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। একটু চুপ থেকে বললো, “মনে হচ্ছে হাসানের সাথে স্কুলের কারো কোনো ঝামেলা হয়েছিলো,” কথাটা বলেই বিশ্বজিৎ সান্যালের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করার চেষ্টা করলো সে। তার কাছে মনে হলো লোকটা কেমন জানি ভড়কে গেলো।

“না, তার সাথে আবার কার ঝামেলা হতে যাবে?” কথাটা বলেই চোখ নামিয়ে ফেললো বিশ্বজিৎ সান্যাল।

স্থিরচোখে বাবুর দিকে চেয়ে রইলো জেফরি। বুঝতে পারলো, স্মৃতিশক্তির পরীক্ষায় বাবু উতরে গেলেও অভিব্যক্তি লুকাবার বেলায় আবারো ব্যর্থ হয়েছে।

“চা খাবেন?”

চা খাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই জেফরির কিন্তু মাথা নেড়ে সায় দিলো সে, বাবুকে আরো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাবে বলে।

ভদ্রলোক বেল বাজালে একটা ছেলে ঢুকলো ঘরে। ছেলেটাকে দু'কাপ চায়ের কথা বলে দিলো।

“কারো সাথে যদি ঝামেলা না-ই হয়ে থাকে তাহলে খুনটা হলো কেন? নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছিলো,” বেশ জোর দিয়ে বললো সে।”

যথারীতি বাবু নিজের অভিব্যক্তি লুকাতে ব্যর্থ হলো। আস্তে করে ঢোক গিলে জেফরির দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। “কেউ কি আপনাকে এরকম কিছু বলেছে?”

বাবুর অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে একটা ঢিল ছুড়লো জেফরি। “আমাকে অবশ্য একজন বলেছে, হাসান সাহেবের সাথে নাকি স্কুলে কী একটা ঝামেলা হয়েছিলো কয়েক দিন আগে।”

“কে বলেছে?” বাবু অনেকটা ঘাবড়ে গেলো।

“কে বলেছে সেটা বড় কথা নয়, এরকম কিছু ঘটেছে কিনা সেটাই হলো আসল কথা।”

বিশ্বজিৎ সান্যাল ভেবে পেলো না কী বলবে।

“আমি ভাবলাম হাসান যেহেতু আপনার সাথেই কাজ করতো, আপনার অফিসরুম শেয়ার করতো, এই ব্যাপারটা আপনিই ভালো বলতে পারবেন।”

চা চলে এলে জেফরি নিজের কাপটা তুলে নিলো কিন্তু সান্যাল বাবু কাপ ছুঁয়েও দেখলো না।

“আমার জানামতে এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি,” বললো বিশ্বজিৎ সান্যাল। “হাসান আমাকে এরকম কিছু বলেও নি। বললে আমার মনে থাকতো। বুঝতে পারছি না আপনাকে এ কথা কে বললো।”

খুব দ্রুত চা শেষ করে ফেললো জেফরি বেগ। “আপনার কাজে আর ব্যঘাত ঘটাবো না, আপনি কাজ করুন। আমি একটু অরুণদার সাথে দেখা করে আসি।”

জেফরি উঠে দাঁড়ালে বিশ্বজিৎ সান্যালও উঠে দাঁড়ালো। ভদ্রলোকের সাথে করমর্দন করে বের হয়ে গেলো রুম থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে যখন নীচে নামছে তখন ইনভেস্টিগেটর বেগ বুঝতে পারলো বিশ্বজিৎ সান্যাল দারুণ টেনশনে পড়ে গেছে। লোকটার হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা আর ঘামে ভিজে একাকার। একটা সামান্য প্রশ্নে এতোটা টেনশনে পড়ে যাবে কেন? ভাবনার বিষয়।

নীচে নেমে জেফরি দারুণ অবাক। পুরো স্কুল কম্পাউন্ড হাতে গোনা কিছু ছাত্রছাত্রী ছাড়া একেবারে ফাঁকা। যারা এখনও রয়ে গেছে তারাও মেইন গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রশাসনিক ভবন থেকে সোজা চলে এলো অরুণদার রুম। কিন্তু রুমের দরজা বন্ধ। এক কর্মচারিকে জিজ্ঞেস করলে সে জানালো প্রিন্সিপ্যাল সাহেব কিছু গার্জেনের সাথে উপর তলায় কনফারেন্স রুমে মিটিং করছেন। জেফরি ইচ্ছে করলে ভিজিটর রুমে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারে।

কিন্তু ভিজিটর রুমে না গিয়ে সে চলে এলো পার্কিংলটের সামনে। মাত্র দুটো গাড়ি আছে এখন। তার মধ্যে একটা অবশ্যই অরুণদার হবে, ভাবলো।

অলস ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে বাস্কেটবল কোর্টের দিকে চলে এলো। চার পাঁচজন ছেলে প্র্যাকটিস করছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেগুলোর খেলা দেখতে লাগলো সে। স্কুলে শোকের পরিবেশ বিরাজ করলেও এই ছেলেগুলোর প্র্যাকটিস বন্ধ হয় নি। খুব সিরিয়াসলি তারা প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে।

মোট পাঁচজন ছেলে। সবাই বেশ লম্বা। স্কুলের ছেলে হিসেবে মেনে নিতে কষ্টই হয়, কিন্তু জেফরি জানে, বাস্কেটবল খেলায় উচ্চতা একটি বিরাট ফ্যাক্টর। তাই স্কুলের লম্বা ছেলেরাই এই খেলার প্রতি বেশি ঝোঁকে।

চারজন ছেলে একজোট হয়ে একজন ছেলের বিরুদ্ধে খেলছে। খুবই পরিচিত দৃশ্য। স্কুল জীবনের কথা মনে পড়ে গেলো তার। এ রকম একজনকে তারা বলতো ‘কুত্তা’। শুনতে যতো খারাপই লাগুক, প্র্যাকটিসের সময় তারা এটা নিয়মিত করতো। সেই কুত্তা যার কাছ থেকে বল কেড়ে নিতো সে আবার ‘কুত্তা হয়ে যেতো। এভাবেই পালাক্রমে চলতে থাকতো তাদের প্র্যাকটিস। অবশ্য এখনকার দিনের ছেলেরা কুত্তা’ শব্দটি ব্যবহার করে কিনা সে ব্যাপারে তার সন্দেহ আছে।

ছেলেগুলো আড়চোখে তার দিকে বার বার তাকাচ্ছে। জেফরি সতর্ক হয়ে উঠলো। কোনোভাবেই এদের কাছে তার আসল পরিচয় দেয়া যাবে না। সে একজন গেস্ট। তাদের প্রিন্সিপ্যালের পরিচিত। এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে।

জেফরি লক্ষ্য করলো ছেলেগুলো শুধু আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছেই না, মাঝেমধ্যে নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে কথাও বলছে। তাদের কথাবার্তার বিষয় যে সে নিজে, এ ব্যাপারে একদম নিশ্চিত।

আরেকটা ব্যাপারও লক্ষ্য করলো, ছেলেগুলো তাকে দেখার পর থেকে নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শনের প্রতিযোগীতা শুরু করে দিয়েছে। কে কার চেয়ে বেশি ভালো এরকম এক অলিখিত প্রতিযোগীতায় যেনো তারা লিপ্ত।

পাঁচজন ছেলের মধ্যে দুজনের নামও জেনে গেলো একে অন্যেকে সম্বোধন করার ফলে। নাফি নামের ছেলেটা যে এই দলের সবচাইতে ভালো খেলোয়াড় সেটা বুঝতে জেফরির খুব বেশি সময় লাগলো না। দুর্দান্ত স্কিল আর গতি, সেইসাথে নিখুঁত থ্রোয়িং। জেফরি নিজেও খুব ভালো বাস্কেটবল খেলতো। ইন্টারস্কুল টুর্নামেন্টে বেশ কয়েকবার নেতৃত্বও দিয়েছে তাদের স্কুল টিমের।

ছেলেগুলো জেফরিকে দেখে কি মনে করেছে সেটা বোঝা না গেলেও এটা বোঝা গেলো নিজেদেরকে প্রদর্শন করার তীব্র প্রতিযোগীতা শুরু করে দিয়েছে। অল্পবয়সী ছেলেরা সাধারণত এই বয়সে এমনটিই করে থাকে। সারা দুনিয়াকে তারা দেখিয়ে দিতে চায়। প্রতিভা থাকুক আর না থাকুক নিজেদের জাহির করার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী থাকে তারা।

খুব মজা পাচ্ছে জেফরি। বাস্কেটবল কোর্টের বাউন্ডারি লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ খেলা দেখে যাচ্ছে সে।

এক সময় বলটা একজনের হাত থেকে ছিটকে চলে এলো তার পায়ের কাছে। দ্রুত বলটা হাতে তুলে নিলো সে। বলটা নেবার জন্য নাফি নামের ছেলেটা এগিয়ে আসতেই হঠাৎ করে ছেলেমানুষি ভর করলো তার মধ্যে। হুট করে দূর থেকে বলটা থ্রো করে বসলো বাস্কেট লক্ষ্য করে। বলটা যখন শূন্যে ভাসছে, ছুটে যাচ্ছে বাস্কেটের দিকে তখনই তার মনে হলো একদম ছেলেমানুষির মতো কাজ করে ফেলেছে। কোর্টে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেগুলো অবাক হয়ে হা করে চেয়ে রইলো শূন্যে ভেসে থাকা বলটার দিকে।

সবাইকে বিস্মিত করে বলটা বাস্কেটে গিয়ে পড়লে জেফরি নিজেও বেশ অবাক হলো।

"ওয়াও!" একটা ছেলে বলে উঠলো বেশ জোরে।

কিছুটা বিব্রত ভঙ্গিতে ছেলেগুলোর দিকে তাকালো সে।

"নাইস শট, ম্যান," তার সামনে এসে বললো নাফি নামের ছেলেটা। লম্বায় জেফরির চেয়েও দু'এক ইঞ্চি বেশি হবে। বেশ সুগঠিত শরীর।

বাকি ছেলেগুলো এখন জেফরির দিকে চেয়ে আছে অবাক চোখে।

"থ্যাঙ্কস," লজ্জিত ভঙ্গিতে বললো জেফরি বেগ।

"রিয়েলি নাইস শট, নাফি নামের ছেলেটা প্রশংসার সুরে বললো।

বিব্রত হয়ে হেসে ফেললো সে। "ঝড়ে বক মরেছে মনে হচ্ছে।"

"ওহ্ প্লিজ," নাফি বললো। হাত বাড়িয়ে দিলো জেফরির দিকে। "আমি নাফি হাজ্জাদ।"

ছেলেটার সাথে করমর্দন করলো সে। "নাইস টু মিট ইউ।" কিন্তু নিজের নাম বললো না।

"কোন টিমের কোচ, আপনি?"

নাফির এই প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো জেফরি। "বুঝলাম না?"

"আই মিন, আপনি কোন টিম থেকে এসেছেন? আমি শিওর আপনি একজন কোচ। অ্যাম আই রাইট?"

"আরে না, আমি কোনো কোচটোচ নই," বললো জেফরি বেগ। ছেলেগুলো তাকে বাস্কেটবলের কোচ ভেবেছে! মনে মনে হেসে ফেললো সে।

"রিয়েলি?" অবিশ্বাস্য চোখে চেয়ে রইলো নাফি হাজ্জাদ নামের ছেলেটি।

তার বন্ধুরা এক পা দুপা করে নাফির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে এখন। তারাও কৌতূহল নিয়ে চেয়ে আছে জেফরির দিকে।

"সত্যি বলছি, আমি কোনো টিমের কোচ নই," জোর দিয়ে বললো সে।

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো নাফি হাজ্জাদ নামের ছেলেটি। তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেগুলো একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে।

জেফরির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো করে দেখে নিলো নাফি। "তাহলে আপনি

কে?”।

“আমি তোমাদের প্রিন্সিপ্যালের একজন গেস্ট।” জেফরি বেগ দেখতে পেলো ছেলেগুলো হতাশ হলো তার কথা শুনে।

“ও,” বললো নাফি হাজ্জাদ। “সরি, আমি ভেবেছিলাম আপনি কোনো টিমের কোচ হবেন।”

“আমাকে দেখে কি কোচ বলে মনে হয়?” হেসে জানতে চাইলো সে।

“না, ঠিক তা না, ঐদিন আপনার মতোই একজন কোচ এসেছিলো তো তাই...” নাফি ঘুরে চলে গেলো তার বন্ধুদের কাছে।

জেফরি দেখতে পাচ্ছে ছেলেগুলো একটু হতাশ। নাফির সাথে চাপাস্বরে কথা বলছে, বার বার তাকাচ্ছে তার দিকে। তবে এবার একটু বিরক্ত হয়ে, যেনো অযাচিত একজন তাদের প্র্যাকটিস সেশনে ঢুকে পড়েছে।

মুচকি হাসলো সে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘুরে চলে গেলো বাস্কেট বলের কোর্ট থেকে। এতোক্ষণে হয়তো অরুণ রোজারিওর সাথে গার্জিয়ানদের মিটিং শেষ হয়ে গেছে। সে দেখতে পাচ্ছে সু-টাই পরা কিছু লোক মেইনগেটের দিকে চলে যাচ্ছে। এরাই হয়তো সেইসব উদ্বিগ্ন গার্জিয়ান।

বলটা বাস্কেটে থ্রো করতে পেরেছে বলে ছেলেগুলো তাকে বাস্কেটবলের কোচ ভেবেছিলো। এটাকে কি কম্প্লিমেন্ট হিসেবে নেবে, নাকি...।

আপন মনে আবারো হেসে ফেললো সে। প্রিন্সিপ্যালের রুমের বাইরে এসে দেখতে পেলো দরজা খোলা। দরজার কাছে আসতেই একটা ভাবনা তার মাথায় চলে এলো। আর ভাবনাটি বাস্কেটবল নিয়েই। থমকে দাঁড়ালো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর। কপালের বাম পাশটা হাত দিয়ে ঘষতে ঘষতে কখন যে উল্টো দিকে ঘুরে হাটা ধরেছে খেয়ালই করতে পারলো না।

কলেজ থেকে লিটু দেরি করে ফিরে এসেছে আজ। তার কারণ কলেজের ক্লাস শেষ করে আজিমপুর গোরস্থানে গিয়েছিলো সে। হাসানের কবরটার চারপাশে বেড়া লাগানোর কথা ছিলো, কাজটা ঠিকমতো করা হয়েছে কিনা দেখতে গিয়েছিলো।

তার আশংকাই ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। হাসানের কবরের কবরের চারপাশে কোনো বেড়া নেই। কবরস্তানের যে কেয়ারটেকার লোকটাকে বেড়া কিনে দেবার জন্য টাকা দিয়েছিলো তাকে খুঁজে বের করতেই লোকটা নানান অজুহাত দেখাতে শুরু করলো। দুনিয়ার মানুষ মরেছে, একটার পর একটা লাশ এসেছে, তাই সেগুলো সামাল দিতে দিতেই তার জান বের হয়ে গেছে, বেড়া কিনতে যাবার সময় কই?

কবরস্তানের লোকজন যে খুব একটা সুবিধার হয় না সে কথা কলেজের বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে শুনেছে লিটু। এখানে নাকি প্রচুর ধান্দাবাজ লোকজন নানা রকম চিটিং-বাটপাড়ি করে বেড়ায়। তার বিশ্বাসই হয় না, মৃতদের নিয়ে ধান্দাবাজি কিভাবে করে মানুষ!

লিটু আর কথা বাড়ায় নি। লোকটার কাছ থেকে টাকাগুলো ফেরত নিয়ে নিয়েছে। লোকটা অবশ্য গাইগুই করছিলো, টাকা ফেরত দিতে চাচ্ছিলো না। সন্ধ্যার আগেই নাকি কবরে বেড়া লাগিয়ে দেবে। কিন্তু লিটু আর দ্বিতীয় কোনো সুযোগ দেয় নি। টাকাগুলো ফেরত নিয়ে নিজেই চলে যায় বেড়া কিনতে। তারপর সেগুলো কবরস্তানে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে লাগিয়ে দিয়েছে। এ আর এমন কী কঠিন কাজ। গ্রামের ছেলে সে। এরকম কাজ তো ছোটো বয়স থেকেই করেছে।

হাসানের কবরটা বেড়া লাগিয়ে সেখানে আগরবাতি জ্বালিয়ে সুরা ফাতেহা পাঠ করে চলে আসে বাড়িতে। তার বোন মলি বলে দিয়েছিলো, আগরবাতি জ্বালিয়ে সুরা ফাতেহা পাঠ করতে যেনো ভুলে না যায়।

বাড়িতে এসে দেখে আসতে দেরি হয়েছে বলে তার বোন আর বৃদ্ধ বাবা অস্থির হয়ে আছে। দরজা খুলেই তার বোন তাকে জড়িয়ে ধরে। কদিন আগে স্বামীকে হারানোর পর তার বোন মানসিকভাবে এতোটাই ভেঙে পড়েছে যে, খুব সহজেই ঘাবড়ে যায়।

তার কাছে কোনো মোবাইল ফোন নেই, থাকলে বোনকে আর এতোটা দুশ্চিন্তায় রাখতো না।

মোবাইল ফোন!

সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেলো। তার বোন জামাই হাসান কদিন আগেই তাকে বলেছিলো সামনের মাসে তাকে একটা মোবাইল ফোন কিনে দেবে। কথাটা শুনে খুব খুশি হলেও মুখে বলেছিলো, খামোখা এতো টাকা খরচ করার কী দরকার। তার মোবাইল ফোন লাগবে না। হাসান হেসে বলেছিলো, ফোন তাকে ঠিকই কিনে দেবে কিন্তু সেই ফোন দিয়ে যেনো মেয়েছেলেদের সাথে প্রেমালাপ না করে। কথাটা শুনে কিছুটা লজ্জা পেয়েছিলো লিটু কারণ কথাটা তার বোনের সামনে বলেছিলো হাসান।

তবে একটু পরই বুঝতে পারলো তার বোন অন্য একটা কারণে এতোটা অস্থির হয়ে আছে।

তার বোন হাসানের একটি ডায়রি পেয়েছে আলমিরার ভেতর থেকে। হাসান নাকি ডায়রি লিখতো। লিটু অবশ্য বোনজামাইকে কখনও ডায়রি লিখতে দেখে নি। তার বোন ডায়রিটা পাবার পর থেকে বিরামহীনভাবে পড়ে গেছে। সে যখন সকালে কলেজে যাচ্ছিলো তখনও বোনকে দেখেছে গভীর মনোযোগের সাথে প্রয়াত স্বামীর ডায়রি পড়ছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আর দুচোখ। বেয়ে নীরব অশ্রুপাত করছে। দরজা দিয়ে দৃশ্যটা দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিটু পা বাড়ায় কলেজের দিকে।

দুপুরের পরই ডায়রির একটা জায়গায় এসে মলির খটকা লাগে। ওখানে এমন একটা কথা লেখা ছিলো যার মাথামুণ্ডু সে বুঝতে পারছিলো না। এরকম ঘটনার কথা হাসান তাকে কোনোদিনও বলে নি। ডায়রির ঐ লেখাগুলো পড়ে তার বিশ্বাসই হচ্ছিলো না হাসান এসব

কথা লিখেছে। তার প্রাণপ্রিয় স্বামী, যে কিনা সব কথা তাকে বলতো, এমন কি ঢাকায় কলেজে পড়ার সময় এক বড়লোকের মেয়ের সাথে তার খণ্ডকালীন প্রেমের কথাও মলিকে বলেছে অকপটে, সেই হাসান এরকম একটা কথা বেমালুম চেপে গেলো!

জেফরিকে আবারো বাস্কেটবল কোর্টের কাছে ফিরে আসতে দেখে নাফি হাজ্জাদসহ তার সঙ্গিরা বেশ অবাকই হলো। খেলার ফাঁকে ফাঁকে বার বার আড়চোখে তাকাতে শুরু করলো জেফরির দিকে।

চুপচাপ বাস্কেটবল কোর্টের কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইলো সে। নাফি হাজ্জাদ নামের ছেলেটির সাথে তার চোখাচোখি হতেই হাত নেড়ে তাকে কাছে। ডাকলো।

খুব অবাক হলো মাফি। বন্ধুদের ইশারা করে খেলা থেকে নিজেকে তুলে নিয়ে চলে এলো জেফরির কাছে।

জেফরি লক্ষ্য করলো স্লিভলেস টি-শার্ট আর থ্রি-কোয়ার্টার শর্ট পরা নাফি ঘেমে একাকার। দম ফুরিয়ে হাফাচ্ছে।

"কি ব্যাপার...বলুন?"

"একটু আগে তুমি কোচের কথা বলছিলে না?"

"হুম," হাটুতে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে বললো ছেলেটা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে।

"আমি সে ব্যাপারেই একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

নাফি ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো। "আপনি আসলে কে, বলেন তো?"

"বললাম না, তোমাদের প্রিন্সিপ্যালের গেস্ট।"

এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। "আচ্ছা বলুন, কী জানতে চান?"

"কোন্ টিমের কোচ এসেছিলো ঐদিন?"

"অ্যাঞ্জেলসের।"

জেফরি জানে এটা তাদের স্কুল সেন্ট গ্রেগোরিজের টিম। গ্রেগস নামের আরেকটা টিম আছে তাদের স্কুলে। এই দুটো টিমই এ দেশের বাস্কেটবলের চ্যাম্পিয়ন হয় পালাক্রমে। তারা একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। তার এক স্কুলবন্ধু এই টিমের সাথে জড়িত ছিলো। সেটা অবশ্য অনেক দিন আগের কথা। এখন সেই বন্ধু অ্যাঞ্জেলসের সাথে জড়িত আছে কিনা কে জানে।

"কেন এসেছিলো?"

এবার পেছন ফিরে বন্ধুদের দিকে তাকালো নাফি। গাট্টাগোট্টা গড়নের এক ছেলের সাথে চোখাচোখি হলো তার। ছেলেটা বুড়ো আঙুল তুলে হাই ফাইভ দেখালো তাকে। "প্লেয়ার হান্ট করতে।"

"এটা কতো দিন আগের ঘটনা?"

একটু মনে করার চেষ্টা করলো নাফি। "গত বৃহস্পতিবার মনে হয়।"

বৃহস্পতি বার! জেফরি নড়েচড়ে উঠলো। "তুমি শিওর?"

কাঁধ তুললো নাফি হাজ্জাদ। তারপরই পেছন ফিরে চিৎকার করে বললো, "দিপ্রো... অ্যাঞ্জেলসের কোচ বৃহস্পতিবার এসেছিলো না?"

দূর থেকে মাথা নেড়ে সায় দিলো দিপ্রো নামের ছেলেটি।

জেফরির দিকে ফিরে তাকালো এবার। "হ্যাঁ, বৃহস্পতিবারই।"

আচ্ছা! মনে মনে বললো জেফরি বেগ। "বৃহস্পতিবার কখন এসেছিলো?"

"এরকম সময়েই...আমরা তখন প্র্যাকটিস করছিলাম," নাফি কিছুটা অধৈর্য হয়ে উঠছে। জেফরির এসব প্রশ্ন তার কাছে মোটেও বোধগম্য হচ্ছে না।

"তারপর ঐ কোচ কি করলো?"

এই প্রশ্নের জবাব দিতে ইচ্ছে করলো না নাফির। একটু দ্বিধার সাথে বললো, "একটা ছেলের সাথে কথাবার্তা বলে চলে যায়। তুর্য নামের ছেলেটাকে যে অ্যাঞ্জেলসের কোচ

রিক্রুট করেছে সেটা আর বললো না।

"কথাবার্তা মানে?" জেফরি বুঝতে পারলো না। "কি নিয়ে কথাবার্তা?"

কাঁধ তুললো নাফি। "তা তো বলতে পারবো না...হয়তো কন্ট্রাক্ট সাইন করার জন্য হতে পারে।" তার আর ভালো লাগছে না কথা বলতে। চাইছে তাড়াতাড়ি যেনো এই আলোচনাটা শেষ হয়ে যায়।

"আচ্ছা," বুঝতে পারলো জেফরি বেগ। "ঐ ছেলেটার নাম কি?"

নাফি চেয়ে রইলো জেফরির দিকে। "তুর্য।" একান্ত অনিচ্ছায় বললো সে।

"তোমার সাথে পড়ে নাকি অন্য ক্লাসে?"

"আমার সাথেই পড়ে।"

"ছেলেটা এখানে আছে?"

"না। আজ ক্লাসে আসে নি।"

নাফির অনিচ্ছুক ভঙ্গিটা জেফরির চোখ এড়ালো না। "ক্লাসে আসে নি? কেন?"

এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলো না নাফি। মেজাজ বিগড়ে গেলো। "আরে, কে ক্লাসে এলো না এলো তা আমি কি করে জানবো...শিট!" বিরক্ত হয়ে জেফরির দিকে তাকালো। "আমি প্র্যাকটিস করছি...কয়েকদিন বাদেই ইন্টারস্কুল টুর্নামেন্ট আছে...ওকে?"

জেফরি কিছু বলার আগেই নাফি হাজ্জাদ চলে গেলো কোর্টে, যোগ দিলো বন্ধুদের সাথে। ছেলেটার এমন আচরণে অবাক হলো সে। চুপচাপ কোর্টের সামনে থেকে চলে এলেও তার মাথায় কয়েকটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগলো।

হাসান যেদিন খুন হয় সেদিন অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ এসেছিলো। ঠিক স্কুল ছুটির পরই। প্লেয়ার হান্ট করতে। এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় মোটেও। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে বলেছে এদিন কোনো বহিরাগত স্কুলে প্রবেশ করে নি। তাহলে ঐ কোচ কিভাবে এরকম সুরক্ষিত স্কুলে প্রবেশ করলো?

জেফরি সোজা চলে গেলো প্রিন্সিপ্যালের রুমে।

অরুণ রোজারিও নিজের ডেস্কে বসে কার সাথে যেনো ফোনে কথা বলছেন। জেফরিকে ঢুকতে দেখে বেশ অবাক হলেন তিনি। তবে ইশারা করলেন বসার জন্য।

"কি ব্যাপার, জেফ?" ফোনটা রেখেই সামনে বসা জেফরিকে বললেন তিনি।

"একটা ব্যাপার জানতে এলাম, অরুণদা।"

"কি ব্যাপার, বলো?" অরুণদার চোখেমুখে চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট।

"হাসান যেদিন খুন হয় সেদিন এই স্কুলে বহিরাগত কেউ আসে নি...আপনি এবং দারোয়ান সবাই আমাকে সে কথা বলেছে।"

"হ্যাঁ, অবশ্যই কেউ আসে নি। কেন, কি হয়েছে?"

"কিন্তু বাইরে থেকে একজন এসেছিলো, অরুণদা।" দৃঢ়ভাবে বললো সে।

"বাইরের একজন এসেছিলো!" অবিশ্বাসে বিড়বিড় করে কথাটার প্রতিধ্বনি করলো প্রিন্সিপ্যাল।

"হুম।"

"কে এসেছিলো? আর তোমাকেই বা বললো কে?

"অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ।"

"অ্যাঞ্জেলস টিম মানে?" অরুণ রোজারিও বুঝতে পারলেন না।

"একটা বাস্কেটবল টিম...তারাই এখন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন," বললো জেফরি।

"আচ্ছা, কিন্তু এ কথা তোমাকে কে বললো? আমি তো কিছু জানি না!"

"বাইরে বাস্কেটবল কোর্টে কিছু ছেলেপেলে প্র্যাকটিস করছে, তারা বলেছে।"

অরুণ রোজারিও ঘাবড়ে গেলেন। "হোয়াট!" কিছুটা ভয়ও যেনো জেঁকে বসলো তার মধ্যে। "তুমি ইন্টেরোগেশন করেছে ওদেরকে? আই মিন, মার্ডার কেসটা নিয়ে কথা বলেছো?" জেফরি কিছু বলতে যাবার আগেই বলতে লাগলেন প্রিন্সিপ্যাল, "তুমি কিন্তু

আমাকে কথা দিয়েছিলে, আমার কনসার্ন ছাড়া ছাত্রছাত্রী দেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না, আর করলেও–

হাত তুলে থামিয়ে দিলো জেফরি। "অস্থির হবেন না, আমি তাদের সাথে এ বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলি নি।" অরুণ রোজারিওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো সে।

"তাহলে? তুমিই না বললে ওরা তোমাকে এ কথা বলেছে।"

"হ্যাঁ, ওরাই বলেছে, কিন্তু আমি যে এই কেসের তদন্ত করছি সেটা ওরা জানে না।"

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, জেফ?"

"অরুণদা, আপনি একদম চিন্তা করবেন না। আমি ওদের সাথে এমনি কথা বলতে বলতে এটা জেনে নিয়েছি।"

জেফরির এ কথা শুনে অরুণ রোজারিও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। "ওরা তোমাকে কথারছলে এ কথা বললো?!"

মেজাজ কিছুটা খারাপ হয়ে গেলো তার। একজন ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কারো কাছে এভাবে জবাবদিহি করতে ভালো লাগে না। অরুণ রোজারিওর জায়গায় অন্য কেউ হলে সমুচিত জবাব দিয়ে দিতো।

"অরুণদা, আমি একটা হত্যা মামলা তদন্ত করছি, আর সেই হত্যাকাণ্ডটি এখানেই ঘটেছে। সুতরাং, আমি কার সাথে কিভাবে কথা বলে জেনে নিয়েছি সেটা নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ দেখছি না।"

জেফরির অভিব্যক্তি দেখে অরুণ রোজারিও চুপসে গেলেন। "না, মানে তুমি তো ভালো করেই জানো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি খুব..."

"হ্যাঁ, আমি সেটা জানি, অরুণদা। কিন্তু আপনি আমার উপরে আস্থা রাখুন। এমন কোনো কাজ আমি করবো না যাতে আপনার সমস্যা হয়।"

"না, সেটা আমি অবশ্যই জানি...তুমি এমন কিছু করবে না..."।

"তাহলে এটা আমার উপরেই ছেড়ে দেন...আমি কিভাবে জানলাম সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। ওকে?"

অরুণ রোজারিও কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন জেফরির দিকে। তারপর নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সায় দিলেন কেবল।

"এখন কাজের কথায় আসি," বললো জেফরি।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন প্রিন্সিপ্যাল। "কাজের কথায়?"

"হ্যাঁ," একটু থেমে আবার বললো। "এই কোচ ভদ্রলোক কার মাধ্যমে, কিভাবে এখানে ঢুকতে পারলো সেটা আমাকে জানতে হবে।"

গাল চুলকালেন অরুণ রোজারিও। "কার মাধ্যমে ঢুকবে ...কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

"আমাকে জানতে হবে আপনার এই দূর্গে কোন ফাঁটল দিয়ে বাইরের লোকজন অনায়াসে ভেতরে ঢুকে ছাত্রদের মধ্যে থেকে প্লেয়ার হান্ট করতে পারে।"

জেফরির কথাটা শুনে অরুণ রোজারিও কাচুমাচু খেলেন।

লিটুর ঘরে মলি আর তার বাবা বসে আছে। তাদের সবার মুখ থমথমে।

একটু আগে হাসানের ডায়রি থেকে একটা ঘটনার কথা মলি তাদের দুজনকে জানিয়েছে। কথাটা শোনার পর থেকেই তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কী করবে।

হাসানের মতো নিরীহ নির্বিবাদি একটা ছেলেকে কারা খুন করতে যাবে-আজকের দুপুর পর্যন্ত এই প্রশ্নের কোনো জবাব তাদের কাছে ছিলো না। এখন তারা প্রশ্নের জবাবটা পেয়ে গেছে কিন্তু বুঝতে পারছে না কার কাছে এ কথা বলবে।

মলির বৃদ্ধ বাবা ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। একমাত্র মেয়ে অল্প বয়সে বিধবা হওয়াতে এমনিতেই তিনি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন, এখন ডায়রির এই ঘটনা শোনার পর থেকে তার হৃদকম্প বেড়ে গেছে। তিনি নিশ্চিত, এটা পুলিশের কাছে প্রকাশ করলে বিরাট একটা ঝামেলায় পড়ে যাবেন তারা সবাই। তাদের মতো সাধারণ পরিবারের লোকজন এরকম শক্তিশালী কোনো ব্যক্তির রোষাণলে পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই।

মেয়েকে তিনি বার বার বলেছেন, পুলিশকে কোনোভাবেই এটা বলা যাবে না। পুলিশ হলো ঐসব ক্ষমতাবান লোকদের পোষা কুকুর। যা হবার হয়েছে, আর কোনো বিপদ ডেকে আনতে চান না তিনি। কিছুক্ষণ আগে মনে মনে একটা সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছেন ভদ্রলোক : মলিকে গ্রামে নিয়ে যাবেন দুএকদিনের মধ্যে। সমস্যা হলো ছেলেটাকে নিয়ে। মাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছে। ক্লাসও শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে। এখন তাকে একা রেখে যাবেন কোথায়? যে কলেজে ভর্তি হয়েছে সেটার কোনো আবাসিক হল নেই। থাকলে সেখানেই তুলে দিতেন। তারপরও মেয়েকে এই নির্মম শহরে একা রেখে যাবেন না, এই সিদ্ধান্তে তিনি অটল।

“যে ইনভেস্টিগেটরটা এসেছিলো তাকে আমার খুব ভালো মনে হয়েছে, আপা। তাকে বললে মনে হয় না কোনো সমস্যা হবে…”

মলি তার ভায়ের দিকে চেয়ে রইলো। ইনভেস্টিগেটরকে তারও ভালো মানুষ বলে মনে হয়েছে কিন্তু পুলিশের লোকজনকে বিশ্বাস করা তার পক্ষেও কঠিন। সে কি ভুলে গেছে, তাদের গ্রামের এক গরীব মেয়ে জেসমিনকে কিভাবে একদল পুলিশ ধর্ষণ করে খুন করেছিলো। তার বয়স তখন বারো কি তেরো। মাত্র ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে। নারীত্ব জেগে উঠছে তার মধ্যে। জেসমিন ধর্ষণের পর দুঃস্বপ্নের ভয়ে কতো রাত যে ঘুমাতে পারে নি সেটা শুধু সে-ই জানে।

দুঃস্বপ্নে দেখতে একদল পুলিশ তাকে ঘিরে রেখেছে। তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তারা। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে মলি কুঁকড়ে যেতো। তারপরই ভীতিকর সেই দৃশ্যটা দেখতে পেতো সে-সবগুলো পুলিশ একসাথে প্যান্টের জিপার খুলছে।

কথাটা মনে পড়তেই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো। ছোটো ভাই লিটুর দিকে তাকালো মলি।

“ঐ লোকটারে বলব তাহলে?”

“তুমি কি বলতে ভয় পাচ্ছো, আপা?”

মলি কিছু বলার আগেই তার বাবা মৃদু বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, “মারে, এসব করার কী দরকার? কোনো লাভ হবে না। খামোখা বিপদ ডেকে আনা কি ঠিক হবে?”

বাবার দিকে চেয়ে রইলো মলি। কিন্তু হাসানের খুনের বিচার হবে না? তার নিরীহ গোবেচারা স্বামীকে যারা বীভৎসভাবে হত্যা করেছে তাদের কোনো শাস্তি হবে না?

মলি মেনে নিতে পারলো না। “বাবা, হাসানের বিচার চাও না তুমি?”

বৃদ্ধ স্কুলশিক্ষক মেয়ের দিকে চেয়ে রইলেন। এ প্রশ্নের অন্য কোনো জবাব নেই। “চাইবো না কেন, মা,” মাথা নীচু করে ফেললেন মলির বাবা। “আল্লাহর কাছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে হাসানের খুনিদের বিচার চাই।”

“তাহলে কি ঐ ইনভেস্টিগেটরকে আমাদের সাহায্য করা উচিত না?”

মলির এ কথায় তার বাবা চুপ মেরে রইলেন। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে তাকালেন স্কুল শিক্ষক। তার দু'চোখ আদ্র। "পাগলামি করিস না। ঐ ইনভেস্টিগেটর নিজের যোগ্যতা দিয়ে আসল খুনিকে বের করে ফেলবে। আমি নিশ্চিত। শুনেছি লোকটা নাকি খুবই মেধাবী অফিসার। দেখবি, ও ঠিকই হাসানের খুনিকে খুঁজে বের করতে পারবে।"

বাবার কথায় মলি কিছু বললো না। স্থিরচোখে চেয়ে রইলো শুধু।

অধ্যায় ১৫

অরুণ রোজারিওর অফিস থেকে বের হবার সময় জেফরি দেখতে পেলো বাস্কেটবল কোর্টে মাত্র একজন ছেলে আছে, বাকি সবাই চলে গেছে। জেফরি মনে করতে পারলো, এই ছেলেটাকে তার বন্ধুরা দিপ্রো বলে সম্বোধন করেছিলো।

কী মনে করে যেনো ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেলো সে।

ছেলেটা তার ব্যাগ খুলে কিছু একটা ঢোকাচ্ছে। একটা টাওয়েল ব্যাগটার পাশেই রাখা।

"সবাই চলে গেছে?"

জেফরির কথাটা শুনে পেছন ফিরে তাকালো দিলো। "হুম।" আবার নিজের কাজে মন দিলো সে।

"তুমি রয়ে গেলে যে?"

জেফরির দিকে সন্দেহের চোখে তাকালো ছেলেটা। "এই তো, একটু দেরি হয়ে গেছে।"

"ও," বললো জেফরি।

"কি নাম তোমার?"

"দিপ্রো।"

"গুড।"

এবার দিপ্রো নামের ছেলেটা চেয়ে রইলো জেফরির দিকে। কিছু একটা বলতে গিয়েও বললো না।

"এতো লেট করে বাড়ি যাচ্ছো, মা-বাবা চিন্তা করবে না?" জেফরি খেয়াল করলো এ কথা শুনে ছেলেটার ঠোঁটে কেমন যেনো বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো। অবশ্য সেটা খুব ক্ষণিকের জন্য।

"আমাকে নিয়ে চিন্তা করার চেয়ে অনেক ইম্পোর্টেন্ট কাজ তাদের আছে।" ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে পা বাড়ালো সে।

"তোমার সাথে একটু কথা বলতে পারি?"

থমকে দাঁড়ালো ছেলেটা। "বলুন, কি বলবেন?"

"গত বৃহস্পতিবার একজন কোচ এসেছিলো...অ্যাঞ্জেলস টিমের...তাই না?"

"হুম।"

"তোমার সাথে তার কথাবার্তা হয়েছে?"

"না।"

"তাহলে কার সাথে হয়েছে?"

"তুর্যের সাথে।"

"তোমাদের বন্ধু?"

"হ্যাঁ।"

"ও কি খুব ভালো প্লেয়ার?"

"আছে, মোটামুটি।"

"মোটামুটি?" একটু চুপ করে থেকে আবার বললো সে, "তাহলে ভালো প্লেয়ার কে?"

"নাফি...আপনি যার সাথে একটু আগে কথা বলেছেন।"

"ও...হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভালো খেলে ছেলেটা। আমি তোমাদের সবার খেলাই দেখেছি। তোমরাও বেশ ভালো খেলো।"

দিপ্রো চেয়ে রইলো জেফরির দিকে। "আপনি কি আসলেই কোনো টিমের কোচ নন?"

দুহাত তুলে বললো জেফরি বেগ, "আমি কোনো কোচ-টোচ নই, বিশ্বাস করো।"

"কিন্তু যেভাবে বলটা বাস্কেটে ফেললেন..."

"ওটা ঝড়ে বক মরার মতো হয়ে গেছে। স্কুলে থাকতে আমিও বাস্কেটবল খেলতাম। অনেকদিন পর হাতে বলটা পেয়ে ছুঁড়ে মেরেছিলাম, এই যা..."

"তাহলে আপনি কে?"

"আমি তোমাদের প্রিন্সিপ্যালের গেস্ট," আবারো নিজেকে গেস্ট পরিচয় দিলো জেফরি।

"ও," দিপ্রো আর কিছু বললো না।

"ঐ কোচ কি একাই এসেছিলো?" স্বাভাবিকভাবে জানতে চাইলো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর।

"হ্যাঁ।" হাতঘড়িতে সময় দেখলো দিপ্রো।

জেফরি বুঝতে পারলো কোনোরকম সন্দেহের উদ্রেক না করে তাড়াতাড়ি কিছু প্রশ্ন করে নিতে হবে। "অ্যাঞ্জেলস টিমের ঐ কোচ কি তুর্য নামের ছেলেটাকে সিলেক্ট করে ফেলেছে?"

"সিলেক্ট না, সাইন করে ফেলেছে...ভাবুন এবার," বললো দিপ্রো।

"তাই নাকি?...একেবারে সাইন?"

"হুম...অথচ এই স্কুলের সবচাইতে সেরা প্লেয়ার হলো নাফি। তুর্য তো আমার চেয়েও ভালো খেলে না...ওকেই অ্যাঞ্জেলস টিম সাইন করালো! স্ট্রেইঞ্জ।"

"তুর্য আজ তোমাদের সাথে প্র্যাকটিস করে নি?"

"না।"

"কেন?"

"স্কুলেই আসে নি।"

"তাই নাকি?"

"হুম...মনে হয় অ্যাঞ্জেলস টিমের সাথে প্র্যাকটিস করছে।"

"ও," একটু থেমে যে-ই না কিছু বলতে যাবে অমনি একটা ফোন বেজে উঠলো। রিংটোনটা একটা থ্রাশ মেটাল গানের।

দিপ্রোর ফোনটায় রিং হচ্ছে। কয়েকবার রিং হতেই সেটা থেমে গেলো। পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখলো সে। কেউ তাকে মিস কল দিয়েছে।

"আমার গাড়ি এসে গেছে," বলেই হাটা ধরলো গেটের দিকে।

জেফরি চেয়ে রইলো ছেলেটার দিকে। দৌড়াতে দৌড়াতে চলে যাচ্ছে মেইনগেটের দিকে।

অ্যাঞ্জেলসস টিমের কোচকে এই স্কুলে কে ঢুকতে দিয়েছিলো সেটা দু'ভাবে বের করা সম্ভব। স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যাবে কিন্তু সেটা খুব ঝামেলার কাজ। সময়সাপেক্ষও বটে। তবে আরেকভাবে সে কাজটা করতে পারে। মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জানতে পারবে অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ কার মাধ্যমে স্কুলে ঢুকেছিলো।

আপন মনে হেসে সেন্ট অগাস্টিন স্কুল থেকে বের হয়ে গেলো জেফরি বেগ। রাস্তায় নেমে তাকিয়ে দেখলো কোনো খালি রিক্সা আছে কিনা। একটা রিক্সা আসতে দেখে ডাক দিলো সে।

"রিক্সা?"

অধ্যায় ১৬

“ওই ব্যাটা, আমি কি ডাইলখোর নাকি?...অ্যাঁ! চা তো সরবত বানায়া ফালাইছোস...”

ওয়েটার ছেলেটা অপরাধি চেখে চেয়ে রইলো তার ক্রেতার দিকে। মনে মনে প্রমাদ গুনলো এই বুঝি একটা থাপ্পর এসে পড়ে তার গালে।

“বালের চা, বুড়িগঙ্গায় ফালা,” চায়ের ক্রেতা রেগেমেগে কাপটা সরিয়ে রাখলো। “এইবার ভালা কইরা এক কাপ চা বানায়া আন...উল্টাপাল্টা বানাবি তো খবর আছে।”

ছেলেটা ভয়ে ঢোক গিলে চায়ের কাপটা তুলে নিতেই একটা কণ্ঠ দরজার সামনে থেকে বলে উঠলো। “এক কাপ না, দু’কাপ চা নিয়ে আসো।”

“আরে...তুমি!” চায়ের ক্রেতার মুখ থেকে রাগ-বিরক্তি মুহূর্তে উধাও হয়ে গেলো। উঠে এসে জড়িয়ে ধরলো জেফরি বেগকে। “আমাগো তো ভুইল্যাই গেছো।”

“কেমন আছো, ম্যাকি?” আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হতেই বললো জেফরি।

“আছি আর কি...ভালাই মনে হয়,” স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বললো ম্যাকি নামের পুরনো বন্ধুটি। জেফরিকে নিজের পাশে বসতে দিলো সে।

“আমি আশা করি নি তোমাকে এখানে পাবো।”

“কেন? আমারে কই আশা করছিলা?...শেরাটনে?” কথাটা বলেই হা হা করে হেসে উঠলো ম্যাকি।

দরবার নামের এই রেস্তোরাঁয় স্কুলজীবনে প্রচুর আড্ডা মারতো তারা। এটা ছিলো তাদের প্রিয় জায়গা। জেফরি খুব অবাক হলো, এতোগুলো বছর পরও রেস্তোরাঁটির খুব বেশি পরিবর্তন হয় নি।

“কি মনে কইরা এই পুরানা বন্ধুরে ইয়াদ করলা?” ম্যাকি হাসি হাসি মুখে জানতে চাইলো।

“কেন, এমনি এমনি আসতে পারি না?” বললো জেফরি।

“তা তো আইতেই পারো।”

বেয়ারা ছেলেটি দুকাপ চা নিয়ে হাজির হলো।

“সিগারেট খাইবা?” জানতে চাইলো ম্যাকি।

“না। ছেড়ে দিয়েছি?”

“কবে ছাড়লা?”

“অনেকদিন আগে।”

“খুব ভালা একটা কাম করছো, আমি হালায় এহনও ছাড়বার পারি নাই।”

চায়ের কাপটা তুলে চুমুক দিলো জেফরি। “তুমি এখন কি করছো?”

“কি আর করমু,..আগের মতোনই আছি।” কাপ থেকে পিরিচে চা ঢেলে শব্দ করে চা খেতে লাগলো ম্যাকি। এটা তার চা খাওয়ার ধরণ।

জেফরির খুব ভালো লাগলো, এতোটা সময় পরেও ম্যাকি প্রায় আগের মতোই আছে। শুধু বয়স বাড়া ছাড়া তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই।

“ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু করার কথা আর ভাবলে না?” জেফরি চা খেতে খেতে বললো।

“আরে ধুর, ব্যবসা-ট্যাবসা আমারে দিয়া অইবো না। এমনিই ভালা আছি। বাপে একটা বাড়ি রাইখা গেছিলো...এহন ভাড়া দিয়া যা পাই তা দিয়াই চইলা যায়।”

ম্যাকি হলো তার বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। তার মা অ্যাংলো, আর বাবা ছিলো স্থানীয় এক ব্যবসায়ি। ম্যাকির চেহারা দেখে যে কেউ তাকে বিদেশী ইউরোপিয়ান সাহেব ভাবলেও কথাবার্তা শোনার পর ভুল ভাঙবে, সেইসাথে বিস্ময়ও জাগবে।

“তুমি কি এখনও অ্যাঞ্জেলসের সাথে জড়িত আছো?”

“আবার জিগায়,” কথাটা বলেই পিরিচ থেকে সশব্দে চুমুক দিয়ে চা খেলো ম্যাকি। “ওইটা লইয়াই আছি, দোস্ত। একে একে সবাই কাট্টি মারছে মাগার আমি এহনও লাইগা আছি।”

কথাটা শুনে জেফরি খুশি হলো। ম্যাকি এখনও অ্যাঞ্জেলসের সাথে জড়িত আছে। তার কাছ থেকে খুব সহজেই জানা যাবে ঐ টিমের কোচ কে, সেন্ট অগাস্টিনে সে গিয়েছিলো কিনা।

"তোমার টিমের কি খবর?" জেফরি বললো তার পুরনো বন্ধুকে।

"আরে ঐ টিম নিয়া মাথা খারাপ আছে," অনুযোগের সুরে বললো ম্যাকি। নতুন পোলাপান আর পাই না। আজকাইলকার পোলাপান তো সব ডাইল খায়া শ্যাষ...আর আছে ইন্টারনেট, কম্পিউটার গেম। ফুটবল, ক্রিকেট, বাস্কেটবল খেলোনের টাইম আছে নি ওগো!"

"কিন্তু তোমার টিম তো পর পর দু'বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।"

"তা হইছে, সবই তোমাগো দোয়া, কিন্তু এইবার অবস্থা সুবিধার না।"

"কেন?"

"নতুন প্লেয়ার কই? আমাগো স্কুলের পোলাপান এহন আর আগের মতোন বাস্কেটবল খেলে না। যারা খেলে তাগোর মইদ্যে কোয়ালিটির প্লেয়ার নাই।"

"তাহলে তো সমস্যা।"

"হুম। পুরা ভেজালের মইদ্যে আছি। আমার বেস্ট তিনটা প্লেয়ার বিদেশ চইলা গেছে। চোখে আন্ধার দেখতাছি।"

"তোমার টিমের কোচ কে এখন?" জানতে চাইলো জেফরি বেগ।

"কোচ?" চোখমুখ বিকৃত করে পাল্টা জানতে চাইলো ম্যাকি। "আরে টিম চালানোর পয়সা পাই না কোচ পামু কই?"

"মানে?" অবাক হলো জেফরি।

"বুঝলা না?" ম্যাকি নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো।

"তুমি বলতে চাচ্ছো তোমার টিমে কোনো কোচই নেই?" জেফরির মাথায় অন্য একটা চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগলো। তাহলে সেন্ট অগাস্টিনে কে গেছিলো?

"ঠিক ধরবার পারছো," আক্ষেপে বললো ম্যাকি।

"কি বলো? পর পর দু'বার চ্যাম্পিয়ন টিমের কোনো কোচ নেই?"

বাঁকা হাসি হাসলো ম্যাকি। "কি করুম কও? আইজকাইল তো পলিটিক্যাল পার্টি ছাড়া কেউ চান্দাফান্দাও দিবার চায় না। খেলাধুলা আর কালচারের লাইগা কোনো হালার রেসপনসিবিলিটি নাই। এমনে করলে চলবো, কও তো?" পিরিচ থেকে চা খেতে খেতে বলে চললো ম্যাকি।

তার মানে খুনি অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ সেজে সেন্ট অগাস্টিনে ঢুকেছে। মাইগড! মনে মনে বললো জেফরি। সামনে বসে থাকা ম্যাকি বুঝতেই পারলো না স্কুল জীবনের বন্ধুটি তার এসব কথা আর মন দিয়ে শুনছে না। তার মাথায় এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ভাবনা খেলা করছে।

"নিজের পকেট থেইকা ট্যাকা দিয়া কয়দিন আর টিম চালামু? এমনে চলতে থাকলে এই টিম আর চালাইবার পারুম কিনা কে জানে।"

ম্যাকি খেয়াল করলো জেফরি উদাস হয়ে আছে। কী যেনো একটা ভাবনায় ডুবে আছে সে।

"কি ভাবতাছো?"

সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখতে পেলো তার বন্ধু ম্যাকি অবাক হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে।

"কোনো কোচই নেই!" বিড়বিড় করে বললো জেফরি বেগ।

অধ্যায় ১৭

রাত বাজে ন'টা। এ সময় ঢাকা শহরের লোকজন রাতের খাবারও খায় না। টিভি দেখে, গালগল্প করে। অথচ মলি তার নিজ ঘরে বাতি নিভিয়ে চুপচাপ বসে আছে। তার পাশে পড়ে আছে হাসানের সেই ডায়রিটা।

পাশের ঘরে তার ভাই আর বাপ আছে, তারাও রাতের খাবার খেয়ে-দেয়ে বাতি বন্ধ করে শুয়ে থাকার চেষ্টা করছে। মলি জানে, তার মতো ওদের চোখেও ঘুম নেই।

হাসান খুন হবার পর থেকে টানা কয়েক দিনে রাতের ঘুম না হবার কারণে তার চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে। এমনিতে হালকা পাতলা গড়নের মলির শরীর আরো রোগাটে হয়ে গেছে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া না করার ফলে।

আজ সকাল থেকে ডায়রিটা পড়ার পর থেকে এক ধরণের অস্থিরতার মধ্যে নিপতিত হয়েছে সে। এরকম একটা মূল্যবান জিনিস হাতে পেয়েও সেটা কোনো কাজে আসবে না, ব্যাপারটা মেনে নিতে মলির খুব কষ্ট হচ্ছে। স্বামীর প্রতি কি তার কোনো কর্তব্য নেই? এরকম ভীরু আর কাপুরুষের মতো কাজ করলে হাসানের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে?

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে।

বিছানায় গা এলিয়ে দেবে অমনি দরজায় টোকা পড়লো।

"কে?" আস্তে করে বললো মলি। ভালো করেই জানে হয় তার বাপ নইলে ছোটো ভাই-ই হবে।

"আপা আমি," দরজার ওপাশ থেকে বলে উঠলো লিটু।

"দাঁড়া," বিছানা থেকে উঠে বাতি জ্বালিয়ে দরজাটা খুলে দিলো সে।

লিটু চুপচাপ বিছানায় বসে পড়লো। মলি বুঝতে পারলো কোনো জরুরি কথা বলতে এসেছে তার ভাই।

"কিছু বলবি?" ভায়ের পাশে বসে বললো মলি।

বোনের দিকে তাকালো লিটু। "আপা, অনেক ভেবে দেখলাম, বুঝলা..."

মলি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তার কলেজ পড়ুয়া ভায়ের দিকে। "কি?"

"ডায়রিটা আমরা সরাসরি না দিয়ে অন্যভাবেও কিন্তু ঐ ইনভেস্টিগেটরের কাছে দিতে পারি।"

মলি একটু অবাক হলো কথাটা শুনে। "কিভাবে?"

"ধরো, নাম পরিচয় না জানিয়ে উনার কাছে কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা ডায়রিটা পাঠিয়ে দিতে পারি?"

মলি হতাশ হলো। ভেবেছিলো তার ভাই বুঝি সত্যি কোনো দারুণ আইডিয়া বের করতে পেরেছে। এখন বুঝতে পারছে, সদ্য কলেজে ভর্তি হওয়া একটা ছেলের কাছ থেকে এতোটা আশা করা উচিত হয় নি। মাত্র দু'মাস আগে গ্রাম থেকে এই শহরে এসেছে লিটু। দিনক্ষণ হিসেব করলে মলির থেকেও কম সময় ধরে ঢাকায় বসবাস করছে সে।

"কিছু বলছো না যে?" উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলো লিটু।

"তোর কি ধারনা এভাবে ডায়রিটা পাঠালে ঐ পুলিশের লোকগুলো কিছু বুঝতে পারবে না?"

ফ্যালফ্যাল করে বোনের দিকে চেয়ে রইলো লিটু।

"হাসানের ডায়রি আমরা ছাড়া আর কার কাছে থাকার কথা, বল?"

মাথা নীচু করে ফেললো লিটু। নিজের বোকামি বুঝতে পেরেছে।

"যারা বড় বড় খুনখারাবির তদন্ত করে খুনিকে ধরে ফেলে তাদের কাছে এরকম মিথ্যে বললে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়তে হবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো লিটু। "তাহলে কি ডায়রিটা দিয়ে কিছুই করবে না?"

এবার ভায়ের দিকে স্থির চোখে তাকালো মলি। "বাবাকে কিছু বলবি না, বল?"

"বলবো না।"

“আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি...”

“কি সিদ্ধান্ত নিয়েছো, আপা?” কৌতূহলী হয়ে উঠলো সে।

“বাবাকে হাসানের কবর জিয়ারত করতে পাঠিয়ে আমি ঐ ইনভেস্টিগেটরকে কাল আসতে বলবো।”

জেফরি বেগ এবার একটা কু পেয়ে ভেতরে ভেতরে চাঙ্গা অনুভব করছে। সেন্ট অগাস্টিনের জুনিয়র ক্লার্ক হাসানের খুনের জট পাকানো রহস্যের একটা সূত্র পাওয়া গেছে তাহলে। যে কোনো কেসে প্রথম সূত্রটা পাওয়াই সবচেয়ে কঠিন কাজ। একবার একটা সূত্র পাওয়া গেলে ধীরে ধীরে অনেক কিছুর জট খোলা সম্ভব হয়। সেন্ট অগাস্টিন থেকে সোজা এখানে চলে এসে দারুণ একটা কাজ করেছে, মনে মনে ভাবলো সে।

“আমার টিমের দুরাবস্থার কথা শুনার পর থেইকা তুমি দেখি তবধা খায়া গেছো!”

ম্যাকির কথায় জেফরি হেসে ফেললো। “আরে না, সেরকম কিছু না, বন্ধু।”

“আমার কথা তো অনেক হইছে, এইবার তোমার কথা কও। বিয়া-শাদি তো করো নাই এহনও, এই বছর সানাই বাজবো নি?” ম্যাকি একটা সিগারেট ধরিয়েছে, সেটাতে জোরে টান মেরে ধোয়া ছাড়লো।

“হতে পারে,” ছোট্ট করে বললো জেফরি।

“কও কি! খুব খুশি হইলাম।”

“তুমি বিয়ে করবে না?”

“আরে আমারে বিয়া করবো কে?”

“কেন, তোমার পছন্দের কোনো মেয়ে নেই?”

“পছন্দের তো অনেকেই আছিলো, কিন্তু কেউ আমার উপর ভরসা রাখতে পারে না। একে একে সব শালি কাট্টি মারছে।”

“কেন ভরসা রাখতে পারে না?”

“সারাদিন বাস্কেটবল লইয়া পইড়া থাকি, কাজকাম কিছু করি না, ভরসা পাইবো কেমনে?” সিগারেটের আবার টান দিলো ম্যাকি।

“এইজন্যেই তো বলি কিছু একটা করো।”

“হ, আমিও চিন্তা করছি, কিছু একটা করোনই লাগবো। সামনের বছর একটা ছোটোখাটো ব্যবসা শুরু করুম ভাবতাছি।”

“সামনের বছর কেন, এখনই শুরু করে দাও,” সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো জেফরি বেগ।

না। এই বছর আমার টাইম নাই। টিমটারে হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন করাইতে অইবো। এই সুযোগটা মিস্ করন যাইবো না, বুঝলা?”

“তুমি কি সারাক্ষণই টিম নিয়ে ব্যস্ত থাকো নাকি?”

“কি কও তুমি?” কৃত্রিম বিস্ময়ে বললো ম্যাকি। “আমি না থাকলে আমার টিম থাকবো? এতিম হইয়া যাইবো না?”

“কী যে বলো, আরো লোকজন আছে না, তুমি কি একা একা টিম চালাও?”

হা হা করে হেসে ফেললো ম্যাকি। “তুমি তো কোনো খবরই রাখো না।” সিগারেটটায় দুটো টান মেরে মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেললো সে। হাতের আঙুল গুনতে গুনতে বললো, “আমি হইলাম অ্যাঞ্জেলস টিমের সভাপতি, ম্যানেজার, পৃষ্ঠপোষক...”

“বাপরে...” অবাক হবার ভান করে বললো জেফরি। “এতো কিছু!”

“খাড়াও, এহনও সব শ্যাষ হয় নাই...আরেকটা বাকি রয়া গেছে।”

“সেটা আবার কি?”

ঐ যে একটু আগে কোচের কথা কইলা না...ছয় মাস ধইরা আমিই আমার টিমের কোচের কামটা করছি।”

“কি!” একটা ধাক্কা খেলো জেফরি।

“ওয়ানম্যান আর্মি, বুঝছো?” কথাটা বলে হেসে ফেললো ম্যাকি। “টিমের যা অবস্থা, ভাবতাছি এই বয়সে শিং কাইটা বাছুর হইয়া প্লেয়ার হিসাবে নাইমা যাইতে হয় কিনা কে জানে!” কথাটা বলেই হাসতে লাগলো সে।

ম্যাকির দাঁত বের করা হাসির দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ।

অধ্যায় ১৮

হোমিসাইডের ক্যান্টিনে বসে চা খাচ্ছে জেফরি। তার সামনে বসে আছে জামান। সকালে অফিসে এসেই ক্যান্টিনে বসে এক কাপ চা খাওয়াটা তার রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এমন নয় যে চা খেতে এখানেই আসতে হবে, নিজের অফিসে বসে ইন্টারকমের বোতাম টিপেই সেটা করা যায়, কিন্তু ইচ্ছে করেই এখানে বসে চা খায় সে। সারাদিন কাজের ব্যস্ততায় অফিসের সবার সাথে বলতে গেলে দেখাই হয় না। তার কাজের সাথে সম্পর্কিত দুএকজন ছাড়া বাকিদের সাথে দেখা করার এই একটাই সুযোগ। এই সুযোগটা জেফরি হাতছাড়া করতে চায় না।

গতকাল অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচের ব্যাপারটা জামানকে একটু আগেই সে বলেছে। সব কথা শুনে দারুণ আগ্রহী হয়ে উঠেছে ছেলেটা।

তার বন্ধু ম্যাকি নিজেই তার টিমের কোচের কাজ করছে এখন।

কথাটা শুনে জেফরি কিছুক্ষণের জন্য অবাক হলেও পরক্ষণেই বুঝতে পেরেছে, আসলে এটা তার জন্য বাড়তি সুবিধা। কারণ ম্যাকি সেন্ট অগাস্টিনে গিয়েছিলো কিনা সে ব্যাপারে এখন শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

তাই হয়েছে। বন্ধুকে যখন বলে সে গত বৃহস্পতিবার সেন্ট অগাস্টিন স্কুলে গিয়েছিলো কিনা তখন ম্যাকি খুবই অবাক হয়। তাকে জানায়, বিগত এক সপ্তাহে সে এলাকার বাইরে এক পাও রাখে নি। নতুন কিছু ছেলেকে কোচিং দেয়া নিয়ে জঘন্য রকমে ব্যস্ত।

"স্যার, তাহলে সেন্ট অগাস্টিনে যে লোকটা কোচ সেজে গিয়েছিলো সে ই আমাদের সন্দেহভাজন?" বললো জামান।

"আমি অবশ্য সন্দেহভাজন মনে করছি না," চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলো জেফরি। অবাক হলো জামান। "এখন আমি অনেকটা নিশ্চিত খুনটা সে-ই করেছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জামান।

"স্কুলে ঢোকার জন্য কোচের পরিচয়টা ব্যবহার করেছে।"

"কিন্তু অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ হলেই কি তাকে স্কুলে ঢুকতে দেবে?" জামান জানতে চাইলো। "তাকে নিশ্চয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়েছে স্কুলে ঢোকার জন্য?"

জামানের এ কথায় মাথা দোলালো জেফরি। "অরুণদা তার স্কুলের জন্য যেরকম সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেছেন তাতে তো মনে হয় না অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবার আদৌ দরকার আছে।"

"অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দারোয়ান ঢুকতে দেবে?" জামান আগ্রহভরে জানতে চাইলো।

"তা দেবে না।"

"তাহলে?"

"ভুলে যেও না, অরুণদার সাথে দেখা করার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয় কিন্তু স্কুলের কোনো শিক্ষক-কর্মচারির সাথে কেউ দেখা করতে এলে শুধুমাত্র ঐ লোকের অনুমোদন থাকলেই চলে।"

"তাহলে স্কুলের কোনো শিক্ষক-কর্মচারির মাধ্যমে ঢুকেছিলো?"

"আমার ধারণা একজন শিক্ষক এ কাজে সহায়তা করেছে," বললো জেফরি। এটা সে গতকাল রাতেই ভেবেছিলো।

"শিক্ষক? তার মানে এই খুনের পেছনে একজন শিক্ষকও জড়িত?"

"ব্যাপারটা ঠিক সেরকম না," একটু থেমে আবার বললো জেফরি বেগ। "শিক্ষক হয়তো লোকটাকে ঢুকতে সাহায্য করেছে কিন্তু খুনের সাথে তার জড়িত হবার সম্ভাবনা নাও থাকতে পারে।"

"বুঝলাম না, স্যার?"

"আমি অনুমাণ করছি, আমাদের খুনি সেন্ট অগাস্টিনের একজন শিক্ষককে ম্যানেজ করে স্কুলে ঢুকেছে। আর সেই শিক্ষক স্পোর্টস টিচার কিংবা ফিজিক্যাল ট্রেইনার হওয়ার

সম্ভাবনাই বেশি।”

জামান মাথা নেড়ে সায় দিলো। তার বসের অনুমাণ সত্যি হতে পারে। প্রতিটি স্কুলেই একজন ফিজিক্যাল ট্রেইনার থাকে, তারাই খেলাধুলার ব্যাপারগুলো দেখাশোনা করে সাধারণত।

“তাহলে এখন কি করবেন, স্যার?”

“একটু পরই আমি আর তুমি সেন্ট অগাস্টিনে যাবো। কোন শিক্ষক এ কাজে সাহায্য করেছে সেটা আশা করি বের করতে পারবো।”

অধ্যায় ১৯

লিটু আজ কলেজে যায় নি। একটু আগে তার বাপ গেছে হাসানের কবর জিয়ারত করতে। সঙ্গে করে নিয়ে গেছে এলাকার মসজিদের মুয়াজ্জিনকে।

তার বোন মলি চাচ্ছে ওই অদ্ভুত নামের ইনভেস্টিগেটর ভদ্রলোককে বাড়িতে ডেকে আনতে। ডায়রিটা তার হাতেই তুলে দেবে। তবে এটা বলবে না, ডায়রিতে হাসান কি লিখেছে। মলি ভান করবে ডায়রিটা সে পড়ে দেখে নি। পড়ে দেখার মতো মনমানসিকতা এখন তার নেই। ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেটর ভদ্রলোক খুব সহজেই বিশ্বাস করবে।

মলি শুধু ডায়রিটা দিয়ে বলবে, গতকাল রাতে এটা সে খুঁজে পেয়েছে। হাসান যে নিয়মিত ডায়রি লিখতো সে কথা বলতে ভুলে গেছিলো ঐদিন। এটা হয়তো খুনের তদন্তে সাহায্য করতে পারে সেজন্যে তাকে দিতে চাইছে। ইনভেস্টিগেটর এসব কথা বিশ্বাস না করে পারবে না।

লিটুকে যখন মলি এই পরিকল্পনার কথা বলেছিলো তখনই সে বুঝে গেছিলো তার বোনের আসল উদ্দেশ্যটা কি বোনের বুদ্ধির প্রশংসা করেছে। মনে মনে।

ইনভেস্টিগেটর নিজের উদ্যোগে ডায়রিটা পড়ে সব জেনে নিতে পারবে। ভদ্রলোক যদি সৎ আর দায়িত্ববান হয়ে থাকে-যেমনটি পুলিশে খুব কমই আছে বলে মনে করে তার বোন-তাহলে নিজের তাগিদেই তদন্ত করে দেখবে। আর যদি সেরকম না হয়ে থাকে তাহলেও খুব একটা সমস্যা নেই। লোকটা হয়তো পুরো ঘটনা চেপে যাবে। এতে করে মলি কিংবা তার বাপ-ভায়ের কোনো সমস্যা হবে না। সে ভাববে, তারা তো কিছুই জানে না।

বোনের বুদ্ধির দৌড় এখানেই শেষ হয় নি। তাকে বলেছে সকাল সকাল নীলক্ষেতে গিয়ে পুরো ডায়রিটা ফটোকপি করে আনতে। নিজের কাছে এর একটা কপি রাখা জরুরি। ভবিষ্যতে যদি কখনও দরকার পড়ে তখন এটা ব্যবহার করা যাবে। লিটু নিজেও এ ব্যাপারে একমত। এরকম মূল্যবান একটি ডায়রির কপি তাদের কাছে থাকা উচিত। তবে সেটা তার বোন আর সে ছাড়া এ দুনিয়ার কেউ জানবে না।

এখন নীলক্ষেতে যাচ্ছে সে। ডায়রিটার ফটোকপি করা হয়ে গেলে ইনভেস্টিগেটরকে ফোন করে তাদের বাড়িতে আসতে বলবে। ব্যাপারটা খুবই জরুরি। তার বোন জামাইর একটা ডায়রি খুঁজে পেয়েছে তারা। দেরি না করে যেনো এক্ষুণি চলে আসে। কারণ আজ বিকেলেই বোনকে নিয়ে তার বাপ দেশের বাড়িতে চলে যাচ্ছে।

পুরোটাই তার বোন মলির পরিকল্পনা। লিটুও জানে, এ কথা শোনার পর ঐ ইনভেস্টিগেটর দ্রুত ছুটে আসবে তাদের বাড়িতে। তবে তার কাছে অদ্ভুত নামের ঐ ইনভেস্টিগেটরের ফোন নাম্বারটা নেই, আছে তার সাথে আসা সহকারী ছেলেটার নাম্বার। লিটু অবশ্য এ নিয়ে চিন্তা করছে না। সে নিশ্চিত, সহকারীকে ফোন করলেই কাজ হবে।

এখন জেফরিকে নিজের অফিসে ঢুকতে দেখলেই অরুণ রোজারিওর মুখে আর সেই আন্তরিকমাখা হাসিটা থাকে না। এক ধরণের কৃত্রিম হাসি এঁটে রাখেন। তিনি। সেই কৃত্রিম হাসিটা কোনোভাবেই আসল অভিব্যক্তি আড়াল করতে পারে না। এক ধরণের ভয় আর আড়ষ্টতা জেঁকে বসে তাকে দেখলে।

এবারও তাই হলো। জেফরি আর জামানকে দেখে ভদ্রলোক কৃত্রিম হাসি মুখে এঁটে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

"আমি ভেবেছিলাম তুমি দুপুরের পর আসবে," বানোয়াট হাসিটা মুখে এঁটেই বললেন সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যাল। "চা না কফি?"

"কিছু না," বললো জেফরি। "এইমাত্র চা খেয়েই অফিস থেকে বের হয়েছি।"

অরুণ রোজারিও চুপ মেরে রইলেন। আগ বাড়িয়ে কিছু বলার ইচ্ছে তার নেই।

"অরুণদা, একটা কাজ করতে হবে আপনাকে।"

জেফরির এই কথাটা শুনে অরুণ রোজারিও ঢোক গিলে বললেন, "কি কাজ?"

“এই স্কুলের ফিজিক্যাল ট্রেইনার যিনি আছেন তাকে ডাকুন। আমি তার সাথে একটু কথা বলবো।”

অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যাল স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তার এই ছোটো ভাইটি খুনের মামলা তদন্ত করতে এসে এসব কী বলছে? গতকাল বললো এক বাস্কেটবল কোচের গল্প, আজ আবার ফিজিক্যাল ট্রেইনারের সাথে কথা বলতে চাচ্ছে। অদ্ভুত! খুনের সাথে স্পোর্টসের কী সম্পর্ক? মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি।

“অরুণদা?” জেফরি তাড়া দিলো।

উদাস ভাবটা কেটে গেলো মুহূর্তে। “ওহ, সরি,” কথাটা বলেই ইন্টারকমটা তুলে নিলেন তিনি। ফিজিক্যাল ট্রেইনারকে এক্ষুণি তার রুমে আসার জন্যে বলে দিলেন।

“আমাদের ফিজিক্যাল ট্রেইনার হিসেবে আছেন কাজি হাবিব। ছাত্র জীবনে ভালো ফুটবলার ছিলেন।”

“তাই নাকি,” বললো জেফরি।

“হুম...” কথাটা বলেই একটু থেমে আবার বললেন, “আমাকে কি বলা যায় উনার সাথে কী নিয়ে কথা বলবে?”

“হাসান সাহেবের কেসটা নিয়ে,” সোজাসাপ্টা জবাব দিলো জেফরি বেগ।

“সেটা আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু উনার সাথে কেন কথা বলবে সেটা কি আমি জানতে পারি?”

মুচকি হেসে প্রিন্সিপ্যালের দিকে চেয়ে রইলো জেফরি। “উনি এলেই বুঝতে পারবেন।”

অধ্যায় ২০

লিটু নীলক্ষেত থেকে ফিরে এসেছে। তার হাতে হাসানের ডায়রি আর সেটার ফটোকপি। স্পাইরাল বাইন্ডিং করে ফেলেছে সে। যদিও তার বোন বলেছিলো শুধু ফটোকপি করতে।

বেশ কয়েকবার বেল বাজানোর পর তার বোন দরজা খুলে দিলো। মলির চোখমুখ ফোলাফোলা। সারারাত তার ঘুম আসে না। হাসান খুন হবার পর থেকেই এরকম চলছে। লিটু জানে না কবে তার বোন এই শোক কাটিয়ে উঠবে।

"সবগুলো পাতা ফটোকপি করেছিস তো?"

লিটু ঘরে ঢুকতেই জানতে চাইলো মলি। তার হাতে স্পাইরাল বাইন্ডিং করা কপিটা। "হ্যাঁ, সবগুলো পাতাই করেছি।"

"ওই ভদ্রলোককে ফোন করেছিস?"

"না।"

"কেন?"

"তুমি না বললে ফটোকপি করার পর ফোন করতে..."

"হ্যাঁ, ফটোকপি তো হয়েই গেছে, জলদি কল কর, আব্বা আসার আগেই ওদেরকে বিদায় করতে চাই," তাড়া দিলো মলি।

"চিন্তা কোরো না, আব্বার আসতে অনেক দেরি হবে।"

কথাটা বলেই বোনের কাছে মোবাইল ফোনটা চাইলো সে। মলি ফোনটা তার হাতে দিলে পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজ বের করে একটা নাম্বারে ডায়াল করলো লিটু। এটা সহকারী ইনভেস্টিগেটর জামানের। তার সাথে কথা বলার একফাঁকে এই নাম্বারটা দিয়েছিলো ভদ্রলোক।

কানে ফোন চেপে রেখেছে লিটু। পাশেই উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে মলি।

রিং হচ্ছে...

কাজি হাবিব লোকটা বিশালাকৃতির। বয়স মধ্য-চল্লিশে হবে। কুস্তিগীরের মতো শরীর। তবে জেফরি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো লোকটার বেশ বড়সড় ভুড়িও আছে। ফিজিক্যাল ট্রেইনারদের ভুড়ি কেন থাকে সে জানে না।

তাদের স্কুলের পিটি স্যারেরও বেশ বড়সড় বপু ছিলো। এজন্যে তারা আড়ালে আবডালে স্যারকে পেটালি' বলে ডাকতো। পরে দেখেছে, শুধু তাদের স্কুলেই না, আশেপাশের অনেক স্কুলেই পিটি স্যারকে পেটালি বলে ডাকে ছাত্ররা।

তবে সেন্ট অগাস্টিনের মতো অভিজাত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পিটি স্যারকে ছাত্ররা এই নামে ডাকে কিনা বুঝতে পারলো না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা হয়তো বেশি সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটায় এ ক্ষেত্রে।

অরুণ রোজারিও যে-ই না জেফরির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জানালো সে হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর অমনি কাজি হাবিবের মুখ থেকে হাসি হাসি ভাবটা উধাও হয়ে গেলো।

জেফরির পাশেই বসলো ভদ্রলোক। মাথার চুল একেবারে ছোটোছোটো করে ছাটা। নাকের নীচে বেশ পুরু গোফ। দেখলেই মনে হয় জাঁদরেল একজন। কিন্তু জেফরির সামনে চুপসে যাওয়া বেলুন মনে হচ্ছে তাকে।

"সামনে কি ইন্টারস্কুল বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট?" পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার জন্য অন্যরকম কথাবার্তা দিয়ে শুরু করলো জেফরি বেগ।

কাজি হাবিব একটু অবাক হলো প্রশ্নটা শুনে। "জি।"

"আপনাদের টিম কেমন করবে বলে আশা করছেন?"

অরুণ রোজারিও চোখ পিটপিট করে জেফরির দিকে তাকাতে লাগলেন। জেফরি কি

খুনের তদন্ত করতে এসেছে নাকি স্পোর্টস জার্নালিস্ট হয়ে ইন্টারভিউ নিতে এসেছে! মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না।

জামান খেয়াল করলো কাজি হাবিব নামের লোকটাও যারপরনাই বিস্মিত।

"ভালোই করবে মনে করছি, গতবার তো আমরা রানার্স-আপ হয়েছিলাম।"

"দ্যাটস গুড।"

"আমাদের অনেক ভালো প্লেয়ার আছে, ন্যাশনাল লেভেলে কমপিট করার মতো প্লেয়ার তারা..."

"আপনাদের কোনো প্লেয়ার কি ফার্স্ট ডিভিশনে খেলে?"

অরুণ রোজারিওর চেহারাটা দেখার মতো হলো। কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছেন না।

"না, তা নেই...তবে আশা করছি খুব জলদিই আমাদের দুএকজন প্লেয়ার ফার্স্টক্লাসে খেলতে পারবে," বললো কাজি হাবিব।

"গুড," কথাটা বলেই জেফরি তাকালো অরুণ রোজারিওর দিকে। "আপনার স্কুল দেখছি খেলাধুলায়ও বেশ ভালো।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো তো...আমরা সব বিভাগেই ভালো করার চেষ্টা করি, তাই না, মি: হাবিব?"

"জি, স্যার..."

"আচ্ছা মি: হাবিব, গত বৃহস্পতিবার অ্যাঞ্জেলস টিমের এক কোচ এসেছিলো স্কুলে, সেটা কি আপনি জানেন?"

কাজি হাবিব একটু অবাকই হলো কথাটা শুনে। "হ্যা! কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?"

অরুণ রোজারিও অস্থির হয়ে তাকালেন কাজি হাবিবের দিকে। "এসেছিলো নাকি?"

"জি, স্যার, প্রিন্সিপ্যালকে বললো কাজি হাবিব।

"ওই লোক কি স্কুলে আসার আগে আপনার সাথে দেখা করেছিলো?"

"তা। প্রথমে ফোন করে বললো তাদের নাকি প্লেয়ার শর্ট...কার কাছ থেকে যেনো শুনেছে আমাদের স্কুলে বেশ কয়েকজন ভালো প্লেয়ার আছে...তো আমি বললাম ঠিক আছে, নো প্রবলেম...আসুক, আমাদের প্লেয়ারদের দেখুক...সমস্যা কি? অ্যাঞ্জেলসের মতো ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন টিমে স্কুলের কেউ চান্স পেলে সেটা তো দারুণ ক্রেডিটের ব্যাপার হবে, তাই না?"

"অবশ্যই," বলেই জামানের দিকে চকিতে তাকালো জেফরি। ছেলেটা আগ্রহভরে তাদের কথা শুনে যাচ্ছে। আমি আসলে সেই কোচের সম্পর্কেই আপনার কাছে কিছু জানতে চাচ্ছিলাম।"

"কি জানতে চান, বলুন?" কাজি হাবিব বললো।

"ওই লোকটা স্কুলে কখন ঢুকেছিলো?"

"ওরা মনে হয় তিনটার পর ঢুকেছিলো-"

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো জেফরি বেগ, "ওরা মানে?"

"ওরা দুজন ছিলো...একজন কোচ, আরেকজন সম্ভবত টিমের কোনো কর্মকর্তা হবে।"

জামানের ফোনটা বেজে উঠলো এমন ক্লাইমেক্সের সময়। বিরক্ত হয়ে তাকালো জেফরি। বসের বিরক্তি দেখে জামান সবার কাছ থেকে এক্সকিউজ চেয়ে চলে গেলো বাইরে।

"হ্যাঁ, তারপর, বলুন?" জেফরি তাড়া দিলো কাজি হাবিবকে।

"ওরা আমার সাথে যোগাযোগ করে বুধবার। আমি ওদেরকে পরদিন আসতে বলি।"

"যোগাযোগটা কি ফোনে হয়েছিলো?" জানতে চাইলে জেফরি।

"হ্যাঁ।"

“তারপর, বলুন?”

“আমি দুপুরের লাঞ্চ করি স্কুলের বাইরে, তো বৃহস্পতিবার লাঞ্চ করতে গেলে ওদের সাথে আমার রেস্তোরাঁয় দেখা হয়ে যায়। ওরাও ওখানে লাঞ্চ করছিলো। লাঞ্চ শেষ করে আমাকে সঙ্গে নিয়েই গাড়িতে করে স্কুলে চলে আসে ওরা।”

“ওই লোকগুলো আপনাকে কিভাবে চিনলো? আপনিই তো বললেন ফোনে যোগাযোগ হয়েছিলো আগের দিন?”

কাজি হাবিব ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। “সেটা তো আমি জানি না। ব্যাপারটা আমার মাথায় আসে নি।”

বুঝতে পারলো জেফরি। খুবই পেশাদার লোকজনের কাজ। দীর্ঘদিন। নজরদারি আর রেকির ফল হলো এই হত্যাকাণ্ড। কিন্তু সামান্য একজন ক্লার্ককে খুন করতে এতো বড় পরিকল্পনা কেন?

মাথা থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেললো সে। পরে এ নিয়ে ভাবরে। “ওদের সাথে গাড়ি ছিলো?” জানতে চাইলে জেফরি।

“হুম।”

“গাড়িতে করে আপনারা তিনজন চলে এলেন স্কুলে?”

“জি।”

“তারপর?”

“আমার সাথে কথাবার্তা বললো, স্কুলের বাস্কেটবল কোর্টটা ঘুরেটুরে দেখলো। ওদেরকে আমি বললাম স্কুল ছুটির পর ইন্টারস্কুল টুর্নামেন্টের জন্য সিলেক্ট করা ছেলেরা প্র্যাকটিস করবে। ওরা বললো, ঠিক আছে। সেখান, থেকেই কিছু প্লেয়ারের সাথে কথা বলবে।”

“তারপর?” কৌতূহলী হয়ে উঠলো জেফরি।

“শুনেছি আমাদের একজন স্টুডেন্টকে তারা টিমে নিয়েছে।”

“শুনেছেন মানে? আপনি ওদের সাথে ছিলেন না?”

“না, আমার তো থাকার দরকার ছিলো না, ওরা ওদের মতো করে প্লেয়ার সিলেক্ট করেছে।”

“অর্থাৎ তারা বিকেলের দিকে কোর্টে প্র্যাকটিস করতে থাকা ছেলেদের মধ্য থেকে একজনকে সিলেক্ট করে চলে যায়?”

“হুম।”

“এরপর আপনার সাথে তারা আর যোগাযোগ করে নি?”

“না।”

“তাহলে আপনি কিভাবে জানলেন একজনকে সিলেক্ট করা হয়েছে?”

“আমাকে দিপ্রো আর সায়েম নামের দুটো ছেলে এ কথা বলেছে।”

“কাকে সিলেক্ট করেছে জানেন?”

এমন সময় জামান এসে চুপচাপ জেফরির পাশে বসে পড়লো।

তুর্যকে,” বললো কাজি হাবিব।

জেফরি লক্ষ্য করলো তুর্য নামটা শোনামাত্রই অরুণ রোজারিও কিছুটা চমকে উঠলেন।

থুতনীর নীচে চুলকে নিলো জেফরি। একটু ভেবে বললো, “ওই লোকগুলো কি আপনাকে তাদের নাম বলেছে?”।

“বলেছে। কোচের নাম ম্যাকি, আর কর্মকর্তার নামটা যেননা কী...” মনে করার চেষ্টা করলো কাজি হাবিব।

“ভুলে গেছেন?”

“আসলে আমার যা কথা হয়েছে ঐ কোচের সাথেই হয়েছে, কর্মকর্তার সাথে খুব একটা কথা হয় নি।”

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি বেগ। তার কাছে একটা ব্যাপার স্পষ্ট : অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ সেজে দু'জন লোক সেন্ট অগাস্টিনে প্রবেশ করে। আর তার পর পরই খুন হয় জুনিয়র ক্লার্ক হাসান। তারা শুধু কোচের পরিচয়টাই ব্যবহার করে নি, সত্যিকারের কোচের নামটাও ব্যবহার করেছে। এটাও একটা ক্লু। যারাই খুন করে থাকুক, তারা ম্যাকিকেও ভালো করে চেনে।

"লোক দুটোর বয়স কেমন হবে?"

"কোচের বয়স ত্রিশের মতো, আর কর্মকতার বয়স হবে তারচেয়ে একটু বেশি, ভদ্রলোকের মুখে চাপদাড়ি ছিলো," বললো কাজি হাবিব।

"স্যার।"

জামানের দিকে ফিরলো জেফরি।

"মিসেস হাসান আমাদেরকে উনার বাসায় আসতে বলছেন, গলা নামিয়ে অনেকটা চাপাকণ্ঠে বললো জামান। "খুবই নাকি জরুরি।"

মিসেস হাসান! "জরুরি?!" আস্তে করে বললো জেফরি।

অধ্যায় ২১

নিহত হাসানের ডায়রিটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে বসে আছে জেফরি বেগ। নোটবুক সাইজের একটি ডায়রি।

একটু আগে হাসানের শ্যালক লিটু ফোন করে জামানকে। জেফরি তখন সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যাল আর পিটি স্যারের সাথে কথা বলছিলো।

মলি বলছে ডায়রিটা সে গতকাল রাতে পেয়েছে। আলমিরাতে হাসানের কাপড়চোপরের ভেতরে। হাসান যে ডায়রি লিখতো সেটা মলি জানতো তবে স্বামী হারানোর শোকে এ কথাটা ইনভেস্টিগেটরকে বলতে ভুলে গেছিলো। মলির কাছে মনে হয়েছে, ডায়রিটা থেকে হাসানের অনেক কথাই জানতে পারবে তারা।

নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবে পুলকিত হলো জেফরি। খুব দ্রুত, একের পর এক ক্লু আর নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছে সে। এই ডায়রিটা হয়তো গুরুত্বপূর্ন কিছু দিক নির্দেশনা দেবে।

মলি আর তার ছোটো ভাই লিটু বসে আছে বিছানার উপর। জেফরি আর জামান দুটো চেয়ারে।

"হাসান সাহেব কি প্রতিদিনই ডায়রি লিখতেন?" জিজ্ঞেস করলো জেফরি।

"আমি ঢাকায় আসার পর থেকে নিয়মিত লিখতো না। তবে ওর কাছ থেকে শুনেছি এর আগে নাকি নিয়মিতই লিখতো," মলি বললো।

"ডায়রিটা আপনি পড়েছেন?"

জেফরির দিকে তাকালো মলি। "না।"

"ডায়রি পড়ার মতো মনমানসিকতা আপার নেই, বুঝতেই পারছেন," লিটু আস্তে করে বললো। "আমি অবশ্য আপাকে পড়তে বারণ করেছিলাম। ওটা পড়লে খামোখাই মন খারাপ হতো..."।

জেফরি কিছু বললো না। চেয়ে রইলো লিটুর দিকে। তা ঠিক। কয়েকদিন আগে খুন হওয়া স্বামীর ডায়রি পড়াটা মোটেও সুখকর কিছু হতো না।

"আমি চাই হাসানের খুনি ধরা পড়ক...তার উপযুক্ত শাস্তি হোক, তাই ভাবলাম আপনাকে এটা দিয়ে দিলে হয়তো তদন্তে সাহায্য করা হবে," মলি বললো।

"খুব ভালো কাজ করেছেন। আমি নিশ্চিত, এই ডায়রি থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো।"

"তদন্তের কাজ কতোদূর এগোলো? কিছু বের করতে পেরেছেন?" মলি জানতে চাইলো।

জেফরি একটু ভেবে নিলো। "মাত্র তদন্ত শুরু করেছি, কিছুটা অগ্রগতিও হয়েছে। তবে এ মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়। আশা করছি খুব জলদিই আসামী ধরতে পারবো।"

মলি আর লিটু চকিতে একে অন্যের দিকে তাকালো।

"আপনার বাবা কোথায়...উনি কি চলে গেছেন?"

"না। হাসান ভায়ের কবর জিয়ারত করতে গেছেন," বোনের হয়ে জবাব দিলো লিটু।

"আপনি নাকি দেশের বাড়িতে চলে যাচ্ছেন?" জেফরি বললো নিহত হাসানের স্ত্রীকে।

মাথা নীচু করে ফেললো মলি। "জি।"

"কবে যাচ্ছেন?"

মুখ তুলে তাকালো লিটুর বোন। "কাল-পরশু।"

একটু গাল চুলকে নিলো জেফরি। "আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে যাবেন। আপনার সাথে আমাদের কথা বলার দরকার হতে পারে।"

"ঠিক আছে।"

কথাটা বলেই মলি তার নাম্বারটা বলে দিলে জামান সেটা তার ফোনে টুকে নিলো।

"ঠিক আছে, উঠে দাঁড়ালো জেফরি বেগ। "আমরা তাহলে উঠি।" ডায়রিটা বেশ

ছোটো হওয়ায় জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে ওটা রেখে দিলো।

তাদেরকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো লিটু।

জামানকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় জেফরির চোখ গেলো পাশের ফ্ল্যাটের দরজার দিকে। থমকে দাঁড়ালো সে।

ব্যাপারটা জামানও খেয়াল করলো। তাদের মধ্যে চোখাচোখি হতেই জেফরি বললো, "চলো দেখি, মিলন সাহেব এসেছে কিনা..."

দরজায় টোকা মারলো জামান। মনে মনে সে আশা করলো মিলন সাহেবের অদ্ভুত দুই স্ত্রীদের একজনকে। আজকে না জানি কী করে তারা।

কোনো সাড়াশব্দ নেই। জামান আবারো দরজায় টোকা দেবে এমন সময় সেটা আস্তে করে খুলে গেলো। টোকা মারতে উদ্যত হাতটা সরিয়ে নিলো জামান।

স্যান্ডো গেঞ্জি আর জিন্স প্যান্ট পরা এক যুবক দরজা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ পেশীবহুল শরীর। দেখতেও সুপুরুষ। ভুরু কুচকে চেয়ে আছে তাদের দিকে।

"কাকে চাই?" জেফরি আর জামানকে আপাদমস্তক দেখে বললো যুবক।

"মিলন সাহেব আছেন?"

জামানের কথাটা শুনে যুবক একটু চুপ করে থেকে মাথা দোলালো। "না। বাসায় নাই।"

"উনার স্ত্রীরা আছে?" জামান বললো।

"একজন মার্কেটে গেছে, আরেকজন বাথরুমে ..." যুবক কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললো। "আপনারা কারা?"

"আমরা হোমিসাইড থেকে এসেছি..."

"কি সাইড?" বুঝতে না পেরে বললো যুবক।

"পুলিশ ডিপার্টমেন্ট," পাশ থেকে বলে উঠলো জেফরি বেগ।

"পুলিশ?!" স্বাভাবিকভাবেই ভড়কে গেলো যুবক। "ঘটনা কি?"

"তার আগে বলুন, আপনি কে?" জেফরি জানতে চাইলো।

"আমি সুমন, মিলনের দ্বিতীয় ওয়াইফের বড় ভাই," যুবক কথাটা বলেই গাল চুলকালো।

জেফরির কাছে কেন জানি মনে হলো কথাটা সত্যি নয়। ছেলেটাকে আপাদমস্তক দেখে নিলো। মাথার চুল উসকোখুসকো। এই শীতের দিনেও গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে আছে। তার কাছে মনে হচ্ছে, মিলন সাহেবের তরুণী স্ত্রীর সাথে সুমন নামের এই যুবকের কোনো সম্পর্ক আছে, তবে সেটা রক্তসম্পর্ক নয়। হয়তো স্বামীর অনুপস্থিতিতে গোপন প্রেমিককে বাড়িতে ডেকে আনা হয়েছে।

"মিলন সাহেব কি ঢাকায় ফেরেন নি?" জানতে চাইলো জামান। জেফরি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সুমন নামের যুবককে।

"না।"

"কবে ফিরবে, বলতে পারেন?"

ঠোঁট উল্টালো সুমন। "আমি কিভাবে বলবো!...আমি তো মাত্র এলাম এখানে।"

"আপনার দেশের বাড়ি কোথায়?"

"বগুড়া।"

"কি করেন?"

"আমি জাপানে ছিলাম। আট দিন আগে দেশে এসেছি।"

"ও," বললো জামান। তার বস জেফরির দিকে তাকালো।

"কেসটা কি?" কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলো সুমন।

"পাশের ফ্ল্যাটের হাসান সাহেব কয়েক দিন আগে খুন হয়েছেন, আমরা সে ব্যাপারে মিলন সাহেবের সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

জামানের কথা শুনে যুবক অবাক হলো। “বলেন কি!” একটু ঢোক গিলে আবার বললো, “কোথায় খুন হয়েছে? ওই ফ্ল্যাটে?”

“না,” জামানও কিছুটা বিরক্ত এখন। “উনি যেখানে কাজ করতেন, সেই স্কুলে...”

“তাহলে মিলনরে কেন খুঁজছেন?”

“উনার সাথে এ ব্যাপারে আমরা একটু কথা বলবো,” এর বেশি বলতে চাইছে না জামান। পাশ থেকে জেফরি আস্তে করে জামানের কঁনুই ধরে টান দিলো। খামোখা কথা বলে কী লাভ। চলে যাওয়াই ভালো।

“বাপরে...খুনখারাবির কেসে মিলনরে খুঁজছেন..আমার তো শুনেই ভয় করছে।”

“ঠিক আছে, আপনাকে ডিস্টার্ব করার জন্য দুঃখিত,” বললো জামান।

“ওকে ওকে,” বললো সুমন। তার চোখমুখ থেকে বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটে নি। কিন্তু জেফরির কাছে কেন যেনো মনে হলো যুবকটি বিস্মিত হবার ভান করছে। যাইহোক জামানকে নিয়ে যে-ই না ঘুরে দাঁড়াবে অমনি ঘরের ভেতর থেকে একটা ফোন বাজার শব্দ হলো।

পেছন ফিরে তাকালে সুমনের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলো জেফরির। একটা হাসি দিলো সে।

ঘুরে দু’পা সামনে এগোতেই জেফরি শুনতে পেলো ভেতর থেকে একটা নারী কণ্ঠ নাকি সুরে বলছে : “অ্যাই মিলন...তুমার ফোন!”

ততোক্ষণে জামান সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে চলে গেছে। আচমকা জেফরির গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেলো। ঘুরে দাঁড়ালো সে। আবারো সুমন নামের যুবকের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলো তার। দরজা ফাঁক করেই দাঁড়িয়ে আছে, তবে এবার তার চেহারায় আর হাসি দেখা গেলো না। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে জেফরির দিকে।

পুরো ব্যাপারটার স্থায়ীত্ব বড়জোর দু’সেকেন্ডের মতো হবে।

জেফরি বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেলো দরজার দিকে। সুমন নামের যুবকটি প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় দরজা বন্ধ করে দিতে চাইলেও পারলো না। ছুটে এসে নিজের ডান পায়ের পাতাটা দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে জেফরি। সেজন্যেই দরজা বন্ধ করা সম্ভব হয় নি।

সুতীব্র ব্যাথায় নাকি জামানের মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে, ঠিক বোঝা গেলো না, জেফরি বেগ চিৎকার করে উঠলো।

সিঁড়ির উপর থমকে দাঁড়ালো জামান। মুহূর্তে ঘুরে দেখতে পেলো তার বস্ দরজার ভেতরে এক পা ঢুকিয়ে দু’হাতে দরজাটা ঠেলে যাচ্ছে সে। তবে ভেতর থেকে সুমন নামের সেই যুবক গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করছে।

জামান দৌড়ে এসে হাত লাগালো। সজোরে ধাক্কা দিলো দরজায়। কিন্তু যুবকের গায়ে যেনো অসুরের মতো শক্তি। দরজাটা ঠেলে কয়েক ইঞ্চির বেশি ফাঁক করতে পারলো না জামান। জেফরি বেগ নিজের পাটা সঙ্গে সঙ্গে বের করে আনলো। ব্যাথায় চোখমুখ কুচকে গেলো তার।

জেফরি তার জ্যাকেটের ভেতর থেকে শোল্ডারহোলস্টারে রাখা পিস্তলটা দ্রুত বের করে নিলে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে ফেললো সেই যুবক। এক ঝটকায়, প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে। শক্তিতে জামান পেরে উঠলো না তার সাথে।

“লাথি মারো!” চিৎকার করে বললো জেফরি। তার নিজের পায়ের অবস্থা খুব খারাপ।

জামান লাথি মারলো দরজায়।

“এই লোকটাই মিলন!” জেফরি চিৎকার করে বললো। জামান আরেকটা লাথি মারলো, কিছুই হলো না।

জেফরি বাম হাতে জামানকে সরিয়ে একটু পিছিয়ে গেলো, তারপর ডান কাঁধটা দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারলো বন্ধ দরজায়। ঘ্যা করে শব্দ হয়ে দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে জামান তাকে সরিয়ে দিয়ে লাথি মারতেই হুরমুর করে খুলে গেলো দরজাটা। এরইমধ্যে জামানও পিস্তল হাতে তুলে নিয়েছে। জেফরির আগে সে-ই ঢুকে পড়লো ভেতরে ঢোকার আগে চিৎকার করে বললো, "স্যার, আপনি ব্যাকআপে থাকেন..."

একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জেফরি বেগও ঢুকে পড়লো ভেতরে।

ঘরে কোনো বাতি জ্বলছে না। একটা খোলা জানালা আর মিউট করা টিভির আলোয় স্পষ্ট দেখা গেলো মেঝেতে একটা মেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। গায়ে তোয়ালে পেচানো। কাছে আসতেই জেফরি চিনতে পারলো। মিলনের প্রথম স্ত্রী। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে তার। পুরোপুরি জ্ঞান হারায় নি অবশ্য।

মিলন তার স্ত্রীকে প্রচন্ড জোরে ঘুষি মেরে চলে গেছে ভেতরের ঘরে। মহিলার বোকামির জন্য রেগেমেগে মনের ঝাল মিটিয়েছে সে।

জামান তার পেছন পেছন ছুটে গেলো ভেতরের ঘরটায়। একটু পরই খোঁড়াতে খোঁড়াতে জেফরিও চলে এলো সেই ঘরে।

অবাক করা ব্যাপার, ঘরে কেউ নেই। যেনো উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই তারা বুঝতে পারলো। ঘরের পূর্ব দিকে একটা বেলকনি আছে। এটা এই বাড়ির পেছন দিক। জামান আর জেফরি বেলকনিতে এসে দেখলো নীচে একটা একতলা বাড়ি। সেই বাড়ির ছাদে অনায়াসে নেমে গেছে মিলন।

চারপাশে দ্রুত দেখে নিলো জেফরি। জামানও অস্থির হয়ে আশেপাশে তাকাচ্ছে।

জেফরির চোখেই ধরা পড়লো প্রথম।

নীচের একতলা বাড়ির ছাদে একটা বড়সড় পানির ট্যাঙ্কি। ডান দিকের একটা তিনতলা বাড়ির ছাদ থেকে এক অল্পবয়সী ছেলে একবার ট্যাঙ্কি আরেকবার পিস্তল হাতে জেফরি এবং জামানের দিকে তাকাচ্ছে অবাক চোখে।

ট্যাঙ্কির পেছনে!

"ট্যাঙ্কির পেছনে?" একটু জোরেই বললো জেফরি। সঙ্গে সঙ্গে জামান তাকালো সেদিকে। জেফরি কিছু বলার আগেই জামান তার পিস্তলটা কোমরে খুঁজে বেলকনি থেকে নেমে শরীরটা ঝুলিয়ে দিলো।

"জামান!" জেফরির মুখ দিয়ে কথাটা বের হয়ে গেলে ঝুলে থাকা অবস্থায় জেফরির দিকে তাকালো জামান। কিছু একটা বলতে গিয়েও বললো না। হাতটা ছেড়ে দিতেই ধপাস করে নীচের একতলার ছাদে নেমে পড়লো সে।

জেফরি ট্যাঙ্কির দিকে তাকালো। মিলন বুঝতে পেরে ট্যাঙ্কির পেছন থেকে দৌড়ে চলে যাচ্ছে পাশের একটা টিনের ছাদের দিকে।

জামান দ্রুত পিস্তলটা কোমর থেকে হাতে নিয়ে ছুটে চললো মিলনের পেছন পেছন।

বেলকনি থেকে দৃশ্যটা দেখে যাচ্ছে জেফরি বেগ।

আশেপাশে অনেকগুলো বাড়িই একতলা, আর অনেকগুলোরই টিনের ছাদ। মিলনের গায়ে একটা টি-শার্ট। ঘরে ঢুকে দ্রুত পরে নিতে ভুল করে নি সে।

জামানও এখন টিনের ছাদে চলে এসেছে। মিলনের থেকে তার দূরত্ব বড়জোর বিশ গজ। অ্যাফেক্টিভ রেঞ্জের মধ্যে আছে টার্গেট।

"গুলি করো!" বেলকনি থেকে চিৎকার করে বললো জেফরি।

জামান সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটা তাক করে ফেললো। কিন্তু জামানের মতো মিলনও জেফরির কথাটা শুনতে পেয়েছে। চট করে সে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে বসলো। জামান আর জেফরি কয়েক মুহূর্তের জন্য বুঝতে পারলো না। এরপরই জামান দৌড়ে চলে গেলে সেখানে যেখান থেকে মিলন লাফ দিয়েছে। একটু উপুড় হয়ে দেখেই পেছন ফিরে জেফরির দিকে তাকালো সে।

"স্যার! নীচে একটা গলি আছে...গলিতে নেমে গেছে!"

কথাটা বলেই জামান আবারো পিস্তলটা কোমরে খুঁজে নিলো। জেফরি কিছু বলার আগেই মিলনের মতো লাফ দিয়ে দৃশ্যপট থেকে উধাও হয়ে গেলো সে। জেফরি কয়েক মুহূর্ত ভেবেই উল্টো দিকে ছুটে গেলো। খোঁড়া পায়ে অনেকটা দৌড়েই চলে এলো মিলনের স্ত্রী যেখানে পড়েছিলো সেখানে। মহিলা এখন উঠে বসেছে। হাত দিয়ে নাক চেপে ধরে

কাঁদছে নিঃশব্দে।

পিস্তল হাতে জেফরিকে ছুটে আসতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকালে তার দিকে। জেফরি অবশ্য থামলো না। সোজা চলে গেলো দরজার দিকে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় টের পেলো পায়ের পাতাটা খুব সম্ভবত মচকে গেছে।

তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। সেই যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে নেমে এলো নীচ তলায়।

বাড়িটার পেছন দিকে যে গলিটা চলে গেছে সেখানে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়ে গেলো সে। কিছু লোক দৃশ্যটা দেখে ভয়ে সরে গেলো। এক মোটামতো মহিলা হেলেদুলে আসছিলো, জেফরির সামনে পড়ে যেতেই কানফাটা চিৎকার দিয়ে উঠলো, এসব কিছু আমলে না নিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে চললো জেফরি বেগ।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ ভেসে এলো।

গুলি!

খুব কাছ থেকেই আওয়াজটা এসেছে, জেফরি নিশ্চিত। পায়ের ব্যাথাটা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে ছুটে গেলো সেখানে।

সে অনেকটাই নিশ্চিত মিলনের কাছে কোনো পিস্তল নেই। তার মানে গুলিটা করেছে জামান।

আতঙ্কগ্রস্ত লোকজনের চিৎকার শুনতে পেলো সে।

এবার আরেকটা গুলির শব্দ।

জেফরির মুখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। জামান আর জেফরি ব্যবহার করে নাইন এমএম ক্যালিবারের পিস্তল। এটার ফায়ারিংয়ের শব্দ জেফরির কাছে বেশ পরিচিত।

কিন্তু শেষ গুলিটার যেরকম শব্দ হয়েছে সেটা তার কাছে একদম অচেনা।

মাই গড!

একটা টিনের ছাদ থেকে মিলন লাফ দিয়ে নেমে পড়লে জামানও লাফিয়ে নেমে পড়ে নীচের সংকীর্ণ একটি গলিতে। তবে মিলনের মতো জামান দক্ষতার সাথে ল্যান্ড করতে পারে নি। প্রায় আট ফুট উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ার কারণে তার ডান পায়ের গোড়ালি কিছুটা মচকে যায়।

পরিস্থিতির কারণেই হোক আর মিলনকে ধরার দৃঢ়প্রতীজ্ঞ মনোভাবের জন্যই হোক, প্রথমে সে কিছুই টের পায় নি। চোখের সামনে মিলনকে দৌড়ে যেতে দেখে সেও তার পিছু নেয়।

গলিটা একদম নিরিবিলি ছিলো।

মিলন আচমকা ডান দিকে মোড় নিলে জামানও তাই করে, আর তখনই বুঝতে পারে তার ডান পায়ের গোড়ালিতে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। চিনচিনে ব্যাথাটা আমলে না নিয়ে মিলনের পিছু পিছু দৌড়াতে থাকে সে। আচমকা, তাকে একেবারে অপ্রস্তুত করে দিয়ে গলির বাম দিকের একটা বৈদ্যুতিক পিলারের আড়ালে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় মিলন।

ঠিক তখনই জিনিসটা জামানের চোখে পড়ে।

লোকটার হাতে পিস্তল।

তার ধারণাই ছিলো না এর কাছে পিস্তল থাকতে পারে। ভড়কে গেলেও জামান দেরি না করে গুলি চালায় তাকে লক্ষ্য করে। গুলিটা অব্যর্থই ছিলো, যদি না অস্ত্রধারী লোকটার সামনে একটা পিলার থাকতো।

জামান যখন দেখলো গুলিটা টার্গেটকে ঘায়েল করতে পারে নি তখনই বুঝে যায় একদম অরক্ষিত অবস্থায় আছে সে। দ্বিতীয় গুলি না চালিয়ে বুদ্ধিমানের মতো গলির বাম দিকের একটা বাড়ির দেয়ালের সাথে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

একটু দেরি হলেই গুলিটা তার শরীরে বিদ্ধ হতো। লক্ষ্যচ্যুত হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। একেবারে নাকের সামনে দিয়ে উত্তপ্ত বুলেটটা যখন চলে যায় সেটার ঝাঁপটা টের পেয়েছিলো জামান।

গুলির শব্দ প্রকম্পিত করে তোলে সংকীর্ণ গলিটা।

মিলন আরেকটা গুলি করার আগেই জামান দেখতে পায় তার ঠিক সামনেই একটা বাড়ির সদর দরজা খোলা। মুহূর্ত দেরি না করে এক লাফে ঢুকে পড়ে সেই দরজার ভেতরে।

মিলন গুলি করতে গিয়েও কেন যে গুলি করে নি জামান সেটা জানে না। তার ধারণা ছিলো একটা সুযোগ সে নেবে। কিন্তু তার ধারনা ভুল প্রমাণ করে আর কোনো গুলি করে নি।

যে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো জামান, সেই বাড়িতে লোকজনের আতঙ্কগ্রস্ত চিৎকার শুনতে পায়। হঠাৎ কাবোর পায়ের শব্দ শুনে সতর্ক হয়ে ওঠে সে।

কেউ দৌড়ে চলে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে জামান দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পায় পিলারের আড়ালে মিলন নেই।

পালিয়েছে।

জামান পিস্তল হাতে বের হয়ে আসে, গলি দিয়ে আবারো দৌড়াতে শুরু করে, তবে এবার তার গতি আগের মতো দ্রুত নয়, কারণ সে জেনে গেছে মিলনের হাতে পিস্তল আছে।

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগোতে শুরু করে জামান।

গলিটা বড়জোর পাঁচ-ছয় ফুট চওড়া। দু'পাশে সারি সারি বাড়িঘর। মাঝেমধ্যেই আরো সংকীর্ণ গলি চলে গেছে ডানে-বায়ে। খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিত। পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে অস্ত্রধারী সামনে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে।

নাকি সটকে পড়েছে?

নিশ্চিত হতে পারে নি জামান।

হঠাৎ তার মনে হয় চারপাশ থেকে এতোক্ষণ ধরে যে চাপা আর্তনাদ আর ভয়ার্ত মানুষের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিলো সেটা যেনো অদৃশ্য কোনো ইশারায় থেমে গেছে। শুধু ভো-ভো শব্দ হচ্ছে তার কানে।

মাথাটা দু'পাশে ঝাঁকিয়ে পরিস্কার করে নেয়। তার সন্দেহ হয়, প্রচণ্ড নাভার্সনেস আর টেনশনের কারণে শ্রবণশক্তিতে ব্যঘাত ঘটছে হয়তো।

ঠিক তখনই টের পায় দম ফুরিয়ে রীতিমতো হাফাচ্ছে। এতোক্ষণ দৌড়াদৌড়ির মধ্যে থাকার কারণে ব্যাপারটা খেয়াল করে নি।

নিজের হৃদস্পন্দনটা কানে শুনতে পায় জামান।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে সে। আস্তে আস্তে হেঁটে এগোতে থাকে সামনের দিকে। পিস্তলটা দু'হাতে ধরে নাক বরাবর তুলে তাক করে রাখে। একটু মুভমেন্ট নজরে এলেই গুলি চালাবে।

কিন্তু অস্ত্রধারী না হয়ে যদি সাধারণ কোনো লোকজন হয়ে থাকে?

কথাটা মনে পড়তেই নিজেকে আরো বেশি অসহায় মনে করে সে।

একটু একটু করে এগোতে এগোতে গলির শেষ মাথায় এসে পড়ে। একটা চওড়া রাস্তা চলে গেছে দুদিক দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় নেমে পড়ে নি। অস্ত্রধারী যদি গলির শেষ মাথায় এসে ঘাপটি মেরে থাকে?

কিন্তু কোন্ দিকে?

ডানে? বায়ে? সে জানে না।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

দ্রুত বাম দিকে পিস্তল তাক করে ডান দিকে পিঠ দিয়ে আড়াআড়িভাবে গলি থেকে বেরিয়ে আসে সে।

কেউ নেই!

বড় রাস্তাটা বাম দিক দিয়ে অনেক দূর চলে গেছে। কিন্তু অস্ত্রধারীর টিকিটাও দেখা যাচ্ছে না।

ডান দিকে, তার পেছনে কিছু একটা নড়ে উঠতেই সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে সে বুঝে যায় মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে।

হায় আল্লাহ্!

এক ঝটকায় ডান দিকে ঘোরার চেষ্টা করতেই মাথার পেছনে শক্ত কিছু এসে আঘাত হানে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা খপ করে ধরে ফেলে একটা শক্ত হাত। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার ডান হাটুতে পেছন থেকে সজোরে লাথি মারা হলে সে বসে পড়ে। হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে পড়ে যায়।

আরেকটা আঘাত নেমে আসে তার উপর।

কিডনি বরাবর একটা ঘুষি!

সঙ্গে সঙ্গে মাথার তালুর চুল খপ করে ধরে একটা হেচকা টান।

পুরো ব্যাপারটা ঘটে মাত্র দু-তিন সেকেন্ডের মধ্যে। জামান কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখতে পায় রাস্তায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার দিকে ঝুঁকে আছে সুমন নামে পরিচয় দেয়া মিলন। পিস্তল তাক করে রেখেছে সে। মুখে ক্রুড় হাসি। লোকটার নার্ভ একদম স্বাভাবিক।

"একদম নড়বি না!" ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে কথাটা। জামান টের পায় তার হৃদস্পন্দন থেমে গেছে। লোকটার ভাবভঙ্গি খুবই বিপজ্জনক।

গুলির আওয়াজটা শোনার আগে জামানের শুধু মনে হয়, এই লোকটাই সম্ভবত হাসানের খুনি। এখন সেও হাসনের মতো ভাগ্য বরণ করতে যাচ্ছে।

তারপরই কান ফাঁটা শব্দ।

.

গুলির শব্দটা জেফরি বেগকে উদভ্রান্ত করে ফেলেছে। সে জানে এটা জামানের

পিস্তল থেকে ছোঁড়া হয় নি।

তাহলে?

এ নিয়ে তার মনে কোনো দ্বিধা নেই। মিলন নামের লোকটাই ফায়ার করেছে। জামানের যদি খারাপ কিছু না হয়ে থাকে তাহলে তো পাল্টা গুলির আওয়াজ আসতো! বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়তে জামান।

এক পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যতোটা দ্রুত দৌড়ানো সম্ভব দৌড়াচ্ছে সে। সমস্যা হলো ঠিক কোন্ গলিতে ঢুকবে বুঝতে পারছে না। এর আগে ঢাকা শহরের এই জায়গায় কখনও আসে নি। এখানকার পথঘাট তার একদম অচেনা। তবে পুরনো ঢাকায় মানুষ হবার কারণে অলিগলির ব্যাপারে তার ভালো ধারণাই আছে। কোটা কানাগলি আর কোন গলিটা বড় রাস্তার সাথে গিয়ে মিশেছে সেটা গলির ধরণ দেখলেই বুঝতে পারে।

তার হাতে পিস্তল দেখে গলির আশেপাশে কিছু বাড়ি থেকে ভয়ার্ত মানুষ উঁকিঝুঁকি মেরে দেখছে। ব্যাপারটা তার নজর এড়ালো না।

হাসানের বাড়ি থেকে বের হয়ে কিছুটা এগোবার পরই ডান দিকে চলে গেছে গলিটা। তারপর আবারো অল্প একটু ডানে গিয়ে সোজা চলে গেছে উত্তর দিকে। সে জানে, মিলন উত্তর দিকের একটা গলিতেই লাফ দিয়েছে।

সোজা কিছুটা পথ এগিয়ে যাবার পর আরেকটা গুলির শব্দ প্রকম্পিত করলো চারপাশ। সংকীর্ণ গলিতে সেটা আরো ভয়াবহ শোনালো।

এটাও জামানের নয়! সে একদম নিশ্চিত। কারণ গুলির শব্দের পর পরই জামানের আর্তনাদটা তার কানে বজ্রপাতের মতো আঘাত করলো।

মৃত্যু যন্ত্রণার আর্তনাদ!

জামান। তার ভেতরের কণ্ঠস্বরটা চিৎকার করে বললো। মুহূর্তেই এক পাশবিক শক্তি এসে ভর করলো তার মধ্যে। বুঝতে পারলো আওয়াজটা কোত্থেকে এসেছে।

সামনের ডান দিকে মোড় নিয়েছে গলিটা। সেখানে ছুটে গেলো সে। একটু এগোতেই দেখতে পেলো মিলন নামের লোকটি পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা গলির মোড়ে। কিন্তু তারচেয়েও ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো মিলনের পায়ের সামনে তার সহকারী জামান পড়ে আছে।

জামান গুলিবিদ্ধ!

মিলন খেয়ালই করছে না জেফরিকে। তার সমস্ত মনোযোগ জামানের দিকে। জামানকে কিছু একটা বলছে সে। ছেলেটা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতমাচ্ছে।

দু'হাত তুলে বাধা দিতে চাইছে।

কিংবা প্রাণ ভিক্ষা!

যদিও মিলনের হাতে পিস্তলটা জামানের দিকে তাক করা নেই, তারপরও দূর থেকে জেফরি বুঝতে পারছে লোকটার ভাবভঙ্গি খুবই বিপজ্জনক।

প্রায় নিঃশব্দে কয়েক পা এগিয়ে গেলো জেফরি বেগ। তার হাতের পিস্তলটা মিলনের দিকে তাক করা। খুব সম্ভব অ্যাফেক্টিভ রেঞ্জের ভেতরে চলে এসেছে এখন।

"ফ্রিজ!" ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গর্জে উঠলো জেফরি বেগ।

মিলন চমকে তার দিকে তাকাতেই পিস্তল ধরা হাতটা তোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু জেফরি সতর্ক ছিলো। "একদম নড়বে না!" আবারো গর্জে উঠলো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর।

মিলন বরফের মতো জমে গেলো। লোকটার দুচোখে যেনো আগুন। জেফরি জানে, যেকোনো মুহূর্তে মিলন তাকে গুলি করার চেষ্টা করবে। সতর্ক হয়ে উঠলো সে। মিলনকে কোনো সুযোগ দেবে না। একটু নড়াচড়া করলেই সোজা গুলি করে দেবে। একটা নয়, অনেকগুলো। যতোক্ষণ না তার দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

মিলনও বুঝতে পারছে একটু নড়লেই জেফরি তাকে গুলি করে দেবে। সে আস্তে করে

বাম হাতটা তুলে জেফরিকে আশ্বস্ত করলো।

“পিস্তলটা ফেলে দাও!” ধমকের সুরে বললো জেফরি। “কোনো চালাকি করবে না!”

মিলন আবারো বাম হাতের তালু উঁচিয়ে জেফরিকে আশ্বস্ত করলো। একটু ঝুঁকে নীচু হয়ে পিস্তলটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে যাবে অমনি একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে থমকে গেলো সে। কিছু বুঝে উঠতে পারলো না। জেফরির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো তার চোখমুখ কুচকে গেছে। সেই চোখের ভাষা পড়তে বিন্দুমাত্র কষ্ট হলো না মিলনের। জেফরির দৃষ্টি অনুসরণ করে একটু পেছনে তাকালো।

একদল যুবক তার দিকে এগিয়ে আসছে!

তাদের সবার হাতে লাঠি। চোখে কালো চশমা!

একটা ক্রুড় হাসি ফুটে উঠলো মিলনের ঠোঁটে।

জেফরি বেগের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। বুঝতে পারলো এমন একটি অবস্থায় পড়ে গেছে যেখানে সে খুবই অসহায়।

কিন্তু তারচেয়েও বড় বিপদ হলো, তার সামনে থাকা মিলন নামের ভয়ঙ্কর লোকটি সেটা বুঝে গেছে। পিস্তলের মুখেও তার ঠোঁটে বাঁকা হাসির আভাস দেখতে পাচ্ছে সে।

মিলনের পেছনেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে লোকগুলো।

তাদের সবার হাতে লাঠি। চোখে কালো চশমা। সবাই যুবক { লাঠিগুলো একসাথে রাস্তার কংক্রিটে ঠকঠক শব্দ করছে। শব্দটা জেফরির কানে হাতুড়ি পেটার মতো শোনাচ্ছে এখন।

এরা এখানে কেন? এতোগুলো একসাথে!

মিলনের দিকে তাকালো সে। লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার পিস্তল ধরা হাতের দিকে তাকালো জেফরি। সেই হাতটা উঠে আসছে ধীরে ধীরে।

জেফরি অসহায়। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো কেবল। কিছুই করতে পারলো না।

চশমা পরা লাঠি হাতে লোকগুলো মিলনের ঠিক পেছনে চলে এসেছে। এখন। জেফরি জানে সে গুলি করতে পারবে না। কখনই পারবে না।

কিন্তু মিলন?

এখনও তার ঠোঁটে বাঁকা হাসির আভাস লেগে রয়েছে। আস্তে করে পিস্তল ধরা হাতটা জেফরির দিকে তাক করে চোখ টিপে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে প্রকম্পিত হলো সংকীর্ণ রাস্তাটি।

জেফরির শুধু মনে হলো কেউ তার বুকে সজোরে হাতুড়ি চালিয়েছে। ঠিক বুকের বাম দিকে। যেখানে হৃদপিণ্ড থাকে!

গুলির আঘাতে কয়েক পা পেছনে টলে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো কংক্রিটের রাস্তার উপর।

আমি গুলি খেয়েছি।

টের পেলো দম বন্ধ হয়ে আসছে। পিস্তলটা আর তার হাতে নেই। কোথাও ছিঠকে পড়ে গেছে। খুকখুক করে একটু কেশে উঠলো, কিন্তু বুঝতে পারলো না মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়েছে কিনা।

সংকীর্ণ রাস্তার দু'পাশে থাকা সারি সারি চার-পাঁচ তলার বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ দেখতে পেলো। সেই আকাশে নিঃসঙ্গ এক চিল উড়ে বেড়াচ্ছে আয়েশি ভঙ্গিতে।

তার কানে লোকজনের কোলাহলের শব্দটা এলো। চিৎকার চেঁচামেচি আর ছোটোছুটির আওয়াজ। তবে সব আওয়াজ ছাপিয়ে যাচ্ছে একটা কণ্ঠ।

“স্যার!...স্যার!...”

প্রাণপণে, জীবনের শেষ শক্তি দিয়ে জামান চিৎকার করে যাচ্ছে।

জেফরি জানে একটু পরই এই শব্দটা আর শুনতে পাবে না। উপরের আকাশটাও আর

দেখতে পাবে না। লোকজনের যে হৈহল্লা হচ্ছে সেটাও নিঃশব্দ হয়ে উঠবে।

তারপর সব কিছু অন্ধকার!

কিন্তু সব কিছু অন্ধকার হবার আগে জেফরি বেগ চমৎকার একটি দৃশ্য দেখতে পেলো।

বাম দিকের একটি চার-পাঁচ তলার উপরে, বারান্দার রেলিং থেকে অল্পবয়সী এক ছেলে নিষ্পাপ আর ভীত চোখে তার দিকে চেয়ে আছে।

ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে ছুটে যাচ্ছে হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদের গাড়ি। খবরটা শোনামাত্র অস্থির হয়ে পড়েছে ভদ্রলোক। রমিজ লস্কর যদিও জানিয়েছে জেফরির কিছু হয় নি কিন্তু তার মন বলছে খারাপ একটা ঘটনা ঘটে গেছে। হয়তো বেশি মর্মান্তিক কিছু, আর তাই দুঃসংবাদটি তাকে এখনও জানাচ্ছে না।

রমিজ শুধু বলেছে কিছুক্ষণ আগে জেফরি আর জামান নিহত হাসানের বাড়ি থেকে ফেরার পথে অজ্ঞাতপরিচয়ের এক দুষ্কৃতিকারীর হামলার শিকার হয়েছে। তারা দুজনেই এখন মেডিকেলের ইমার্জেন্সিতে রয়েছে।

তেমন কিছু না হলে মেডিকেলের ইমার্জেন্সিতে নেয়া হবে কেন?

মহাপরিচালকের এ কথায় রমিজ লস্কর আমতা আমতা করে বলেছে, জামান গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

মাই গড! আর জেফরির?

রমিজ বলেছে তার তেমন কিছু হয় নি। কিন্তু মহাপরিচালকের মন বলছে তার কাছ থেকে বড় একটা দুঃসংবাদ লুকানোর চেষ্টা করছে তার অধীনস্তরা। সঙ্গে সঙ্গে জেফরি বেগের সেলফোনে কল করে সে, কিন্তু সেটা বন্ধ। জেফরির চিন্তায় রীতিমতো অস্থির হয়ে ওঠে ভদ্রলোক।

রমিজকে নাকি জেফরি নিজে ফোন করে জানিয়েছে এই খবরটা, তবে সেই ফোনটা ছিলো স্থানীয় থানার এক এসআইয়ের।

জেফরির যদি কিছু না হয়ে থাকে তাহলে তার ফোনটা বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কেন?

রমিজ লস্কর এর কোনো সদুত্তর দিতে পারে নি। ছেলেটার আচার আচরণ বেশ সন্দেহজনক ঠেকেছে ফারুক আহমেদের কাছে, সেজন্যে নিজেই ছুটে যাচ্ছে হাসপাতালে।

রমিজ বার বার বলেছে, তার যাবার দরকার নেই, হোমিসাইড থেকে এরইমধ্যে দু'তিনজন চলে গেছে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমে। কিন্তু ফারুক আহমেদ কোনো কথাই শোনে নি।

গাড়িতে ওঠার পর রমিজ যেটুকু বলেছে তাতে মনে হচ্ছে পরিস্থিতি খুবই সিরিয়াস। বিশ্বাসই হতে চাইছে না তার দু'দু'জন কর্মকর্তা তদন্তের কাজ করতে গিয়ে এভাবে...

"স্যার?"

ফারুক আহমেদ আর ভাবতে পারলো না। তার গাড়িটা কখন হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমের সামনে এসে থেমে গেছে বুঝতে পারে নি। পাশে বসা রমিজ লস্কর তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে ভাবনায় ছেদ পড়লো।

ইমার্জেন্সি রুমের দিকে যাবার সময় দেখতে পেলো হোমিসাইডের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, মহাপরিচালককে আসতে দেখে দ্রুত সালাম দিয়ে সরে দাঁড়ালো সবাই। ফারুক আহমেদ কারো সাথে কোনো কথা না বলে রমিজ লস্করকে নিয়ে চুপচাপ ঢুকে পড়লো সেই রুমে।

একজন ডাক্তার বসে আছে। বয়স বড়জোর ত্রিশের মতো হবে। ফারুক আহমেদকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেলো।

"হোমিসাইডের মহাপরিচালক," ডাক্তারের সাথে তার বসকে পরিচয় করিয়ে দিলো রমিজ লস্কর।

"কি অবস্থা, ডাক্তার?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলো ফারুক আহমেদ।

"অপারেশন চলছে, চিন্তার কিছু নেই...আপনি বসুন, চেয়ার দেখিয়ে বললো ডাক্তার।

"গুলি লেগেছে কোথায়?"

"পায়ে," বললো ডাক্তার। "তবে মাথাসহ বেশ কিছু জায়গায় মারাত্মক আঘাতও আছে।"

"সত্যিকারের অবস্থাটা বলুন, ডাক্তার?" ফারুক আহমেদ উদ্বিগ্ন বাবার মতো জানতে

চাইলো।

"স্যার, আপনি?"

ফারুক আহমেদ চমকে ঘুরে তাকালো।

"তুমি!" তারপরই জড়িয়ে ধরলো জেফরি বেগকে।

জেফরি কিছুটা অবাক হলো। তার বস সব সময় ভারিক্কি সাজার চেষ্টা করে, কিন্তু এখন যেনো সেসবের বালাই নেই।

জেফরিকে ছেড়ে দিয়ে বললো ফারুক আহমেদ, "তোমার কিছু হয় নি?!" বিস্মিত ভাবটা এখনও কাটে নি তার।

"না, স্যার, তবে আমারও গুলি লেগেছিলো"

"কি?" জেফরি কথাটা শেষ করার আগেই বললো হোমিসাইডের মহাপরিচালক। "কোথায়?"

"বুকে-"

"হোয়াট!" ফারুক আহমেদ যারপরনাই বিস্মিত। "তাহলে তুমি...?!

জেফরি বেগ গুলিবিদ্ধ হবার কিছুক্ষণ পরই টের পায় তার তেমন কিছু হয় নি। শুধু বাম পাঁজরে তীব্র ব্যাথা। হাত পা নড়াতে পারছে, দৃষ্টিশক্তিও ঠিকঠাক আছে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকে তার কাছে। আস্তে করে বুকে হাত দিয়ে বুঝতে পারে ঘটনাটা।

তার জ্যাকেটের ভেতরের বাম পকেটে ছোট্ট একটা ডায়রি রাখা ছিলো। নিহত হাসানের স্ত্রী মলির কাছ থেকে এটা নিয়েছিলো সে। আর সেই ছোট্ট ডায়রিটাই বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে। মিলন নামের ভয়ঙ্কর লোকটার গুলি তার বুকে বিদ্ধ হবার আগে বিদ্ধ হয়েছে সেই ডায়রিটায়।

মিলন নামের লোকটাকে বাগে পেয়েও সে কিছুই করতে পারে নি। তার হাতে পিস্তল ছিলো, আর মিলনও অনেকটা হাল ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিলো কিন্তু তখনই একদল অন্ধ চলে আসে মিলনের পেছনে। কাছেই একটা অন্ধদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে তারা দল বেধে ফিরছিলো। মিলন বুঝে যায়, জেফরি ইচ্ছে করলেই তাকে আর গুলি করতে পারবে না। কতোগুলো নিরীহ অন্ধ ছেলে তার জন্য অনেকটা মানবঢাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সে। গুলি চালিয়ে বসে জেফরিকে লক্ষ্য করে। একটা গুলি করেই সে সটকে পড়ে ঘটনাস্থল থেকে।

উঠে দাঁড়ানোর আগেই জেফরি দেখতে পায় তার সামনে ছুটে এসেছে একদল পুলিশ।

স্থানীয় থানার একটি টহলদল আশেপাশেই ছিলো, তারা গোলাগুলির শব্দ শুনে দ্রুত চলে আসে ঘটনাস্থলে।

পুলিশের গাড়িতে করেই পায়ে গুলিবিদ্ধ জামানকে নিয়ে হাসপাতালে চলে আসে জেফরি বেগ। পকেট থেকে মোবাইলফোনটা বের করে হোমিসাইডে কল করতে গেলে দেখতে পায় সেলফোনটা ভেঙে গেছে। ওটা দিয়ে আর কাজ হবে না। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ার কারণে এমনটি হয়েছে। অগত্যা টহলদলের এক এসআইয়ের ফোন থেকে রমিজ লস্করকে কল করে সংক্ষেপে ঘটনাটা জানায়, সেইসাথে এও বলে দেয়, ফারুক আহমেদকে যেনো কিছু না বলে। খামোখা টেনশনে পড়ে যাবে তাদের বস। এমনিতেই তার প্রেসারের অবস্থা ভালো না। কিন্তু রমিজ তার কথা রাখে নি।

ফারুক আহমেদ সব শুনে যারপরনাই বিস্মিত হলেও দারুণ খুশি হলো। তবে জামানের অবস্থা কেমন, তার কি অবস্থা, এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লে জেফরি তাকে আশ্বস্ত করে জানালো, জামানের অবস্থা ভালো। ডান পায়ের পেশিতে একটা গুলি লেগেছে। ডাক্তাররা ইতিমধ্যেই এক্সরে করে দেখেছে, গুলিটা হাঁড়ে লাগে নি।

এ যাত্রায় জামান অল্পের জন্য বেঁচে গেছে বলা যায়। তবে বেডরেস্টে থাকতে হবে বেশ কয়েক দিন। তার হাটু মচকে গেছে। মাথার পেছনেও আঘাত পেয়েছে।

অধ্যায় ২৫

স্থানীয় থানার পুলিশ সিজ করে ফেলেছে মিলনের পরিত্যাক্ত ফ্ল্যাটটি। খুব দ্রুত, বলতে গেলে চোখের নিমেষেই ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা নিজেদের আসবাব আর ব্যবহার্য জিনিসপত্র ফেলেই পালিয়ে গেছে।

জামানের অপারেশন শেষ হবার পরই হাসপাতাল থেকে সোজা মিলনের ফ্ল্যাটে চলে এলো জেফরি বেগ। জামানকে তিন-চারদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। লোকাল অ্যানেস্থিয়া ব্যবহার করার কারণে ছেলেটার জ্ঞান ছিলো। অপারেশন শেষে জেফরি আর হোমিসাইডের মহাপরিচালকের সাথে তার কথাও হয়েছে। জেফরিকে অক্ষত দেখে ছেলেটার চোখেমুখে যে আনন্দ দেখেছে সেটা কোনো দিন ভুলবার মতো নয়।

জামান বলেছে, মিলন তার পায়ে গুলি করার পর একটা কথা জানতে চেয়েছিলো। পুলিশ কেন হাসানের খুনের জন্য তাকে খুজছে? জামানকে বার বার তাড়া দিচ্ছিলো মিলন, কোন তথ্যের উপর ভিত্তি করে পুলিশ তার পেছনে লেগেছে। জামান পিস্তলের মুখে বলেছে, হাসান সাহেবের সাথে তার সখ্যতা ছিলো, সেজন্যে তারা মনে করছে হাসান সাহেবের ব্যাপারে সে হয়তো কিছু। তথ্য দিতে পারবে।

জামান বলেছে, কথাটা শুনে মিলন বিশ্বাস করতে পারে নি। জামান তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জীবনের ভয়ে মিলনকে বার বার এ কথা বললেও মনে হয় না ওই সন্ত্রাসী তার কথা বিশ্বাস করেছে।

মিলনের দরজার সামনে দু'জন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে এখন। দরজায় তালা মারা ছিলো, পুলিশই সেই তালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে। পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হাসানের স্ত্রী আর ছোটো ভাই জানিয়েছে, জেফরিরা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই মিলনের ঘর থেকে তার স্ত্রী তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে যায় একটা লাগেজ নিয়ে। মহিলাকে একাই বের হতে দেখেছে, তার বোন অর্থাৎ মিলনের শ্যালিকাকে দেখে নি। যদিও মেয়েটা তাদের সাথেই থাকতো।

শ্যালিকা!

হাসানের স্ত্রী মলি যা বলেছে তাতে মনে হচ্ছে, মিলন নামের লোকটা তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে শ্যালিকা পরিচয় দিতো ফ্ল্যাটের সবার কাছে। লোকটার অনেক কিছুই রহস্যময়, তারচেয়েও বড় কথা, সে একজন পেশাদার সন্ত্রাসী। সম্ভবত হাসানের হন্তারক। কিন্তু হাসানকে কি কারণে সেন্ট অগাস্টিনে গিয়ে খুন করলো সে?

পাশের ফ্ল্যাটের একজন, যার সাথে প্রায়ই ছাদে বসে সিগারেট খাওয়া হতো, তাকে খুন করার জন্য এতো নাটক কেন করা হলো?

মাথা থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে কাজে মন দিলো জেফরি বেগ। এ নিয়ে পরে ধীরেসুস্থে চিন্তা করা যাবে।

স্থানীয় থানার এক এসআই'র সাহায্যে মিলনের পুরো ঘরটা তল্লাশি করা হলো। তেমন কিছুই পাওয়া গেলো না। আসবাবপত্র আর ব্যবহার্য টিভি-ফ্রীজ এসব বাদে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। হোমিসাইড থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট টিমকে আসতে বলেছে সে। এই ঘরে মিলনের আঙুলের ছাপ রয়েছে, জেফরি এ ব্যাপারে নিশ্চিত। মিলনের পরিচয় জানার জন্য আঙুলের ছাপ খুব গুরুত্বপূর্ন।

মোবাইল ফোন, পাসপোর্ট, কাগজপত্র কোনো কিছুই নেই। সব নিয়ে সটকে পড়েছে মিলনের স্ত্রী।

জেফরিকে গুলি করার পরই সে হয়তো পালিয়ে গিয়ে তার স্ত্রীদের সাথে যোগাযোগ করে। তৎক্ষণাত বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেয়। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর কিছু কাপচোপড় নিয়ে দ্রুত সটকে পড়ে তারা।

স্থানীয় থানার এসআই ছেলেটা, বয়স বড়জোর ছাব্বিশ-সাতাশ হবে, বেশ উৎসাহ নিয়ে জেফরির সাথে কাজ করে যাচ্ছে। দু'জন কনস্টেবল নিয়ে তন্ন তন্ন করে ঘরগুলো তল্লাশি করছে সে।

ড্রইংরুমের সোফায় বসে আছে জেফরি। তার মধ্যে জেঁকে বসেছে এক ধরণের ঔদাসিন্য। মৃত্যুর খুব কাছ থেকে ফিরে আসার পর একটু বৈরাগ্য ভাব পেয়ে বসেছে তাকে। বলতে গেলে, এই যে এখনও বেঁচে আছে সেটা নেহায়েতই ভাগ্যক্রমে। হাসানের ডায়রিটা যদি জ্যাকেটের বুক পকেটে না রাখতে, আর গুলিটাও যদি ঠিক সেখানে বিদ্ধ না হতো তাহলে আজ এখানে বসে থাকা সম্ভব হতো না।

জীবন আর মৃত্যুর মাঝে একচুল ব্যবধান নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে। স্বপ্ন দেখে। একটু পর কি করবে, আগামীকাল কি করবে, কিংবা ভবিষ্যতে কি করবে সবই সে ভাবে মৃত্যু আর জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

"স্যার?"

এসআই ছেলেটার ডাকে সম্বিত ফিরে পেলো সে। মুখ তুলে তাকালো।

একটা প্লাস্টিকের কার্ড বাড়িয়ে দিলো ছেলেটা। "এটা ড্রয়ারের কাপড়চোপরের মধ্যে পেয়েছি।"

জিনিসটা হাতে তুলে নিলো জেফরি বেগ। মিলনের প্রথম স্ত্রীর ন্যাশনাল আইডিকার্ড। দারুণ!

একটা কিছু তাহলে ফেলে রেখে গেছে। জেফরি জানে এ ঘরের বাসিন্দা খুব তাড়াহুড়া করে চলে গেছে। সুতরাং অনেক কিছুই যে ফেলে গেছে সে ব্যাপারে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

"আরেকটু খুঁজে দেখো, আমার ধারণা আরো কিছু পাওয়া যাবে," এসআইকে ইন্সট্রাকশন দিলো সে।

এসআই ছেলেটা দ্বিগুন উৎসাহ নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লো আবার।

আইডিকার্ডটা দেখলো জেফরি : আম্বিয়া খাতুন, বয়স ত্রিশ, ঠিকানা ১৪৭, দীননাথ সেন রোড, গেন্ডারিয়া। স্বামী, ইসহাক আলী।

মহিলার ছবিটা বাজেভাবে তোলা। বেশিরভাগ আইডিকার্ডের ছবির এমন করুণ হাল। ভালোমতো চেহারা বোঝা যায় না। তবে সমস্যা নেই। জেফরি এই মহিলাকে সামনাসামনি দেখেছে। বেশ ভালোমতোই দেখেছে। কথাও বলেছে।

তারচেয়েও বড় কথা সন্দেহভাজন মিলনকেও সে খুব কাছ থেকে দেখেছে। তার চেহারাটা মনের মধ্যে গেঁথে আছে এখন। হোমিসাইডের পোর্ট্রেট আর্টিস্টের সাথে একটা সিটিং দিতে হবে, ভাবলো সে।

তবে এই আইডিকার্ডটাও কাজে দেবে। মিলনের প্রথম স্ত্রীর অনেক কিছুই জানতে পারবে এর সাহায্যে। হয়তো মিলনের আইডিকার্ডের নাম্বারটাও জানা যাবে। সাধারণত পরিবারের লোকজনের কার্ড-নাম্বার কাছাকাছি সিরিয়ালেই থাকে। এই কার্ডটার আশেপাশে কিছু নাম্বারের কার্ড চেক করে দেখলেই ভালো ফল পাওয়া যাবে, আর এই কাজটা করতে তার সময় লাগবে খুবই কম।

তবে তার ধারণা অন্য একটা জিনিস তাকে অনেক বেশি ক্লু দিতে পারবে।

নিহত হাসানের ডায়রিটা!

অধ্যায় ২৬

সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যাল অরুণ রোজারিও গতকাল রাতে ঘুমান নি। এমনিতেও হাসানের খুনের পর থেকে তার চোখে ঘুম নেই। রীতিমতো স্লিপিং পিল খেয়ে জোর করে দুচোখের পাতা এক করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিন্তু কাল রাতে তিনটা পিল খাওয়ার পরও কোনো কাজ হয় নি। চার নাম্বার পিলটা খাওয়ার কথা ভাবলেও সেটা আর করেন নি শেষ পর্যন্ত।

তুর্যের কথা জেনে গেছে জেফরি!

সারা রাত ভেবে গেছেন এই ব্যাপারটা নিয়ে। হয়তো ঘটনাচক্রে নামটা চলে এসেছে। মনে হয় না ছেলেটাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে জেফরি। এই ভাবনার পরক্ষণেই তার মাথায় চলে আসে অন্য একটি ভাবনা।

জেফরি সব জেনে যায় নি তো?

না। অসম্ভব। স্কুলের হাতেগোনা কয়েকজন জানে। তাদের সবার সাথে জেফরির কথা হয় নি। বিশ্বজিৎ সান্যালের সাথে তার কথা হলেও অরুণ রোজারিও নিশ্চিত, বাবু এই ঘটনাটি জেফরিকে বলে নি।

হয়তো জেফরি এটা জানে না। নিছক ঘটনাচক্রে তুর্যের নামটা চলে এসেছে।

নাকি জেফরি সব জেনে না জানার ভান করছে?

মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইলেন। তাকে এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজে মন দিতে হবে। অনেক বড় একটা ঝামেলায় পড়ে গেছেন, যদিও এসবের সাথে তার কোনোই লেনদেন নেই কিন্তু ঘটনার জালে তিনি জড়িয়ে পড়ছেন ধীরে ধীরে।

ডেস্কের পেপারওয়েটটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন, এমন সময় তার ল্যান্ডফোনটা বেজে উঠলো। কে ফোন করেছে তিনি জানেন না, তবে কয়েক দিন ধরে এই ল্যান্ডফোনটা বেজে উঠলেই তার মধ্যে ধুকফুকানি শুরু হয়ে যায়।

পাঁচবার রিং হবার পর রিসিভারটা তুলে নিলেন অরুণ রোজারিও।

"হ্যালো?" আস্তে করে বললেন তিনি। ওপাশ থেকে যে কণ্ঠটা শুনতে পেলেন সেটা চিনতে একটুও বেগ পেতে হলো না। খুবই কর্তৃত্বপূর্ণ একটি কণ্ঠ। কয়েক দিন ধরেই তাকে নানা রকম হুকুম দিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অরুণ রোজারিওর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো।

রাতে বাড়ি ফিরে হাসানের ডায়রিটা প্রথম থেকে কিছু পৃষ্ঠা পড়েছে জেফরি বেগ, কিছু পায় নি। সাদামাটা একজন ক্লার্কের জীবন যেরকমটি হবার কথা সেরকমই। বাড়ি থেকে অফিস, অফিস থেকে বাড়ি। অফিসের ব্যাপারে খুব কম কথাই আছে। তবে সবচাইতে বেশি যার কথা আছে সে হাসানের তরুণী স্ত্রী। অবশ্য খুব বেশি পড়তে পারে নি, কারণ গতকাল সারাটা দিন তার মুড অফ ছিলো।

মিলনের বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র রিকভার করে অফিসে ফিরে আসে সে। মিলনের প্রথম স্ত্রী আম্বিয়া খাতুনের ন্যাশনাল আইডি নাম্বারের আশেপাশের আইডি নাম্বারগুলো চেক করে দেখেছে, কিছু নেই। স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে বিক্রমপুরের যে গ্রামের ঠিকানা দেয়া আছে খুব সম্ভবত সেখানকার কিছু নারী-পুরুষের আইডি ওগুলো।

হয়তো আম্বিয়া খাতুনের আত্মীয়স্বজন হবে। তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও অনেক কিছু জানা যেতো। সমস্যা একটাই, ওইসব লোকজন এখন কোথায় আছে কে জানে। তারপরও রমিজ লস্করকে বলে দিয়েছে, ওইসব লোকজনকে যেনো স্থানীয় পুলিশ খুঁজে বের করে। তাদের কাছ থেকে কিছু তথ্য জেনে নেয়।

জেফরির মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো এ সময়।

রেবা।

গতকালকের ঘটনা রেবাকে বলে নি। এমনিতেই মেয়েটা তার বাবাকে নিয়ে ভীষণ সমস্যার মধ্যে আছে, তার উপর জেফরির ঐ ঘটনার কথা শুনলে যারপরনাই দুশ্চিন্তায় পড়ে

যাবে।

“হ্যালো...কি খবর?”

“তুমি আমাকে কালকের ঘটনাটা কেন বলো নি?” রীতিমতো জবাবদিহি চাইবার সুরে বললো রেবা।

জেফরি বুঝতে পারলো না কী বলবে। রেবা এটা জানলো কী করে!

“গতকাল মানে—”

“মিথ্যে বলার চেষ্টা কোরো না, প্লিজ...” একটু চুপ থাকলো রেবা।

“না, মানে, তুমি জানলে কিভাবে?” যতোদূর সম্ভব নরমকণ্ঠে বললো সে।

“আমি কোত্থেকে জানলাম সেটা কি গুরুত্বপূর্ণ?”

“না, তা না...” আর কিছু বলতে পারলো না।

“জামান এখন হাসপাতালে, সে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে, তুমি নিজেও নাকি আহত-”

জামান মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে! বলে কি! “আরে শোনো, আমার কথা। এসব ফালতু গল্প কোত্থেকে জেনেছো?”

“আগে বলো, ঘটনা সত্যি কিনা?”

“পুরোপুরি সত্যি না...”

“তাহলে কতোটুকু সত্যি?”

“জামান মোটেও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে না। আর আমি একদম ঠিক আছি।”

“তাহলে পত্রিকায় কি ভুল লিখেছে?” রেগেমেগে বললো রেবা।

পত্রিকা! অসম্ভব। প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলোতে এই ব্যাপারে কোনো নিউজ ছাপা হয় নি। জেফরি নিশ্চিত। তার অফিসে কমপক্ষে আট-নয়টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়।

“কোন পত্রিকায়?” সন্দেহের সুরে বললো।

“আসমানজমিন।” কাটাকাটাভাবে বললো রেবা।

ওহ। একটা পত্রিকাই বটে, মনে মনে বললো জেফরি। এই সস্তা ট্যাবলয়েড পত্রিকাটি অবশ্য তার অফিসে রাখা হয় না। রাখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না সে। ফালতু সব খবর ছাপা হয়। “তুমি তো জানোই, ওরা সব সময় উল্টাপাল্টা কথা লেখে...”

“তুমি বলতে চাচ্ছো, কিছুই ঘটে নি?...একটু আগে না বললে পুরোপুরি সত্যি বলে নি? তার মানে নিশ্চয় কিছুটা সত্যতা আছে?” রেবার কণ্ঠে ক্রোধ।

একটু চুপ করে থাকলে সে। তারপর বললো, “তুমি কি একটু শান্ত হয়ে আমার কথা শুনবে?”

ওপাশ থেকে কোনো সাড়া শব্দ নেই।

“প্লিজ?”

“আচ্ছা বলো।”

“আসলে ঘটনা তেমন কিছু না,” একটু মিথ্যে করেই বললো জেফরি। রেবাকে দুশ্চিন্তায় রাখতে চায় না।

“তেমন কিছু না?!” রেবার বিস্ময়মাখা জিজ্ঞাসা।

“মানে পত্রিকাগুলো যেরকম বলেছে সেরকম কিছু না, একটু থেমে আবার বললো সে, “আমি আর জামান একটা কেসের তদন্তে গেছিলাম...আচমকা সেখানে একজন সন্দেহভাজনকে পেয়ে গেলে সে পালানোর চেষ্টা করে...জামান তার পিছু ধাওয়া করলে তাদের মধ্যে গোলাগুলি হয়। জামানের পায়ে গুলি লেগেছে। তবে ভয়ের কিছু নেই। সে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে না। ইচ্ছে করলে তুমি জামানকে গিয়ে দেখে আসতে পারো... এখনও হাসপাতালে আছে সে।” এক নিঃশ্বাসে সত্যের সাথে কিছু মিথ্যে মিশিয়ে বলে গেলো জেফরি।

“তোমার কিছু হয় নি?” রেবার সন্দেহগ্রস্ত প্রশ্ন।

“না,” মিথ্যেটা বলতে জেফরির একটুও খারাপ লাগলো না। ভালো করেই জানে সত্য

বললে রেবা কীরকম টেনশন করবে। এটা হলো নির্দোষ মিথ্যে। হোয়াইট লাই।

“সত্যি?”

“না, পুরোপুরি সত্যি না।

“মানে?”

“বুকে একটু আঘাত পেয়েছি।”

“কিভাবে? কিসের আঘাত?” আৎকে উঠে বললো রেবা।

“একটা ধিঙ্গি মেয়ে আমাকে বিশ্বাস না করে ফালতু ট্যাবলয়েড পত্রিকার খবরকে বিশ্বাস করছে।” কথাটা বলেই মুখ টিপে হেসে ফেললো জেফরি।

“আহা রে...” মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলো রেবা। “বেচারা। খুব কষ্ট হচ্ছে?”

“হুমম।”

“আচ্ছা, দেখা হলে আদর করে দেবো।”

“না। এখনই করো।” ছেলেমানুষি আব্দারের সুরে বললো জেফরি বেগ।

“না। এখন করবো না। দেখা হলে সামনাসামনি করবো। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে এই কথাগুলো আবার বলবে। তখন বুঝতে পারবো পুরোপুরি সত্যি বলেছো কিনা। মনে রেখো, তোমাদের মতো পলিগ্রাফ মেশিন আমার কাছে না থাকলেও আমি কিন্তু একজন ধ্যাঙ্গা ছেলের সত্যি-মিথ্যে ভালোমতোই ধরতে পারি।”

এটা ঠিক, রেবার সামনে মিথ্যে বলতে পারে না জেফরি বেগ। অনেকবারই চেষ্টা করেছে। বার বারই একই ফল। হয়তো আবারো ধরা খাবে।

“এসব কথা রাখো। এবার বলো, তোমার বাবার খবর কি?” প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বললো সে।

একটু চুপ মেরে গেলো রেবা। তারপর শান্তকণ্ঠে বললো, “বাবা বিদেশে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করাতে চাচ্ছে না।”

“কেন?”

“এতো টাকা খরচ করে নাকি কোনো লাভ হবে না। তার ধারনা ফোর্থ স্টেজের ক্যান্সার ভালো হয় না। খামোখা এতোগুলো টাকা খরচ করে কী হবে...এইসব বলছে,” কথাটা শেষ হলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো রেবার মুখ দিয়ে।

“কী হবে না হবে সেটা তো ডাক্তারই ভালো বলতে পারবে...উনাকে এসব নিয়ে চিন্তা করতে দিও না। একটু চেষ্টা করতে হবে না?”

“হুম।” রেবা আর কিছু বললো না।

“তুমি আর তোমার মা মিলে উনাকে বোঝাও...উনি বুঝবেন।”

“সেটাই করছি।”

“গুড।”

একটু চুপ থেকে বললো রেবা, “আচ্ছা, আজকে কি আমাদের দেখা হচ্ছে?”

মনে মনে কাজের শিডিউলটা খতিয়ে দেখলো জেফরি বেগ। জামানকে হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসতে হবে। যেতে হবে সেন্ট অগাস্টিনেও। তারপর অবশ্য কোনো কাজ নেই। “হুম...সন্ধ্যায় ফ্রি আছি। ছ'টার দিকে?”

“ঠিক আছে।”

“তাহলে আমি তোমাকে বাসা থেকে পিক করছি...ওকে?”

“ওকে।”

“বাই।” ফোনটা রেখে উদাস হয়ে চেয়ে রইলো জেফরি বেগ।

বেশ কয়েক দিন যাবত চুমু খাওয়া হয় না। আজ অনেক চুমু খাবে। নতুন করে প্রাণশক্তি নিতে হবে। এই বয়সে চুম্বন ছাড়া বেশিদিন থাকলে চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো লাগে নিজেকে। সমস্যা একটাই। রেবার মুড অফ হয়ে আছে। তার বাবার অসুখই এর কারণ।

তারপরও চুম্বন হবে আজ। দীর্ঘ আর গাঢ় চুম্বন।

হাসানের বিধবা স্ত্রী সত্যি সত্যি দেশের বাড়িতে চলে যাচ্ছে তার বাবার সাথে। মলির কোনো পরিকল্পনা ছিলো না এতো তাড়াতাড়ি যাবার। ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগকে ডায়রিটা দেবার সময় অবশ্য বলেছিলো, বাবার সাথে দেশের বাড়িতে চলে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা পুরোপুরি সত্যি ছিলো না। আরো এক সপ্তাহ পরে যাবার ইচ্ছে ছিলো তার কিন্তু ডায়রিটা দেবার পর পরই পাশের ফ্ল্যাটে যে কাণ্ড ঘটে গেছে তারপর আর মলির বাবা ঢাকায় থাকাটা নিরাপদ মনে করেন নি।

পুলিশ বলছে, মিলন সাহেব নাকি হোমিসাইডের দু'জন কর্মকর্তাকে দেখামাত্র পালানোর চেষ্টা করে। প্রথমে সে নিজের পরিচয় লুকালেও ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ বুঝে যায়। এরপরই মিলন নামের লোকটি পালাতে গেলে তাকে ধাওয়া করে হোমিসাইডের দুই ইনভেস্টিগেটর। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে গোলাগুলিও হয়।

ভাগ্যের গুনে দু'জন ইনভেস্টিগেটর বেঁচে গেলেও মিলনকে ধরা সম্ভব হয় নি। সে পালিয়ে গেছে। পালিয়ে গেছে তার দুই স্ত্রীও।

এসব কথা শুনে মলি বিশ্বাসই করতে পারে নি। দুই দু'জন স্ত্রী!

তারা তো এতোদিন জানতো, পাশের ফ্ল্যাটের মিলন নামের লোকটি বউ আর শালি নিয়ে থাকে, যেমন হাসান থাকতে বউ আর শ্যালককে নিয়ে।

তবে মলি বুঝতে পারছে না, মিলন কেন পালালো। কেন সে ইনভেস্টিগেটরদের গুলি করলো। তার সাথে হাসানের হত্যাকাণ্ডের কি কোনো সম্পর্ক আছে?

না। মলি ভালো করেই জানে, হাসানের খুনের সাথে মিলনের কোনো সম্পর্ক নেই। ডায়রিতে সে যে কথা জেনেছে, তাতে করে একদম নিশ্চিত, এর সাথে মিলনের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।

তাহলে মিলন এমন কাজ করতে গেলো কেন?

বাসটা আচমকা ব্রেক কষলে সব যাত্রিদের মতো মলি আর তার বাবাও প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো। সম্বিত ফিরে পেলো সে।

রাস্তার মাঝখান দিয়ে একটা গরু পার হচ্ছিলো। ড্রাইভার গরুকে কুত্তারবাচ্চা বলে গালি দিয়ে আবারো গাড়ি চালাতে শুরু করলে মলির বাবা মেয়ের দিকে তাকালেন।

"লিটুরে নিয়ে চিন্তা করিস না, মা," আস্তে করে বললেন স্কুলশিক্ষক ভদ্রলোক। "ও ভালোই থাকবে।"

লিটুকে একা ফেলে আসতে মন চাইছিলো না, কিন্তু কিছু করার নেই। পাশের ফ্ল্যাটে ওই ঘটনা ঘটে যাবার পর মলির বাবা আর মেয়ের কোনো কথা শোনেন নি। লিটু তাকে বলেছে, তার কোনো সমস্যা হবে না। সে নাকি তার এক বন্ধুর বাসায় কয়েকটা দিন থাকবে, তারপর একটা মেসে উঠে যেতে পারবে।

মলির বাবা হয়তো ভাবছেন, লিটুকে নিয়েই সে ভেবে যাচ্ছে। আসলে তার ভাবনা জুড়ে হাসানের হত্যাকাণ্ড আর গতকালের সেই ঘটনা।

"না, বাবা," আস্তে করে বললো মলি। "লিটুর কথা ভাবছি না।"

স্কুলশিক্ষক বাবা আর কিছু না বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

মলির বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

তারা এখন ঢাকা শহর ছেড়ে চলে এসেছে। পেছনে ফেলে এসেছে হাসানের সাথে করা তার কয়েক মাসের সংসার। ফেলে আসা সেই শহরের মাটিতেই চিরকালের জন্য শুয়ে আছে তার স্বামী।

হাসানের মৃত্যুর পর তাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছিলো সেটা যেনো পূর্ণতা পাচ্ছে এখন। দূরত্বটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

হাসান আমি তোমাকে কখনও ভুলতে পারবো না!

অধ্যায় ২৮

অফিসে কিছু কাজ সেরে লাঞ্চের সময় হাসপাতালে গিয়ে জামানকে দেখেই জেফরি বেগ সোজা চলে গেলো সেন্ট অগাস্টিনে।

জামান ভালো আছে। তার ডান পায়ের পেশীতে যে গুলিটা বিদ্ধ হয়েছিলো সেটা হাঁড়ে কোনো ক্ষতি করে নি, শুধু ক্ষত তৈরি করা ছাড়া। ডাক্তার জানিয়েছে, আর মাত্র একদিন পরই তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া সম্ভব হবে।

হাটুর আঘাতটা তেমন গুরুতর নয়। কিছুদিন বিশ্রাম নিলে সেটাও সেরে যাবে। আর কিডনির আঘাতটা ছিলো একেবারেই সাময়িক। তার কিডনি পুরোপুরি সুস্থ আছে।

জামানের মা-বাবা আর আত্মীয়স্বজনে হাসপাতালের কেবিন গিজগিজ করছিলো। যাইহোক, জামানের অবস্থা দেখে জেফরির খুব ভালো লেগেছে। সন্ধ্যার সময় রেবার সাথে দেখা করার পর নিশ্চয় আরো ভালো লাগবে।

অরুণ রোজারিও একটা কাজে উপরতলায় গেছে, জেফরি বসে আছে তার অফিসে। একটু আগে ফোনে কথা হয়েছে তার সাথে। এক ছেলে এসে এক কাপ চা দিয়ে গেছে তাকে, সেটাতে চুমুক দিয়ে হাসানের কেসটা নিয়ে ভাবতে লাগলো সে।

পাশের ফ্ল্যাটে মিলন নামের লোকটা কেন এমন করলো? এই প্রশ্নের একটাই সহজ জবাব হতে পারে: হাসানের হত্যাকাণ্ডের সাথে মিলন কোনো কোনোভাবে জড়িত। কিন্তু ঘটনা অন্য রকমও হতে পারে। হতে পারে ঘটনাচক্রে মিলন একজন সন্ত্রাসী হবার কারণে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। তবে জেফরির দৃঢ় বিশ্বাস, ঘটনাচক্রে মিলন নামের সন্ত্রাসীর সাথে তাদের মোকাবেলা হয় নি।

মিলন যদি হাসানকে খুন করে থাকে তাহলে আরেকটা সহজ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে: পাশের ফ্ল্যাটের একজনকে খুন করার জন্য মিলন কেন সেন্ট অগাস্টিনে গেলো? খুব সহজেই তো হাসানকে খুন করতে পারতো সে!

"সরি, ব্রাদার।" অরুণ রোজারিও তার অফিসে ঢুকে বললেন।

মুখ তুলে হাসিমুখে তাকালো জেফরি। "খুব ব্যস্ত নাকি?"

নিজের ডেস্কে বসতে বসতে বললেন অরুণ রোজারিও, "না, তেমন কিছু না। স্কুলের রুটিনমাফিক কিছু কাজ।" একটু চুপ থেকে আবার বললেন তিনি, "তা বলো, তোমার কি খবর?"

"ভালো।" চায়ের কাপে চুমুক দিলো জেফরি।

"গুড। কেসটার কি অবস্থা?"

মিলনের সাথে তাদের মোকাবেলার ঘটনাটা না বলার সিদ্ধান্ত নিলো জেফরি। "ভালো। এগোচ্ছে। তবে আরো সময় লাগবে।"

"হাসানের বউ তো দেশের বাড়িতে চলে গেছে, জানো কিছু?"

জেফরি এটা জানে। হাসানের স্ত্রী মলি তাকে ফোন করে জানিয়েছে। "হুম।"।

"আমার সাথে কাল কথা হয়েছে। হাসানের চলতি মাসের বেতন আর বিভিন্ন ফান্ডের টাকা সামনের মাসে দিয়ে দেয়া হবে। আমরা স্কুল থেকে হাসানের পরিবারের জন্য কিছু কমপেনসেশনের ব্যবস্থাও করেছি।"

"ভালো।" ছোট্ট করে বললো জেফরি বেগ।

"আমাকে বলেছে, সামনের মাসে এসে টাকাগুলো নিয়ে যাবে।"

জেফরি কিছু বললো না। অরুণ রোজারিও হয়তো আসমানজমিন নামের ফালতু পত্রিকাটি পড়ে না। জামান যে গুলিবিদ্ধ হয়েছে সে খবর তার জানা নেই।

"অরুণদা, আমি একজনের সাথে কথা বলতে চাই," আস্তে করে বললো সে।

কথাটা শুনেই সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যালের মুখ কালো হয়ে গেলো। ভয়ে ভয়ে বললেন, "কার সাথে কথা বলতে চাও?"

"তুর্যের সাথে।"

জেফরি লক্ষ্য করলো কথাটা শোনামাত্রই অরুণ রোজারিওর দু'চোখের ফোকাস এলোমেলো হয়ে গেলো। নিজের অভিব্যক্তি লুকানোর চেষ্টা করলেও বরাবরের মতোই ব্যর্থ হলেন।

"তু-তুর্য...মানে, ওর সাথে কথা বলবে কেন?" একটু তোতলালেন অরুণ রোজারিও।

"দরকার আছে। ওই ছেলেটার সাথেই অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ কথা বলেছে। তাকে নাকি সাইনও করিয়েছে। অথচ আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ এই স্কুলে আসে নি।"

"ছাত্রদের খুনের কেসে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কি রিঅ্যাকশন হবে, বুঝতে পারছো?"

"আমি তাকে খুনের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবো না। শুধু জানতে চাইবো ঐ কোচের সাথে তার কি কথা হয়েছে।"

জেফরি লক্ষ্য করলো অরুণ রোজারিওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে।

"কিন্তু হোমিসাইডের একজন ইনভেস্টিগেটর কোনো ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এটা জানাজানি হলে-"

"আমি হোমিসাইডের পরিচয় দেবো না," অরুণ রোজারিওর কথার মাঝখানে বললো জেফরি।

"তাহলে?" ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন প্রিন্সিপ্যাল।

"এ নিয়ে আপনার চিন্তার কিছু নেই। আমি অন্য পরিচয়ে কথা বলবো। ছেলেটা বুঝতেই পারবে না।"

অরুণ রোজারিও চিন্তায় পড়ে গেলেন।

"ছেলেটাকে আপনার রুমেই ডেকে আনুন। এখানেই কথা বলবো ওর সাথে। আপনিও নিশ্চয় সেরকমই চান, তাই না?"

"কিন্তু..." অরুণ রোজারিও ইতস্তত করলেন।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো জেফরি বেগ। "কি?"

"ছেলেটা তো আজ স্কুলে আসে নি।"

"স্কুলে আসে নি?" অবাক হলো জেফরি। এর আগেও তার সহপাঠিরা তাকে জানিয়েছে ছেলেটা স্কুলে আসে নি। আজও অনুপস্থিত।

"হুমম..."

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো জেফরি। শতশত ছাত্রের মধ্যে একজন অনুপস্থিত হলে সেটা প্রিন্সিপ্যাল কিভাবে জানবে?

"আপনি কি করে জানলেন সে স্কুলে আসে নি?" মনে হলো প্রিন্সিপ্যালের পাছায় কেউ আলপিন দিয়ে খোঁচা দিয়েছে।

"না, মানে...ইয়ে," কথাটা বলতে বেগ পেলেন তিনি। যেনো গলার কাছে এসে আটকে গেলো। "ওই ফিজিক্যাল ট্রেইনার মি: কাজি বললেন, ইন্টারস্কুল টুর্নামেন্টে বস্কেটবল টিম থেকে তুর্যকে বাদ দেয়া হয়েছে, ছেলেটা নাকি অ্যাবসেন্ট আছে কয়েক দিন ধরে।" অরুণ রোজারিও নিজেও অবাক হলেন এতো দ্রুত কিভাবে গুছিয়ে মিথ্যে বলতে পারলেন তিনি।

"ও," জেফরি চেয়ে রইলো তার স্কুলের বড়ভায়ের দিকে। অরুণ রোজারিওর ভাবভঙ্গি তার কাছে খটকা লাগছে। লোকটা এরকম করছে কেন?

"মনে হয় অ্যাঞ্জেলস টিমে চান্স পেয়ে খুশিতে আত্মহারা...টিমের সাথে হয়তো প্র্যাকটিস করছে," জেফরিকে চুপ থাকতে দেখে বললেন তিনি।

"অরুণদা, ঐ লোকটা কিন্তু অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ ছিলো না। সে ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে স্কুলে ঢুকেছিলো।"

জেফরির কথাটা শুনে বরফের মতো জমে গেলেন অরুণ রোজারিও।

"সুতরাং টিমে চান্স পাওয়া, প্র্যাকটিস করা, এসবের প্রশ্নই ওঠে না।"

গাল চুলকালেন সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যাল। "তাহলে?" বোকার মতো বলে ফেললেন।

"সেটাই তো এখন খুঁজে বের করতে হবে।"

অরুণ রোজারিও ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন জেফরির দিকে।

সেন্ট অগাস্টিন থেকে বের হয়ে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে কিছু খেয়ে নিয়েছে। জেফরি বেগ। লাঞ্চের সময় অবশ্য অনেক আগেই পেরিয়ে গেছিলো। প্রচণ্ড ক্ষিদে লাগলে হালকা কিছু খেয়ে এক কাপ চা পান করে। তারপর আবারো চলে আসে সেন্ট অগাস্টিনে। তবে এবার আর প্রিন্সিপ্যালের অফিসে নয়, সোজা চলে এসেছে বাস্কেটবল কোর্টে।

ঐদিনের মতোই পাঁচ-ছয়জন ছাত্র প্র্যাকটিস করছে। এটাই সে চেয়েছিলো। সামনেই ইন্টারস্কুল টুর্নামেন্ট। ছেলেগুলো বেশ মন দিয়ে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে।

কোর্টের কাছে আসতেই ছেলেগুলো তাকে দেখে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কথা বলতে শুরু করলো। নাফি হাজ্জাদ নামের ছেলেটা বার বার তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। জেফরি হাত তুলে 'হাই' জানালে অনিচ্ছায় হাত তুলে জবাব দিলো ছেলেটা। মুচকি হাসলো জেফরি বেগ।

খেলতে খেলতে দিপ্রো নামের ছেলেটি এক সময় তার কাছে চলে এলে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলো।

"কেমন আছো?" হেসে বললো জেফরি বেগ।

"জি, ভালো আছি," পাল্টা হাসি দিয়ে দিপ্রো বললো।

"তোমার সাথে কি একটু কথা বলতে পারি?"

অবাক চোখে চেয়ে রইলো দিপ্রো। তারপর কাঁধ তুললো। "ওকে।"

দিপ্রো তার বাকি সঙ্গিদের দিকে ফিরে হাত তুলে কিছু একটা ইশারা করলে নাফি হাজ্জাদ নামের ছেলেটা বিরক্ত হয়ে তাকালো জেফরির দিকে।

"বলুন...কি বলবেন?" হাফাতে হাফাতে বললো দিপ্রো।

"তুর্য তোমাদের সাথে প্র্যাকটিস করছে না?"

"না।"

"কেন?"

"ও তো স্কুলেই আসে না...অ্যাঞ্জেলস টিমে চান্স পাবার পর থেকে গন উইথ দ্য উইন্ড..."

"ও," ছোট্ট করে বললো জেফরি। ভালো করেই জানে, সেন্ট অগাস্টিনের মতো স্কুলে কথায় কথায় অনুপস্থিত থাকা যায় না। তুর্য নামের ছেলেটা কী কারণ দেখিয়ে স্কুলে আসছে না? নিশ্চয় সে কর্তৃপক্ষকে বলে নি, অ্যাঞ্জেলস টিমে চান্স পাবার কারণে আসছে না। তাছাড়া, এটা কোনো কারণও হতে পারে না। এরকম ঘটনা আদতে ঘটেই নি।

"ও কি আসলেই অ্যাঞ্জেলস টিমের সাথে প্র্যাকটিস করছে নাকি অন্য কোনো কারণে স্কুলে আসছে না?"

"কে জানে?" দিপ্রো বললো।

"কেন, তোমাদের সাথে ওর ফোনে যোগাযোগ হয় নি?"

"না।" দিপ্রো একটু কাটাকাটাভাবে বললো কথাটা।

"কোনো রকম ছুটি না নিয়ে স্কুলে আসছে না, এটা তো ঠিক হচ্ছে না, তাই না?"

"হু কেয়ারস..." কাঁধ তুললো দিলো।

"তোমাদের স্কুলের নিয়মকানুন খুব কড়াকড়ি, তাহলে ও এভাবে অ্যাবসেন্ট আছে কি করে?"

দিপ্রো ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো জেফরির দিকে। "আপনি আসলে কে, বলুন তো?"

"বলেছি না, আমি তোমাদের প্রিন্সিপ্যালের গেস্ট।"

“আচ্ছা,” কথাটা টেনে টেনে বললো সে।

“তাহলে আপনি এসব জানতে চাচ্ছেন কেন?”

“দরকার আছে,” বললো জেফরি।

জেফরির দিকে চেয়ে রইলো দিপ্রো, “কি দরকার?”

“সেটা তোমাকে বলা যাবে না।”

ঠোঁট ওল্টালো দিপ্রো। “দেখুন, আমার সাথে চালাকি করবেন না। আমি জানি আপনি কেন এসব জানতে চাচ্ছেন।”

অবাক হলো জেফরি বেগ। “কেন জানতে চাচ্ছি?”

“আপনি ঐ মার্ডার কেসটার ইনভেস্টিগেশন করছেন,” বেশ দৃঢ়ভাবে বললো দিপ্রো।

মাথা দোলালো জেফরি। তার মুখে হাসি। “তোমার ধারনা আমি পুলিশের লোক?”

“না। আপনি হোমিসাইডে আছেন। আপনার নাম জেফরি বেগ!”

অরুণ রোজারিও অফিস থেকে বের হয়ে পার্কিংলটের দিকে যাচ্ছেন। তার গাড়িটা ওখানেই আছে। পার্কিংলটে এসে বাস্কেটবল কোর্টের দিকে তাকালেন তিনি। দূর থেকেই দেখতে পেলেন তার প্রিয় ছোটো ভাই জেফরি এক ছেলের সাথে কথা বলছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে।

অফিস থেকে বের হবার আগেই এক চাপরাশি পাঠিয়ে জানতে পেরেছিলেন জেফরি এখানে আছে। খবরটা শোনার পর থেকে অস্থির হয়ে আছেন। জেফরিকে কিছু বলা যাবে না, তাহলে তাকেও সন্দেহের তালিকায় ফেলে দেবে। এমনিতেই অনেক ঝামেলার মধ্যে আছেন। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব সামলাতে হবে। একটুও ভুল করা যাবে না।

চেষ্টা করে যাচ্ছেন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে কিন্তু সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যায় মিথ্যে বলতে গেলে, অভিব্যক্তি লুকিয়ে ফেলার সময়। তিনি লক্ষ্য করেছেন, জেফরি তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। হয়তো কিছুটা খটকা লেগে গেছে তার মনে।

এখনও একটা ছেলের সাথে কথা বলে যাচ্ছে জেফরি। কী এতো কথা? অরুণ রোজারিও বুঝতে পারছেন না। এসব খুনখারাবির সাথে বাস্কেটবলের কোচ, ছাত্র এরা কিভাবে জড়ায়! ঘটনা তো আসলে অন্যরকম।

ড্রাইভার তাকে ডাক দিলে ফিরে তাকালেন। জেফরির দিকে আরেকবার তাকিয়ে প্রচণ্ড আক্ষেপ নিয়ে উঠে পড়লেন গাড়িতে। এই কেসের পরিণতি কি হবে কে জানে!

তার গাড়িটা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো স্কুল থেকে।.

পত্র-পত্রিকাগুলো সব সময়ই জেফরির চক্ষুশূল, এখন রীতিমতো শত্রু বলে মনে হচ্ছে তার কাছে।

সে তো কোনো সেলিব্রেটি না। বিরাট গায়ক, নায়ক, মডেল কিংবা কবি সাহিত্যিকও নয়। তাহলে তার ছবি ছাপানোর কী মানে আছে?

তার কাজ হলো হত্যা-খুনের রহস্য উন্মোচন করা, প্রকৃত দোষিদের খুঁজে বের করা। এই কাজে তাকে সফল হতেই হবে। এখানে ব্যর্থতার কোনো স্থান নেই। তাহলে আলোচিত কোনো খুনের কেস সমাধান করলে পত্রিকাগুলো কেন তার ছবি ছাপিয়ে দেবে? চটকদার হেডলাইন করবে তাকে নিয়ে?

এ দেশই হলো একমাত্র দেশ যেখানে স্বাভাবিক কাজকর্ম করেও বাহবা পাওয়া যায়। ফাঁকি না দিলেই কৃতিত্ব পাওয়া যায়।

কয়েক মাস আগে লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের পর যখন ঘটনাস্থল থেকে লেখকের তরুণী স্ত্রীর প্রেমিককে গ্রেফতার করলো তখনই এই কাণ্ডটা করে বসে আসমানজমিন। এরপর ব্ল্যাক রঞ্জুর কেসটার বেলায় এই পত্রিকা একই কাজ করেছে। খুব সম্ভবত আসমানজমিন আবারো তার ছবি ছাপিয়ে দিয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রেই ক্রাইমসিনে তার আগমনের সময় কিছু সাংবাদিক ফটোগ্রাফার উপস্থিত থাকে। জেফরি তখন ডুবে থাকে কাজের মধ্যে। আশেপাশে কে তার ছবি তুলছে সেটা তখন খেয়াল থাকে না।

শালার আসমানজমিন, মনে মনে বললো জেফরি বেগ। দিপ্রো হয়তো এই আজগুবি খবরের পত্রিকাটা পড়ে তাকে চিনতে পেরেছে।

কিন্তু সত্যি কথা হলো, দিপ্রো এটা জেনেছে দারোয়ান আজগরের কাছ থেকে। যখনই তারা জানতে পারলো সে কোনো কোচ নয় তখনই তাদের একটু কৌতূহল হয়। দারোয়ান আজগরকে জিজ্ঞেস করলে সে জানিয়ে দেয় জেফরির আসল পরিচয়টা।

জেফরি ঠিক করলো সে আর নিজের পরিচয়টা অস্বীকার করবে না।

"ওহ্, আমি যে এতো পপুলার সেটা তো জানতাম না," কৃত্রিমভাবে হেসে বললো ইনভেস্টিগেটর।

"শুধু আমি না...আমাদের সবাই আপনাকে এখন চেনে," পেছন ফিরে বাকিদের দিকে ইঙ্গিত করলো দিপ্রো।

"ওয়াও, গ্রেট, জেফরি বেগ মুখে এটা বললেও মনে মনে বললো, শিট শিট-শিট!

"আর কিছু জানতে চান, মি: ইনভেস্টিগেটর?" একটু বাঁকাভাবে বললো দিলো।

"তুর্যের সাথে আমি দেখা করতে চাই, তুমি কি তার বাড়ি চেনো?"

দিপ্রো আবারো বাঁকা হাসি হেসে চেয়ে রইলো জেফরির দিকে। যেনো তার সাথে ঠাট্টা করা হয়েছে। "আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুর্য কে আপনি চেনেন না।"

অবাক হলো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর। "তাকে কি আমার চেনার কথা?" পাল্টা বললো সে।

"অবশ্যই চেনার কথা।"

"তাই নাকি," কথাটা বলে জেফরিও বাঁকা হাসি হাসলো তবে বুঝতে পারছে না দিপ্রো কী বলতে চাচ্ছে।

"কি কারণে তোমার মনে হলো তুর্য নামের ছেলেটাকে আমার চেনার কথা?"

"আপনি আবারো চালাকি করছেন, মিস্টার," বললো দিপ্রো। "আমাদের সাথে গেম খেলবেন না..."

বোকার মতো হেসে ফেললো জেফরি বেগ। "তুমি কী বলছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

দিপ্রো নিজেও অধৈর্য হয়ে উঠলো। "লুক মিস্টার, আপনার এইসব ট্রিক্স অন্য কোথাও অ্যাপ্লাই করবেন...ওকে," বলেই ঘুরে চলে যেতে উদ্যত হলো সে।

"প্লিজ, শোনো, আমি এখনও বুঝতে পারছি না তুমি কী বলছো?" জেফরি পেছন থেকে ডাক দিলো।

ঘুরে দাঁড়ালো দিপ্রো। তার ঠোঁটে ব্যঙ্গাত্মক হাসি। "ইন দ্যাট কেস, ফর ইওর কাইন্ড ইনফর্মেশন...তুর্য হোমমিনিস্টারের ছেলে। এটা সবাই জানে!" দিপ্রো দৌড়ে চলে গেলো তার বন্ধুদের কাছে।

পাথরের মূর্তির মতো স্থির দাঁড়িয়ে রইলো জেফরি বেগ।

হোমমিনিস্টারের ছেলে?!

সন্ধ্যার পর রেবার সাথে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে কিন্তু চুম্বন হয় নি। এমন নয় যে, রেবা আপত্তি করেছে, কিংবা সুযোগ পায় নি। তারা দেখা করেছিলো বেইলি রোডের একটি লাউঞ্জে। কিন্তু রেবার সাথে প্রায় দুই ঘণ্টা থাকার পরও চুমু খাওয়ার কোনো ইচ্ছে জাগে নি। মাথার মধ্যে শুধু তুর্যের নতুন পরিচয়টা ঘুরপাক খাচ্ছিলো।

বাড়ি ফিরে এসে সোজা বিছানায় চলে যায়। জুতোটা কোনোরকম খুলে সটান শুয়ে পড়ে। অন্ধকার ঘর, একদম একা। চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে। টানা তিন ঘণ্টা। মাথার মধ্যে একটাই ভাবনা ঘুরতে থাকে শুধু।

তুর্য হোমমিনিস্টারের ছেলে!

ঠিক আছে। সেন্ট অগাস্টিনের মতো স্কুলে এরকম ভিআইপিদের সন্তানরাই পড়াশোনা করে। খবর নিলে দেখা যাবে আরো অনেক মন্ত্রী, শিল্পপতি আর ক্ষমতাবানদের ছেলেমেয়ে ওখানে পড়াশোনা করছে। কিন্তু সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যাল অরুণদা কেন এ কথাটা তার কাছ থেকে লুকালো?

পুরো ঘটনাটা একে একে সাজিয়ে নিয়ে ভেবে গেলো সে।

সেন্ট অগাস্টিনের এক জুনিয়র ক্লার্ক হাসান স্কুলের টয়লেটে খুন হয়েছে। তার ঘাড় মটকে দেয়া হয়েছে বেশ দক্ষতার সাথে। কাজটা অবশ্যই একজন পেশাদার লোকের।

হাসান খুন হবার একটু আগে স্কুলের সুকঠিন নিরাপত্তা ভেদ করে বাস্কেটবলের কোচ সেজে ঢুকে পড়ে দু'জন। লোক দুটো যে পরিচয় ব্যবহার করেছে সেটা একদম ভুয়া। কেন ঐদিন ভুয়া পরিচয় দিয়ে দু'জন লোক ঢুকবে স্কুল কম্পাউন্ডে?

উত্তরটা খুব সহজ : হাসানকে খুন করতে।

এটা সত্যি ধরে নিলে আরেকটা প্রশ্ন জাগে। ভুয়া পরিচয়ে যারা ঢুকেছে তাদের মধ্যে কোচ পরিচয় দেয়া লোকটি কথা বলেছে তুর্য নামের এক ছেলের সাথে। জেফরি আজ বিকেলে জানতে পেরেছে, সেই ছেলেটি বর্তমান হোমমিনিস্টারের একমাত্র সন্তান। দিপ্রোর কাছ থেকে সে আরো জেনে নিয়েছে, তুর্যকে নাকি ঐ ভুয়া কোচ অ্যাঞ্জেলসস টিমে সাইন করিয়েছে। কথাটা তুর্য নিজে বলেছে তাদেরকে।

দিপ্রো নামের ছেলেটার সাথে ভাব জমিয়ে কিছু জিনিস জানতে পেরেছে জেফরি। প্রথমত, তুর্য তাদের বন্ধু হলেও ছেলেটার সাথে বাকিদের সম্পর্ক ইদানিং মোটেও ভালো যাচ্ছে না। হোমমিনিস্টার বাবার ক্ষমতার দম্ভে মাটিতে তার পা পড়ে না।

দিপ্রোর কাছ থেকে তুর্যের মোবাইল নাম্বারটা কৌশলে নিয়ে নিয়েছে সে।

এদিকে তুর্য কয়েক দিন ধরে স্কুলেও আসে না। ঠিক করে বললে, হাসান খুন হবার পর থেকেই স্কুলে আসছে না।

কেন?

তুর্যকে পাওয়া গেলে জবাবটা জানা যাবে। কিন্তু ছেলেটার মোবাইল ফোন বন্ধ। সমস্যা নেই। হোমিসাইডে গিয়ে আগামীকাল এটার ব্যবচ্ছেদ করবে। জামান থাকলে কোনো সমস্যা ছিলো না, এই কাজটা খুব সহজেই করতে পারতো সে।

যেভাবেই হোক তুর্যের নাগাল তাকে পেতেই হবে। কারণ হাসান খুন হবার আগে ভুয়া কোচ হিসেবে যে দু'জন লোক সেন্ট অগাস্টিনে ঢুকেছিলো তাদের সাথে শুধুমাত্র তুর্যেরই কথা হয়েছে।

তবে হাসানের খুনের সাথে মিলনের সংশ্লিষ্টতা কোনোভাবেই মেলাতে পারছে না। সন্দেহ নেই মিলন একজন পেশাদার সন্ত্রাসী, ভয়ঙ্কর এক লোক, কিন্তু সে কি নিছক হাসানের প্রতিবেশি? নাকি হাসানের হত্যাকাণ্ডে তার গভীর কোনো যোগাযোগ আছে?

এমনও তো হতে পারে, ঘটনাচক্রে জেফরি মিলনের ডেরায় চলে গেছিলো? পুরো ব্যাপারটাই ভুল বোঝাবুঝি!

হতে পারে।

ঠিক তখনই আধোঘুমের ভাবটা কেটে গেলে বিছানা থেকে উঠে জামাকাপড় পাল্টে হাত-মুখ ধুয়ে নিলো সে। হাসানের ডায়রিটা হাতে নিয়ে চলে গেলো বেলকনির বারান্দায়। ওখানে একটা রকিংচেয়ার আছে। সেটাতে বসে ডায়রিটা পড়তে শুরু করলো সে।

জামান সুস্থ থাকলে এই ডায়রিটা তাকেই পড়তে দিতো। ছেলেটার পড়ার অভ্যেস আছে। দুএকদিনেই এটা পড়ে শেষ করে ফেলতো সে। কিন্তু জেফরির পড়ার অভ্যেস অনেক কম। বই খুললেই চোখে ঘুম চলে আসে। তার এই ব্যাপারটা ফাদার জেফরি হোবার্টও খেয়াল করেছিলেন। মৃত্যুর আগে ফাদারের দেয়া উপদেশগুলোর মধ্যে একটা ছিলো এই পড়া নিয়ে।

খুব চমৎকারভাবে বলেছিলেন ফাদার : এ দুনিয়াতে নাকি দু'ধরণের মানুষ আছে। একদল বই পড়ে আর অন্যদল বই লেখে! এর মাঝামাঝি কেউ নেই।

তাহলে তার মতো যারা বই পড়ে না তারা কোনো মানুষই না?

মনে মনে হেসে ফেললো জেফরি। ফাদার খুব একটা বাড়িয়ে বলেন নি। আসলেই পড়াশোনার অভ্যেসটা থাকা দরকার। এর কোনো বিকল্প নেই।

রাত বারোটা থেকে ডায়রি পড়তে শুরু করলো সে। চোখে ঘুম চলে এলে মুখে পানির ঝাঁপটা মেরে এলো দুএকবার। মাঝরাতে ক্লান্তি এসে ভর করলে নিজে নিজে পানি গরম করে টি-ব্যাগ দিয়ে এক কাপ চাও খেলো, কিন্তু পড়ায় কোনো বিরতি দিলো না।

ফজরের আজানের ঠিক আগে, ডায়রির একটা জায়গায় এসে তার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেলো। যা আশা করেছিলো তারচেয়েও অনেক বেশি কিছু আছে এই ডায়রিতে।

পুরো এক পৃষ্ঠাও হবে না, বড়জোর তিন প্যারার একটি লেখা। সেই লেখায় হাসান এমন এক ঘটনার কথা উল্লেখ করে গেছে যে, জেফরি বরফের মতো জমে রইলো কিছুক্ষণ। বার বার লেখাটা পড়লো সে, যদিও সেটা করার কোনো দরকারই নেই। হাসান বেশ সহজ সরল ভাষায় একটা ঘটনা বর্ণনা করে গেছে, অনেকটা ক্ষোভের সাথে। বিস্তারিত কিছুই লেখে নি। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট। তার কারণ এই ঘটনায় তুর্য নামের হোমমিনিস্টারের একমাত্র সন্তানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

ডায়রির পাতার উপর তারিখটা দেখলো জেফরি। মাত্র সাড়ে তিন মাস আগের ঘটনা।

আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাস আগে সেন্ট অগাস্টিনের জুনিয়র ক্লার্ক হাসান আর হোমমিনিস্টারের আদরের দুলাল তুর্যের সম্পর্ক মোটেও ভালো ছিলো না। তাদের মধ্যে একটা জঘন্য ব্যাপার ঘটে গেছিলো সেই সময়।

ঘটনা তাহলে এই! রকিংচেয়ারে দোল খেতে খেতে ভাবলো জেফরি বেগ।

অধ্যায় ৩১

জামান হাসপাতাল থেকে রিলিজ পেয়ে বাসায় চলে গেছে। ধারণার চেয়েও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে সে। তারপরও কমপক্ষে এক সপ্তাহ বেডরেস্টে থাকার জন্য হোমিসাইড থেকে তাকে ছুটি দেয়া হয়েছে জেফরির সুপারিশে। জামান অবশ্য তিন-চার দিন পরই কাজে যোগ দিতে চেয়েছিলো কিন্তু জেফরি সায় দেয় নি।

জামান সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত রমিজ লস্কর তার সহকারী হিসেবে কাজ করবে।

হাসানের ডায়রিতে যে ঘটনার কথা সে জেনেছে সেটা মহাপরিচালক ফারুক সাহেবকে বলে নি। ব্যাপারটা আপাতত গোপনই রাখবে, যতোদিন না শক্ত কোনো প্রমাণ তার হাতে আসে। ভালো করেই জানে, তার বস হোমমিনিস্টারের ছেলের কথা শুনলেই ঘাবড়ে যাবে। এ নিয়ে কোনো রকম তদন্ত করতে দেবে না।

জেফরি আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অরুণ রোজারিওকেও তুর্যের ব্যাপারে কিছু বলবে না। সময় হলে সব প্রকাশ করবে।

রমিজ লস্করকে দুটো কাজ দিয়েছে জেফরি : মিলনের প্রথম স্ত্রী আম্বিয়া খাতুনের গ্রামের বাড়িতে খোঁজ নেয়া এবং তুর্যের মোবাইল ফোনটার কললিস্ট চেক করা। অবশ্য লস্করকে সে বলে নি ফোন নাম্বারটা হোমমিনিস্টারের ছেলে তুর্যের।

কাজের অগ্রগতি কততদূর হলো জানার জন্য সকাল সকাল অফিসে এসেই রমিজকে ডেকে পাঠালো সে।

সালাম দিয়ে রমিজ লস্কর জেফরির সামনের চেয়ারে বসে পড়লো। তার হাতে একটা ফাইল। সরাসরি কাজের কথায় চলে এলো লস্কর।

‘স্যার, প্রথমে আসি আম্বিয়া খাতুনের ব্যাপারে। সিরাজদিখান থানার ওসি তার নিকট আত্মীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু তথ্য জানতে পেরেছে।”

“বলতে থাকো।”

“আম্বিয়া খাতুনের বেশিরভাগ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন থাকে ঢাকার গেন্ডারিয়ায়। গ্রামের বাড়িতে এক চাচাতো ভাই আর এক ফুফাতো বোন ছাড়া কেউ থাকে না। তাদের সাথে আম্বিয়ার তেমন যোগাযোগ নেই। এটা তারা বলেছে সিরাজদিখান থানার ওসিকে। তবে আমার মনে হয় ওরা মিথ্যে বলেছে।”

“হুম, সেটাই স্বাভাবিক,” বললো জেফরি বেগ।

“চাচাতো ভাই জানিয়েছে আম্বিয়ার স্বামীর নাম ইসহাক আলী...” রমিজ একটু থেমে কেশে নিলো। “তবে লোকটার ডাক নাম মিলন। এ নামেই সবাই তাকে চেনে।”

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। “মিলন সম্পর্কে কতোটুকু জানা গেছে?”

“বলছি স্যার, পাতা ওল্টালো রমিজ। “মিলনের গ্রামের বাড়িও বিক্রমপুরে...শ্রীনগর থানায়। এক সময় জুডো-কারাতে শেখাতো। এলাকার লোকজন জানে সে ব্ল্যাকবেল্টধারী।”

বিস্মিত হলো জেফরি। “আচ্ছা!”

“দীর্ঘদিন সিনেমায় কাজ করেছে।”

“সিনেমায়?”

“জি, স্যার। ওর একটা ফাইটিংগ্রুপ ছিলো, গ্রুপটার নাম অবশ্য জানা যায় নি। অনেকদিন থেকেই নাকি সিনেমায় কাজ করছে না। বর্তমানে সে কি করে, কোথায় থাকে তার কিছুই জানে না আম্বিয়া খাতুনের চাচাতো ভাই।”

“মিলনের দ্বিতীয় স্ত্রী সম্পর্কে কিছু জানে না তারা?” প্রশ্ন করলো জেফরি।

“বগুড়ার মেয়ে...এর বেশি কিছু জানা যায় নি, স্যার।”

“ও...ঠিক আছে, বলো, আর কি জানা গেছে।”

“স্যার, আম্বিয়া খাতুনের চাচাতো ভাই আর কিছু জানাতে না পারলেও স্থানীয় এক ইউপি মেম্বার ওসি সাহেবকে জানিয়েছে, মিলন দীর্ঘদিন থেকে জেলে আছে।”

রিভলভিং চেয়ারের দোল খাওয়া থামিয়ে দিলো জেফরি। “তাই নাকি?”

“জি, স্যার। তবে এটার সত্যতা জানা যায় নি। এ ব্যাপারে আম্বিয়া খাতুনের চাচাতো ভাইকে জিজ্ঞেস করা হলে লোকটা জানায়, কয়েক মাস আগে কোরবানির ঈদের সময় মিলন তার বউকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে এসেছিলো। তিন-চারটা গরু কোরবানি দিয়েছে। গ্রামের অনেক লোক এটা জানে।”

“ও,” একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এলো জেফরি। “তাহলে মেম্বারের তথ্যটা সঠিক নয়...”

“তাই মনে হচ্ছে, স্যার।”

“আর কিছু?”

“আম্বিয়ার চাচাতো ভাই জানিয়েছে, মিলনের এক ছোটো ভাই আছে, সে থাকে পুরনো ঢাকার গেন্ডারিয়ায়। তার নাম দোলন।”

“গুড।”

“এই স্যার, এর বেশি জানা যায় নি।” রমিজ লস্কর আরেকটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে জেফরির দিকে তাকালো। “আর যে ফোন নাম্বারটা দিয়েছিলেন সেটার কল লিস্ট চেক করেছি।”

“হুম, বলো কি পেলে।”

“আদনান খুরশিদ তুর্য নামে সিমটা রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। গত চার পাঁচদিন ধরে ফোনটা বন্ধ আছে, স্যার।”

জেফরি চেয়ে রইলো রমিজের দিকে। “সেটা আমি জানি।”

রমিজ একটা এ-ফোর সাইজের কাগজ বাড়িয়ে দিলো জেফরির দিকে। “বন্ধ হবার চব্বিশ ঘণ্টা আগে যেসব ইনকামিং আর আউটগোয়িং কল করা হয়েছে এখানে তার সবগুলোর লিস্ট আছে।”

কাগজটা হাতে তুলে নিলো জেফরি।

ফাইলটা বন্ধ করলো রমিজ লস্কর। “আমি কি এ ব্যাপারে ফারদার ইনভেস্টিগেশন করবো, স্যার?”

জেফরি একটু ভেবে নিলো। কয়েক মুহূর্ত পর বললো, “রমিজ, আমি তোমাকে অন্য একটা কাজ দেবো। কিন্তু তার আগে তোমাকে কথা দিতে হবে, ব্যাপারটা কারো সাথে শেয়ার করতে পারবে না।”

“আপনি বললে অবশ্যই করবো না, স্যার, রমিজ দৃঢ়ভাবে বললো।

“এমন কি ফারুক স্যারকেও বলতে পারবে না।”

জেফরির মুখ থেকে এ কথা শোনার পর রমিজ লস্কর কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো তার বসের দিকে। “ঠিক আছে, স্যার। কাউকেই বলবো না,” অবশেষে বললো সে।

“গুড।”

“কাজটা কি, স্যার?” কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলো রমিজ।

“যে ফোন নাম্বারটার কললিস্ট দিলে সেটা সেন্ট অগাস্টিনের এক ছাত্রের। আমি তার বর্তমান অবস্থান খুঁজে বের করতে চাই।”

রমিজ লস্কর হতাশ হলো। একটা স্কুলছাত্রকে খুঁজে বের করার জন্য তাকে বলা হচ্ছে? তাও আবার পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখতে অনুরোধ করছে তার বস। আজব ব্যাপার!

“এর আর এমন কি...”

রমিজ লস্করের দিকে চেয়ে রইলো জেফরি বেগ। “কিন্তু কাজটা যতো সহজ ভাবছো ততোটা সহজ না।”

“ছেলেটা কি হাসান সাহেবের খুনের সাথে জড়িত? এখন আত্মগোপন করে আছে?”

“আমি সেরকমই ধারনা করছি।”

“ওকে স্যার, নো প্রবলেম।”

“কিন্তু প্রবলেম একটা আছে, রমিজ।”

“কিসের প্রবলেম?” অবাক হলো রমিজ লস্কর।

“ছেলেটার বাবা খুবই ক্ষমতাবান, রমিজের দিকে স্থিরচোখে চেয়ে বললো জেফরি।

“আই ডোন্ট কেয়ার, রমিজ বেশ দৃঢ়তার সাথে বললো কথাটা।

“তুর্য। আদনান খুরশিদ তুর্য,” আস্তে করে বললো জেফরি।

রমিজ লস্কর কিছু বুঝতে পারলো না। এই নামটা তো একটু আগে সে নিজেই তার বসকে জানিয়েছে। “জি, স্যার। ছেলেটা কোন ক্লাসে পড়ে?”

“ক্লাস টেন।”

“ওকে। আমি আজ থেকেই কাজ শুরু করে দিচ্ছি।”

“রমিজ?”

“জি, স্যার?”

“ছেলেটার বাবা কে জানো?”

“কে?”

“আমাদের হোমমিনিস্টার। মাহমুদ খুরশিদ!”

রমিজ লস্করের মনে হলো জেফরি বেগ তার সাথে ঠাট্টা করছে। কিন্তু সে ভালো করেই জানে কাজের সময় তার বস্ কোনো রকম ঠাট্টা-তামাশা করে না। “হোমমিনিস্টারের ছেলে?!” বিস্মিত রমিজ লস্কর বলে উঠলো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি বেগ।

“কী বলছেন, স্যার!”

অধ্যায় ৩২

বিশ্বজিৎ সান্যাল বরাবরের মতো একটু দেরি করে সেন্ট অগাস্টিন থেকে বের হয়ে এলো। মেইনগেটের বাইরে এসে এদিক ওদিক তাকালো ভদ্রলোক। ইদানিং রিক্সায় করে বাড়ি ফেরে না। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় অর্ধেক পথ চলে আসে, তারপর রাস্তার পাশে কোনো চায়ের দোকানে বসে এক কাপ চা খেয়ে রিক্সা নিয়ে নেয়, নয়তো আবার হাটা শুরু করে।

সেন্ট অগাস্টিন থেকে তার বাড়ির দূরত্ব খুব বেশি হলে তিন-চার মাইল। এটা তার কাছে কোনো দূরত্বই না। ছোটোবেলায় বাড়ি থেকে দশ মাইল পায়ে হেঁটে রোজ রোজ স্কুলে যেতো। আজকালকার ছেলেপুলেরা এ কথা হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না। আর সেন্ট অগাস্টিনের বড়লোকের ছেলেমেয়েরা এটাকে নির্ঘাত গাঁজাখুরি গল্প মনে করবে।

ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে লাগলো বিশ্বজিৎ সান্যাল । স্কুল থেকে বেশ খানিকটা দূরে আসার পর তার কেন জানি মনে হলো কেউ তাকে অনুসরণ করছে। পেছনে ফিরে তাকালো। না। কেউ নেই। ফুটপাতটা একেবারেই নিরিবিলি। রাস্তায় অবশ্য কিছু গাড়িঘোড়া চলছে।

হাঁটতে হাঁটতে একটা নিরিবিলি জায়গায় চলে এলো সে। তার বাম দিকে রাস্তার উপর একটা রিক্সা, অনেকটা তার পাশাপাশি চলছে। ব্যাপারটা খেয়াল করতেই বিশ্বজিৎ সান্যাল সেদিকে তাকালো।

রিক্সার যাত্রিকে দেখে রীতিমতো ভিমরি খেলো সান্যাল বাবু। বরফের মতো জমে গেলো যেনো। রিক্সাটাও থেমে গেলো তার পাশে।

"কেমন আছেন, মি: সান্যাল ?"

জেফরি বেগের প্রশ্নটা শুনে থ বনে গেলো বাবু। কিছু বলার আগেই রিক্সা থেকে নেমে এলো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর।

"আপনি?" আড়ষ্ট ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কথাটা বের হয়ে গেলো।

"অবাক হয়েছেন?" জেফরি এসে বিশ্বজিৎ সান্যালের হাতটা ধরে করমর্দন করলো।

"না, মানে..." বাবু আর কিছু বলতে পারলো না।

"বাসায় যাচ্ছেন নিশ্চয়?"

"হ্যা।" বিশ্বজিৎ সান্যালের চোখেমুখে অজ্ঞাত ভীতি জেঁকে বসেছে।

"চলুন, এক কাপ চা খাওয়া যাক," জেফরি প্রস্তাব দিলো।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো বাবু।

"আপনার বাসায় তো কেউ নেই। ওখানে গিয়ে কি করবেন?...তারচেয়ে বরং চা খেয়ে গল্প করা যাক, কী বলেন?"

জেফরির কথার মধ্যে অন্য রকম কিছুর গন্ধ আছে, বিশ্বজিৎ সান্যাল বুঝতে পারছে সেটা। এই ইনভেস্টিগেটরকে না বলা মানে সন্দেহের বেড়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা।

"চলুন," কথাটা বলেই বাবুর হাত ধরে রিক্সার দিকে টেনে নিয়ে গেলো জেফরি। "রিক্সায় উঠুন। সামনের কোনো ভালো রেস্টুরেন্টে বসে চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।"

একান্ত অনিচ্ছায় বিশ্বজিৎ সান্যাল উঠে পড়লো রিক্সায়।

.

জেফরি আর বিশ্বজিৎ সান্যাল বসে আছে একটা রেস্টুরেন্টে। তাদের সামনে দু'কাপ চা। একটু আগে তারা এখানে এসে পৌঁছেছে। রিক্সায় যতোক্ষণ ছিলো বাবু কোনো কথা বলে নি। জেফরিও আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যায় নি। যা বলার চা খেতে খেতে ধীরেসুস্থে বলবে।

জেফরি চায়ে চুমুক দিলেও বিশ্বজিৎ সান্যাল কাপটা ধরেও দেখছে না।

"কি হলো?...চা নেন," তাড়া দিলো জেফরি বেগ।

বাবু চেয়ে রইলো ইনভেস্টিগেটরের দিকে। "আপনি কি আমার কাছে থেকে কিছু জানতে চান?" অনেকটা ভয়ে ভয়ে বললো বিশ্বজিৎ সান্যাল ।

“আপনার এরকম মনে হচ্ছে কেন?” চায়ে চুমুক দিয়ে বললো জেফরি।

“না, মানে...” বাবু আর বলতে পারলো না।

চওড়া হাসি দিলো জেফরি। “শুনুন বাবু, আমরা প্রফেশনাল ইনভেস্টিগেটর। আমাদের কাছ থেকে কেউ কিছু লুকালে কোনো লাভ হয় না। একটু দেরি হয়, বাড়তি কষ্ট করতে হয়, কিন্তু যা জানার তা আমরা ঠিকই জানবো।”

“আপনি আমাকে এসব কথা বলছেন কেন?” কিছুটা অবাক হয়ে বললো বিশ্বজিৎ সান্যাল ।

“কারণ আমি চাই না, এ মুহূর্ত থেকে আপনি কোনো কিছু গোপন করার চেষ্টা করেন।” চায়ে চুমুক দিয়ে মুচকি হাসলো জেফরি।

“আ-আমি...”

হাত তুলে থামিয়ে দিলো সে। “আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।”

বাবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও চায়ের কাপটা তুলে নিলো তবে চুমুক দিলো না।

“আমি কিন্তু আপনার কাছে কোনো কিছু গোপন করি নি...”।

“একদিক থেকে বলতে গেলে আপনার কথাটা সত্যি।”

বিশ্বজিৎ সান্যাল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। কিছু বলতে গিয়েও বললো না।

“আপনি আসলেই কিছু গোপন করেন নি, কোনো কিছু লুকান নি।”

“তাহলে যে বললেন?”

“দোষটা আসলে আমার।”

“আপনার দোষ মানে?”

“কারণ হোমমিনিস্টারের ছেলে তুর্য আর হাসানের মধ্যে যে ঝামেলাটা হয়েছিলো সে ব্যাপারে আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেসই করি নি। আর যেহেতু জিজ্ঞেস করি নি, আপনিও আমাকে কিছু বলেন নি।” কথাটা বলেই জেফরি হেসে ফেললো। সে লক্ষ্য করলো বিশ্বজিৎ সান্যাল প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছে। “অবশ্য তখন আমি এই ঘটনাটা জানতামও না।”

ঢোক গিললো বাবু। পুরোপুরি নার্ভাস হয়ে গেছে। উদভ্রান্তের মতো আশেপাশে তাকালো। কী বলবে বুঝতে পারছে না।

“নিশ্চয় এখন আর বলবেন না, আপনি কিছু জানেন না?”

বিশ্বজিৎ সান্যালের শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়ে গেলো।

“শুনুন, মি: সান্যাল। এখন থেকে আপনি মিথ্যে বললে বিরাট সমস্যায় পড়ে যাবেন।” কথাটা বলেই বিশ্বজিৎ সান্যালের চায়ের কাপের দিকে তাকালো সে। “মনে হচ্ছে চা খাবার রুচি হারিয়ে ফেলেছেন।”

“দেখুন, আমি একজন সামান্য ক্লার্ক-”।

“প্লিজ,” কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো জেফরি। “এরকম অক্ষমতার কথা বলবেন না। এরকম কথা শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে।”

“আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমার অবস্থাটা?” আকুতি জানিয়ে বললো বিশ্বজিৎ সান্যাল।

“অবশ্যই বুঝতে পারছি,” কথাটা বলে বাবুর হাতের উপর একটা হাত রাখলো সে। “আর সেজন্যেই স্কুলে গিয়ে সবার সামনে আপনাকে এবং আমার ঐ বিগ ব্রাদারকে নাস্তানাবুদ করি নি।”

“আপনি একজন রেসপনসিবল মানুষ, আপনি আমাদের অবস্থাটা বুঝবেন। হোমমিনিস্টারের ছেলের বিরুদ্ধে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কিছু বলতে পারে না।”

“অবশ্যই পারে না। আপনাদের অবস্থা আমার চেয়ে ভালো আর কে বুঝবে।”

“তাহলে আমাদেরকে এসব ঝামেলায় জড়ানো কি ঠিক হচ্ছে?”

“আপনি কি করে ভাবলেন, আমি আপনাদেরকে ঝামেলায় জড়াবো?” জেফরি তার চায়ের কাপটা শেষ করে ফেললো। “আমাকে দেখে কি কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ বলে মনে

হয়?”

বাবু অবাক হয়ে চেয়ে রইলো, কিছু বললো না।

“না, মি: সান্যাল। আমি ভালো করেই জানি, হোমমিনিস্টারের ছেলের বিরুদ্ধে এভাবে সরাসরি অভিযোগ আনা যাবে না।”

“তাহলে আমার কাছ থেকে এসব জানতে চাচ্ছেন কেন?”

“বলতে পারেন, তথ্যটা যাচাই করে দেখতে চাচ্ছি। কারণ যা জেনেছি তা যদি সত্যি হয় তাহলে এই ঘটনায় আরো অনেকেই ফেঁসে যাবে। তার মধ্যে আপনিও আছেন।”

বাবুর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। “আপনাকে এসব কে বলেছে? আর আমি কেন ফেঁসে যাবো? আমি তো কিছু করি নি।”

‘কার কাছ থেকে জেনেছি সেটা পরে বলছি,” জেফরি বললো। “তার আগে বলুন, তুর্যের সাথে হাসানের ঘটনাটা আপনি কতোটুকু জানেন? আর আপনি নিজে কতোটুকু জড়িত ছিলেন তাতে?”।

বিশ্বজিৎ সান্যাল ঢোক গিলে চেয়ে রইলো জেফরি বেগের দিকে।

রমিজ লস্কর প্রথমে ভিমরি খেলেও জেফরির কথামতো কাজে নেমে পড়েছে। হোমমিনিস্টারের ছেলেই হোক আর প্রেসিডেন্টের নাতি, তার কি? ঝড়ঝাপটার সবটাই যাবে তার বসের উপর দিয়ে।

জেফরি বেগ তাকে আশ্বস্ত করেছে, তার কোনো সমস্যা হবে না। সে জানে, ইনভেস্টিগেটর বেগ যখন কথা দিয়েছে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। এই লোক তার অধস্তনদের কোনো সমস্যায় ফেলবে না। দরকার হলে এক কথায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। ডিপার্টমেন্টের সবাই এটা জানে। তাদের মতো রুটিরুজির চিন্তায় সারাক্ষণ জড়োসড়ো হয়ে থাকে না জেফরি বেগ।

এখন সে বসে আছে হোমিসাইডের কমিউনিকেশন রুমে। হোমমিনিস্টারের ছেলে তুর্যের ফোনকলের লিস্ট তার কাছে। সেই লিস্ট থেকে বের করতে হবে তুর্যের ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধু-বান্ধবকে।

তার বস্ অবশ্য বলে দিয়েছে, ভালো হয় তুর্যের প্রাইভেট টিউটরকে পেলে। ছেলেটা নিশ্চয় একাধিক টিউটরের কাছে পড়ে। প্রাইভেট টিউটর মিনিস্টারের বাড়িতে যায়। সুতরাং তুর্য কোথায় আছে সেটা জানা যাবে তার মাধ্যমে।

রমিজ এবার অন্যভাবে কাজটা করলো। তুর্যের নাম্বারে যেসব ইনকামিং এসএমএস এসেছে সেগুলো ঐ ফোন কোম্পানি থেকে একটু আগে জোগাড় করেছে সে।

মাত্র নয়টি এসএমএস। কিন্তু এরমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে।

একটা এসএমএস বাদে সবগুলোই রিটা নামের এক মেয়ের কাছ থেকে এসেছে।

তবে ওই একটা এসএমএস করা হয়েছে 'ম্যাথ টিচার' নামে সেভ করা নাম্বার থেকে। রমিজ লস্করের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তার স্যার জানতে পেলে খুশিই হবে।

এসএমএস'টা ওপেন করে পড়লো সে :

আমার আধ ঘণ্টা লেট হবে। ওকে?

এসএমএস'টা করা হয়েছে গত বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়, অর্থাৎ হাসানের খুন হবার আগের দিন।

তুর্যের ম্যাথ টিচার!

রমিজ লস্কর মুচকি হাসলো। কাজ শুরু করার মতো একজনকে পেয়ে গেছে সে।

হোমমিনিস্টারের বখে যাওয়া ছেলে তুর্য। বাবা হোমমিনিস্টার হবার পর তার আচার আচরণে বিরাট পরিবর্তন আসে। কাউকে তোয়াক্কা না করার প্রবণতা দেখা যায়। ক্লাস টেনে পড়া এক ছেলে, বয়স বড়জোর পনেরো, অথচ এই বয়সেই বদমায়েশিতে হাত পাকিয়ে ফেলেছে।

আজ থেকে সাড়ে তিন মাস আগে সেন্ট অগাস্টিনে একটি নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে।

সবেমাত্র ক্লাস টেনে ওঠা আদনান খুরশিদ তুর্য তারই এক ক্লাসমেট সিমরানকে নিয়ে সেন্ট অগাস্টিনের ছয় তলার উপর নিরিবিলি এক কক্ষে গোপন কাজকারবারে ব্যস্ত ছিলো। ছয় তলার উপর সেই ফ্লোরটার কন্ট্রাকশন সবেমাত্র শেষ হয়েছে, তখনও সেটা ব্যবহার উপযোগী হয়ে ওঠে নি। ওখানকার একটা রুম স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

তুর্য আর সিমরান সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে চলে যায় সেই স্টোররুমে। তুর্য কিভাবে দরজার তালা খুলতে পেরেছিলো সেটা একটা রহস্য। যাইহোক, অল্পবয়সী দুটো ছেলেমেয়ে ফাঁকা একটি কক্ষে ঢুকে অ্যাডভেঞ্চারে মত্ত হয়ে পড়ে। তারা শুধু যৌনকর্মেই লিপ্ত ছিলো না, পুরো ঘটনাটি ভিডিও করছিলো মোবাইলফোনের ক্যামেরায়।

সিমরানও এক ধনী পরিবারের বখে যাওয়া মেয়ে। ক্যামেরায় যে সঙ্গমের দৃশ্য ধারণ করা হচ্ছে সে ব্যাপারে পুরোপুরি জ্ঞাত ছিলো সে। তাদের কাছে ব্যাপারটা নিছক

অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

কিন্তু বিপত্তি বাধায় হাসান।

সত্যি বলতে, নিরীহ গোবেচারা হাসান ঘটনাচক্রে এসে পড়ে সেখানে। কী একটা কাজে বিশ্বজিৎ সান্যাল হাসানকে ছয় তলার উপরে স্টোররুমে পাঠিয়েছিলো।

হাসান স্টোররুমে ঢোকার আগেই লক্ষ্য করে ফ্লোরে ঢোকার যে কলাপসিবল গেট আছে সেটার তালা খোলা। অবাক হয় সে। এটার চাবি তো বিশ্বজিৎ সান্যাল আর তার কাছে আছে। স্টোররুমের কাছে আসতেই অদ্ভুত গোঙানির শব্দ শুনতে পায় সে।

উত্তেজনার চোটে কিংবা বেখেয়ালের কারণে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলো মিনিস্টারের ছেলে। হাসান দরজা ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে যায়। ভেতরে ঢুকে যে দৃশ্যটা সে দেখতে পায় সেটা তার কল্পনাতেও ছিলো না।

স্কুলের দুটো অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে যৌনক্রিয়ায় মগ্ন!

হাসানকে ঘরে ঢুকতে দেখে তুর্য আর সিমরানও ভড়কে যায়। কিন্তু তাদের কিছুই করার ছিলো না। বুঝতে পারে জুনিয়র ক্লার্কের কাছে ধরা পড়ে গেছে তারা।

বিস্মিত হাসান আরো লক্ষ্য করে পাশে একটা টেবিলের উপর মোবাইলফোন সেটআপ করা। সেটাতে পুরো দৃশ্যটা রেকর্ড করা হচ্ছে।

অচিন্তনীয় একটি ঘটনা।

তুর্য আর সিমরান দ্রুত জামাকাপড় পরে নিলেও ততোক্ষণে মোবাইলফোনটা কেড়ে নিয়ে নেয় হাসান। শুরু হয় হাসানের সাথে তুর্যের বাকবিতন্ডা। হাসানকে কঠিনভাবে শাসায় মিনিস্টারের ছেলে। মোবাইলফোনটা ফেরত দিয়ে দিতে বলে। শুধু তা-ই নয়, পুরো ঘটনাটি যেনো কাউকে না বলে সেজন্যে হুমকি পর্যন্ত দেয়। হাসান অবশ্য জানতো না তুর্য নামের বখে যাওয়া ছেলেটি নতুন হোমমিনিস্টারের একমাত্র সন্তান।

তুর্যের হুমকি-ধামকিতে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে যায় হাসান। এক পর্যায়ে কষে চড় মারে তাকে। হাসানের হাত থেকে মোবাইলফোনটা কেড়ে নিতে গেলে তুর্যের সাথে তার ধস্তাধস্তি পর্যন্ত হয়। কিন্তু শারিরীকভাবে হাসানের সাথে পেরে ওঠে না পনেরো বছরের তুর্য। ধস্তাধস্তির সময় সিমরান ছয় তলা থেকে দ্রুত সটকে পড়লেও তাতে কোনো লাভ হয় না। হাসানের কাছে অকাট্য প্রমাণ রয়ে যায়-তুর্যের মোবাইলফোনে ধারণ করা তাদের অপকর্মের ভিডিও।

হাসান তুর্যকে জাপটে ধরে নীচে নিয়ে আসতে গেলে ছেলেটা কোনো রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে যায়।

হাসান সোজা চলে আসে বিশ্বজিৎ সান্যালের কাছে। সব ঘটনা জানায় তাকে। সান্যালবাবু সব শুনে যারপরনাই বিস্মিত আর মর্মাহত হয়। তবে হাসানের মতো বাবুও জানতো না তুর্যের পরিচয়। হাজার হোক, তারা তো শিক্ষক নয়, সামান্য ক্লার্ক। ছাত্রছাত্রীদের সাথে খুব কমই তাদের দেখাসাক্ষাত হয়।

বিশ্বজিৎ সান্যাল সব শুনে তৎক্ষণাত হাসানকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসে প্রিন্সিপ্যাল অরুণ রোজারিওর রুমে। রাগে ক্ষিপ্ত হাসান আর বিশ্বজিৎ সান্যাল সব খুলে বলে সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যালকে। ঘটনা শুনে রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি, কিন্তু মোবাইলফোনে ধারণ করা পর্নো ভিডিওটা দেখে চুপসে যান।

অরুণ রোজারিও বুঝতে পারেন, হাসান আর বিশ্বজিৎ বাবু কার সম্পর্কে কথা বলছে। তিনি তাদেরকে জানান, তুর্য হোমমিনিস্টারের একমাত্র সন্তান। কথাটা শুনে হাসান আর বিশ্বজিৎ সান্যাল ভড়কে যায়।

ততোক্ষণে পানি অনেক দূর গড়িয়েছে। তুর্য চলে গেছে স্কুল থেকে। অরুণ রোজারিও বুঝতে পারছিলেন না তার কী করা উচিত। হোমমিনিস্টারকে ব্যাপারটা জানাবেন কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। হাসানের কাছ থেকে মোবাইলফোনটা নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেন তিনি। বিশ্বজিৎ সান্যাল আর হাসানকে বলে দেন এ ঘটনা যেনো অন্য কেউ না

জানতে পারে। ব্যাপারটা তিনি দেখবেন।

কিন্তু অরুণ রোজারিও কিছু দেখার আগেই পরদিন আরেকটা বাজে ঘটনা ঘটে যায়।

স্কুল ছুটির পর বিশ্বজিৎ সান্যালের রুমে ঢুকে হাসানকে পিস্তল দিয়ে ভয় দেখায় তুর্য। পিস্তলটা ছিলো তার বাবা হোমমিনিস্টারের লাইসেন্স করা। বাবার অগোচরে আলমিরা থেকে সেটা নিয়ে স্কুলে চলে আসে সে। তুর্য তার মোবাইলফোন ফেরত চায় হাসানের কাছে। ঐ সময় সান্যাল বাবু ছিলো টয়লেটে। দারুণ ভয় পেয়ে যায় হাসান। তুর্যের মারমুখি আচরণে একদম অসহায় হয়ে পড়ে সে। ছেলেটাকে জানায়, তার মোবাইলফোন প্রিন্সিপ্যালের কাছে দিয়ে দিয়েছে। এ কথা শুনে তুর্য রেগেমেগে হাসানকে গুলি করতে উদ্যত হয় কিন্তু টয়লেট থেকে বের হয়ে সান্যাল বাবু পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরে ফেলে। অল্পের জন্য রক্ষা পায় জুনিয়র ক্লার্ক।

হাসান আর বিশ্বজিৎ বাবু মিলে পিস্তলসহ তুর্যকে ধরে নিয়ে আসে প্রিন্সিপ্যালের রুমে। অরুণ রোজারিও পুরো ব্যাপারটা শুনে যারপরনাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে হোমমিনিস্টারকে ফোন করেন, কিন্তু ফোনটা ধরে মিনিস্টারের পিএস। সব শুনে পিএস ছুটে আসে সেন্ট অগাস্টিনে।

হাসান, বিশ্বজিৎ সান্যাল আর প্রিন্সিপ্যাল অরুণ রোজারিও অবাক হয়ে দেখতে পায়, তুর্যের বিচার তো দূরের কথা, উল্টো তাদেরকে শাসাচ্ছে পিএস আলী আহমেদ। ফোনটা ফেরত দিতে বলে, সেইসাথে পুরো ঘটনা চেপে যেতে বলে তাদেরকে। এই ঘটনা যদি জানাজানি হয় তাহলে তাদের কারোর জন্যই ভালো হবে না বলেও হুমকি দেয়া হয়।

অরুণ রোজারিও অসহায়ের মতো আত্মসমর্পন করেন। এদেশের হোমমিনিস্টার কতোটা ক্ষমতা রাখে সেটা তিনি ভালো করেই জানতেন। তুর্যের মোবাইলফোন আর হোমমিনিস্টারের লাইসেন্স করা পিস্তলটা পিএসের কাছে ফেরত দিয়ে দেন তিনি।

ক্ষমতার সামনে অসহায় অরুণ রোজারিও রাগে অপমানে হতবাক হয়ে পড়েন। তারই স্কুলের এক পুচকে ছেলে এতো বড় অপরাধ করার পরও তিনি কিছু করতে পারলেন না শুধুমাত্র এই কারণে যে, ছেলেটার বাপ হোমমিনিস্টার!

তার অধীনস্ত কর্মচারি হাসান আর সান্যাল বাবুর সামনে দারুণ অপমানিত বোধ করেন প্রিন্সিপ্যাল। শেষে সান্যাল বাবু আর হাসানকে বলে দেন, পুরো বিষয়টা যেনো কাউকে কোনোদিন না বলে। বললে তারা সবাই ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে।

কিন্তু কারো কাছে মুখ খোলার আগেই তারা আবারো বিপদে পড়ে যায়।

এ ঘটনার দুদিন পরই স্কুলে ছুটে আসে তুর্যের বডিগার্ড আর পিএস আলী আহমেদ। তাদের আচরণ ছিলো বেশ মারমুখি। পারলে অরুণ রোজারিওকে স্কুলেই মেরে ফেলে। প্রথমে সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যাল কিছুই বুঝতে পারেন নি। পরে যখন তাকে বলা হলো, তুর্যের ভিডিওটা ইন্টারনেটে আপলোড করা হয়েছে, সেটা এখন লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখছে তখন তিনি ঘাবড়ে যান।

এটা কি করে সম্ভব? মোবাইলফোনটা তিনি বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু পরদিনই তো ফেরত দিয়ে দিয়েছেন পিএসের কাছে। ভিডিওটা তিনি যে দেখেন নি তা নয়, দুএকবার সেই জঘন্য পর্নোগ্রাফিটা দেখলেও ফোনটা তিনি ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলেন। তুর্যের ফোনটা তার কাছে মাত্র একরাতের জন্য ছিলো-এই সময়ের মধ্যে ভিডিওটা কে কপি করলো, আর কে-ই বা আপলোড করে দিলো ইন্টারনেটে?

অরুণ রোজারিও দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করলেও পিএসের মারমুখি আচরণের সামনে ভড়কে যান। মুখ ফসকে বলে ফেলেন, কাজটা খুব সম্ভবত হাসান করে থাকতে পারে। কেননা, সে-ই হাতেনাতে। তুর্যকে ধরেছিলো। অরুণ রোজারিওর হাতে দেবার আগে তার কাছেই ছিলো মোবাইলফোনটা।

প্রিন্সিপ্যালের রুমে ডেকে এনে হাসানকে কঠিন জেরা করে পিএস আলী আহমেদ। কিন্তু দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে হাসান। সে জানায়, ফোনটা হাতে পাবার পরই সান্যাল

বাবুকে নিয়ে প্রিন্সিপ্যালের রুমে চলে আসে। তারপর থেকে ফোনটা অরুণ রোজারিওর কাছেই ছিলো।

অনেক হুমকি-ধামকি আর ভয় ভীতি দেখানোর পরও যখন কোনো লাভ হলো না তখন পিএস আলী আহমেদ স্কুল কম্পাউন্ড থেকে চলে যায়, যাবার আগে শীতলকণ্ঠে বলে যায়, এরজন্য তাদেরকে পস্তাতে হবে।

নিরীহ হাসান খুব ভয় পেয়ে গেছিলো এ ঘটনায়। তার মাথায় ঢোকে না, দেশের হোমমিনিস্টার, যার উপর সারা দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত, তারই স্কুল পড়ুয়া ছেলে এতোবড় অন্যায় করার পরও উল্টো তাদেরকে হুমকি দেয়া হচ্ছে!

হাসানের দৃঢ় বিশ্বাস, ইন্টারনেটে ভিডিও আপলোড করার কথাটা ডাহা মিথ্যা। তাদের মুখ বন্ধ রাখার জন্য এই অপবাদ দেয়া হয়েছে।

অবশ্য প্রিন্সিপ্যাল অরুণ রোজারিও এটা মনে করেন নি। ঐদিন বাসায় ফেরার আগেই তার মনে সন্দেহ হতে থাকে, খুব সম্ভবত তার ছোটো ভাই টিংকু তুর্যের মোবাইল থেকে ভিডিওটা আপলোড করে থাকতে পারে। কারণ মোবাইলফোনটা রেখেছিলেন স্টাডিরুমের ড্রয়ারে। সেই রুমটাই এখন ব্যবহার করে তার ছোটো ভাই টিংকু-যে কিনা বছরখানেক আগে ঢাকার একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য তার বাসায় এসে উঠেছে। তার এই ভাইটি সারাক্ষণ ইন্টারনেট নিয়ে ডুবে থাকে।

অরুণ রোজারিও নিজের ছোটো ভাইকে সন্দেহ করলেও এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেন নি। পুরো ব্যাপারটা চেপে যান।

ওদিকে সান্যাল বাবু হাসানকে বার বার বলে দেয়, এ ঘটনার কথা যেনো অন্য কেউ না জানে। হয়তো কিছুদিন পর মিনিস্টারের ছেলে আর তার পরিবার ব্যাপারটা ভুলে যাবে।

সত্যি বলতে কি, তা-ই হয়েছিলো। এরপর আর কিছু হয় নি। হোমমিনিস্টার তার ক্ষমতাবলে ইন্টারনেট থেকে তুর্যের পর্নো ভিডিওটা রিমুভ করতে সক্ষম হন। কয়েক সপ্তাহ পর পুরো ব্যাপারটাই বিস্মৃত হয়ে যায়।

.

বিশ্বজিৎ সান্যাল মাথা নীচু করে বসে আছে। একটু আগে পুরো ঘটনাটা খুলে বলেছে ভদ্রলোক।

জেফরি বেগ এই ঘটনার খুব কমই জানতো, কারণ নিহত হাসান তার ডায়রিতে বিস্তারিত কিছু লেখে নি। শুধু তুর্য নামের ছেলেটা জঘন্য অপরাধ করার পরও পার পেয়ে যাবার কথা লেখা আছে। আরো আছে, তুর্য ছেলেটা যেকোনো সময় তার ক্ষতি করতে পারার আশংকা।

এখন পুরো ঘটনা জানার পর বুঝতে পারছে হাসানের খুনের রহস্যটা। সব কিছুর পেছনে আছে ঐ বখে যাওয়া ছেলে, হোমমিনিস্টারের আদরের দুলাল তুর্য।

"আমার ধারণা ঐ দিন আপনি আরো কিছু দেখেছিলেন, তাই না?"

বিশ্বজিৎ সান্যাল জেফরির দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

"আপনি আরো কিছু জানেন, মি: সান্যাল । আমার কাছে সব বলুন। আমার সাথে কো-অপারেট করলে আপনার কোনো সমস্যা হবে না।"

একটা টোপ দিলো জেফরি। তার ধারণা হাসান যেদিন খুন হয় সেদিন আরো কিছু ঘটনা ঘটেছে যা অরুণ রোজারিও আর সান্যাল বাবুসহ সেন্ট অগাস্টিনের অনেকেই গোপন করে যাচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বজিৎ সান্যাল মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"তুর্যের বডিগার্ড লোকটা..."।

চমকে উঠলো জেফরি বেগ। "হ্যাঁ, বডিগার্ড লোকটা কি?"

"হাসান যেদিন খুন হয় সেদিন আমি ওকে টয়লেট থেকে বের হতে দেখেছি!"

"কি!"

অধ্যায় ৩৪

পর দিন নিজের অফিসে বসে আছে জেফরি বেগ। তার সামনে বসে আছে রমিজ লস্কর। একটু আগে জেফরি তাকে জানিয়েছে গতকাল বিশ্বজিৎ সান্যাল তুর্যের বডিগার্ড সম্পর্কে কি বলেছে।

সেন্ট অগাস্টিনের জুনিয়র ক্লার্ক হাসানের রহস্যময় হত্যাকাণ্ডটি এখন উন্মোচিত হয়ে গেছে বলা যায়।

বডিগার্ড লোকটি বৃহস্পতিবার শেষ বিকেলে সেন্ট অগাস্টিনে ঢুকেছিলো। সান্যাল বাবু নিজের অফিসরুমের জানালা দিয়ে দেখেছে লোকটা টয়লেট থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা খেয়াল করেছিলো বাবু। কেমন জানি নাভার্স আর তাড়াহুড়ার ভাব ছিলো। তুর্যের বডিগার্ড হিসেবে লোকটা প্রায়ই স্কুলে ঢুকতো সুতরাং পরদিন টয়লেটের ভেতরে হাসানের লাশটা পাওয়ার আগ পর্যন্ত এ ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামান নি ভদ্রলোক।

সাড়ে তিনমাস আগে তুর্যের সাথে হাসানের ঝামেলাটার কথা ভালো করেই জানে সান্যাল বাবু। তুর্যের পর্নো ভিডিওটা যখন ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে তখন মিনিস্টারের পিএস প্রিন্সিপ্যাল আর হাসানকে শাসিয়ে গিয়েছিলো।

"স্যার, তাহলে তো ঘটনা একদম পরিস্কার," সব শোনার পর বললো রমিজ লস্কর।

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি বেগ।

"এজন্যেই তুর্যকে আড়াল করে রেখেছেন মিনিস্টার।"

"আমার মনে হয় ছেলেটা তার নিজের বাড়িতেই আছে," জেফরি বেগ বললো।

"হতে পারে, স্যার।"

"একজন মিনিস্টারের বাড়ির চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর হয় না। কারো সাধ্য নেই ওখানে ঢুকে খোঁজ নেয়া। হাতেগোনা নিজস্ব কিছু লোকজন ছাড়া কেউ ঢুকতেও পারে না।"

"তাহলে তো তুর্যের নাগাল পাওয়া খুব কঠিন হয়ে যাবে। আমরা তো ইচ্ছে করলেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবো না," বললো রমিজ।

"কাজটা যে খুব কঠিন সেটা আমিও জানি কিন্তু অসম্ভব নয়।"

রমিজ লস্কর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

"পুলিশি তদন্তে যে কাউকে জিজ্ঞাসবাদ করা যায়। আইন আমাদের সে ক্ষমতা দিয়েছে। এ কাজে কেউ বাধা দিলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে পারমিশন নিয়েও কাজটা অনায়াসে করা সম্ভব।

"আপনি কি সেটাই করবেন, স্যার?" রমিজ লস্করের চোখেমুখে ভয়।

"না। আপাতত এরকম কিছু করার ইচ্ছে আমার নেই।"

"তাহলে আপনি এখন কি করতে চাচ্ছেন?"

"মিলনকে ট্র্যাকডাউন করার পাশাপাশি তুর্যের মোবাইল ফোনটাও মনিটর করতে থাকো। আমি নিশ্চিত, ফোনটা সে ব্যবহার করবেই," বললো জেফরি বেগ।

"জি, স্যার," মাথা নেড়ে সায় দিলো রমিজ লস্কর। একটু চুপ থেকে বললো, "স্যার, আমরা যদি তুর্যের বিরুদ্ধে শক্ত কোনো প্রমাণ পেয়ে যাই তখন কী হবে?"

জেফরি জানে এরকম কিছু হলে আসলেই একটা সংকটে পড়ে যাবে। এ দেশের পলিটিশিয়ানরা যতোই জোর গলায় গণতন্ত্র আর আইনের শাসনের কথা বলুক না কেন, আদতে সবই ফাঁপা বুলি। যতো বড় অন্যায়ই করুক না কেন, ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের কিছুই করা যায় না। এদিক থেকে দেখলে জেফরির সমস্যা আরো প্রকট-তাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে খোদ হোমমিনিস্টারকে। নিজের একমাত্র ছেলেকে রক্ষা করার জন্য তিনি সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করবেন সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করে দিয়েছেন।

তাই বলে জেফরি পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলবে না। এই কেসটার শেষ দেখতে চায় সে। আগেভাগে আশংকা করে থেমে যাবার কোনো মানেই হয় না।

"কী হবে না হবে সেটা ভাবার দরকার নেই। আমরা আমাদের কাজ করে যাবো," কয়েক মুহূর্ত পর বললো জেফরি বেগ। "এখন আমাদের উচিত শুধুমাত্র কেসটা নিয়ে ভাবা। শক্ত প্রমাণ পাবার পর এসব নিয়ে ভাবা যাবে।"

"কিন্তু সতর্ক থাকা উচিত না, স্যার?" রমিজ লস্কর বললো। "হাজার হলেও হোমমিনিস্টারের ছেলের ব্যাপার। তারা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে আমরা অনেক কিছু জেনে গেছি তাহলে কিন্তু আমাদেরও সমস্যা হবে।"

উদ্বিগ্ন রমিজ লস্করের দিকে চেয়ে রইলো জেফরি। "ঠিক আছে। এখন থেকে যা যা জানতে পারবে সেগুলো কারো সাথে শেয়ার কোরো না। এমনকি ফারুক স্যারের সাথেও না।"

রমিজ চুপ করে থাকলো। কথাটা সত্যি। তার বস জেফরি বেগ এই কেসটার অগ্রগতি নিয়ে কারা সাথে কোনোরকম আলোচনা করছে না। অথচ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাদের হাতে চলে এসেছে।

"এই কেসে একটা বিরাট খটকা এখনও রয়ে গেছে," বললো জেফরি।

"সেটা কি, স্যার?"

"মিলন। সন্ত্রাসী মিলনের কানেকশানটা এখনও পরিস্কার নয়। তাছাড়া বাস্কেটবলের কোচ সেজে যারা গেছিলো তাদের মধ্যে মিলন ছিলো কিনা সে ব্যাপারে কিন্তু আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারি নি।"

রমিজ লস্কর আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আমি আর্টিস্টের সাথে সিটিং দেবো, মিলনের একটা পোর্ট্রেইট তৈরি করতে হবে। সেই ছবি দেখে যদি সেন্ট অগাস্টিনের ফিজিক্যাল ট্রেইনার চিহ্নিত করতে পারে তাহলে বুঝতে পারবো মিলনই ঐদিন কোচ সেজে স্কুলে গেছিলো।"

"আমার মনে হয় ফারদার ইনভেস্টিগেশন করার আগে এটাই করা উচিত, স্যার," বললো রমিজ লস্কর।

জেফরির স্মৃতিতে মিলনের ছবিটা বেশ স্পষ্ট। প্রায় নিখুঁত বিবরণ দিতে পারবে। মনে মনে ঠিক করলো, আজই আর্টিস্টের সাথে সিটিং দেবে।

মিলন খুবই স্মার্ট আর ভয়ঙ্কর এক সন্ত্রাসী। মাথা ঠাণ্ডা রেখে তাদের মতো দু দু'জন ইনভেস্টিগেটরকে মোকাবেলা করেছে। এরকম কাজ যার তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। খুব কম সন্ত্রাসীই এটা পারবে।

কথাটা ভাবতেই অন্য একজনের কথা মনে পড়ে গেলো তার। বাবলু!

বাস্টার্ড নামেই যে বেশি পরিচিত।

অধ্যায় ৩৫

হাসপাতালের নির্জন করিডোর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে উমা। পড়ন্ত বিকেল। একটু পর তার ডিউটি শেষ হবে। হাত ঘড়িতে সময় দেখলো। আর মাত্র দশ মিনিট, তারপরই বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। কিন্তু তার মধ্যে কোনো তাড়া নেই। অনেকটা ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। সুদীর্ঘ করিডোরটা যেনো আরেকটু প্রলম্বিত হয়, মনে মনে এই আশা করছে সে।

মুচকি হেসে ফেললো। একেবারে অবুঝের মতো ভাবছে। যা আশা করছে তা হবার নয়। অন্তত আজকে।

গত সপ্তাহে ঠিক এরকম সময়ে ঠিক এই করিডোর দিয়েই হেঁটে যাচ্ছিলো সে। প্রায় ফাঁকা করিডোরটা দিয়ে যেতে যেতে সিঁড়ির ঠিক আগে, যেখানটা একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন, সেখানে আসতেই দেখতে পায় এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় সানক্যাপ। গায়ে চামড়ার জ্যাকেট।

উমা প্রথমে বুঝতে পারে নি। তার মাথায় ছিলো অন্য একটা চিন্তা। তার মা-বাবা একটা ছেলে ঠিক করেছে বিয়ের জন্য। খুব চাপাচাপি করছে। মানসিকভাবে উমা সুস্থির ছিলো না। বাবা-মাকে কী করে বাবলুর কথা বলবে। তাদের সম্পর্কটা জোড়া না লাগতেই যে বিচ্ছেদের আবর্তে পড়ে গেছে। জেল থেকে বের হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বাবলু। উমার সাথে অবশ্য মাঝেমধ্যে ফোনে যোগাযোগ হয়, কিন্তু তাদের সম্পর্কের ভবিষ্যত একদম অনিশ্চিত। বাবলু কবে দেশে ফিরবে, ফিরলেও মামলা-মোকদ্দমাগুলোর কি হবে, কিছুই জানতো না।

মনে মনে বাবলুকে কাছে পেতে ইচ্ছে করছিলো তার। এরকম সময় বাবলু তার পাশে থাকলে খুব ভালো হতো। তার সাথে এ নিয়ে কথা বলা যেতো।

সিঁড়ির কাছে আসতেই উমার নজরে পড়ে ক্যাপ পরা একজনের দিকে। আচমকা ভুত দেখার মতো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। যা ভাবছিলো, কামনা করছিলো তা-ই ঘটে গেছে!

এটা কি বাস্তব নাকি দিবাস্বপ্ন?

না। কোনো দিবাস্বপ্ন ছিলো না সেটা।

“বাবলু?!” অস্ফুটস্বরে বলে উঠেছিলো সে। তার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেছিলো।

মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে চশমা। মাথায় সানক্যাপ। কিন্তু বাবলুকে চিনতে বেগ পেতে হয় নি। তার দেবদূতের মতো চোখ জোড়া কোনোভাবেই ভুলবার নয়।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে উমা। বাবলু মিটিমিটি হাসতে থাকে। জ্যাকেটের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে চলে আসে তার কাছে।

“কেমন আছো?”

উমার মনে হয়েছিলো জাপটে ধরবে বাবলুকে, কিন্তু নিজেকে বহুকষ্টে সংবরণ করে।

তারা দুজন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে চলে যায় কাছের একটি পার্কে। একটা বেঞ্চে হাত ধরাধরি করে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

বাবলু জানায়, সে পরশু চলে যাবে। উঠেছে এক হোটেলে। উমার একটু সন্দেহ হয়- বাবলু কি শুধু তার সাথে দেখা করার জন্যই দেশে ফিরে এসেছে? নাকি অন্য কোনো কাজে? যে কাজে সে জীবনের দীর্ঘ একটা সময় নিজেকে জড়িত রেখেছিলো?

বাবলুর হাত ধরে ছলছল চোখে জিজ্ঞেস করেছিলো উমা, সে কি সত্যি তাকে দেখার জন্য এসেছে? তার মাথায় হাত রেখে বলতে বলে। বাবলু হেসে উমার মাথায় হাত রেখে বলে, সে শুধুমাত্র তার সাথে দেখা করার জন্যই এসেছে। তারপরও উমা তাকে দিয়ে আবারো প্রতীজ্ঞা করায়, এ জীবনে আর কখনও খুনখারাবির মতো কাজ করবে না। বাবলু অবলীলায় বলে, সে এ কাজ আর করবে না। কখনওই না। সে শুধু ভালোবাসা পেতে চায়। উমার সাথে থাকতে চায়।

খুশিতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিলো উমা।

সন্ধ্যা হয়ে এলে তাকে রিক্সায় করে বাসায় পৌঁছে দিতে চায় বাবলু, কিন্তু উমা রাজি হয়

না। তারা হাঁটতে হাঁটতেই রওনা হয়, কারণ উমারা এখন রামপুরায় থাকে না, থাকে পিজি হাসপাতালের খুব কাছে সেগুন বাগিচায়। রিক্সা নিলে হুট করে বাসায় চলে আসবে, তারচেয়ে ভালো হেঁটে গেলে। অন্তত বাড়তি কিছুটা সময় তো পাওয়া যাবে।

বাড়িতে ঢোকার আগে ঠিক করে আগামীকাল তারা সারাটা দিন একসঙ্গে কাটাবে। উমা ছুটি নিয়ে নেবে হাসপাতাল থেকে।

উমার বেশ মনে পড়ে, ঐদিন ভালো লাগার অনুভূতি আর উত্তেজনার চোটে সারা রাত ঘুমোতেই পারে নি।

পরদিন তারা দেখা করে হোটেল র‍্যাডিসনে বাবলুর সুইটে। সমস্ত সংস্কার আর নিয়মনীতি তুচ্ছ করে তারা পাগলের মতো মিলিত হয়। ভালোবাসার তীব্রতার কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একসাথেই থাকে। তাদের দুজনের কাছে সেইদিনটি ছিলো স্বপ্নের মতো।

বাবলুকে ভেতরে নেবার সময় উমার মধ্যে যে তীব্র আবেগের সূচনা হয়েছিলো সে কথা কখনও ভুলতে পারবে না। কেঁপে কেঁপে উঠছিলো উমা। সারা শরীর যেনো সুখের খনি হয়ে উঠেছিলো। প্রতিটি রোমকূপ সুখের সুতীব্র প্রস্রবন ছড়িয়ে দিয়েছে।

"তুমি আমাকে খুন করেছে, বাবলু!" আবেগে থরো থরো উমা বলেছিলো তার ভালোবাসার মানুষটিকে।"

"আমি তোমাকে সব সময় খুন করতে চাই...এভাবে!" বাবলু বলেছিলো একইরকম তীব্র আবেগ নিয়ে।

"আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি!" উমা কম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে।

শক্ত করে জড়িয়ে ধরে উমার কানে কানে বাবলু বলে, "আবার বলো।"

"কি ব্যাপার, এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন?"

কথাটা শুনে সম্বিত ফিরে পেলো উমা। তার সঙ্গে কাজ করে এক নার্স, অবাক চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। খেয়ালই করে নি, কখন যে দাঁড়িয়ে পড়েছে করিডোরের সেই জায়গাটাতে যেখানে গত সপ্তাহে বাবলুর সাথে দেখা হয়েছিলো।

"না, দিদি, এমনি..." নিজেকে সামলে নিয়ে বললো উমা।

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো রুনুদি হিসেবে পরিচিত সিনিয়র নার্সটি। "কি হয়েছে?"

"কিছু না, দিদি," কথাটা বলেই তড়িঘড়ি হাঁটতে শুরু করলো আবার।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবলো, আবার কবে বাবলু এমনি করে চলে আসবে তার সাথে দেখা করার জন্য?

অধ্যায় ৩৬

অরুণ রোজারিও মাথা নীচু করে চোখ বন্ধ করে রেখেছেন। তার বুকের কাছে দু'হাত ভাঁজ করা। মানসিকভাবে মুষড়ে পড়েছেন বলা যায়।

একটু আগে বিশ্বজিৎ সান্যাল তার কাছে এসে বলে গেছে, গতকাল সন্ধ্যার দিকে জেফরির সাথে তার সাক্ষাতের ঘটনাটি। জেফরি যদিও বাবুকে বলেছিলো তাদের এই সাক্ষাতের কথা কাউকে না বলার জন্য কিন্তু বিশ্বজিৎ সান্যাল তা করে নি। সে আর নতুন কোনো ঝামেলায় জড়াতে চায় না। তাছাড়া ঐ ইনভেস্টিগেটরকে বিশ্বাস করার চেয়ে নিজের চাকরিদাতাকে বিশ্বাস করা অনেক ভালো।

সান্যাল বাবুর কথা শেষ করার পরই অরুণ রোজারিও চুপ মেরে যান। জেফরি এসব কিভাবে জেনে গেলো-তার মাথায় ঢুকছে না।

বাবু কিছুক্ষণ বসে থেকে চুপচাপ চলে গেছে। তাদের প্রিন্সিপ্যাল এই কথাটা শুনে এভাবে ভেঙে পড়বে তা তার জানা ছিলো না।

অরুণ রোজারিও এরকম আশংকাই করেছিলেন। হয়তো তুর্যের ব্যাপারে সব জেনে গেছে জেফরি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো তার এই ছোটোভাই তাকে কিছুই বলছে না। যদি বলতো তাহলে নিজের অবস্থান পরিস্কার করার একটা সুযোগ পেতেন তিনি। এখন কী করবেন বুঝতে পারছেন না।

জেফরিকে সব বলে দেবেন? কিন্তু আগ বাড়িয়ে বললে উল্টো যদি তাকেই সন্দেহ করতে শুরু করে সে? তাছাড়া সব কথা বলা কি সম্ভব?

না। আগ বাড়িয়ে কিছু বলার দরকার নেই। যেহেতু এখনও সব কথা বলার মতো সময় আসে নি তাই ঠিক করলেন আরেকটু সময় নেবেন। দেখবেন জেফরি এ ব্যাপারে কিছু জানতে চায় কিনা। অবশ্য তার মনে হচ্ছে, জেফরি কিছুই জানতে চাইবে না। এটাই হলো ভয়ের কথা। সব কিছু জানার পরও এই না জানতে চাওয়ার একটাই মানে-জেফরি আর তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কিংবা কে জানে, তাকেও হয়তো সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে।

এখন যদি জেফরিকে সব খুলেও বলেন বিপদে পড়বেন। কারণ আরেক দিকে আছে হোমমিনিস্টার। প্রথম থেকে তিনি সব জানার পরও জেফরিকে কিছু বলেন নি। চেপে গেছেন সুকৌশলে। বিভ্রান্ত করেছেন তার এই ছোটো ভাইটিকে। আর এটা তিনি করেছেন মিনিস্টারের নির্দেশে। এখন জেফরি যদি তার কাছ থেকে সব জানতেও চায় তিনি কি সব বলে দিতে পারবেন?

তার অবস্থা হয়েছে সঙ্গিন। দুদিক থেকেই তিনি বিপদের মধ্যে আছেন অথচ এই ব্যাপারটায় তার কোনো সংশ্লিষ্টতাই নেই।

"হ্যালো অরুণদা।"

কণ্ঠটা চিনতে ভুল হলো না তার। মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন দরজার কাছে। জেফরি দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে।

বহু কষ্টে হাসার চেষ্টা করলেন কিন্তু আজ যেনো তার মধ্য থেকে হাসি নামক জিনিসটা একেবারেই উধাও হয়ে গেছে। "আসো আসো...বসো।" শুধু এটুকুই বলতে পারলেন।

"আপনার কিছু হয়েছে?" বসতে বসতে বললো জেফরি বেগ।

'না। এই একটু মাথা ব্যাথা...মাইগ্রেনের পুরনো সমস্যা..." অরুণ রোজারিও অবাক হলেন, আজকাল তিনি বেশ দক্ষতার সাথেই ঝটপট মিথ্যে বলতে পারছেন। শুধু অভিব্যক্তি লুকিয়ে ফেলতে পারলেই বেঁচে যেতেন।

"এই ব্যাথাটা আমারও আছে, তবে অতোটা তীব্র না... খুব খারাপ ব্যাথা," কথাটা বলেই ডেস্কের উপর একটা বড় ইনভেলপ রাখলো জেফরি বেগ।

"এটা কি?" এনভেলপটার দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইলেন অরুণ রোজারিও।

"একটা স্কেচ। হোমিসাইডের আর্টিস্ট এঁকেছে। সম্ভবত যে লোকটা কোচ সেজে

আপনার স্কুলে ঢুকেছিলো তার ছবি।”

“তার ছবি?” অবাক হলেন প্রিন্সিপ্যাল। “তার ছবি কিভাবে আঁকলো?”

জেফরির মনে পড়লো মিলনের সাথে তাদের মোকাবেলার কথাটা অরুণ রোজারিওকে বলা হয় নি। “আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, একজন সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করতে পেরেছি আমরা।”

“তাই নাকি?” অনেকটা আপন মনে বললেন প্রিন্সিপ্যাল।

“আপনার ঐ ফিজিক্যাল ট্রেইনারকে একটু ডাকুন,” বললো জেফরি।

“কেন?”

“উনাকে ছবিটা দেখাবো। ছবি দেখে উনি চিনতে পারলে দারুণ ব্যাপার হবে।”

অরুণ রোজারিও চুপচাপ ইন্টারকমটা তুলে কাজি হাবিবকে আসতে বললেন তার অফিসে।

“চা খাবে?” জানতে চাইলেন জেফরির অরুণদা।

“হ্যাঁ, তা খাওয়া যায়।”

তিনি বেল টিপে চায়ের অর্ডার দিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ পর চা চলে এলো, সেইসাথে কাজি হাবিবও। ভদ্রলোক জেফরিকে দেখে কেমন জানি কুকড়ে গেলো। কুশল বিনিময় করে তার সাথে হাত মিলিয়ে চুপচাপ বসে পড়লো চেয়ারে।

ডেস্ক থেকে এনভেলপটা হাতে তুলে নিলো জেফলি। “মি: হাবিব, দেখুন তো ছবিটা... চিনতে পারেন কিনা?” হাতে আঁকা স্কেচটা বের করে নিলো জেফরি। সে ভালো করেই জানে তাদের আর্টিস্ট যে ছবিটা এঁকেছে সেটা মিলনের আসল চেহারার অনেকটাই কাছাকাছি।

কাজি হাবিব ছবিটা হাতে নিয়ে বিস্ময়ে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। “মাইগড!”

কথাটা শুনে অরুণ রোজারিও সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারে। তার চোখেমুখেও বিস্ময় উপচে পড়ছে।

“এটাই তো সেই লোকটা!” জেফরিকে বললো কাজি হাবিব।

“আমি জানতাম,” কথাটা বলেই হেসে ফেললো জেফরি বেগ। “এই লোকটাই অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ সেজে স্কুলে এসেছিলো।”

অরুণ রোজারিও হাত বাড়িয়ে ছবিটা নিয়ে নিলেন কাজি হাবিবের কাছ থেকে। গোল গোল চোখে তিনি চেয়ে থাকলেন সেটার দিকে।

“আপনি নিশ্চিত তো, মি: হাবিব?” বললেন তিনি।

“জি, স্যার। এই লোকটাই এসেছিলো,” দৃঢ়ভাবে বললো ফিজিক্যাল ট্রেইনার।

“অরুণদা, মি: হাবিব চিনতে ভুল করেন নি, আমি নিশ্চিত।”

“কে এই লোকটা?” এটা বলার কোনো ইচ্ছেই ছিলো না অরুণ রোজারিওর কিন্তু মুখ ফসকে বের হয়ে গেলো।

“এর নাম ইসহাক আলী,” কথাটা বলে বাঁকা হাসি হাসলো জেফরি। “সবাই অবশ্য মিলন নামেই তাকে চেনে। সম্ভবত একজন পেশাদার খুনি!”

অরুণ রোজারিও চেয়ে রইলেন তার স্কুলের ছোটো ভায়ের দিকে। এতসব কিভাবে জানতে পারলো জেফরি! না জানি আরো কতো কিছু জানে। অথচ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করছে না। তার সাথে কি এক ধরণের খেলা খেলছে সে?

হায় ঈশর!

অধ্যায় ৩৭

হোমিসাইডের অফিসে বসে আছে জেফরি বেগ আর রমিজ লস্কর। ডেস্কের উপর পড়ে আছে মিলনের স্কেচটা। তারা এখন জানে এই মিলনই অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ সেজে সেন্ট অগাস্টিনে গিয়েছিলো। তারপর তুর্য নামের ছেলেটার সাথে তার কথা হয়। তুর্য এসে তার সঙ্গিদের জানায় তাকে অ্যাঞ্জেলস টিম সাইন করিয়েছে। কথাটা শুনে তার অন্য সঙ্গিরা অবাক হয়েছিলো, কেননা তুর্যের চেয়েও ভালো প্লেয়ার ছিলো সেখানে, তাদেরকে বাদ দিয়ে তুর্য কেন? পুরোটাই কি হত্যা পরিকল্পনার অংশ?

এরপরই, বিকেলের শেষদিকে বিশ্বজিৎ সান্যাল নিজের অফিসঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পায় তুর্যের বডিগার্ড টয়লেট থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। লোকটার আচরণ মোটেও স্বাভাবিক ছিলো না।

পরদিন স্কুলের টয়লেট থেকে পাওয়া যায় হাসানের লাশ। ফরেনসিক পরীক্ষায় জানা গেছে খুনটা সংঘটিত হয়েছে আগের দিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে। অর্থাৎ মিলন স্কুলে ঢোকার পর।

প্রথমে মিলন ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে স্কুলে ঢোকে, তুর্যের সাথে কথা বলে, তারপরই স্কুলে ঢোকে তুর্যের বডিগার্ড। পুরো বিষয়টা এখন পরিস্কার-অন্তত জেফরি বেগের কাছে-হাসানের হত্যাকাণ্ডের সাথে হোমমিনিস্টারের ছেলে এবং তার বডিগার্ড জড়িত। তাদের সহায়তায় কাজটা করেছে মিলন নামের ভয়ঙ্কর এক সন্ত্রাসী। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, হাসানের উল্টোদিকের ফ্ল্যাটেই থাকতো সেই খুনি।

নিঃসন্দেহে তুর্য, হাসান আর মিলন এক অদ্ভুত নেক্সাস।

জেফরির বুঝতে বাকি রইলো না, হাসানের হত্যাকাণ্ডটি দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ফসল। তাকে জানতে হবে মিলন কবে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলো। সেটা কি হাসানের আগে নাকি পরে? যদি পরে হয়ে থাকে তাহলে খাপে খাপে মিলে যাবে। আগে হয়ে থাকলে আরেকটা গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়বে।

"এই লোকটাকে খুঁজতে হবে," ছবিটার দিকে ইঙ্গিত করে রমিজ লস্করকে বললো জেফরি বেগ। "আমি নিশ্চিত, সে ঢাকা শহরেই আছে। তার দু দু'জন স্ত্রী...একজনের ব্যাপারে আমরা কিছুটা জানি।"

রমিজ মাথা নেড়ে সায় দিলো। বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছে তার বস। হোমমিনিস্টারকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার চেয়ে এটাই বেশি নিরাপদ।

"আমার মনে হয় তুর্যের পেছনে ছোটার চেয়ে এদের পেছনে ছুটলেই বেশি ভালো হবে...বিশেষ করে মিলনকে ধরতে পারলে সবকিছু পরিস্কার হয়ে যাবে।"

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো রমিজ। মিলন নামের খুনিটাকে ধরা সম্ভব হলে তাদের অনেক সুবিধা হবে। খুনির স্বীকারোক্তিতে উঠে আসবে সব কিছু। তাতে মিনিস্টারের ছেলে জড়িত থাকলেও তাদের কোনো দায় থাকবে না।

"তাহলে আমি এখন কি করবো, স্যার?" রমিজ জানতে চাইলো।

"জি, স্যার, আমারও একই প্রশ্ন।" কথাটা শুনে জেফরি আর রমিজ তাকালো দরজার দিকে। জামান দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে হাসি।

"জামান, তুমি?" অবাক হলো জেফরি।

রমিজের পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়লো সে। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটে এখনও। তবে তাকে দেখে সুস্থই মনে হচ্ছে। "বাড়িতে বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না, স্যার। একদম বোর হয়ে গেছি..."

"তোমার ছুটি তো এখনও শেষ হয় নি," বললো জেফরি, তার মুখেও হাসি। সহকারীকে দেখে তার ভালো লাগছে।

"ছুটি ক্যান্সেল করে দিন। আমি কাল থেকেই জয়েন করতে চাই।"

"কিন্তু তুমি তো পুরোপুরি সুস্থ নও।"

“পায়ের অবস্থা কেমন, জামান?” জানতে চাইলো রমিজ লস্কর।
“একদম ঠিক আছি, লস্কর ভাই। কোনো সমস্যা নেই।”
“ব্যান্ডেজ লাগানো আছে না?” বললো জেফরি।
“টেপব্যান্ডেজ, স্যার। ঘা শুকিয়ে যাচ্ছে। হাটাচলা করতে পারি…”
“ঠিক আছে, কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হবার আগে কাজে জয়েন করার কী দরকার?”
“হ্যাঁ, আরো কয়টা দিন রেস্ট নেন,” বললো রমিজ।
“স্যার, বাড়িতে বসে থাকতে ভালো লাগে না। আমি কাল থেকেই অফিসে জয়েন করতে চাই।” জোর দিয়ে বললো জামান। “দৌড়াদৌড়ির কাজ করবো না। শুধু ডেস্ক জব।”
জেফরি চুপ করে থাকলো। রমিজ তাকালো তার দিকে। “তাহলে জয়েন করাই ভালো, কী বলেন, স্যার?”
“ওকে।” ছোট্ট করে বললো জেফরি। “চা খাবে?”
জামানের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। “খাবো, স্যার।”
ইন্টারকমটা তুলে তিন কাপ চায়ের অর্ডার দিলে কিছুক্ষণ পরই চা চলে এলো। জমে উঠলো তাদের আলোচনা।
“তাহলে মিলনই কোচ সেজে স্কুলে গেছিলো?” ডেস্কের উপর রাখা ছবিটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো জামান। চা আসার আগে এ পর্যন্ত যা যা জানতে পেরেছে তা সংক্ষেপে বলে দিয়েছে জেফরি বেগ।
“হুম। অগাস্টিনের ফিজিক্যাল ট্রেইনার নিশ্চিত করেছে,” বললো জামানের বস্।
“স্যার, আপনার ঐ বড় ভাই অরুণ রোজারিও সবই জানেন। ভদ্রলোককে প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো কিছু একটা লুকাচ্ছেন…” বললো জামান।
“অনেক কিছুই লুকিয়েছেন। এখনও অনেক কিছু লুকাচ্ছেন, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।” একটু চুপ থেকে আবার বললো, “কিন্তু আমার মনে হচ্ছে উনি যদি কিছু লুকিয়ে থাকেন সেটা নিশ্চয় হোমমিনিস্টারের কারণেই করেছেন।”
“তাহলে কি মিনিস্টার নিজেও এ কাজে জড়িত?” জামান বললো তার বসকে।
“আমার মনে হয় না মিনিস্টার এ কাজে জড়িত,” জেফরি কিছু বলার আগেই রমিজ লস্কর বললো।
“এ দেশের পলিটিশিয়ানদের কোনো বিশ্বাস নেই,” একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো জেফরি বেগ। “মনে রেখো, তুর্যের বডিগার্ড লোকটার কথা। আমাদের অনুমাণ সেও এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত। তবে মিনিস্টার সরাসরি জড়িত কিনা বুঝতে পারছি না। হয়তো উনি প্রথম দিকে জড়িত ছিলেন না, পরে ঘটনা জানতে পেরে সামাল দেবার চেষ্টা করছেন।”
জেফরি বেগের এ কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলো তার সহকারী দু’জন।
“রমিজ, তুমি আম্বিয়া খাতুনের ব্যাপারে খোঁজ নেবে।”
“জি, স্যার।” একটু থেমে আবার বললো রমিজ, “মিলনের এক ছোটো ভাই পুরনো ঢাকার গেন্ডারিয়ায় থাকে। তার ব্যাপারে কি করবেন?”
“আমি নিজে সেটা দেখবো।”
জেফরি যেখানে মানুষ হয়েছে সেই সেন্ট গ্রেগোরি স্কুলের খুব কাছেই জায়গাটা। তারচেয়েও বড় কথা তার বন্ধু ম্যাকির বাড়ি সেখান থেকে খুব কাছে। তাছাড়া মিলন শুধু ম্যাকির পরিচয়টাই ব্যবহার করে নি, তার নামটাও ব্যবহার করেছে। এর মানে, ম্যাকিকে সে চেনে। সুতরাং এই ব্যাপারটা জেফরি নিজেই খোঁজ নিতে পারবে।
“স্যার, আমি কি করবো?” জামান জানতে চাইলো।
“রমিজ যে কাজটা করছিলো সেটা করতে পারো…তুর্যের টেলিফোনটা মনিটর করা।”
“আপনার জন্য ভালোই হবে, পিওর ডেস্ক জব, পাশ থেকে বললো রমিজ লস্কর। “অবশ্য বিরক্তিকর কাজ। ফোনটা বন্ধ আছে, কবে খুলবে কে জানে।”

“ওকে, নো প্রবলেম,” জামান কাঁধ তুলে বললো।

“হোমমিনিস্টারের ফোনটা ট্র্যাক-ডাউন করলে অবশ্য দ্রুত ফলাফল পাওয়া যেতো, কিন্তু সেটা তো করা যাবে না,” বললো রমিজ লস্কর।

জেফরি ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো তার দিকে। “আমরা কিন্তু সেটা করতে পারি...” বললো সে। তার চোখেমুখে অন্যরকম এক অভিব্যক্তি।

“জি স্যার!”

কথাটা একসাথে বলে উঠলো জামান আর রমিজ। তাদের চোখেমুখে বিস্ময়। বিশ্বাসই করতে পারছে না তাদের বস্ কী বলছে! হোমমিনিস্টারের ফোন ট্যাপিং! পাগল!

“আমরা হোমমিনিস্টারের ফোন ট্যাপ করবো?!” ঢোক গিলে বললো রমিজ।

“এটা করার অনুমতি কি আমাদের আছে, স্যার?” জামানও যারপরনাই বিস্মিত। সত্যি বলতে, ভড়কে গেছে সে।

“না। তা নেই,” আস্তে করে বললো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর।

“তাহলে?” রমিজ লস্কর আবারো ঢোক গিললো।

“কিন্তু অন্য একটা উপায়ে কাজটা আমরা করতে পারি!”

জেফরির কথাটা শুনে জামান আর রমিজ একে অন্যের দিকে তাকালো।

বেআইনীভাবে হোমমিনিস্টারের ফোন ট্যাপিং করা! মাথা খারাপ?!

“ভাবছো আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?” জেফরি যেনো তার দু’জন অধস্তনের মনের কথা পড়তে পেরেছে। রমিজ আর জামান অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে। দু’পাশে মাথা দোলালো সে। “না। আমার মাথা ঠিকই আছে। এটা করা সম্ভব।”

অসম্ভব! রমিজ আর জামান মনে মনে বললো।

ম্যাকি বসে আছে দরবার নামক রেস্তোরাঁয়। যথারীতি চা খাচ্ছে, অপেক্ষা করছে পুরনো বন্ধু জেফরির জন্য। ঘণ্টাখানেক আগে জেফরি তাকে ফোন করে জানিয়েছে জরুরি একটা কাজে আসছে। ম্যাকি অবশ্য জানতে চেয়েছিলো কাজটা কি, কিন্তু তার বন্ধু এরচেয়ে বেশি কিছু বলে নি। বলেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছে।

রেস্তোরাঁ থেকেই ম্যাকি দেখতে পেলো জেফরির রিক্সাটা এসে থেমেছে বাইরে। জেফরির হাতে একটা বড়সড় এনভেলপ।

"ব্যাপারটা কি, দোস্ত?" জেফরিকে পাশে বসার জন্য ইশারা করে বললো ম্যাকি। "আমি তো টেনশনে পইড়া গেছি।"

মুচকি হাসলো সে, এনভেলপটা টেবিলে রেখে বসে পড়লো। "আমি আসবো এটা আবার টেনশনের কি আছে?"

"আরে তুমি কি আর আগের তুমি আছো, পুলিশের লোক হইয়া গেছে। নিশ্চয় কোনো খুনখারাবির কেস, ঠিক কইছি না?"

মুচকি হাসলো জেফরি বেগ। "তা ঠিক। খুনখারাবি ছাড়া তো আমি কোনো কেস ইনভেস্টিগেশন করি না।"

"আবার টেনশনে ফালায়া দিলা," কথাটা বলেই ভয় পাওয়ার কপট অভিনয় করলো ম্যাকি। তারপরই হাক দিলো, "আবে ওই মুইনা, এক কাপ চা দে। চিনি কম।"

"তোমার টিমের খবর কি?" জেফরি জানতে চাইলো।

"কোনো ব্রেকিংনিউজ নাই। সব আগের মতোই আছে। প্রবলেমস আর রিমেইন দ্য সেম..." হেসে ফেললো ম্যাকি। তারপর দ্রুত সিরিয়াস হয়ে উঠলো। এটাই তার বৈশিষ্ট। "আমার টিমের নাম কইয়া যে হালারপো সেন্ট অগাস্টিনে গেছিলো হের পাত্তা লাগাইতে পারছো?"

"হুম।"

"কও কি!" একটু থেমে আবার বললো সে, "আমি ওরে চিনি?"

"আমার মনে হয় ওর ছবি দেখলে তুমি চিনতে পারবে," বললো জেফরি।

"ছবি?" ম্যাকি আবারো অবাক হলো। "ওই হালার ছবিও যোগাড় কইরা ফালাইছো? তুমি তো বহুত কামের আছো!"

মুচকি হাসলো জেফরি বেগ। ঠিক তখনই চা চলে এলো। "লোকটা ভুয়া হলেও অ্যাঞ্জেলস টিমের সত্যিকারের কোচের নাম ব্যবহার করেছে।"

"হালারপুতে করছেটা কি?" একটু রেগে বললো ম্যাকি।

"খুব স্মার্ট লোক, কিন্তু এই কাজটা করেই ভুল করে ফেলেছে," চায়ে চুমুক দিয়ে বললো সে।

"আলবত ভুল করছে," নিজের কাপে চুমুক দিলো জেফরির স্কুল বন্ধু। "হালারপুতেরে পাইলে ওর পাছা দিয়া আমি বাস্কেটবল ঢুকামু।"

হেসে ফেললো জেফরি। "তোমার নাম ব্যবহার করার অর্থটা কি বুঝতে পারছো?"

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো ম্যাকি। "কি?"

"লোকটা তোমাকে চেনে। খুব সম্ভবত এই এলাকারই কেউ হবে হয়তো।"

"কও কি!" ম্যাকির চোখমুখ সিরিয়াস হয়ে উঠলো।

"তুমি বলেছো কয়েক মাস ধরে অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচের দায়িত্ব পালন করছো, এ কথাটা খুব কম লোকেরই জানার কথা, তাই না?"

"একদম ঠিক কইছো।"

"তাহলেই বোঝো।"

"ওই হালার নামটা কি?" চায়ে চুমুক দিয়ে বললো ম্যাকি।

টেবিল থেকে এনভেলপটা হাতে তুলে নিলো সে। "তার নাম মিলন।"

"মিলন?! আরে, আমার পরিচিত কতো মিলন আছে জানো? বাইট্টা মিলন, মুরগি মিলন, গিট্টু মিলন, ধলা মিলন, কালা মিলন-" হঠাৎ চুপ মেরে গেলো ম্যাকি।

জেফরি এনভেলপ থেকে মিলনের ছবিটা বের করে তুলে ধরেছে তার সামনে।

"হায় হায়, মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বের হলো ম্যাকির। "এইটা তো মনে হইতাছে..." কথাটা বলে জেফরির হাত থেকে ছবিটা নিয়ে নিলো সে।

"চিনতে পেরেছো?" জানতে চাইলো জেফরি। সে নিশ্চিত তার বন্ধু চিনতে পেরেছে।

"কেরাতি মিলন!"

হোমিসাইডের কমিউনিকেশন্স রুমে বসে আছে জামান আর রমিজ লস্কর। তাদের বস্ জেফরি বেগ যখন হোমমিনিস্টারের ফোন ট্যাপ করার কথা বলেছিলো তখন বেশ ঘাবড়ে গেছিলো তারা।

পাগল না হলে কেউ এমন কথা বলে

কিন্তু না, তাদের বস, যাকে হোমিসাইডের সবাই আড়ালে আবডালে জেফবিআই বলে ডাকে, সে মোটেও পাগল নয়। তার মাথাটা বরাবরের মতোই প্রখর আর ঠাণ্ডা। সেই মাথা থেকে উদ্ভট আইডিয়া খুব কমই বের হয়।

রমিজ আর জামানের অবস্থা দেখে জেফরি বেগ খুব মজা পেয়েছিলো। তবে তাদেরকে বেশিক্ষণ টেনশনে রাখে নি। হোমমিনিস্টারের ফোন ট্যাপ করার অন্য উপায়টা বলতেই রমিজ আর জামান হাফ ছেড়ে বাঁচে।

এখন সেই অন্য উপায়েই কাজটা করছে তারা। এটা একদম আইনসম্মত আর নিরাপদ।

জামান আর রমিজ প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে একটা ফোন ট্যাপ করার কাজে ব্যস্ত আছে। তাদের হাতে বড় বড় দুই মগ ভর্তি কফি।

এই কাজটা হলো মাছ ধরার মতো। ছিপ ফেলে ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেও মাছ টোপ গিলতে পারে আবার কয়েক ঘণ্টাও লেগে যেতে পারে। এমনও হতে পারে সারাটা দিন একটা মাছও বঁড়শি গিললো না। সুতরাং এক দিক থেকে এটা যথেষ্ট বিরক্তিকর কাজও বটে। তবে জামান আর রমিজ লস্কর দু'জনেই এ কাজে দক্ষ। তাদের ধৈর্য পরীক্ষা অনেক আগেই হয়ে গেছে।

কয়েক মিনিট ধরে রমিজ লস্করের কাছে নিজের গুলি খাওয়ার কাহিনীটা বিস্তারিত বলে গেলো জামান। কিভাবে মিলনকে চিহ্নিত করতে পারলো জেফরি, কিভাবে পালালো সে, তার পিছু ধাওয়া করতে করতে গলির মোড়ে এসে গুলি খাওয়া, সব বললো।

জেফরি কেন মিলনকে হাতে পেয়েও গুলি করতে পারলো না, সে কথা বলার আগেই একটা বিপ হলো।

রমিজ আর জামান দু'জনেই তাকালো মনিটরের দিকে।

যে নাম্বারটা তারা ট্যাপিং করছে সেটাতে একটা ইনকামিং কল এসেছে। বিগত দু'ঘণ্টায় আরো পাঁচ-ছয়টি কল এলেও সেগুলো ছিলো মাকাল ফল। তারা অবশ্য এটাকে সংক্ষেপে বলে 'মাফ'।

এবারেরটা কি হয় দেখার জন্য বাটন চেপে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে নিলো রমিজ। জামান অবশ্য কফিতে চুমুক দিচ্ছে, ইয়ারফোনটা খুলে রেখেছে সে। তার ধারণা, এটা আরেকটা 'মাফ'।

রমিজ লস্কর মনোযোগের সাথে কিছুক্ষণ শুনে গেলো, তারপর দ্রুত ইয়ারফোন তুলে নেবার ইশারা করলো জামানকে।

বড়শিতে মাছ ধরা পড়েছে! ইয়ারফোনটা কানে লাগাতে লাগাতে ভাবলো জামান।

প্রায় তিন মিনিট ধরে তারা শুনে গেলো ফোনালাপটি। কলটা শেষ হলে দু'জনেই একে অন্যের দিকে তাকালো বিস্ময় নিয়ে। তাদের বস জেফরি বেগ একদম সঠিক লোককে বেছে নিয়েছে। তবে জামান নিশ্চিত, তার বসও জানে না এই লোক কতোটা গভীরভাবে

হাসানের খুনের সাথে জড়িত!

"ইনকামিং কলটার আইডেন্টিফিকেশন কনফার্ম করা দরকার, রমিজ লস্কর কম্পিউটারে কিছু টাইপ করতে বললো, যদিও এরইমধ্যে সে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

জামান চুপ মেরে রইলো।

অরুণ রোজারিওর ফোনে একটু আগে যে ইনকামিং কলটা এসেছিলো সেটার পরিচয় জানতে মাত্র চার-পাঁচ মিনিট লাগলো রমিজ লস্করের।

হোমমিনিস্টার!

রমিজ আর জামান হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো একে অন্যের দিকে।

"কেরাতি মিলন!" কথাটা আপন মনে বললো জেফরি।

একটু আগে ম্যাকি জানিয়েছে, কেরাতি মিলন নামটা এসেছে 'কারাতে থেকে। কয়েক বছর আগে এই কেরাতি মিলন থাকতো ম্যাকিদের পাশের বাড়িতে। এলাকার ছেলেপেলেদেরকে কারাতে শেখাতো সে। তবে কয়েক বছর ধরে আর পুরনো ঢাকায় থাকে না। ম্যাকি শুনেছে, মিলন ফিল্ম লাইনেও কাজ করেছে। মার্শাল আর্টে বেশ দক্ষ এই লোকটা নাকি ব্ল্যাকবেল্টধারী। জেফরি জানে কথাটা সত্যি। তার গ্রামের বাড়ি থেকেও এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

"ওই মিলন কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস মাল, দোস্ত," ম্যাকি বললো। কথাটা বলে সিগারেটে টান দিলো সে। "টপ টেরর শাহাদাতের ডাইন হাত আছিলো।"

"তাই নাকি," বললো জেফরি বেগ।

একটু আগে ম্যাকি তাকে জানিয়েছে মিলনের সাথে তার বেশ ভালো খাতিরই ছিলো। সেটা অবশ্য অনেক আগের কথা। গত মাসে লক্ষ্মীবাজারে তার সাথে দেখা হলে চা-সিগারেট খেতে খেতে একটু আড্ডাবাজিও করেছে দু'জন। তখনই নানা কথা বলতে বলতে ম্যাকি তাকে জানিয়েছিলো অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ হবার কথা।

"শোনো, আমি আরেকটা কাজে তোমার কাছে এসেছি," বললো জেফরি।

"আরেকটা কাম?" ধোয়া ছেড়ে বললো ম্যাকি।

"হুম..." কিন্তু কিছু বলার আগেই তার মোবাইলফোনটা বেজে উঠলো। পকেট থেকে বের করে ডিসপ্লের দিকে তাকালো সে।

জামান!

রমিজ আর জামানকে সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যাল অরুণ রোজারিওর ফোন ট্যাপিং করার কাজ দিয়ে সে এখানে চলে এসেছিলো। কিন্তু এতো দ্রুত রেজাল্ট পাওয়া যাবে ভাবে নি।

কলটা রিসিভ করলো জেফরি। ম্যাকি অবাক হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে।

"হ্যাঁ, বলো?"

ওপাশ থেকে জামানের কথা শুনতেই তার চোখমুখের অভিব্যক্তি পাল্টে গেলো। তবে খুব বেশি অবাক হয় নি। এরকম কিছুই প্রত্যাশা করেছিলো সে। কলটা শেষ করার আগে শুধু বললো : "ঠিক আছে...ওই নাম্বারটাও ট্যাপ করো...হুম...কোনো সমস্যা নেই...করো..."

ম্যাকি চুপচাপ বন্ধুকে দেখে গেছে এতোক্ষণ। ফোনটা রাখতেই জেফরিকে সে বললো, "কিছু হইছে নাকি?"

বন্ধুর দিকে তাকালো সে। "না। অন্য একটা কেস।"

"ও," সিগারেটে আবারো জোরে টান দিলো ম্যাকি। "আরেকটা কামের কথা না কইলা?"

"হুম।" পকেটে মোবাইল ফোনটা রেখে দিলো জেফরি। "মিলনের এক ছোটো ভাই গেন্ডারিয়ায় থাকে...তাকে খুঁজে বের করতে হবে।"

"দোলন?" জানতে চাইলো ম্যাকি।

"তুমি তাকে চেনো?"

"চিনি তো..."

"গুড," বললো জেফরি বেগ। "ওকে কিভাবে পাওয়া যাবে?"

"ঠিক কুন বাড়িতে থাকে তা তো জানি না, খালি জানি গেন্ডারিয়ায় থাকে।"

"গেন্ডারিয়ায় গিয়ে খোঁজ নিলে জানা যাবে না?"

জেফরির কথায় একটু ভাবলো ম্যাকি। "যাইবো না কেন?...মাগার ফকির-মিসকিনের মতো বাড়ি বাড়ি গিয়া খোঁজ করবা নাকি?"

“তাহলে কিভাবে তাকে খুঁজে বের করা যায়?”

“খাড়াও, আমি দেখতাছি,” কথাটা বলেই মোবাইল ফোনটা বের করলো। “আমাগো এলাকায় এক নয়া রংবাজ পয়দা অইছে...হালায় বিজাইত্যা অইলেও আমারে খুব মানে...” একটা নাম্বার বের করে ডায়াল করলো ম্যাকি। “লুইচ্চা মাসুম...ডেঞ্জারাস পোলা...” কানে ফোনটা চেপে বলে গেলো সে। “দেহি, ওই দোলনের ঠিকানা দিবার পারে কিনা।”

জেফরি কিছু বললো না। মনে হলো ওপাশ থেকে কলটা রিসিভ করা হয়েছে।

“ওয়ালাইকুম...হ, ভালা আছি...তুমি কিমুন আছো?...আচ্ছা...হুনো, আছো কই?...ও...আমি দরবারে আছি...একটু আইবার পারবা?...হ...এহন আইলে ভালা হয়,” জেফরির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো সে। “হ...জরুরি...জলদি আহো।”

ফোনটা রেখে হাসি দিলো ম্যাকি। “আইতাছে...সামনেই আছে,” তারপর রহস্য করে হেসে বললো, “তুমি হইলা আমার দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই, বুঝছো? থাকো ওয়ারিতে...নতুন বাড়ি করতাছে...মিলনের ভাই দোলন তোমার কাছ থেইকা চান্দা চাইছে,” কথাটা বলেই চোখ টিপে হেসে ফেললো ম্যাকি।

মুচকি হাসলো জেফরি বেগ। “ঠিক আছে, চাচাতো ভাই।”

হা-হা-হা করে হাসলো অ্যাঞ্জেলসস টিমের আসল কোচ। “মুখটারে বেজার কইরা রাখো...দশ লাখ টাকা চান্দা চাইছে...এক্কেবারের পেরেসানের মইদ্যে পইড়া গেছো...ওকে?”

“ওকে।”

কিছুক্ষণ পরই হ্যাংলামতো দেখতে এক ছেলে এসে ম্যাকিকে সালাম দিলো। এ হলো লুইচ্চা মাসুম। সব সন্ত্রাসীকে দেখে চেনা যায় না, তবে লুইচ্চা মাসুমকে দেখলেই মনে হয় এই ছেলেটা অপরাধী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। চোখমুখ, বেশভূষা সবই খারাপ।

ছেলেটাকে ম্যাকি তার পাশে বসতে দিয়ে জেফরিকে বললো, “এই হলো মাসুম। আমার খুব ঘনিষ্ঠ ছোটো ভাই।”

জেফরি হাত বাড়িয়ে দিলে মাসুম লজ্জিত হয়ে হাত মেলালো।

“আমার চাচাতো ভাই, আমেরিকায় আছিলো,” ম্যাকি বলে চললো তার বানোয়াট কথাবার্তা। গত মাসে দ্যাশে আইছে। এহন খুব ফাপড়ে পইড়া গেছে।”

কৌতূহলী চোখে জেফরির দিকে তাকালো মাসুম।

“ওয়ারিতে বাড়ি বানাইবার কাম শুরু করছে, বুঝছো...ওইটা নিয়াই ঝামেলা।”

কোনো কিছু না শুনেই মাসুম এমনভাবে মাথা নাড়লো যেনো সব বুঝে ফেলেছে। “ওয়ারির কুন জায়গায়?”

“লারমিনি স্ট্রিটে...” ম্যাকি ঝটপট জবাব দিলো।

“কতো নম্বর বাড়ি, ভাই?” প্রশ্নটা করলো ম্যাকিকে কিন্তু চেয়ে রইলো জেফরির দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সে।

“চৌদ্দ নম্বর।”

জেফরি অবাক হলো, কতত অবলীলায় ম্যাকি মিথ্যে বলে যাচ্ছে। প্রতিভা আছে বটে।

চোখ কুচকে জেফরির দিকে চেয়ে আছে মাসুম। “ভাইজানরে কই যেন দ্যাখছি?”

প্রমাদ গুনলো জেফরি। এই বদখতটা আসমানজমিনের পাঠক না তো?

“ওয়ারিতে দ্যাখছো মনে হয়, ম্যাকি বললো।

“অইবার পারে।” এখনও চেয়ে আছে মাসুম।

“হুনো, আমার এই ভাই তো পেরেসানির মইেদ্যে পইড়া গেছে, ম্যাকি বললো মাসুমকে। “ওর কাছ থেইকা চান্দা চাইছে...দশ লাখ!”

“কে চাইছে?”

“দোলন।”

“দোলন!” অবাক হলো মাসুম। “কুন দোলন?”

“ওই যে কেরাতি মিলন আছিলো না, ওর ছোটো ভাই।”

“অ্যাঁ!” বিস্মিত হলো মাসুম। “দোলন ভাই চাইছে?...কন কি?”

“হ, আমিও তো বুঝবার পারতাছি না, মাসুম...”

“কিন্তু হের তো চান্দা চাইবার কথা না, ভাই।”

“ক্যান?” ম্যাকি বুঝতে পারছে না সে সঠিক জায়গায় ঢিল মেরেছে কিনা।

“তিন বছর ধইরা দোলন ভাই এই লাইন ছাইড়া দিছে...গত বছর তো হজ্বও কইরা আইলো। না, ভাই, দোলন ভাই না। ঠিক কইরা কন, কুন দোলন চাইছে?”

ম্যাকি তাকালো জেফরির দিকে। “তোমারে তো দোলন নামই কইছে,?”

“হুম,” মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি।

“মিলনের ভাই দোলন কইছে?”

মাসুমের কথায় আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

“বেলাফ মারছে, ভাই।”

“কও কি?” ম্যাকি অবাক হবার অভিনয় করলো।

“ঈমানে কইতাছি, বেলাফ দিছে। কুনো পাইনা রংবাজের কাম এইটা।” তারপর হলুদ দাঁত বের করে হেসে ফেললো। “চিন্তা কইরেন না, বড় ভাই,” কথাটা বললো জেফরিকে। আবার যদি ফোন করে কইবেন, নাকটিরপো, দশ লাখ ট্যাকা তোর গোয়া দিয়া ভইরা দিমু...”

জেফরি আর জামান একে অন্যের দিকে তাকালো। কথাটা শুনে খুব হাসি এলেও জোর করে আঁটকে রাখলো জেফরি।

“কিন্তু ওইটা যদি আসলেই দোলন হইয়া থাকে, তাইলে?” ম্যাকি বললো মাসুমকে।

“কইলাম তো ভাই, ওইটা দোলন ভাই না। বিশ্বাস না অইলে আপনে নিজে দোলন ভায়ের লগে দেহা কইরা জাইন্যা নিয়েন...”

মাসুমের এ কথাটা শুনে জেফরি আর জামান আবারো একে অন্যের দিকে তাকালো। এতোক্ষণ পর আসল কথায় চলে এসেছে মাসুম।

“কিন্তু আমি তো জানি না দোলন কই থাকে,” বললো ম্যাকি।

“অসুবিধা নাই, আমি আপনেরে হের ঠিকানা দিতাছি।”

“হ, ঠিকানাটা দাও। আমি নিজে গিয়া দোলনের লগে দেহা করুম।” ম্যাকি তাড়া দিয়ে বললো কথাটা।

“গেন্ডারিয়ার সাধনার গল্লি আছে না... ওই গল্লিতে ঢুইকা হাতের ডাইন দিকে একটা লন্ড্রির দোকান দেখবেন। দোকানটার লগে একটা পাঁচতলার বিল্ডিং আছে না...ওইটার চাইর তলায় থাকে।”

মাসুমের কথা শুনে ম্যাকি মাথা নেড়ে সায় দিলো। “চা খাইবা নি?”

“আরে না, টাইম নাই,” কথাটা বলেই উঠে দাঁড়ালো মাসুম। “আমি তাইলে যাই।” এবার জেফরির দিকে তাকালো সে। “কুনো টেনশন কইরেন না, বড় ভাই। আমি শিউর, বেলাফ মারছে।”

হাত বাড়িয়ে দিলো জেফরি। “থ্যাঙ্ক ইউ, ভাই।”

জেফরির সাথে করমর্দন করে ম্যাকিকে সালাম দিয়ে চলে গেলো মাসুম।

“কি বুঝলা?” ম্যাকি বললো জেফরিকে।

“তার আগে বলো, ওয়ারির লারমিনি স্ট্রিট, চৌদ্দ নাম্বার বাড়ি, এতো কিছু চট করে কিভাবে বললে?”

হা-হা-হা করে হেসে ফেললো ম্যাকি। “আরে, বুঝলা না?”

মাথা দোলালো জেফরি।

“অমর্ত্য সেন।”

“কি?!”

“আমাগো স্কুলের ফেমাস স্টুডেন্ট...একোনমিক্সে নোবেল পাইছে...”

জেফরি কিছুই বুঝতে পারছে না। নোবেল লরিয়েট প্রফেসর অমর্ত্য সেন তাদের স্কুল সেন্ট গ্রেগোরির ছাত্র ছিলো সেটা অনেকেই জানে কিন্তু চৌদ্দ লারমিনি স্ট্রিটের সাথে তার কী সম্পর্ক?

“হের বাপ-দাদার বাড়ি আছিলো চৌদ্দ নম্বর লারমিনি স্ট্রিটে...এইটা তো এহন জেনারেল নলেজের সাবজেক্ট হইয়া গেছে...ওইটাই আমি ইউজ করছি!” খিক খিক করে হাসতে লাগলো ম্যাকি।

ওহ!

হোমিসাইডের কমিউনিকেশন্স রুমে উত্তেজনার চোটে রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠেছে জামান আর রমিজ লস্কর। একটু আগে তারা সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যাল অরুণ রোজারিওর ল্যান্ডফোন আর সেলফোন দুটোয় আড়ি পাতছিলো। তাদের বস জেফরি বেগের ধারণা, হোমমিনিস্টার কিংবা তার ঘনিষ্ঠ লোকজনের সাথে অবশ্যই অরুণ রোজারিওর যোগাযোগ হবে। তাই হয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে তারা একটি ফোনালাপ শুনেছে একটু আগেই।

পুরো সংলাপটি রেকর্ড করেছে তারা। এরমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছুই আছে। বিশেষ করে, হাসানের খুনের সাথে তুর্যের সংশ্লিষ্টতার কিছু আভাস ইঙ্গিত রয়েছে বলে তারা মনে করে। তবে তাদের বস্ ফোনালাপটি শুনলে আরো ভালো বুঝতে পারবে।

ফোনালাপটি ছিলো বেশ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, বিগত কিছুদিন ধরেই হোমমিনিস্টার নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যালের সাথে যাতে করে হাসানের খুনের ঘটনায় কোনোভাবেই তুর্যের নাম চলে না আসে।

এখন রমিজ লস্কর আর জামান যে কাজটা করছে সেটা নিয়ে দ্বিধায় আছে। তারা। যদিও একটু আগেই তাদের বস জেফরি বেগ জানিয়ে দিয়েছে কাজটা করার জন্য তারপরও হোমমিনিস্টারের ফোন ট্যাপিং করতে গিয়ে তাদের মধ্যে এক ধরণের ভয় জেঁকে বসেছে।

জামান ভেবেছিলো তার বস হোমমিনিস্টারের কথা শোনার পর এরকম আদেশ দেবেন না। কিন্তু আবারো তার বস তাকে অবাক করে দিয়ে এই শিক্ষাটাই দিয়েছেন, দায়িত্ব আর কাজের বেলায় তিনি কাউকে ছাড় দেন না।

জামান ভালো করেই জানে, ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ।

রমিজ লস্কর যেনো জামানের মনের কথাটা পড়ে ফেললো। পাশ ফিরে সে বললো, “আমাদের বসের ভয়ডর বলে কিছু নেই। একেবারেই অন্য রকম একজন মানুষ।”

মাথা নেড়ে সায় দিলো জামান। এই কয়েক বছরে সে যা দেখেছে, এই লোক মনে হয় না হোমমিনিস্টারকে ভয় পাবে। হয়তো কৌশলগত কারণে একটু বিরতি দেবে, অন্যদিকে নজর দেবে কিন্তু কোনোভাবেই ভুলে যাবে না, আর ছাড় দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

তার স্পষ্ট মনে আছে এই হোমমিনিস্টার শপথ নেবার কিছুদিন পরই পেশাদার খুনি বাস্টার্ড যখন জেল থেকে জামিনে বের হয়ে এলো সেদিন জেফরি বেগ কেমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলো। অন্য কেউ ব্যাপারটা না জানলেও সে আর মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ জানে, জেফরি তার রেজিগনেশন লেটার লিখে ফারুক সাহেবকে দিয়ে দিয়েছিলো। চিঠিটা জামানের সামনেই লিখেছিলো তার বস।

ফারুক সাহেব এ কথা শোনার পর টানা দু'ঘণ্টা বুঝিয়েছে জেফরি বেগকে। এই ঘটনায় তার মতো একজন ইনভেস্টিগেটর চাকরি ছেড়ে দিলে রীতিমতো অন্যায় করা হবে। তার উচিত, এই অনাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা। একজন মিনিস্টার না হয় অন্যায়ভাবে এক খুনিকে জামিনে মুক্ত করিয়েছে, তাই বলে জেফরি কেন চাকরি ছাড়বে?

অন্যায়-অবিচার, অনিয়ম এসব তো রাতারাতি দূর করা যাবে না। এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে চলে গেলে সেই লড়াই করা যাবে না। ভেতর থেকেই এটা করতে হবে।

ফারুক আহমেদের এমন জ্বালাময়ী বক্তৃতার পর জেফরি সেবারের মতো সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছিলো। জামানও হাফ ছেড়ে বেঁচেছিলো তখন।

“বুঝলেন লস্কর ভাই...স্যার আমাকে একটা কথা বলেছিলো।”

রমিজ লস্কর মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে তাকালো জামানের দিকে। “কি বলেছিলো?”

“পণ্ডিতেরা বলে থাকে, পৃথিবীতে নাকি দুই ধরণের মানুষ আছে। একদল মনে করে গ্লাসটা অর্ধেক খালি, আরেকদল মনে করে গ্লাসে অর্ধেক পানি আছে...”

“হুম...এটা তো শুনেছি,” বললো রমিজ লস্কর।
“কিন্তু আমাদের স্যার মনে করে আসলে তিন ধরণের মানুষ আছে।”
জামানের কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলো রমিজ। “তাই নাকি?...সেটা কি রকম?”
“তৃতীয় দলটার সংখ্যা খুবই কম। তারা ভাবে, অর্ধেক পানি খেলে কে?”
রমিজ কপালে ভুরু তুললো। “ওয়াও!”
“স্যার বলেছেন, আমরা যারা ইনভেস্টিগেশন করি তারা এই তৃতীয় দলের মধ্যে পড়ি।
“বাপরে...মানতেই হচ্ছে, বস্ কঠিন একটা কথা বলেছেন।”
হেসে ফেললো জামান। এবং সত্যি কথা! মনে মনে বললো সে।

জেফরি বেগ গেন্ডারিয়ায় চলে এলো রিক্সায় করে। তার পুরনো বন্ধু ম্যাকি সঙ্গে আসতে চেয়েছিলো, কিন্তু সে রাজি হয় নি। তদন্তকাজে কারোর সাহায্য নেয়া এক কথা আর সঙ্গে করে তাকে নিয়ে ইনকোয়্যারি করতে যাওয়া আরেক কথা।

ম্যাকিকে সে বলেছে, আজ অফিসে ফিরে যাচ্ছে। পরে কোনো এক সময় গেন্ডারিয়ায় দোলনের বাড়িতে তার সহকারীকে পাঠাবে খোঁজ নিতে।

ম্যাকি তার কথা বিশ্বাস করেছে। বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অনেকটা পথ হেঁটে রিক্সা নিয়ে চলে এলো সাধনার গলিতে।

ঐতিহ্যবাহী সাধনা ঔষধালয় এখানেই অবস্থিত। রিক্সা ছেড়ে দিলো জেফরি। গলির ডান দিকে একটা লন্ড্রি, আর সেই লন্ড্রির পাশেই একটা পাঁচতলা বাড়ি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভেবে গেলো সে। তারপর লন্ড্রির দোকানের দিকে পা বাড়ালো।

এক লোক বসে বসে ছোটো একটা টিভি সেটে হিন্দি ছবি দেখছে। দোকানে আর কেউ নেই। জেফরিকে দেখে তার দিকে তাকালো।

“আপনি তো এই দোকানেরই, তাই না?” বললো জেফরি।
লোকটা টিভির সাউন্ড কমিয়ে দিলো। “হ।”
“আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি?”
“বলেন।”
“এখানে দোলন নামের কাউকে চেনেন? আমাকে বলেছে এই গলিতেই থাকে।”
“একটু মোটা কইরা?...দাড়ি আছে?”

দোলন মোটা না পাতলা সে জানে না। তবে লুইচ্চা মাসুম বলেছে লোকটা হজ্ব করে এসেছে গত বছর। তাহলে দাড়ি থাকতে পারে।

“হুম...দাড়ি আছে।”

দোকান থেকে মাথাটা বের করে পাশের পাঁচতলা বাড়িটার দিকে ইশারা করলো দোকানি।

“এই বিল্ডিংয়ের চাইর তলায় থাকে।”

জেফরি এবার পুরোপুরি নিশ্চিত হলো এখানেই দোলন থাকে। “সিঁড়ি দিয়ে উঠলে কোন দিকে?”

“ডাইনে।”

দোকানিকে ধন্যবাদ জানিয়ে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে গেন্ডারিয়া থানায় ফোন করলো সে। রিক্সায় ওঠার আগেই লোকাল থানায় ফোন করে ব্যাক-আপ রেডি রাখার কথা বলেছিলো, এখন তাদেরকে কনফার্ম করবে।

কলটা শেষ করে সোজা ঢুকে পড়লো পাঁচতলা বাড়িতে, পুলিশ আসার জন্য অপেক্ষা করলো না। পুরনো ঢাকার বেশিরভাগ বাড়ির মতোই গেটে কোনো দারোয়ান নেই। সুতরাং কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো না কোথায় যাচ্ছে।

চার তলায় উঠে ডান দিকের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ভাবলো জেফরি। দরজার দু'পাশে কলিংবেলের বোতাম নেই। পুরনো ধাঁচের দুই পাল্লার দরজা। কড়া আছে। জেফরি

কড়া নাড়লো।

একবার...দু'বার...তিনবার।

দরজাটা সশব্দে খুলে যেতেই জেফরির চোখ ছানাবড়া।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিলনের দ্বিতীয় স্ত্রী!

তার চোখেমুখে ভুত দেখার ভীতিকর বিস্ময়।

অধ্যায় ৪১

হোমিসাইডের ইন্টেরোগেশন রুমে ঢুকলো জেফরি বেগ। পুরো ডিপার্টমেন্ট এখনও জানে না আসল ঘটনা কি। তারা শুধু জানে সেন্ট অগাস্টিনে যে ক্লার্ক খুন হয়েছিলো তার একজন সন্দেহভাজন আসামী ধরা পড়েছে।

ডিপার্টমেন্টটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথমবারের মতো তাদের দু দু'জন অফিসার গুলিবিদ্ধ হয়েছে কিছুদিন আগে, আর সেই ঘটনায় যার নামে মামলা হয়েছে, এই তরুণী তার স্ত্রী-হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ এরচেয়ে বেশি কিছু জানে না।

মিলনের ছোটো ভাই দোলনের বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে। মেয়েটা দরজা খুলে ভুত দেখার মতো ভিমরি খায়। সত্যি বলতে কি, জেফরি নিজেও বেশ অবাক হয়েছিলে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়েছিলো এভাবে একা একা কোনো ব্যাকআপ ফোর্স না নিয়ে চলে আসাটা ঠিক হয় নি। ভেতরে যদি মিলন থেকে থাকে তাহলে বিপদের আশংকা আছে।

কিন্তু মিলনের দ্বিতীয় স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দেয় ভেতর থেকে। জেফরি শুনতে পায় দুটো নারীকণ্ঠ। তারা আতঙ্কিত হয়ে হৈহল্লা করছে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে জেফরি পকেট থেকে তার রুমালটা বের করে নেয়, দড়ির মতো লম্বা করে দরজার কড়ায় একটা শক্ত গিট লাগিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে পিস্তল হাতে নিয়ে।

গেন্ডারিয়া থানা থেকে সাদা পোশাকে চারজন পুলিশ আসার আগ পর্যন্ত কেউ দরজা খোলার চেষ্টা করে নি। তবে ভেতর থেকে মোবাইলফোনে কারো সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ঐ দুই মহিলা। পরে দেখেছে, মিলন আর দোলন দু'জনের সাথেই যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলো তারা।

মিলনের ভাই দোলন বাড়িতে ছিলো না। তার স্ত্রীকে অবশ্য গ্রেফতার করা হয় নি। জেফরির ধারনা মিলন আর দোলন সব জেনে গা ঢাকা দিয়েছে। মিলনের স্ত্রীর মোবাইলফোনটা এখন তাদের কাছে। এই ফোনটা বেশ ভালো কাজে দেবে বলে আশা করছে সে। ইতিমধ্যেই রমিজ লস্করকে ফোনটার কললিস্ট চেক করার কাজে লাগিয়ে দিয়েছে।

জেফরি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে চুপচাপ বসে পড়লো জামানের পাশে। মেয়েটি মুখ তুলে তাকে দেখেই আবার মাথা নীচু করে রাখলো। এরইমধ্যে তার হাতে পলিগ্রাফ ক্যাবল লাগানো হয়েছে। যথারীতি ক্যাবলগুলো লাগানোর সময় ভড়কে গেছিলো মেয়েটি।

ঘরে জামান ছাড়াও একজন মহিলা কনস্টেবল এককোণে বসে আছে। কোনো মহিলাকে ইন্টেরোগেশন করার সময় একজন নারী কনস্টেবল রাখার নিয়ম আছে হোমিসাইডে। জেফরি কখনও এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায় না।

জামান বেশ আগ্রহ নিয়ে বসে আছে মিলনের দ্বিতীয় স্ত্রীর মুখোমুখি। তার সামনে পলিগ্রাফ মেশিনের কানেকশান দেয়া একটি ল্যাপটপ।

মেয়েটির বয়স পঁচিশের বেশি হবে না। দেখতে সুশ্রী, সারাক্ষণ সেজেগুজে থাকে।

"আসল নামটা বলুন এবার," একেবারে সাদামাটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলো জেফরি বেগ। সে জানে, কঠিন প্রশ্ন দিয়ে শুরু না করে সাদামাটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা অনেক বেশি ফলপ্রসু। কেউ যদি মিথ্যে বলতে চায়, ঘটনা অন্যভাবে সাজাতে চায় তাহলে কঠিন আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো মাথায় রেখেই কাজটা করে। একদম সহজ আর নির্দোষ ব্যাপারগুলো খুব কমই আমলে নেয়া হয়। সুতরাং সহজ প্রশ্ন করার মধ্য দিয়েই মিথ্যের জাল ছিন্ন করা সম্ভব।

মিলনের দ্বিতীয় স্ত্রী মাথা নীচু করেই রাখলো।

"কি হলো?" তাড়া দিলো জামান, অনেকটা ধমকের সুরে বললো, "কথা বলুন।"

মাথা তুলে তাকালো তরুণী। "পলি।"

"পুরো নাম বলুন।"

“নাসরিন আক্তার,” আস্তে করে বললো মেয়েটি। “পলি আমার ডাক নাম।”
“গুড। কে রেখেছিলো নামটা, আপনি নিজে?”
“কোন্ নামের কথা বলছেন?” ঢোক গিলে বললো পলি।
“আসল এবং ডাকনাম...দুটোই।”
আবারো মাথা নীচু করে ফেললো। “আসল নাম রেখেছে আমার নানি।”
“আর ডাক নামটা?”
“আরমান ভাই।”
“আরমান ভাই?” অবাক হয়ে জানতে চাইলো জেফরি বেগ। “উনি কে?”
“ফিল্মের ডিরেক্টর...”
“আপনি কি ফিল্মে কাজ করতেন?”
“জি।”
জামানের দিকে তাকালো জেফরি। “আচ্ছা,” মনিটরের দিকে তাকালো এবার। মেয়েটি সত্যি বলছে। “মিলনের সাথে পরিচয় কিভাবে হলো?”
“এফডিসিতে,” মাথা নীচু করেই বললো সে।
“আপনি কি নায়িকা ছিলেন?”
“সাইড নায়িকা।”
“কয়টা ছবি করেছেন?”
এবার মুখ তুলে তাকালো মেয়েটি। “বেশি না। চার-পাঁচটা হবে...”
“সবগুলোতেই সাইড নায়িকা ছিলেন?”
“জি।”
“মিলনের সাথে আপনার পরিচয় কবে থেকে?”
“চার-পাঁচ বছর আগে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো সাইড নায়িকা পলি।
“বিয়ে করলেন কবে?”
“তিন মাস আগে।”
জামানের দিকে তাকালো সে। মাত্র তিন মাস আগে! “আপনি কি জানতেন মিলন বিবাহিত, তার একটা বউ আছে?”
মাথা নেড়ে সায় দিলো পলি।
“মিলন যে একজন ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী সেটাও নিশ্চয় জানতেন?”
নিরুত্তর।
“এতোদিন ধরে পরিচয় অথচ বিয়ে করলেন মাত্র কিছুদিন আগে...কেন?”
“বিয়েটা আরো আগেই হত, কিন্তু প্রথম বউয়ের কারণে দেরি হয়েছে।”
“তিন মাস আগে হঠাৎ করে রাজি হয়ে গেলো কেন?”
মুখ তুলে তাকালো পলি। “মিলন যখন জেলে ছিলো তখন সে কোনো রকম যোগাযোগ রাখে নি... আমি রেখেছিলাম। জেল থেকে বের হয়ে ডিভোর্স দিতে চেয়েছিলো কিন্তু উনি আমাকে মেনে নিলে আর ডিভোর্স দেয়া হয় নি।”
অবাক হলো জেফরি। মিলন যে জেলে ছিলো এ কথাটা তাহলে সত্যি! “মিলন কবে ধরা পড়েছিলো? বের হলো কবে?”
“এক বছর আগে ধরা পড়েছিলো...চারমাস আগে বের হয়েছে।”
“কেন ধরা পড়েছিলো?” আড়চোখে তাকালো মনিটরের দিকে। মেয়েটা সত্যিই বলছে।
“ইয়াবা নিয়ে ধরা পড়ছিলো...”
ইয়াবা! জামান তাকালো তার বসের দিকে। জেফরি বুঝতে পারলো, হাই প্রোফাইলের এক সন্ত্রাসী এই মিলন। নিশ্চয় পুলিশের রেকর্ডে তার নাম আছে।
“আচ্ছা, তাহলে মিলন ইয়াবা ব্যবসাও করে?”
ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো পলি।

“ঐ বাড়ি থেকে পালিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা?”

“আমাকে দোলন ভায়ের বাড়িতে রেখেছে কিন্তু বড়জনকে কোথায় রেখেছে আমি জানি না।”

“মিলনও আপনার সাথে থাকতো?”

মাথা দোলালো শুধু। পলিগ্রাফ মেশিন জানাচ্ছে মেয়েটা সত্যি বলছে।

“তাহলে?”

“সে কোথায় আছে আমি জানি না।”

“দোলনের বাড়িতে সে আসে না? আপনার সাথে দেখা করে না?”

“আমাকে দোলনের বাড়িতে রেখে যাবার পর সে আর আসে নি... শুধু ফোনে যোগাযোগ হয়েছে...”

“ও কোথায় থাকে আপনি কিছু জানেন না?”

মাথা দোলালো আবার। জানে না।

“হাসানের খুনের ব্যাপারে আপনি কি জানেন?”

অবাক হয়ে তাকালো পলি। “আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের হাসান সাহেব?”

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি।

“না। এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।”

“সত্যি। কিছু জানেন না?”

“না।”

এমন সময় জেফরির ফোনটা বেজে উঠলে পকেট থেকে বের করে নাম্বারটা দেখলো। অপরিচিত একটি নাম্বার। তার এই ফোনে খুব কমই অপরিচিত নাম্বার থেকে কল আসে। একটু ভেবে কলটা রিসিভ করলো সে।

“হ্যালো?”

ওপাশ থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই।

“হ্যালো?” তাড়া দিয়ে বললো আবার।

“আমার বউটাকে ছেড়ে দেন!” ফ্যাসফ্যাসে একটা কণ্ঠ বললো অবশেষে।

মিলন! জেফরি যারপরনাই অবাক হলো। পাশে বসা জামানের দিকে তাকালো সে। সঙ্গে সঙ্গে লাউডস্পিকার মোডে দিয়ে দিলো ফোনটা।

“কে বলছো?”

“আমি আবারো বলছি, আমার বউটাকে ছেড়ে দেন।” বেশ দৃঢ়ভাবে কথাটা পুণরায় বললো সে।

মিলনের দ্বিতীয় স্ত্রী পলি বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলো।

“আগে নিজের পরিচয় দাও...!” বানচোত গালিটা মুখে চলে এলেও উচ্চারণ করলো না জেফরি।

“যে মেয়েটাকে ধরেছেন ওর হাজবেন্ড...”

“শুনে খুশি হলাম। কিন্তু হাজবেন্ডের নামটা কি?”

“আপনি আমার নাম ভালো করেই জানেন...আমার সাথে আপনার দেখাও হয়েছে। কিন্তু কিভাবে যে আপনি বেঁচে গেলেন বুঝতে পারছি না।” একটু থেমে আবারো বললো, “মনে আছে ঘটনাটা?”

জেফরির ভালোই মনে আছে। এই ঘটনা সে কখনই ভুলতে পারবে না।

“ওকে ছেড়ে দেন...আপনার ভালো হবে।”

“আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস, বানচোত!” এবার আর গালিটা না দিয়ে পারলো না।

“মাথা গরম করবেন না,” শান্ত কণ্ঠে বললো মিলন।

জেফরি বিশ্বাস করতে পারছে না একজন খুনি হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটরকে ফোন করে শাসাচ্ছে!

“আমার ক্ষমতা এখনও টের পান নাই...”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ...জানি। তোর অনেক ক্ষমতা। হোমমিনিস্টারের কথা বলছিস তো?”

“এতো কথা বলার টাইম নাই আমার। ফোনটা যেখান থেকে করেছি ওই জায়গাটা একদম সুবিধার না। এখানে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। যা বলছি তাই করেন। নইলে অনেক পস্তাবেন।”

“চুপ, শুয়োরের বাচ্চা!” রেগে গেলো জেফরি।

ওপাশ থেকে মৃদু হাসি শোনা গেলো শুধু।

বানচোতটা হাসছে! “তুই আমাকে ফোন করে কতো বড় ভুল করেছিস একটু পরই টের পাবি।”

“আচ্ছা? কি করবেন? আমার ফোনটা ট্র্যাকডাউন করবেন?” এবার অট্টহাসি। “এসব খেলা আমার সাথে খেলবেন না। আপনারা কিভাবে কাজ করেন আমি ভালো করেই জানি।”

রাগে দাঁতে দাঁত পিষে ফেললো জেফরি বেগ। বদমাশটার সাহস কতো বড়!

“আমি যা বলার বলেছি...আমার বউকে ছেড়ে দেন, নইলে এমন ক্ষতি করবো সারা জীবন পস্তাতে হবে!”

“শুয়োরের বাচ্চা–!”

কলটা কেটে দিলো মিলন।

জামানের দিকে তাকালো জেফরি। “কমিউনিকেশন্স রুমে...” চেয়ার থেকে উঠে তাড়া দিয়ে বললো সে। জামানের জন্য অপেক্ষা না করেই রীতিমতো দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো জেফরি বেগ।

দ্রুত কমিউনিকেশন্স রুমে ছুটে গিয়ে মিলনের ফোনটা ট্রেস করা সম্ভব হলেও তাতে কোনো লাভ হলো না। ফোনটা যে নাম্বার থেকে করা হয়েছে সেটার অবস্থান জানতে পেরেছে তারা। সেখানে স্থানীয় থানার পুলিশ গিয়ে কাউকে খুঁজে পায় নি। পাওয়ার কথাও না।

ফার্মগেটের ব্যস্ততম এলাকার একটি পাবলিক টয়লেট।

লক্ষ লক্ষ লোকজনের মিছিলে একজন মিলনকে এভাবে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ফোন কলটা শেষ হবার পর ট্র্যাকডাউন আর লোকেট করতে যে সময় লেগে যায় সেটা সটকে পড়ার জন্য যথেষ্ট। অপরাধী যদি সচেতন না থাকে, তাহলে এভাবে তাকে লোকেট করা যায়। কিন্তু যে অপরাধী এই ব্যাপারটা বেশ ভালোমতো জানে, তার পক্ষে স্থান ত্যাগ করার জন্য যথেষ্ট সময় থাকে।

মিলন তাদের ট্র্যাকডাউন করার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত। তাকে এভাবে ধরা সম্ভব হবে না। জেফরিকে কলটা করার পরই ওই নাম্বারটা বন্ধ হয়ে গেছে।

দারুণ স্মার্ট! ভাবলো জেফরি। এখন পর্যন্ত এরকম প্রতিপক্ষের মোকাবেলা তাকে করতে হয় নি। মোবাইল ফোন ট্র্যাকডাউন করার ব্যাপারটা এমনকি বাস্টার্ড নামের পেশাদার খুনিও জানতো না। শেষে জানলেও ততোক্ষণে জেফরি বেগ যা বোঝার, যা করার করে ফেলেছিলো।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে কমিউনিকেশন্স রুমে বসে রইলো সে। ইন্টেরোগেশন রুমে যে মিলনের দ্বিতীয় স্ত্রী আছে সেটা যেনো ভুলেই গেলো। কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলো জামান।

ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এলো ইন্টেরোগেশন রুমে।

মিলনের স্ত্রী পলি চোখ বন্ধ করে বসে আছে। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। জামান আর জেফরি ঘরে ঢুকতেই চোখ খুলে তাকালো মেয়েটি।

চেয়ারে বসলেও ইন্টেরোগেশন করার মতো মনমেজাজ নেই জেফরির। তার সহকারী জামান হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। সে-ই শুরু করলো জিজ্ঞাসাবাদ।

"মিলন একটা নিরীহ ছেলেকে খুন করেছে, আমাকে আর আমার স্যারকেও গুলি করেছে...তার শাস্তি তাকে পেতেই হবে।"

জামানের কথা শুনে পলি চোখ পিটপিট করে চেয়ে রইলো শুধু।

"আপনি যদি ভালোয় ভালোয় সব না বলেন তাহলে কপালে অনেক দুঃখ আছে," জামান চোখমুখ খিচে বললো কথাটা।

"আমি তো এসবের কিছুই জানি না...আমাকে খামোখা ধরে এনেছেন, কাঁদো কাঁদো গলায় বললো পলি।

"চুপ!" রেগেমেগে ধমকে উঠলো জামান। মেয়েটা দারুণ ভয় পেলো। "অভিনয় করা হচ্ছে? সিনেমা পেয়েছেন? আমাদের সাথে নাটক করে...কতো বড় সাহস! "

জেফরি আস্তে করে জামানের বাহুটা ধরে তাকে নিবৃত্ত করলো।

"দেখেন ভাই, আমি যা জানি সবই বলেছি। আমি কোনো খুনখারাবির সাথে জড়িত নই। গরীবঘরে জন্ম আমার...ভাগ্যের দোষে ফিল্ম লাইনে এসেছিলাম, মিলন যদি আমাকে আশ্রয় না দিতো তাহলে আমার ঠাঁই হতো খারাপ কোনো জায়গায়..." আবেগের সুরে বলে চললো পলি। "আমার মতোন মেয়েদের অবস্থা আপনারা বুঝবেন না।"

জামান রেগেমেগে তাকালেও কিছু বললো না। জেফরি মাথা নীচু করে কপাল চুলকাচ্ছে।

"মিলন এখন কী করে না করে আমি জানি না। বছরখানেক আগে ইয়াবা নিয়ে ধরা পড়েছিলো, অনেকদিন পর বের হয়ে আসে। আমার দুরাবস্থা দেখে অবশেষে প্রথম স্ত্রীর অনেক বাধা সত্ত্বেও বিয়ে করেছে..."

"চুপ করুন!" ধমক দিলো জামান। "আপনার কাছ থেকে এসব কাহিনী শুনতে চেয়েছি

আমরা?”

পলি চুপ মেরে গেলো।

“ফিলমি স্টাইলের কাহিনী বলে যাচ্ছে। যত্তোসব!”

জামান কথাটা শেষ করতে না করতেই আবারো জেফরির ফোনটা বেজে উঠলো। চোখাচোখি হলো তাদের দুজনের মধ্যে। ঝটপট পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখলো সে।

আরেকটা অপরিচিত নাম্বার।

কলটা রিসিভ করলেও কোনো কথা বললো না। লাউডস্পিকার মোডে আছে ফোনটা।

“কথা বলছেন না কেন?” কণ্ঠটা একেবারে শান্ত।

মিলন আবারো ফোন করেছে! জেফরি চেয়ে রইলো জামানের দিকে। সে কিছু বললো না।

“আপনার পুলিশ কী খুঁজে পেলো?” টিটকারি মারার সুরে জানতে চাইলো মিলন।

জামান কমিউনিকেশন্স রুমে যাবার জন্য উঠতে গেলে জেফরি তার হাত ধরে বিরত রাখলো। দরকার নেই। এই বদমাশটাকে এভাবে ধরা যাবে না।

“দুর্গন্ধ ছাড়া কিছু পায় নি মনে হচ্ছে,” কথাটা বলেই হা হা করে হাসলো সন্ত্রাসী।

“যখন আমার হাতে ধরা পড়বি তখন এমন হাসি থাকবে না,” যতোদূর সম্ভব শান্তকণ্ঠে বললো জেফরি বেগ।

“ভাইজান অবশেষে কথা বলেছে তাহলে?” আবারো গা রি রি করা হাসি। “আমি তো ভাবছিলাম বোবা হয়ে গেছেন।”

“হোমমিনিস্টার তোকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না, কথাটা মনে রাখিস।”

“আচ্ছা, মনে রাখবো। এবার কাজের কথায় আসেন।”

ভুরু কুচকে জামানের দিকে তাকালো জেফরি।

“কিসের কাজ?”

“আমার বউ...ওর কোনো দোষ নেই। ওকে ছেড়ে দেন। ও কিছু জানে না। খেলাটা আপনার সাথে আমার...মেয়ে মানুষের সাথে বাহাদুরি না দেখিয়ে আমার সাথে দেখান।”

“তোর কথা শেষ?” ঝাঁঝের সাথে বললো জেফরি।

“না। শেষ কথাটা শুনে রাখেন, এক ঘণ্টার মধ্যে পলিকে ছেড়ে দেবেন। নইলে আমি আমার মতো খেলবো?”

“শুয়ো-” থেমে গেলো জেফরি। লাইনটা কেটে দিয়েছে মিলন।

“স্যার, ট্র্যাকডাউন করা দরকার ছিলো,” অধৈর্য কণ্ঠে বললো জামান।

“কোনো লাভ হবে না।” উদাস হয়ে বললো জেফরি। “ওকে এভাবে ধরতে পারবো না আমরা।”

জামান চেয়ে রইলো তার বসের দিকে।

জেফরি বেগ বুঝতে পারলো ছেলেটা কিছু বলতে চাচ্ছে কিন্তু ইন্টেরোগেশন রুমে মিলনের স্ত্রীর সামনে নয়।

উঠে দাঁড়ালো সে। “চলো, একটু ব্রেক নেয়া যাক।”

মাথা নেড়ে সায় দিলো জামান। এটাই চাচ্ছিলো সে।

দশ মিনিট পর, জেফরি আর জামান বসে আছে কমিউনিকেশন্স রুমে। রমিজ লস্করও আছে সেখানে। জামানের প্রস্তাব মতে মিলনের শেষ কলটা খতিয়ে দেখছে তারা।

জামান মনে করে, মিলন সত্যি সত্যি তাদের ট্র্যাকডাউন করার মেথড সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য শেষ কলটা ট্র্যাকডাউন করা দরকার। জেফরি তার কথাটা মেনে নিয়েছে।

রমিজ লস্কর দেখছে শেষ কলটা মিলন কোত্থেকে করেছিলো।

“স্যার!” পেছন ফিরে আতঙ্কিত কণ্ঠে বললো রমিজ।

জেফরি আর জামান মনিটরের দিকে তাকালো।

“শেষ কলটা বেইলি রোড থেকে করেছে!”

রমিজের কথা শুনে ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো জেফরি। জামান রীতিমতো হতভম্ব।

“আমাদের অফিসের খুব কাছেই!” যোগ করলো রমিজ লস্কর।

মাইগড!

মিলনের পরিকল্পনা কি? সে কি করতে চাইছে? জেফরির মাথায় কিছুই ঢুকছে না। বদমাশটা আগ্রাসী আচরণ করছে। হয়তো তার নার্ভের শক্তি পরীক্ষা করে দেখতে চাইছে। নাকি দলবল নিয়ে হোমিসাইডে অক্রমণ করার পায়তারা করছে?

অসম্ভব!

তাহলে হোমিসাইডের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে কেন?

বদমাশটার এতো বড় আস্পর্ধা!

অধ্যায় ৪৩

হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদকে হোমমিনিস্টারের জড়িত থাকার কথা বাদ দিয়ে মিলনের ব্যাপারটা বিস্তারিত জানালো জেফরি বেগ। যা ঘটেছে তারপর মহাপরিচালককে না জানিয়ে আর কোনো উপায় রইলো না। মিলন নামের ধুরন্ধর বদমাশটা ভালো খেলাই শুরু করেছে। একেবারে হোমসিাইডের আঙিনায় চলে এসে একধরণের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করছে, সে কতোটা ক্ষমতা রাখে; কততটা বেপরোয়া হতে পারে।

সব শুনে ফারুক আহমেদ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

একটা রাস্তার মাস্তান হোমিসাইডের দু দু'জন অফিসারকে গুলি করেছে, সে-ই কিনা এখন ফোন করে রীতিমতো হুমকি-ধমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। এতো সাহস সে পেলো কোত্থেকে?

"হোমিসাইডের বাইরে ভেতরে নিরাপত্তা জোরদার করার কথা বলে দিচ্ছি আমি..." বললে ফারুক আহমেদ।

"দরকার নেই, স্যার," আস্তে করে বললো জেফরি বেগ।

অবাক হলো মহাপরিচালক।

"দরকার নেই?"

"জি, স্যার। দরকার নেই।" একটু থেমে আবার বললো জেফরি, "ওই বদমাশটা মনে করবে আমরা সবাই ওর হুমকিতে ভয় পেয়ে গেছি।"

"তাহলে আমরা কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো?" মাথা দোলালো ফারুক আহমেদ। "কিছু একটা তো করতেই হবে, নাকি?"

"জি, স্যার। তাতো করতেই হবে।"

"এনি আইডিয়া?"

কমিউনিকেশন্স রুম থেকে ফারুক আহমেদের কাছে আসার পথে একটা আইডিয়া তার মাথায় এসেছে। এ মুহূর্তে এরচেয়ে ভালো কিছু আশা করা যায় না।

"আমি ঠিক করেছি মিলনের স্ত্রীকে ছেড়ে দেবো।" নির্বিকারভাবে বললো জেফরি বেগ।

"কি!" ফারুক আহমেদ যেনো নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলো না। "ছেড়ে দেবে মানে?"

"আমার ধারনা মেয়েটা তেমন কিছু জানে না। ওকে আটকে রেখে আমাদের কোনো লাভ হবে না। মাঝখান থেকে ঐ সন্ত্রাসী বেপরোয়া হয়ে উল্টাপাল্টা কিছু করে ফেলতে পারে..."

"মাইগড, আমি ভাবতেই পারছি না তুমি এ কথা বলছো!" জেফরির দিকে গোল গোল চোখে চেয়ে রইলো মহাপরিচালক।

"এটাই সহজ সমাধান, স্যার," নির্বিকারভাবে বললো জেফরি বেগ।

"সহজ সমাধান?" মাথা দোলালো জেফরির বস্। "না না...এটা হবে সন্ত্রাসীর ভয়ে পিছু হটে যাওয়া।"

"কৌশলগত কারণে কখনও কখনও পিছু হটতে হয়, স্যার।"

হা করে চেয়ে রইলো ফারুক আহমেদ। তার এই প্রিয়পাত্র কি রাতারাতি বদলে গেলো নাকি? সেই দৃঢ়, একরোখা, হাল ছেড়ে না দেয়া জেফরি বেগ কোথায় গেলো!

"মিলনের স্ত্রীর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানা যাবে না। আমি নিশ্চিত," বসকে চুপ থাকতে দেখে বললো জেফরি।

"তোমার এরকম মনে হবার কারণ কি?"

"মিলন ধরে নিয়েছে তার বউ অল্প যেটুকু জানে সবই আমাদের বলে দিয়েছে। সে এখন আরো সতর্ক হয়ে গেছে।"

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো ফারুক আহমেদ।

“সেজন্যেই বলছি, খামোখা মিলনের স্ত্রীকে আটকে রেখে কী লাভ।”

“কিন্তু তার স্ত্রীকে এভাবে ছেড়ে দিলে সে বুঝে যাবে আমরা তাকে ভয় পেয়ে গেছি। এটা আমাদের জন্যে ভালো হবে?”

“স্যার, সত্যি বলতে কি, আমি আসলেই ভয় পেয়ে গেছি।”

ফারুক আহমেদ যেনো দুঃস্বপ্ন দেখছে। “তুমি ভয় পেয়ে গেছো? কী বলছো এসব? তুমি তো কখনও ভয় পাবার লোক ছিলে না!”

“স্যার, আমি আমাকে নিয়ে নয়, অন্যদের নিয়ে ভয়ে আছি।”

জেফরি সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথাটা বললো বলে ফারুক আহমেদও ঘাবড়ে গেলো কিছুটা।

“অন্যদের নিয়ে মানে?”

“আমাদের হোমিসাইডের কর্মকর্তাদের কথা বলছি। মিলন হয়তো মাথা গরম করে আমাদের কারো কোনো ক্ষতি করে ফেলতে পারে। তার হুমকিতে এরকম কিছুরই ইঙ্গিত ছিলো।”

“মাইগড!” ফারুক আহমেদ মুখে হাত দিয়ে বললো। “এই যদি অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে কি আমাদের উচিত হচ্ছে মিলনের হুমকি-ধামকিতে ভয় পেয়ে ওর স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়া?” মাথা দোলালো মহাপরিচালক। “নো মাই বয়...দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি রং মুভ।”

“তাহলে রাইট মুভটা কি, স্যার?”

“ফাইন্ড হিম...অ্যান্ড শুট হিম লাইক অ্যা ডগ!” ডেস্কের উপর একটা কিল মেরে বসলো ফারুক আহমেদ।

জেফরির মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠলে ভুরু কুচকে তাকালো হোমিসাইডের মহাপরিচালক।

“হাসছো কেন?”

অধ্যায় ৪৪

বিকেল পাঁচটার দিকে মিলনের দ্বিতীয় স্ত্রী বেরিয়ে এলো হোমিসাইড থেকে। মেয়েটির চোখেমুখে বিস্ময়। মিলনের হুমকিতে এরকম কাজ হবে ভাবতেই পারে নি। আজব ব্যাপার!

মিলন যখন প্রথম ফোন করেছিলো পুলিশের লোকটাকে তখন সে ভেবেছিলো পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে উঠবে তার জন্য। মনে মনে মিলনের বোকামির জন্য সে গালিও দিয়েছে। কী দরকার ছিলো পুলিশকে শাসানোর? তাকে তো রিমান্ডে নিয়ে টর্চার করে নি। একদম ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলো ঐ লোকটা। পুলিশ রিমান্ড এ রকম হয় তার ধারনাই ছিলো না। তাছাড়া সত্যি বলতে কি, মিলনের ব্যাপারে সে খুব বেশি কিছু জানেও না।

জেল থেকে বের হবার পর মিলনের জামিন করানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, লাভ হয় নি। তারপর হঠাৎ করেই বেরিয়ে এলো মিলন। পর্দার আড়াল থেকে কারা তার জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করে নামি-দামি ব্যারিস্টার ধরেছে সে জানে না।

যাইহোক, জামিনে বের হয়ে এসেই তাকে বিয়ে করে ফেলে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, প্রথম স্ত্রী আম্বিয়া একটুও আপত্তি জানায় নি তাদের এই বিয়েতে। অথচ এই মহিলার কারণেই মিলন তাকে আলাদা বাড়িতে রেখেছিলো, সে ছিলো বলতে গেলে তার রক্ষিতা।

বিয়ের পর তারা আলাদা বাসায় থাকত, কিন্তু দু'মাস আগে আরামবাগের বাড়ি ভাড়া নিয়ে মিলন তার দুই বউকে একসাথে রাখতে শুরু করে। পলি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে মিলন বলেছে, একটা জরুরি কাজের নাকি ভীষণ ব্যস্ত থাকবে কয়েক মাস। প্রায়ই বাসায় থাকতে পারবে না। সেজন্যে এই ব্যবস্থা। মাত্র দু'তিন মাসের ব্যাপার। তারপরই আম্বিয়ার একটা ব্যবস্থা করে তারা দু'জনে উঠবে নতুন ঠিকানায়।

কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, মিলন হয়তো বড়সড় কোনো কাজে জড়িয়ে পড়েছে। পুলিশের লোকগুলো সেরকম কথাই বলছিলো তাকে। এক অজানা আশংকা জেঁকে বসলো পলির মধ্যে।

বিকেলের আলো কমে সন্ধ্যা নামি নামি করছে। বেইলি রোডের একটা ফুটপাত ধরে হেঁটে যাচ্ছে সে। ভ্যানিটি ব্যাগে কিছু টাকা ছিলো, বের হওয়ার সময় খুলে দেখেছে, সব কিছু ঠিকঠাক আছে। অদ্ভুত ব্যাপার। এর আগে যখন গ্রেফতার হয়েছিলো তখন তার ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতরে ছিলো দশ হাজার টাকা ছাড়া পাওয়ার পর একটা টাকাও ব্যাগে ছিলো না। সব টাকা মেরে দিয়েছিলো পুলিশের লোকগুলো!

কিন্তু এবার যাদের কাছে ধরা পড়েছে তারা পুলিশ হলেও পোশাকে আশাকে ব্যবহারে পুলিশের ছিটেফোঁটাও নেই। এরা তাহলে কারা?

কী যেনো একটা নাম বললো? হোমি...

মাথা থেকে এসব ঝেড়ে ফেলে একটা সিএনজি নেবার চেষ্টা করলো। এই রাস্তায় আবার রিক্সা চলে না। ধারেকাছে কোনো সিএনজিও নেই। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো সে। রাস্তার দু'পাশে তাকালো। এখান থেকে সিএনজি নিয়ে সোজা চলে যাবে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে। তারপর মিলনের সাথে যোগাযোগ করবে।

আশেপাশে তাকালো। এবার সিএনজি'র খোঁজে নয়, তার পেছনে কোনো টিকটিকি লেগেছে কিনা দেখতে। না। সেরকম কাউকে দেখতে পেলো না। ছাড়া পাবার পরই তার মনে হয়েছিলো সাদা পোশাকের পুলিশ তাকে ফলো করবে। তার ধারণা ভুল। কেউ তাকে ফলো করছে না।

রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে থাকা কিছু লোক তার দিকে বার বার তাকাচ্ছে। পলি দেখতে খুব সুন্দর। এরকম সুন্দরী একটা মেয়ে একা একা দাঁড়িয়ে থাকলে লোকজন তো তাকাবেই। ব্যাপারটা আমলে নিলো না সে।

এক লোক রাস্তার ওপার থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। চোখে চোখ পড়তেই বদমাশটা মিটিমিটি করে হাসলো।

ফাজিল কোথাকার! মনে মনে বললো পলি। তাকে অন্য কিছু ভেবেছে হারামজাদা। অস্থির হয়ে আবারো তাকালো রাস্তার দু'পাশে। কোনো সিএনজি নেই। আরেকটু হেঁটে সামনে এগোবে কিনা বুঝতে পারলো না।

পলি অবাক হয়ে দেখতে পেলো লোকটা রাস্তা পার হয়ে তার কাছেই। আসছে। মুখে এক ধরণের হাসি লেগে আছে। যেনো শিকার ধরতে পেরেছে।

পলির খুব কাছে এসে দাঁড়ালো বদমাশটা। বিরক্তি নিয়ে তাকালো সে। এদের জন্য ঢাকা শহরে একা একা বের হওয়াই দায়।

"একা নাকি?" আস্তে করে বললো সেই লোকটি।

পলি তাকালো তার দিকে। "আপনার সমস্যা কি?" একটু ঝাঝের সাথে বললো।

"সমস্যা হইবো কেন?...একা থাকলে চলো একটু কথা কই," প্রস্তাব দিলো বদমাশটা।

"আপনার সাথে আমি কথা বলবো কেন?"

হে হে করে নীরব হাসি দিলো লোকটা। "এতো রাগ করো কেন, আমি তো বুঝবার পারছি তুমি কোন লাইনের..." কথাটা বলে পলির গা ঘেষে দাঁড়ালো। "কতো দিতে হইবো?" ফিসফিস করে পলির কানের কাছে মুখ এনে বললো সে।

একটু সরে গেলো পলি। এরকম লোকজন এর আগেও সে ম্যানেজ করেছে। "অতো টাকা তো আপনার কাছে নেই, ভাইজান।"

ভুরু কপালে তুললে লোকটা। "তুমার রেট কতো, শুনি?"

"পঞ্চাশ হাজার!" বলেই মুচকি হাসলো পলি।

দাঁত বের করে হাসলো বদমাশটা। "ফ্ল্যাট বাড়ির মাইয়ারাও তো পাঁচের বেশি চায় না... আর তুমি তো রাস্তায় নামছো ..." আরো কাছে এগিয়ে এসে চাপা কণ্ঠে বললো সে, "এক দিমু নি...চলো!"

"কি হয়েছে?"

কথাটা শুনে তারা দুজনেই তাকালো রাস্তার দিকে। একটা মোটরসাইকেল কখন এসে থেমেছে তাদের সামনে টেরই পায় নি। মাথায় হেলমেট পরা এক আরোহী। কালো রঙের জ্যাকেট আর জিন্স প্যান্ট। মোটরসাইকেলটাও কালো রঙের।

পলি ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো আরোহীর দিকে। তার বিশ্বাসই হচ্ছে না। কণ্ঠটা চিনতে একদম ভুল হয় নি।

"ওঠো!" আস্তে করে বললো মোটরসাইকেল আরোহী।

পলি চুপচাপ উঠে পড়লো মোটরসাইকেলের পেছনে।

সাই করে চলে গেলো মোটরসাইকেলটা।

হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদের রুম থেকে বের হয়ে জেফরি বেগ চলে আসে কমিউনিকেশন্স রুমে। জামান আর রমিজকে জানায় তার পরিকল্পনাটি। মিলনের স্ত্রীকে ছেড়ে দেবার কথা শুনে প্রথমে তারা অবিশ্বাসে চেয়ে থাকে। একটু পরই যখন জেফরি তাদেরকে সব খুলে বলে তখন হাফ ছেড়ে বাঁচে।

তবে জামানের মন খুব খারাপ, এই অপারেশনে তাকে বাদ দেয়া হয়েছে। পুরোপুরি বাদ পড়ে নি। তাকে কমিউনিকেশন্স রুমে থেকে জরুরি একটা কাজ করতে হবে।

রমিজ লস্করসহ হোমিসাইডের আরো একজনকে নিয়ে দ্রুত একটা টিম তৈরি করে ফেলে জেফরি। তাকে নিয়ে টিমের সদস্য সংখ্যা তিন।

জেফরি, রমিজ আর আমান নামের নতুন একটি ছেলে হোমিসাইডের পেছন দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবে। মিলনকে ফলো করার কাজ করবে তাদের এই টিমটা।

এই কাজটা প্রচলিত পদ্ধতিতে করা হবে না। এরজন্য ছোট্ট একটা ডিভাইস ব্যবহার করা হবে। মিলনের স্ত্রীর সাথে সেই ডিভাইসটা জুড়ে দেয়া হবে সুকৌশলে।

পুরো পরিকল্পনাটি ব্রিফ করে কাজে নেমে পড়তে দু'ঘণ্টার মতো সময় লেগে যায়। তারা যখন মিলনের স্ত্রীর ভ্যানিটি ব্যাগটা ফিরিয়ে দিয়ে তাকে বলছিলো একটু পরই তাকে ছেড়ে দেয়া হবে ঠিক তখনই মিলন কল করে বসে জেফরিকে।

কলটা রিসিভ করে জেফরি।

"আমি যে আপনাকে সময় দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে, ভাইজান!" ফ্যাসফাসে কণ্ঠে বলে মিলন।

"শোনো, ইচ্ছে করলেই হুটহাট করে আসামী ছেড়ে দেয়া যায় না, এরজন্য সময় লাগে..."

জেফরির এ কথা শুনে মিলন চুপ মেরে থাকে কয়েক মুহূর্ত। "আর কতোক্ষণ সময় লাগবে আপনার?"

"উমমম..." মিলনের স্ত্রীর দিকে তাকায় জেফরি। "একটা শর্ত আছে। আমার।"

"কি শর্ত?"

"হাসানকে খুন করার জন্য তোমাকে কে ভাড়া করেছিলো?" জেফরি জানতো মিলন তার কাছে নির্ঘাত মিথ্যে বলবে, কিন্তু এটা এমনি এমনি বলা।

হা হা করে হেসে ফেলে মিলন। "আপনি এখনও জানেন না?" একটু চুপ থেকে আবার বলে, "আমার তো ধারণা ছিলো আপনি সব জেনে গেছেন।"

"আমি জানি তুমি কাজটা করেছে, কিন্তু তোমাকে কে ভাড়া করেছে সেটা জানি না।"

"আপনার কি মনে হয়? মানে কি আন্দাজ করছেন?"

"কোনো আন্দাজ নেই। তুমি বলো?"

"শোনেন, এসব প্যাচাল বাদ দিয়ে একটা আসল কথা বলি। এই কেসটা নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামাবেন না। আদার ব্যাপারি হয়ে জাহাজের খবর নিতে গেলে বিরাট ভুল করবেন।"

"তুমি বলতে চাচ্ছো, হোমমিনিস্টার তোমাকে ভাড়া করেছে?"

একটু চুপ থেকে মিলন বলেছিলো, "বউটাকে ছেড়ে দেন...তাহলে আপনার সাথে আমাদের লেনদেনও চুকে যাবে, ওকে?"

"তুমি যদি মনে করে থাকো ভয় পেয়ে তোমার বউকে ছেড়ে দিচ্ছি তাহলে ভুল করছে।"

"না। ভয় পান নাই। আমার অনুরোধে ছেড়ে দিচ্ছেন...এবার খুশি হয়েছেন?" মৃদু হাসি শোনা যায় ফোনের ওপাশ থেকে।

"তোমার বউ তেমন কিছু জানে না। তাকে আটকে রেখে লাভ নেই, বুঝলে?"

"হুম। ঠিক লাইনে এসেছেন। ও আসলেই কিছু জানে না।"

“দশ মিনিটের মধ্যে ওকে ছেড়ে দিচ্ছি...তুমি আমাদের ধারেকাছেও থাকার চেষ্টা কোরো না। তোমার কোনো লোকজনও যেনো না থাকে,” ইচ্ছে করেই এ কথাটা বলেছে মিলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য।

“তাহলে আমার কথাটাও শুনে রাখেন। পলির পেছনে টিকটিকি লাগাবেন না। আমার আবার টিকটিকি পিষে ফেলতে দারুণ মজা লাগে।”

এ কথা বলার পরই লাইনটা কেটে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে পলিকে ছেড়ে দেবার অর্ডার দিয়ে রুম থেকে চলে যায় জেফরি বেগ। ইন্টেরোগেশন রুমে তখন জামান আর রমিজ ছিলো। তারা পলিকে তার ভ্যানিটি ব্যাগটা বুঝিয়ে দেয়। ভেতরের সব কিছু ঠিকঠাকমতো আছে কিনা চেক করে দেখতে বলে। পলি অবশ্য চেক করার প্রয়োজন বোধ করে নি।

জামান পলিকে বলে দেয়, এখান থেকে যেখানে খুশি সেখানে চলে যেতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। সে এখন মুক্ত।

এ কথা শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে পলি। মেয়েটার চোখেমুখে সন্দেহের ছ’টা দেখতে পায় জামান। তবে সে জানতো পলির সন্দেহটা খুব জলদিই দূর হয়ে যাবে, মেয়েটা বুঝতে পারবে তার পেছনে কোনো লোক লাগে নি। কিন্তু যেটা বুঝতে পারবে না সেটা হলো : মিলনের সময় ফুরিয়ে এসেছে। এবার তার খেল খতম!

অধ্যায় ৪৬

মিলনের মোটরসাইকেলটা বেইলি রোড থেকে ইস্কাটনের দিকে চলে যাচ্ছে। যাবার জন্য তার কাছে তিনটি পথ ছিলো।

ডান দিকে মগবাজার ক্রসিং। বাম দিকে ক্রিসেন্ট রোড, যেখান থেকে দু তিনটা রাস্তা চলে গেছে বিভিন্ন দিকে। আর সোজা গেলে ইস্কাটন। সে বেছে নিয়েছে ইস্কাটন। জায়গাটা নিরিবিলি। কেউ ফলো করলে খুব সহজেই বুঝতে পারবে।

পলি তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

"ভয় পেয়েছিলে?" হেলমেটের ভেতর থেকে চিৎকার করে বললো মিলন।

"না।" মিথ্যে বললো পলি।

কথাটা শুনে হেসে ফেললো, তবে হেলমেটের কারণে তার হাসি দেখা গেলো না, আর প্রবল বাতাসের ঝাঁপটা, মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের আওয়াজের কারণে শোনাও গেলো না কিছু।

"ওরা কি আমাদের ফলো করছে?" পলি পেছন থেকে মিলনের কানের কাছে মুখ এনে বললো।

লুকিংগ্লাসের দিকে তাকালো সে। "এখন পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। মনে হয় না ফলো করছে।"

"ঐ লোকটা কে ছিলো?"

মিলন হেসে ফেললো। "আনু।"

"নতুন ছেলে?"

"হুম।"

"আমি ভেবেছিলাম..."

"জানি।"

"ওকে যদি ওরা ধরে ফেলে তাহলে?"

"ও ধরা পড়ে নি..." পলি অবাক হলো।

"তুমি জানলে কিভাবে?"

"একটু আগে কল করেছিলো। আমার এক কানে ইয়ারফোন আছে। ও জানিয়েছে কেউ আমাদের ফলো করছে না। তাকে আশ্বস্ত করে বললো মিলন।

পলি কিছু বুঝতে পারলো না। এসব কী বলছে? কখন ফোন করলো?

মিলনের কানে একটা ব্লুটুথ ইয়ারফোন আছে। পাঁচ মিনিট পর সব কিছু ঠিকঠাক দেখলে আনু নামের ছেলেটার ফোন করার কথা ছিলো। একটু আগেই সে ফোন করে জানিয়েছে, তাদের পেছনে কাউকে ফলো করতে দেখে নি।

তাদের মোটরসাইকেলটা কখন যে কাওরান বাজার পেরিয়ে পান্থপথে চলে এসেছে টেরই পায় নি।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?" জানতে চাইলো পলি।

"নিরাপদ একটি জায়গায়।"

কমিউনিকেশন্স রুমে বসে আছে জামান। তার সামনে যে মনিটর তাতে দেখা যাচ্ছে পান্থপথের দিকে ছুটে যাচ্ছে লাল রঙের বিন্দুটি। চকোলেট সাইজের একটি জিপিএস ডিভাইস এই তথ্য জানাচ্ছে।

এই লোকটা শুধু হাসানকে খুন করে নি, ঠাণ্ডা মাথায় তার পায়ে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করেছে, তার বস জেফরি বেগকে আরেকটুর জন্যে মেরেই ফেলেছিলো। ভাগ্য ভালো, জেফরির জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে ছিলো নিহত হাসানের ডায়রিটা।

জামানের কানে ইয়ারফোন। "স্যার," মনিটরের দিকে তাকিয়ে বললো সে। "পান্থপথে আছে..."

লাল বিন্দুটি যে ভার্চুয়াল মানচিত্রের উপর টুকটুক করে এগিয়ে যাচ্ছে সেটার অবস্থান এখনও পান্থপথেই। তবে আরেকটু পরই চার রাস্তার মোড়ে চলে আসবে। জামান অপেক্ষা করলো তার জন্য। কোথায় যায় সেটা দেখতে হবে।

লাল বিন্দুটি সোজা চলে গেলো ধানমন্ডির দিকে।

"স্যার...ধানমন্ডির দিকে..."

জামান চুইংগাম মুখে দিয়ে চিবোতে শুরু করলো। লাল বিন্দুটির গতি কমে থেমে গেলো হঠাৎ করে। "স্যার...থেমেছে...ট্রাফিক সিগনাল হবে হয়তো..."

চুইংগাম চিবানো বন্ধ করে দেখলো লাল বিন্দুটি আনুমাণিক দশ সেকেন্ড পর আবার চলতে শুরু করেছে। গন্তব্য আগের মতোই ধানমন্ডির দিকে।

লাল বিন্দুটা এখন বায়ে মোড় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে কলাবাগানের দিকে।

"স্যার,..কলাবাগানের দিকে..." এবার ডান দিকে মোড়। "ধানমন্ডি আট নাম্বারে...

পাঁচ মিনিট পর বিন্দুটা থেমে গেলো। তারপর বেশ ধীরে ধীরে এগোলো কিছুটা। অবশেষে স্থির হলো একটা জায়গায় এসে।

নড়েচড়ে বসলো জামান। ভার্চুয়াল মানচিত্রে যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে সেটা অর্কিড ভ্যালি নামের একটি অ্যাপার্টমেন্ট।

""স্যার...অর্কিড ভ্যালি...ধানমন্ডি আট...হাউজ নাম্বার ২৩...একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং!" উত্তেজনায় বলে উঠলো সে।

জামান ভাবতে লাগলো জেফরি আর বাকি দুজন এখন কোথায়। দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারলে মিলন আর পার পেতে পারবে না।

অধ্যায় ৪৭

জেফরি বেগ কান থেকে ইয়ারফোনটা খুলে ফেললো। "ডানে মোড় নাও...আট নাম্বারে।"

আমান নামে নতুন রিক্রুট হওয়া এক ছেলে গাড়িটা চালাচ্ছে। ড্রাইভিংয়ে বেশ দক্ষতা আছে তার। রমিজ বসে আছে পেছনের সিটে। ফোনে কথা বলছে সে। ড্রাইভারের পাশে জেফরি বেগ। তাদের সবার কাছেই অস্ত্র রয়েছে। মিলনের মতো ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীকে মোকাবেলা করতে যাচ্ছে। এর আগে লোকটা জেফরি আর জামানের সাথে যা করেছে তার পুণরাবৃত্তি যেনো না হয় সে ব্যাপারে বেশ সতর্ক তারা।

"স্যার, ধানমন্ডি থানাকে বলে দিয়েছি ব্যাকআপ টিম রেডি রাখার জন্য, বললো রমিজ লস্কর।

"গুড।" জেফরির দৃষ্টি রাস্তার সামনে। ডান দিকের সবগুলো বাড়ি লক্ষ্য রাখছে। সন্ধ্যা নেমে গেছে। আলো কমে আসার কারণে চোখ কুচকে দেখতে হচ্ছে বাড়িগুলোর নাম্বার।

"রাখো," বললো জেফরি।

তাদের গাড়িটা থেমে গেলো রাস্তার বাম পাশে ফুটপাত ঘেষে। রমিজ লস্কর ডান দিকে তাকালো। "কোন্ বাড়িটা, স্যার?"

"পেছনের তিনটা বাড়ির পর, সবুজ আর সাদা রঙের বিল্ডিংটা," বললো পেছন ফিরে। ইচ্ছে করেই গাড়িটা রেখেছে অর্কিড ভ্যালি নামের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে একটু দূরে। মিলন হয়তো জানালা দিয়ে বাইরে নজর রাখতে পারে। সে চায় না মিলন ঘুণাক্ষরেও টের পাক।

বদমাশটাকে চমকে দিতে হবে, মনে মনে বললো জেফরি বেগ।

"নামবো, স্যার?" রমিজ লস্কর বললো।

হাত তুলে রমিজকে অপেক্ষা করতে বলে কানে ইয়ারফোনটা লাগিয়ে নিলো আবার। লাইনটা এখনও চালু আছে। "জামান...কোনো মুভমেন্ট?...আচ্ছা...ওকে...ফাইন।"

"অ্যাপার্টমেন্টেই আছে। কোনো মুভমেন্ট নেই," পেছন ফিরে রমিজকে বললো জেফরি।

"ব্যাকআপ টিমকে আসতে বলবো, স্যার?"

"হুম, ওদেরকে সাদা পোশাকে আসতে বলো। এই বিল্ডিং থেকে বেশ দূরে এসে যেনো রিপোর্ট করে তোমার কাছে।"

"ওকে, স্যার," কথাটা বলেই ধানমন্ডি থানায় কল করলো রমিজ লস্কর।

জেফরি মাথায় একটা সানক্যাপ পরে নিলো। "তোমরা গাড়িতেই থাকো। আমি না বলা পর্যন্ত বের হবে না।"

আস্তে করে গাড়ি থেকে নেমে গেলো সে।

অর্কিড ভ্যালির পাঁচ তলার ৫-বি ফ্ল্যাটে ঢুকলো মিলন আর পলি। এই ফ্ল্যাটটা এক মহাক্ষমতাধর লোকের। ঢাকা শহরে তার কতোগুলো ফ্ল্যাট আছে সেটা বোধহয় মালিক নিজেও জানে না। অনেকে বলে পঞ্চাশটিরও বেশি ফ্ল্যাটের মালিক সে। হতে পারে। এটা আর এমন কি। এই লোকের হয়েই সে কাজ করছে। খুবই রোমাঞ্চকর একটি কাজ। ঠিকমতো করতে পারলে তার জীবনটাই পাল্টে যাবে।

ধানমণ্ডিতে আসার পথে বত্রিশ নাম্বারের আগে একটা মোড়ে বাইকটা থামায় সে। আগে থেকেই সেখানে দু'জন লোক গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো। বাইকটা একজনের কাছে দিয়ে মিলন আর পলি উঠে বসে গাড়িতে। গাড়িটা যে চালাচ্ছিলো সে তাদেরকে সোজা এই ফ্ল্যাটে নিয়ে আসে।

অর্কিড ভ্যালিতে ঢোকার সময় দারোয়ান তাদেরকে দেখতে পায় নি কারণ গাড়ির কাঁচ কালচে, ভেতরে কে আছে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। সেই লোকটা অ্যাপার্টমেন্টের

পার্কিংলটে গাড়িটা রেখে ফ্ল্যাট আর গাড়ির চাবি মিলনকে দিয়ে চলে গেছে। গাড়িটা যে কয়দিন দরকার মিলন ব্যবহার করতে পারবে।

যার হয়ে কাজ করছে সেই লোকের ক্ষমতার আরেকটি নিদর্শন হলো এসব।

চাওয়ামাত্র গাড়ি-বাড়ি হাতের তুড়ি বাজিয়ে যোগাড় করে ফেলে সে।

পুরো ফ্ল্যাটটি খালি। মাত্র তিনঘন্টা আগে ফোন করে বলেছিলো থাকার জন্য তার একটি নিরাপদ আশ্রয় আর গাড়ির দরকার। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এ দুটো জিনিসের ব্যবস্থা করা হয়। জাদুর মতো ব্যাপার।

একেবারে রেডি ফ্ল্যাট। এমনকি আসবাবপত্র আর বিছানা পর্যন্ত আছে। মিলন অবাক হয়ে ভাবলো, এখানে কারা থাকতো? এতো দ্রুত তারা গেলোই বা কোথায়?

এসব নিয়ে অবশ্য তার ভাবনার কিছু নেই। তার নিয়োগদাতা তাকে সব ধরণের সহযোগিতা করবে, সুরক্ষা দেবে, এরকমই কথা হয়েছে তাদের মধ্যে।

"এটা কার ফ্ল্যাট?" ভেতরে ঢুকে বললো পলি। কম করে হলেও আঠারো শ' স্কয়ার ফুটের তো হবেই। সুন্দর করে সাজানো গোছানো।

"আপাতত তোমার," মেইন দরজাটা লক করে পকেটে চাবি রেখে পলির কাঁধে হাত রেখে বললো মিলন।

"আপাতত?" অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরটা ভালো করে দেখে বললো, "ইস আমাদের যদি এরকম একটা ফ্ল্যাট থাকতো!"

"এটা তোমার পছন্দ হয়েছে?" পলিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললো মিলন।

স্বামীর বাহু-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঘুরে তাকালো পলি। "আহা...এমনভাবে বলছো যেনো পছন্দ হলে আমাকে দিয়ে দেবে!"

"দিতেও তো পারি," রহস্য করে হেসে বললো সে।

"সত্যি?" পলি বিস্মিত হয়ে গেলো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "এটা তাহলে তোমার," কথাটা বলেই পকেট থেকে চাবিটা বের করে পলির হাতে তুলে দিলো। "এখন থেকে তুমিই এর মালিক।"

"কী বলছো," চাবিটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে গেলো পলি। "এটা আসলে কার ফ্ল্যাট, বলো তো?"

"সময় হলে সব বলবো, এখন কিছু জানতে চেয়ো না। মনে করো এই ফ্ল্যাটের মালকিন এখন তুমি," পলির গালে আলতো করে টোকা দিলো মিলন।

"তাহলে ওরা যা বলছে সেটাই সত্যি?"

"ওরা কি বলছে?"

"তুমি হোমমিস্টারের হয়ে কাজ করছো..."

মিলন চেয়ে রইলো পলির দিকে। কিছু বললো না।

"কিছু বলছো না কেন?" মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"কাউকে বোলো না। ঠিক আছে?"

"ওরা আরো বলেছে, তুমি নাকি পাশের ফ্ল্যাটের হাসান সাহেবকেও খুন করেছো..."

চুপ মেরে থাকলো মিলন।

"আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না...হোমমিনিস্টার তোমাকে দিয়ে..."

"এসব নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না তো," কথাটা বলে পলির হাত ধরে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলো। "অনেক দিন ধরে তোমাকে পাই না...একেবারে পাগল হয়ে আছি।"

তারা বিশাল একটি বেডরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এখন। এক কথায় চমৎকার একটি রুম।

মিলন আবারো তার বউকে জড়িয়ে ধরে গালে, ঘাড়ে, কানে চুমু খেলো।

"আমার খুব ভয় হচ্ছে..."

পলির কথা শুনে থেমে গেলো সে। "পাগল, ভয়ের কিছু নেই। আমরা আগে যে কাজ

করতাম তারচেয়ে এই কাজটা অনেক নিরাপদ। আমাদের কিচ্ছু হবে না।”

“তাহলে পুলিশ কেন-”

মিলন তার বউয়ের মুখটা চেপে ধরলো। “ওরা আর আমাদের পেছনে লাগবে না। তুমি এ নিয়ে কোনো টেনশন কোরো না...”।

এবার গাঢ় একটি চুম্বন হলো। প্রায় মিনিটখানেক দীর্ঘ। একে অন্যেকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমু খেলো তারা।

দম বন্ধ হয়ে এলো পলির। মিলনকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, “খেয়ে ফেলবে নাকি?” তারপরই হেসে বললো, “দাঁড়াও।” পায়ের জুতোটা খুলে কাঁধের ভ্যানিটি ব্যাগটা বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেললো সে।

মিলন খপ করে জড়িয়ে ধরলো পলিকে। এবার চুমু না খেয়ে কোলে তুলে নিলো। হেসে ফেললো পলি। সোজা বিছানায় নিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বউয়ের উপর। পাগলের মতো আদর করতে লাগলো তাকে। একটানে খুলে ফেললো শাড়িটা।

পলি নিজেই ব্লাউজটা খুলে ফেললো এবার। সে জানে, তা না হলে একটু পর মিলন পাগল হয়ে গেলে তার ব্লাউজটা আর আস্ত থাকবে না।

কয়েক মিনিট পরই পলি গোঙাতে লাগলো।

অধ্যায় ৪৮

অর্কিড ভ্যালির পার্কিংলটে দাঁড়িয়ে আছে জেফরি বেগ। প্রায় আট-নয়টা গাড়ি আছে এখানে। দারোয়ান বলছে গত দশ মিনিটে দুটো গাড়ি ঢুকেছে। কোনো মোটরসাইকেল ঢোকে নি।

কোনো মোটরসাইকেল ঢোকে নি! অবাক হলো জেফরি। মিলন এখানে কিভাবে ঢুকেছে সেটা বুঝতে পারলো না। তবে, এই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়েই যে মিলন আছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত। জিপিএস ডিভাইস এটা জানাচ্ছে।

গাড়িতে এক জোড়া নারী-পুরুষকে বের হতে দেখেছে-এমন প্রশ্নের জবাবে দারোয়ান নেতিবাচক জবাব দিলো। গাড়ি থেকে কারা নেমেছে সেটা সে খেয়াল করে নি।

দারোয়ান জানিয়েছে, এই অ্যাপার্টমেন্টে কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে। একটা আর্কিটেক্টচারাল হাউজ, একটা অ্যাডফার্ম আর দুটো কনসালটিং ফার্ম। প্রচুর লোকজন যাওয়া আসা করে সেসব প্রতিষ্ঠানে। অন্যসব অ্যাপার্টমেন্টের মতো এখানে রেজিস্ট্রি বইয়ে নাম স্বাক্ষর করে ঢোকার নিয়ম নেই।

পুলিশের লোক পরিচয় দেয়ার পর থেকে দারোয়ান তার দিকে চোরা চোখে বার বার তাকাচ্ছে।

জেফরি একটু ভাবলো। পলির ভ্যানিটি ব্যাগে যে জিপিএস ডিভাইসটি আছে সেটা দিয়ে বোঝা যাবে না এখন ঠিক কতো তলার ফ্ল্যাটে আছে ওরা। কমিউনিকেশন্স রুমে জামান শুধু হরাইজন্টাল লোকেশন দেখতে পাচ্ছে। ভার্টিক্যাল লোকেশন ইন্ডিকেট করতে পারে না এই ডিভাইসটি। তাদের ভার্চুয়াল ম্যাপে পথঘাট আর রেসিডেন্সিয়াল অবস্থানগুলোর বিবরণ থাকলেও নির্দিষ্ট কোনো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের ভেতরকার আউটলেট দেয়া নেই। সুতরাং এই ছয় তলার অ্যাপার্টমেন্টটির পাঁচটি ফ্লোরের দশটি ফ্ল্যাটের যেকোনো একটিতে মিলন আর পলি আছে।

"স্যার..." জেফরির ব্লুটুথ ইয়ারফোনে জামানের কণ্ঠটা বলে উঠলো। "কোনো মুভমেন্ট নেই..."

"গুড।" বললো জেফরি। লাইনটা কেটে দিয়ে রমিজকে কল করলো। "কি খবর?... ব্যাকআপ টিম এসেছে?"

রমিজ জানালো তাদের সাথে কথা হয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যে তারা এসে পড়বে। এলেই তাকে জানাবে।

পার্কিংলটের চারপাশটা ভালো করে দেখে নিলো। একটা সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে গেছে। মিলনের মতো ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীকে ধরতে গেলে গোলাগুলি হবার সম্ভাবনা একশ' ভাগ। বুঝতে পারছে না কিভাবে কাজটা করলে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না।

যদি জানতো ঠিক কোন ফ্ল্যাটে মিলন আছে, তাহলে কাজটা খুব সহজ হয়ে যেতো। দলবল নিয়ে ঝটিকা হামলা চালাতো। মিলন গোলাগুলি করলেও একা এতোগুলো মানুষের সাথে পেরে উঠতো না। কিছুক্ষনের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করতো নয়তো গুলি খেয়ে মরতো।

কিন্তু দশটা ফ্ল্যাটের মধ্যে মিলন কোনটাতে আছে?

ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বাদ দিতে পারে সে। দারোয়ান লোকটা বলেছে দুই আর তিন তলায় কোনো ফ্যামিলি থাকে না। ওখানেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর অফিস।

ঠিক আছে, বাকি থাকে চার, পাঁচ আর ছয় তলা। তিনটি ফ্লোরে মোট ছয়টি ফ্ল্যাট। এই ছয়টির মধ্যে যেকোনো একটিতে মিলন আছে।

ছয় সংখ্যাটি শুনতে অনেক কম মনে হলেও এক্ষেত্রে বিরাট একটি সংখ্যা। এটা যদি দুই বা তিন হতো জেফরি খুব সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। কিন্তু এখন কাজটা কঠিন হয়ে গেছে তার জন্য।

কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়, মনে মনে বললো জেফরি বেগ।

দারুণ একটা সঙ্গমের পর মিলন চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, তার বুকে মাথা রেখে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে পলি।

“ওরা তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে নি তো?”

“না, পলি বললো। “ওদেরকে আমার পুলিশ বলেই মনে হয় নি।”

“তাই নাকি,” মুচকি হেসে বললো মিলন। “তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে গেছিলো নাকি?”

“যা, কী যে বলো না,” কপট অভিমানের সুরে বললো পলি। হেসে ফেললো মিলন। “ওরা আসলেই খুব ভালো ব্যবহার করেছে। আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম...পরে দেখি, না...লোকগুলো বেশ ভালো।”

এক বাহুর উপর ভর দিয়ে একটু মাথা তুলে মিলনের চোখে চোখ রাখলো পলি। “জানো, আমার ভ্যানিটি ব্যাগে যা যা ছিলো সবই আছে। কোনো কিছু খোয়া যায় নি। আজব না?”

মিলন ছাদের দিকে চেয়ে ছিলো, পলির কথাটা শুনে তার দিকে তাকালো।

“এর আগেরবার পুলিশ যখন ধরেছিলো...ঐ যে, ইয়াবা নিয়ে ধরা পড়লাম যখন... তখন তো আমার ব্যাগে দশ হাজার টাকা ছিলো...একটা টাকাও ফেরত পাই নি। এইবার ওরা যখন ব্যাগটা ফেরত দিলো ভেবেছিলাম টাকা-পয়সা কিছু থাকবে না। কিন্তু একটা জিনিসও এদিকওদিক হয় নি।”

উঠে বসলো মিলন। তার চোখেমুখে অন্য রকম এক অভিব্যক্তি। “ওরা তোমার ব্যাগ নিয়েছিলো?”

পলির ভ্যানিটি ব্যাগের কথা মনেই ছিলো না তার। ব্যাগটা বেশ ছোটো, তাছাড়া পলির শাড়ির রঙের সাথে ম্যাচ করা বলে ওটা তার চোখেই পড়ে নি।

অবাক হলো পলি। সেও উঠে বসলো। “আমাকে ধরার পর ব্যাগটা ওরা চেক করেছে না?... তারপর ছেড়ে দেবার সময় ফেরত দিয়ে দিয়েছে...”

তার মানে ব্যাগটা ওদের কাছে ছিলো?” মিলনের চোখেমুখে অজ্ঞাত ভীতি।

“হ্যাঁ। ছেড়ে দেবার সময় আমার কাছে ফেরত দিয়েছে।” পলি বুঝতে পারছে না মিলন কেন এসব জানতে চাইছে।

“ব্যাগটা কোথায়?” ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাড়া দিয়ে বললো মিলন।

পলি আবারো অবাক হলো। একটু আগেই তো বিছানার উপরে রেখেছিলো কিন্তু এখন সেটা নেই! এদিক ওদিক তাকালো সে।

“ব্যাগটা কোথায়?” মিলন তাড়া দিলো।

“বিছানার উপরেই তো রেখেছিলাম!”

মিলনও তাকালো বিছানার আশেপাশে। পলির শাড়ি, ব্লাউজ আর ব্রাটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কিন্তু ব্যাগটা নেই।

আশ্চর্য! ব্যাগটা গেলো কোথায়?

অধ্যায় ৪৯

ব্যাকআপ টিম আসতে এতো দেরি করছে কেন? অস্থির হয়ে অর্কিড ভ্যালির পার্কিংলট থেকে বের হয়ে এলো জেফরি বেগ। মেইনগেটের বাইরে এসে দেখতে পেলো ডান দিকের রাস্তার ওপারে, একটু দূরে তাদের গাড়িটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। রমিজকে ফোন না করে সোজা চলে এলো সেখানে।

রমিজ এখন বসে আছে সামনের সিটে। ড্রাইভার ছেলেটা স্টিয়ারিংয়ের উপর হাত দিয়ে চাপড় মেরে তাল ঠুকছে। অল্পবয়সী ছেলে, উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে।

জেফরিকে জানালার কাছে দেখে রমিজ বললো, "স্যার?"

"ব্যাকআপ টিমের কি খবর? ওরা এতো দেরি করছে কেন?"

"জ্যামে আটকা পড়েছে...ধানমণ্ডিতে এখন বেশ জ্যাম থাকে, স্যার।"

কথাটা সত্যি। ধানমণ্ডি এখন আর আগের ধানমণ্ডি নেই। শতশত স্কুল, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভরে গেছে। সেইসাথে আছে রেস্টুরেন্ট আর ফাস্টফুডের দোকান।

"ওদের সাথে লাস্ট কন্ট্যাক্ট কখন হয়েছে?"

"এই তো দু'এক মিনিট আগে...বললো জ্যামে আটকে আছে। চিন্তা করবেন না, স্যার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে।"

কমিউনিকেশন্স রুমে বসে আছে জামান। লাল বিন্দুটা অনেকক্ষণ ধরেই স্থির হয়ে আছে। একটু আগেও তার বস জেফরি বেগকে সে জানিয়েছে কোনো মুভমেন্ট নেই।

জামান আশা করছে অ্যাকশন শুরু হবার আগে এটা আর মুভ করবে না। সে জানে তার বস স্থানীয় থানার ব্যাকআপ টিম নিয়ে মিলনকে ঘিরে ফেলবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। এবার মিলনের আর রক্ষা নেই।

চুইংগামটা মুখ থেকে ফেলে দিলো পাশের বাস্কেটে। চোয়াল ব্যথা করছে। এক কাপ চা খেতে পারলে ভালো হতো। ইন্টারকম তুলে চায়ের অর্ডার দিয়ে দিলো সে।

জামান মনে করছে, তার বস মিলনকে এবার কোনো সুযোগ দেবে না। জামানের পায়ে গুলি করেছে সে, তার বসের বুকেও গুলি চালিয়েছিলো, ভাগ্য সহায় না থাকলে ওই গুলিতেই প্রাণ হারাতো তার আইডল। সে জানে, ভেতরে ভেতরে জেফরি বেগ কতোটা ক্ষেপে আছে। এবার আর মিলন রক্ষা পাবে না।

নো চান্স, মনে মনে বললো সে।

আরদালি এসে চা দিয়ে গেলে কাপটা তুলে একটা চুমুক দিলো। বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। চা'টাও দারুণ হয়েছে। আরো কয়েকটা চুমুক দিলো দ্রুত।

ঠিক তখনই বিপ বিপ শব্দ হলে চমকে উঠলো জামান। আরেকটুর জন্যে হাত থেকে কাপটা পড়েই যেতো। মনিটরের দিকে তাকিয়ে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো। অসম্ভব!

ডেস্কের উপর কাপটা রেখে ইয়ারফোনটা লাগিয়ে নিলো কানে।

লাল বিন্দুটা এতোক্ষণ ধরে অর্কিড ভ্যালি নামক অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ছিলো, এখন সেটা পাশের একটি ভবনে!

মিলন লাফ দিয়ে পাশের ভবনে চলে গেছে?

দ্রুত কল করলো সে।

অধ্যায় ৫০

অর্কিড ভ্যালির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে জেফরি বেগ। অস্থির হয়ে পায়চারি করছে সে। ব্যাকআপ টিম এখনও এসে পৌঁছায় নি। বার বার হাতঘড়ি দেখছে। কাছেই রমিজ লস্কর গাড়িতে বসে আছে। খুব বেশি হলে চার-পাঁচ মিনিট আগেই তার সাথে কথা হয়েছে, সে জানিয়েছে ট্রাফিক জ্যামের কারণে ফোর্স আসতে দেরি করছে, কিন্তু জেফরির কাছে মনে হচ্ছে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এরপর।

পায়চারি করতে করতে রমিজের গাড়ির সামনে চলে এলো আবার। গাড়ির ভেতর থেকে জানালা দিয়ে রমিজ তাকে দেখলো। হাত তুলে জেফরিকে বোঝানোর চেষ্টা করলো ব্যাকআপ টিম কাছেই এসে গেছে।

ঠিক তখনই জেফরির কানে ব্লুটুথ ইয়ারফোনটায় কল এলো। জামান করেছে। দ্রুত রিসিভ করলো কলটা।

"স্যার...পাশের বিল্ডিংয়ে লাফ দিয়েছে! মিলন পাশের বিল্ডিংয়ে লাফ দিয়েছে!" চিৎকার করে বললো জামান।

"কি?!" জেফরি যারপরনাই অবাক হলো। "লাফ দিয়েছে মানে?"

"স্যার! মিলন এখন পাশের বিল্ডিংয়ে আছে। এই যে আমি দেখছি!" উদভ্রান্তের মতো বললো জেফরির সহকারী।

"জামান!" ধমকের সুরে বললো সে। "তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

"স্যার, কী বলছেন? এই যে আমি দেখছি...লাল বিন্দুটা এখন পাশের বিল্ডিংয়ে!"

"জামান, ডিভাইসটা মিলনের স্ত্রী পলির ভ্যানিটি ব্যাগে ইম্প্যান্ট করা আছে...মিলনের শরীরে না!"

কথাটা শুনে চুপ মেরে গেলো জামান। নিজেকে এতোটা বোকা তার কখনও মনে হয় নি। তাই তো, ডিভাইসটা সুকৌশলে মিলনের স্ত্রী পলির ভ্যানিটি ব্যাগে লুকিয়ে রাখা আছে। কাজটা তো সে নিজেই করেছে রমিজ লস্করকে নিয়ে।

"স্যার...এখানে তো দেখাচ্ছে, মানে পাশের বিল্ডিংটায় চলে গেছে," আমতা আমতা করে বললো সে।

ব্যাকআপ টিমের দেরিতে মেজাজটা বিগড়ে ছিলো তার, জামানের এমন বোকামিতে সেটা আরো বেড়ে গেলো। ছেলেটাকে ধমক দিতে যাবে এমন সময় চিন্তাটা তার মাথায় আসতেই থমকে দাঁড়ালো সে। অর্কিড ভ্যালির দিকে তাকালো।

জিপিএস ট্রান্সমিটারটি পলির ভ্যানিটি ব্যাগে ছিলো...জামান বলছে লাল বিপটা, মানে ব্যাগটা এখন পাশের বিল্ডিংয়ে!

ওহ্!

"রমিজ! আমান! জলদি আসো!" কথাটা বলেই সে ছুটে গেলো অর্কিড ভ্যালির দিকে।

রমিজ কিছু বুঝে উঠতে না পারলেও গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে পড়লো আমানকে নিয়ে। সে দেখতে পেলো জেফরি পিস্তল হাতে তুলে নিয়েছে। দৌড়ে ছুটে যাচ্ছে অর্কিড ভ্যালির দিকে। রমিজও দৌড়াতে দৌড়াতে পিস্তল হাতে তুলে নিলো শোল্ডারহোলস্টার থেকে।

অর্কিড ভ্যালির মেইনগেটে আসতেই জেফরি বুঝতে পারলো তার সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল হতে চলেছে।

ভেতর থেকে মেইন গেটটা একপাশে টেনে খুলে ফেলছে দারোয়ান । পার্কিংলটে যে দুটো গাড়ি দেখেছিলো তার মধ্য থেকে একটা গাড়ি এরইমধ্যে এগিয়ে আসছে বের হবার জন্য।

"গেট বন্ধ করো! বন্ধ করো!" চিৎকার দিলো জেফরি বেগ।

দারোয়ান বুঝতে পারলো না, বুঝলেও কোনো কাজ হতো না। গেটটা এরইমধ্যে যথেষ্ট ভোলা হয়ে গেছে। একটা প্রাইভেট কার বের হবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট।

কয়েক মুহূর্তের জন্য জেফরির সাথে গাড়ির চালকের চোখাচোখি হয়ে গেলো।

মিলন!

গাড়িটা আচমকা গতি বাড়িয়ে ছুটে এলো সামনের দিকে। জেফরি পিস্তলটা তা করে এক মুহূর্তও দেরি না করে গুলি চালালো।

পর পর তিনটি।

গাড়ির সামনের কাঁচে তিনটি ফুটো হয়ে গেলেও গতি একটুও কমলো না। জেফরি বেগ আর গুলি করার সুযোগ পেলো না। বিস্ফারিত চোখে দেখলো গাড়িটা ছুটে আসছে। বাম দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে।

অল্পের জন্য গাড়িটা তাকে আঘাত করতে পারলো না। কিন্তু জেফরির পেছন পেছন ছুটে আসছিলো রমিজ লস্কর আর আমান। তারা পড়ে গেলো ছুটন্ত গাড়িটার সামনে।

রমিজ সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেও রক্ষা পেলো না। গাড়িটার সাইডবডির সাথে তার ডান পাটা ধাক্কা লাগলে ছিটকে পড়ে গেলো রাস্তার উপর।

তবে আমান ছেলেটা প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাম দিকে। গড়িয়ে চলে গেলো এক পাশে।

জেফরি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেও গাড়িটা চলে গেলো বিশ-ত্রিশ গজ দূরে। সেদিকে তাক করে আরো দুটো গুলি করলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলো কোনো লাভ হবে না।

মিলন দ্বিতীয়বারের মতো তার হাতের ফাঁক গলে পালিয়ে গেলো।

রমিজ লস্করের দিকে ছুটে গেলো এবার। রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে সে। তার পায়ে আর মাথায় বেশ চোট লেগেছে বলে মনে হলো। নতুন ছেলেটার হাত-পা ছড়ে গেলেও সে ঠিক আছে। উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

"রমিজ?" চিৎকার করে বললো জেফরি।

"স্যার!" আর্তনাদ করে উঠলো সে। "আমার পা!"

আমান নামের ছেলেটাকে ডাকলো জেফরি বেগ। "আমাদের গাড়িটা নিয়ে আসো। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। জলদি।"

অধ্যায় ৫১

বিছানায় ভ্যানিটি ব্যাগটা না পেয়ে মিলন আর পলি যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য পলির কাছে মনে হয়েছিলো এটা ভুতুড়ে ব্যাপার। কিন্তু পরক্ষনেই বিছানার নীচে মেঝেতে ব্যাগটা পড়ে থাকতে দেখে তারা। বুঝতে পারে তাদের দুজনের প্রেমলীলার সময় বিছানা থেকে ওটা পড়ে গেছিলো।

মিলন দ্রুত ব্যাগটা হাতে নিয়ে খুলে দেখে। ভেতরের সব কিছু বিছানার উপর ফেলে খালি ব্যাগটা চেক করে দেখতেই চকোলেট সাইজের একটি ডিভাইস পেয়ে যায় ভেতরে। মিলনের গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে পলিকে তাড়া দেয় কাপড় পরে নেবার জন্য। দ্রুত ভাবতে থাকে মিলন। তাদের ফ্ল্যাটটা দক্ষিণ দিকে। বাইরের রাস্তা দেখা যায় জানালা দিয়ে। মিলন একটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে সানক্যাপ পরা এক লোক রাস্তাটা পার হয়ে হেঁটে যাচ্ছে কিছুটা দূরে পার্ক করা একটি গাড়ির দিকে। লোকটা গাড়ির সামনে এসে ঝুঁকে কথা বলতে থাকে।

লোকটার মুখ দেখতে না পেলেও হাটার ভঙ্গি আর শারিরীক গড়ন দেখে মিলন নিশ্চিত, এটা হোমিসাইডের ঐ ইনভেস্টিগেটর। গাড়িতে আরো কয়েকজন আছে। তারা তাকে ঘিরে ফেলেছে হয়তো।

হতভম্ব পলি কোনো রকম শাড়ি পরে ফেলার পর মিলন ছুটে যায় পশ্চিম দিকের বেলকনির দিকে। সেখান থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে আরেকটা ভবনের বেলকনি লক্ষ্য করে ডিভাইসটা ছুঁড়ে মারে। তারপরই দ্রুত ঘর থেকে পলিকে নিয়ে বের হয়ে যায়।

তার ভাগ্য ভালো, পার্কিংলটে কোনো পুলিশ কিংবা হোমিসাইডের কেউ ছিলো না। গাড়িতে উঠে দারোয়ান কে গেট খুলে দিতে বলে। দারোয়ান গেট খুলতে না খুলতেই ছুটে আসে জেফরি বেগ। তার হাতে পিস্তল।

মিলন আর সময় নষ্ট করে নি। জেফরি বেগ গুলি চালালেও সে মাথা নীচু করে ফুলস্পিডে গাড়ি চালিয়ে বের হয়ে যায়। তার সামনে কে পড়লো, কে মরলো কিছুই পরোয়া করে নি। রাস্তায় নামতেই আরো দু'জন তার সামনে পড়ে যায়। তার ভাগ্য ভালো মাত্র তিনজন ছিলো। একগাদা পুলিশ থাকলে কী হতো কে জানে।

মনে মনে ইনভেস্টিগেটরের বোকামির জন্য হেসেছিলো সে। তার হাত থেকে একবার ভাগ্যের জোরে বেঁচে যাবার পরও লোকটা মাত্র দু'জন লোক নিয়ে চলে এসেছে তাকে ধরার জন্য! এখনও লোকটার শিক্ষা হয় নি।

কোনো রকম বাধাবিপত্তি ছাড়াই ধানমন্ডি থেকে বের হয়ে যেতে পেরেছে মিলন। কমপক্ষে তিনটি গুলি তার গাড়ির সামনের কাঁচ ভেদ করে চলে গেছে। সময়মতো মাথা নীচু না করলে এতোক্ষণে ভবের লীলা সাঙ্গ হয়ে যেতো।

হাফ ছেড়ে বাঁচলো সে। তবে ভালো করেই জানে এই গাড়িটা আর নিরাপদ নয়। এটা পরিত্যাগ করার সময় এসে গেছে।

এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে চালু করলো। সাহায্য-সহযোগীতা পাবার মতো লোকজনের অভাব নেই তার। একটা নাম্বারে কল করতে যাবে ঠিক তখনই মনে পড়লো পলির কথা। তার সাথে শেষ কথা হয়েছিলো জেফরি বেগ গুলি করার আগে। তাকে বলেছিলো মাথা নীচু করে সিটের উপর শুইয়ে পড়তে।

রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকালো সে। সঙ্গে সঙ্গে তার রক্ত হিম হয়ে গেলো। পলি এখনও শুয়ে আছে!

গাড়িটা রাস্তার একপাশে থামিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলো সিটের উপর ঘুমিয়ে আছে তার পলি। মাথার চুল এলোমেলো হয়ে মুখের উপর পড়ে আছে। পুরো সিটটা রক্তে ভিজে একাকার।

"পলি!" একটা আর্তনাদ বেরিয়ে গেলো তার মুখ দিয়ে। হামাগুড়ি দিয়ে চলে এলো

পেছনের সিটে। চুলগুলো সরাতেই দেখতে পেলো পলির কপালে, ঠিক বাম চোখের উপরে একটা গুলির ফুটো। রক্তে সারা মুখ লাল হয়ে আছে।

পলির নিথর দেহটা দুহাতে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলো মিলন। শক্ত করে ধরে রাখলো তাকে। চেষ্টা করলো শব্দ করে না কাঁদার জন্য। জোর করে মুখটা বন্ধ রাখলো কোনোমতে। আরো বেশি শক্ত করে পলির নিথর দেহটা জড়িয়ে রাখলো বুকে। জনমদুঃখি এক মেয়ে।

এই জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো হাউমাউ করে কাঁদলো মিলন। সেই ছেলেবেলায় তার মা যখন মারা যায় তখন এভাবে কেঁদেছিলো।

'না!" আর্তনাদরত পশুর মতো গুঙিয়ে উঠলো সে।

রমিজ লস্করের ডান পাটা ভালোমতোই ভেঙে গেছে। মাথার পেছন দিকটা পিচঢালা পথের উপর আছাড় খেয়ে পড়ার কারণে বেশ থেতলে গেছে। বাম আর ডান হাতটাও আহত হয়েছে তবে সেটা তেমন গুরুতর নয়।

আমান নামের ছেলেটা পুরোপুরি সুস্থ আছে। হাত-পায়ে ছড়ে যাওয়া ছাড়া তেমন কিছু হয় নি।

হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমের বাইরে বসে আছে জেফরি বেগ। একটু আগে জামানও চলে এসেছে খবরটা শুনে।

হোমিসাইডে যোগ দেবার পর থেকে অনেকগুলো হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করেছে জেফরি বেগ, কিন্তু সেন্ট অগাস্টিনের জুনিয়র ক্লার্ক হাসানের খুনটার কূলকিনারা করতে গিয়ে যে পরিমাণ জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছে সেটা একেবারেই অকল্পনীয়।

অল্পের জন্য বেঁচে গেছে জামান। মিলন তাকে খুন করার আগেই জেফরি চলে আসে। তারপর সেও ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় হাসানের ডায়রিটা বুক পকেটে থাকার কারণে। এখন, রমিজ লস্কর গুরুতর আহত। সে নিজেও দ্বিতীয়বারের মতো বেঁচে গেছে। আরেকটুর জন্যে মিলনের গাড়ির নীচে চাপা পড়তো।

মিলনের মতো একজন সন্ত্রাসী শুধুমাত্র হোমমিনিস্টারের আর্শিবাদপুষ্ট হয়ে কতোটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ভাবাই যায় না।

মনে মনে একটা প্রতীজ্ঞা করলো জেফরি বেগ, হয় ইনভেস্টিগেটর হিসেবে এটাই হবে তার শেষ কাজ নয়তো মহাক্ষমতাশালী হোমমিনিস্টারকে সে দেখে নেবে।

"স্যার?" পাশে বসে থাকা জামান বললো। তারা এখন বসে আছে ইমার্জেন্সি রুমের বাইরে একটি বেঞ্চে।

"কি?" জামানের দিকে ফিরে বললো সে।

"আমার মনে হয় হোমমিনিস্টার আর তার ছেলে তুর্যের জড়িত থাকার কথাটা ফারুক স্যারকে বলে দেয়ার সময় এসে গেছে।"

চুপ করে থাকলো সে।

"পরিস্থিতি খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে...মিলনের খুঁটির জোর কোথায় আমরা সেটা জানি। এখন পুরো ডিপার্টমেন্টকে সঙ্গে নিয়ে মুভ করতে হবে। শুধুমাত্র আমাদের তিনজনের মধ্যে এই ঘটনাটা সীমাবদ্ধ রাখা কি ঠিক হবে এখন?"

"ফারুক স্যারকে বললে কী হবে তুমি জানো না?" আস্তে করে বললো জেফরি বেগ। "হোমমিনিস্টারের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা উনার নেই..."।

"কিন্তু আমরা বলে দেখতে পারি...আজ হোক কাল হোক উনাকে তো এ কথাটা বলতে হবে।"

"অবশ্যই বলতে হবে। আফটার অল উনি হোমিসাইডের ডিজি।"

"তাহলে এখন বললে সমস্যা কি?"

"সমস্যা আছে," উদাস হয়ে বললো জেফরি বেগ। "আমাদের কাছে যেসব প্রমাণ

রয়েছে তা যথেষ্ট নয়।”

“যথেষ্ট নয়?” একটু অবাক হয়ে আবার বললো জামান, “হাসানের ডায়রি... অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যালের সাথে হোমমিনিস্টারের ফোনালাপ?...”

“ডায়রিতে তুর্যের কথা বলা আছে, সেখানে মিনিস্টারের জড়িত থাকার কংক্রিট কিছু নেই। আর ফোনালাপ?” মাথা দোলালো জেফরি। “ঐ ল্যান্ডফোনটা হোমমিনিস্টারের বাড়ির, ঠিক আছে। ফোনালাপটিও প্রমাণ করে তুর্য হাসানের খুনের সাথে জড়িত কিন্তু কণ্ঠটা মিনিস্টারের কিনা সেটা আমরা নিশ্চিত করে জানি না। এরকম অবস্থায় হোমমিনিস্টারের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। তাছাড়া...”

“কি, স্যার?”

“ফোন ট্যাপিং করার কথাটা স্যারকে বলা যাবে না।”

“কেন বলা যাবে না? আমরা তো আর মিনিস্টারের ফোন ট্যাপ করি নি? অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যালের ফোন ট্যাপ করতে গিয়ে...”

মাথা দোলালো জেফরি। “এটা আমরা নিজেদের তদন্তের সুবিধার্থে করেছি, হোমমিনিস্টারের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য নয়।”

“ঠিক আছে, আমরা তো আর এটা আদালতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করার কথা বলছি না, আমরা আমাদের স্যারকে বলতে পারি? উনার কাছে প্রমাণ হিসেবে দেখাতে পারি?”

জামানের দিকে চেয়ে রইলো জেফরি।

“তা পারি। কিন্তু মিনিস্টারের ফোনালাপ শুনে ফারুক স্যার কী করবেন, জানো?”

জামান ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

“এই কেসটার তদন্ত অন্য ডিপার্টমেন্টের কাছে ট্রান্সফার করে দেবেন।”

“এটা উনি করতে পারেন না,” জামান প্রতিবাদের সুরে বললো। “অগাস্টিনের হাসানকে যে খুন করেছে সে কিন্তু আমাকেও গুলি করেছে, স্যার। আরেকটুর জন্যে আপনাকেও...” কথাটা শেষ করলো না জামান।

“ফারুক স্যার কেন এটা করবেন জানো?”

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো জামান।

“আমাদের সবার ভালোর জন্য...তোমার আমার, আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবার মঙ্গলের কথা ভেবে এটা উনি ট্রান্সফার করে দেবেন। উনি ভালো করেই জানেন, হোমমিনিস্টার কি করতে পারেন।”

“তাহলে আমরা এখন কি করবো? ঐ হোমমিনিস্টার আর তার ভাড়াটে খুনির হাতে বার বার নাস্তানাবুদ হবো?”

কথাটা জেফরির কানে নয়, একেবারে বুকে এসে বিঁধলো। মিলন তার অহংবোধে আঘাত করেছে। যেভাবেই হোক ঐ মিলনকে তার চাই-ই চাই। হোমমিনিস্টার আর তার ছেলেকে সে কী করতে পারবে না পারবে সেটা হয়তো অনিশ্চিত কিন্তু এই মিলনকে তার হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

জেফরিকে চুপ থাকতে দেখে জামান বললো, “স্যার, আমরা এখন কী করবো?”

“আমান ছেলেটা মনে হয় ফিল্ডে বেশ ভালো কাজ করতে পারবে, তোমার কি মনে হয়?”

“পারবে। বেশ এনার্জিটিক। আগ্রহও আছে। ও কিন্তু সিলেকশন পরীক্ষায় হাইয়েস্ট নাম্বার পেয়েছিলো, স্যার।”

“তাই নাকি?”

“ওকে দিয়ে কি করাতে চাচ্ছেন, স্যার?”

“মিলন এখন সতর্ক হয়ে গেছে, তাকে ধরাটা সহজ হবে না। আমি মিলনের সম্পর্কে প্রচুর তথ্য চাই। তার অতীত, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, কলিগ, পুলিশের খাতায় তার ক্রাইমের রেকর্ড, মামলাগুলোর রিপোর্ট এইসব।”

“আমার মনে হয় এরকম কাজ ও ভালোই পারবে। তাছাড়া কাজটায় ঝুঁকিও কম। নতুনদের জন্য এমন কাজই ভালো হবে, স্যার।”

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি বেগ। “তুমি আরেকটা কাজ করবে।”

“কি কাজ?”

“অর্কিড ভ্যালির কোন ফ্ল্যাটে মিলন উঠেছিলো সেটা আমরা জানি না। এটা তুমি জেনে নেবে। ফ্ল্যাটটার আসল মালিক কে তাও জেনে নিতে হবে। আমার ধারণা ওটা হোমমিনিস্টারেরই হবে...কিংবা তার কোনো ঘনিষ্ঠ লোকের।”

“ওকে, স্যার। আমি আজ থেকেই কাজে নেমে পড়বো।” একটু চুপ থেকে জামান আরো বললো, “একটা কথা বলি, স্যার?”

“বলো।”

“আপনি বাসায় চলে যান। একটু রেস্ট নেন। আমি আছি এখানে। রমিজ ভাইকে দেখে অফিসে চলে যাবো।”

জামানের মুখের দিকে চেয়ে রইলো জেফরি। তার এখন বাসায় যেতে ইচ্ছে করছে না। রেবার সাথে দেখা করতে ইচ্ছে করছে। প্রতিবার যখন সে ব্যর্থ হয় রেবার সাথে সময় কাটাতে চায়।

আপন মনে মুচকি হেসে ফেললো সে। এর উল্টোটাও তো হয়!

সফল হোক আর ব্যর্থ হোক, সব সময়ই সে রেবার সঙ্গ কামনা করে।

পরদিন সকাল থেকে আবারো টেলিফোনে আড়িপাতার কাজ করতে শুরু করলো জামান। এবার শুধু অরুণ রোজারিওর ফোনটাই তার টার্গেট নয়, জেফরির নির্দেশে হোমমিনিস্টারের স্ত্রীর ব্যক্তিগত ফোনটিও ট্যাপিং করছে তারা। তবে এবার সে একা। রমিজ লস্কর এখনও হাসপাতালে। ভাগ্য সহায় থাকলে, সবকিছু ঠিকঠাকমতো চললেও দু'মাসের আগে সে সুস্থ হতে পারবে না।

পর পর দু'দিন জামান শুধু এ কাজ করে যাবে। রাত আটটার পর তার অনুপস্থিতিতে কাজটা করবে কম্পিউটার। এক্ষেত্রে সমস্যা হলো কম্পিউটার সব ধরণের কল রেকর্ড করে রাখবে। সকালে এসে রেকর্ড করা কলগুলো চেক করে দেখতে হবে তখন।

জেফরি বেগের ধারণা মিনিস্টারের স্ত্রীর ফোন ট্যাপিং করলে তুর্যের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যাবে। তুর্যকে এখন ভীষণ দরকার। তার ক্ষমতাশালী বাপের সুরক্ষায় একেবারে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেছে ছেলেটা।

জামান অবশ্য ভেবে পাচ্ছে না, তুর্যের অবস্থান জানার পর জেফরি কী করবে। প্রশ্নটা জেফরিকে করেছিলো, তার বস্ কোনো জবাব দেয় নি। শুধু বলেছে, এটা নিয়ে পরে ভাববে। সবার আগে জানতে হবে ছেলেটা কোথায় আছে।

জামানের ধারণা, তুর্যের অবস্থান জানার পর তার বস হয়তো নতুন কোনো কৌশল খাঁটিয়ে ছেলেটার গতিবিধির উপর নজরদারি করবে। কিংবা তুর্য যাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের খুঁজে বের করবে। এরপরই হয়তো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে হোমমিনিস্টারের ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি আদায় করবে। তখন মিনিস্টারের আর কিছুই করার থাকবে না।

পুলিশ রেগুলেন্স-এ এরকম নিয়ম আছে। একজন তদন্তকারী যে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। এ কাজে কেউই বাধা দিতে পারবে না। বাংলাদেশে শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতিকে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। তারপরও ক্ষমতাশালী লোকজন, রাজনীতিকেরা বাধা হয়ে দাঁড়ায় সব সময়। সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি নিতে পারলে কারোর আর কিছু করার থাকে না। সেটা করতে হলে দরকার হবে জোরালো কিছু প্রমাণের।

চাতক পাখির মতো বসে আছে সে। এ কাজের জন্য বেশি লাগে ধৈর্য। জামানের সেই ধৈর্য আছে।

তার এই ডিউটি অবশ্য রাতের বেলায় দিতে হবে না। এটাই হলো আনন্দের কথা। রাত আটটার পর ডিউটি শেষ। পরদিন সকাল নয়টা থেকে আবার শুরু করতে হবে ঠিক যেমন আজকে করেছে।

কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে এফএম রেডিও শুনে শুনে বিরক্তিকর সময়গুলো পার করলো। ভাগ্যিস এইসব রেডিও স্টেশন ছিলো! নইলে বসে বসে ঘোড়ার ঘাস কাটতো।

গতকাল রেবার সাথে দেখা করতে পারে নি জেফরি বেগ। আজও দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। তবে ফোনে কথা হয়েছে। সপরিবারে গ্রামের বাড়িতে গেছে তারা। হুট করেই তার অসুস্থ বাবা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নিজের জন্মস্থানটা দেখে আসবে। মা-বাবার কবর জিয়ারত করবে। এ জীবনে হয়তো আর সুযোগ পাবে না।

রেবা তার বাবাকে বুঝিয়ে যাচ্ছে দেশের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করালে সেরে ওঠার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সাবেক আমলা ভদ্রলোক এখনও রাজি হয় নি। সমস্ত সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে পরিবারকে অনিশ্চত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছে না। রেবার বাবা আনজার সাহেবের বিশ্বাস, তার এই অসুখ ভালো হবার নয়। মাঝখান থেকে বিপুল পরিমাণের টাকা জলে ফেলা হবে।

যাইহোক রেবা আর তার মা এখনও হাল ছেড়ে দেয় নি। তাদের ধারণা দেশের বাড়ি

থেকে ফিরে এসে রাজি করাতে পারবে।

একটু আগে হোমিসাইড থেকে ফিরে এসে রেবার সাথে প্রায় আধঘণ্টা কথা বলেছে। দেখা হবার আক্ষেপ কিছুটা হলেও কমেছে এখন। বাথরুমে গিয়ে ঝটপট গোসল করে ট্রাউজার আর ফুল স্লিভের টি-শার্ট পরে রকিংচেয়ারে দোল খাচ্ছে সে। চোখ বন্ধ করে নীচু ভলিউমে গান শুনতে লাগলো।

হার্ড টাইমস হার্ড টাইমস! কাম অ্যাগেইন নো মোর...।

বব ডিলান তার অদ্ভুত, অপ্রচলিত আর ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে বলে যাচ্ছে।

রমিজ লস্করের পায়ে অপারেশন করতে হয়েছে। খুব খারাপভাবে পাটা ভেঙে গেছে তার। ডাক্তার বলেছে, সেরে উঠতে কমপক্ষে দু'মাস লাগবে। তবে মাথার চোটটা নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই।

হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ ভীষণ ক্ষিপ্ত। মিলনের মতো একটা সন্ত্রাসী কিভাবে এতো সাহস পাচ্ছে? তার খুঁটির জোর কোথায়?

তার খুব বলতে ইচ্ছে করছিলো: স্যার, আমাদের হোমমিনিস্টার। যার কাছে রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলার গুরুদায়িত্ব দেয়া হয়েছে, জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা রক্ষার ব্রত নিয়ে যে লোক মন্ত্রী হয়েছে তার বখে যাওয়া পুচকে ছেলে পেশাদার খুনি মিলনকে ভাড়া করে নিরীহ এক ক্লার্ককে খুন করেছে, এখন সেই নষ্ট ছেলের বাবা নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে ছেলেসহ ঐ খুনিকে বাঁচানোর জন্য।

কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারে নি সে। বলার সময় এখনও আসে নি।

অনেকক্ষণ পর চোখ খুলে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালো। বব ডিলান এখন করুণ সুরে ফেয়ারওয়েল জানাচ্ছে তার অ্যাঞ্জেলসলিনাকে। এই গানটার চমৎকার বাংলা অনুবাদ করেছে কবীর সুমন- বিদায় পরিচিতা।

কখনও কখনও এই গানটা শুনলে জেফরির মন খারাপ হয়ে যায়। তার মনে আশংকা জাগে, একদিন রেবাকেও এভাবে বিদায় জানাতে হবে।

গানটা বন্ধ করে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালো রাতের সৌন্দর্য দেখার জন্য। শীতের রাত। কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে এখন।

এই জানালাটা দিয়ে বাইরের রাস্তা দেখা যায়, রাস্তার পাশেই একটা পার্ক আছে। আকাশের দিকে তাকালো। অসংখ্য তারা সেখানে। জানালার সামনে এমনি এমনি দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুক্ষণ।

.

কিন্তু পার্কের ঝোঁপের আড়ালে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে সে এমনি এমনি দাঁড়িয়ে নেই।

তার গায়ের পোশাক কালো। মাথায় হুড দেয়া কালো রঙের একটি সোয়েটার। অন্ধকারের পক্ষে একেবারে মানানসই। রাগেক্ষোভে ফুঁসছে সে। গতকাল তার জীবনের একমাত্র ভালোবাসার মানুষটিকে চিরকালের জন্য কবরে শুইয়ে দিয়ে এসেছে। সেই শোক কাটিয়ে ওঠার জন্য বহুদিন পর পেথেড্রিনের আশ্রয় নিতে হয়েছে তাকে। আজ বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙলে প্রথম যে কাজটি করেছে, সেটা হলো তার সামনে যে পাঁচতলা বাড়িটা আছে সেটা খুঁজে বের করা। তার জন্যে এটা তেমন কঠিন কাজ ছিলো না।

যার জন্য এসেছে সেই জেফরি বেগ এখন নিজের ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দুজনের মধ্যে দূরত্ব বড়জোর চল্লিশ গজের মতো। এই দূরত্ব খুব জলদিই ঘুচে যাবে।

ইনভেস্টিগেটর লোকটা অবশ্য তাকে দেখতে পাচ্ছে না। উদাস হয়ে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। হয়তো তারা দেখছে।

তুই তারা গুনতে থাক! আমি আসছি।

কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলটার অস্তিত্ব অনুভব করলো হাতে। ইচ্ছে করলে এক্ষুণি

কাজটা করতে পারে, কিন্তু করতে পারছে না। তাই পরিকল্পনা একটু বদলে নিয়েছে।

জেফরি বেগের আগেই জামান চলে এলো হোমিসাইডে। শুরু করলো ট্যাপিং করার কাজ। যথারীতি কাল রাতের রেকর্ড করা কলগুলো চেক করার কাজটাই আগে করলো সে।

হোমমিনিস্টারের স্ত্রী নিজের মোবাইল ফোন থেকে মোট দশটি কল করেছে, আর তার ফোনে ইনকামিংকল এসেছে সতেরোটি। জামানের ধারনা এগুলোর বেশিরভাগই তদবির সংক্রান্ত। মিনিস্টারের স্ত্রী মানে অসম্ভব ক্ষমতাধর ব্যক্তি। তার কাছে তদবির আসবে, এটা এ দেশের রাজনীতিতে নিয়ম হয়ে গেছে।

কলগুলো চেক করে দেখতে শুরু করলো জামান। মোট সাতাশটি কলের মধ্যে প্রথম বারোটি কল চেক করার পর দেখতে পেলো সবগুলোই 'মাফ। নির্দোষ কল। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো তার। এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বাকি কলগুলো চেক করে দেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেললো সে।

আড়ি পেতে অন্য লোকের কথাবার্তা শোনার মধ্যে যে আনন্দ সেটা তো বিকৃতরুচির ব্যাপার, কিন্তু কাজের প্রয়োজনে তাদেরকে এটা করতে হয় অনেক সময়। প্রথম দিকে এভাবে ট্যাপিং করতে খুব মজা পেতো জামান। এখন আর সেই মজা পায় না। বরং বিরক্তিকর ঠেকে তার কাছে।

চা চলে এলে আয়েশ করে চুমুক দিলো। অফিসে সবার আগে এসেছে, এখনও বেশিরভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারি এসে পৌঁছায় নি। কমিউনিকেশন্স রুমে ঢোকার আগে মাত্র দুএকজনকে দেখেছে। এখন হয়তো আরো অনেকেই চলে এসেছে।

তার বস জেফরি বেগ আসে নি। এলে সবার আগে কমিউনিকেশন্স রুমে ঢু মারতো।

জেফরি বেগের কথা ভাবতেই জামান নড়েচড়ে বসলো। রেকর্ড করা বাকি কলগুলো শুনে ফেলতে হবে। তার বস চলে আসবে একটু পরই, এসে যদি কলগুলো সম্পর্কে জানতে চায়?

চায়ের কাপটা শেষ করে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে রেকর্ড করা কলগুলো শুনতে শুরু করলো সে।

পাঁচ মিনিট পর, শেষ দুটো কলের আগের কলটা শুনে ভিমরি খেলো জামান।

হোমমিনিস্টারের স্ত্রী তার এক ঘনিষ্ঠজনকে ফোন করে এসব কী বলছে! সকালে ঘুম থেকে একটু দেরি করে উঠলেও জগিং মিস করে নি জেফরি বেগ। দ্রুত কর্নফ্লেক্স আর দুধ দিয়ে হালকা নাস্তা সেরে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো। পত্রিকা পড়ার সময় পায় নি। বাসার নীচে অফিসের গাড়ি এসে হর্ন বাজাতে থাকলে পত্রিকাটা হাতে নিয়ে নেমে পড়লো সে।

গাড়ি চলতে শুরু করলে হাতের পত্রিকাটায় চোখ বোলালো। সাধারণ সাদামাটা একটা দিন।

সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু...এসিডে ঝলসে যাওয়া এক গ্রাম্য কিশোরি...শেয়ার মার্কেটের সূচকের পতন...রাজনৈতিক নেতা- পাতি নেতাদের মিথ্যের ফুলঝুরি, ইরান আক্রমণ করার আমেরিকান পায়তারা..শীতকালীন সজির চড়া দাম...

ভেতরের পাতাগুলোতে চোখ বুলালো। কোনো খবরই পুরোপুরি পড়লো না। কোনো খবরই তাকে আকর্ষণ করতে পারলো না, শুধু শিরোনামগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে গেলো।

হঠাৎ ভেতরের পাতায় বাম দিকের এক কোণায় এক কলামের একটি সংবাদ চোখে পড়লো তার। এর শিরোনামটি যদি রিভার্স না হতো তাহলে হয়তো চোখেই পড়তো না।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না জেফরি বেগ। এটা যদি আসমানজমিন পত্রিকা হতো সে বিশ্বাস করতো না। কিন্তু তার হাতের পত্রিকাটি মহাকাল। এ দেশের সর্বাধিক পাঠকপ্রিয় আর বিশ্বাসযোগ্য একটি জাতীয় দৈনিক।

রিপোর্টটি খুব ছোটো। জেফরি সেটা পড়লো :

ব্ল্যাক রঞ্জুর জামিন লাভ?

আদালত সংবাদদাতা-কুখ্যাত শীর্ষ সন্ত্রাসী, অসংখ্য খুন আর চাঁদাবাজির মামলার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্ল্যাক রঞ্জু গতকাল আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ছয় মাস আগে আহত অবস্থায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিলো ঢাকা থেকে।

আমাদের আদালত সংবাদদাতা জানিয়েছে, সত্যিকারের রঞ্জু কোলকাতায় লুকিয়ে থাকা অবস্থায় অন্তর্দলীয় কোন্দলে নিজের দলের লোকজনের হাতে নিহত হয়েছে বলে প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ। যাকে ব্ল্যাক রঞ্জু হিসেবে এতোদিন জেলে আটকে রাখা হয়েছিলো সে রঞ্জু গ্রুপেরই একজন সদস্য। এতোদিন তাকে ভুল করে জেলে আটকে রাখা হয়। গত সপ্তাহে কোলকাতা থেকে ব্ল্যাক রঞ্জুর নিহত হবার প্রমাণ আর ডেথ সার্টিফিকেট চলে এলে আদালত নিতান্তই মানবিক কারণে তার জামিন মঞ্জুর করেন।

উল্লেখ্য, আটককৃত ব্যক্তির আসল নাম মৃণাল। তার শারিরীক অবস্থা খুবই শোচনীয়। ব্ল্যাক রঞ্জুর প্রতিপক্ষ দলের আক্রমণে তার স্পাইনাল কর্ড মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে পঙ্গু হয়ে যায়। তারপক্ষের আইনজীবি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বরাত দিয়ে আদালতকে জানিয়েছে, শীঘ্রই উন্নত চিকিৎসা না পেলে আজীবনের জন্য তার মক্কেল পঙ্গু হয়ে যাবে।

পুলিশ কেন এতদিন এই ব্যক্তিকে ব্ল্যাক রঞ্জ হিসেবে আটক রেখেছিলো সে ব্যাপারে জানতে চাইলে দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা কোনো কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানায়।

.

জেফরি বেগের মনে হলো একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। টের পেলো তার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠছে।

অসম্ভব!

ওটা ব্ল্যাক রঞ্জু না? পুলিশের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

অধ্যায় ৫৪

হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ হতভম্ব হয়ে বসে আছে। অফিসে এসে নিজের রুমে ঢুকতেই ছুটে এসেছে জেফরি বেগ। রাগেক্ষোভে রীতিমতো ফুসছিলো সে। এর আগে তাকে কখনও এতোটা ক্ষুব্ধ হতে দেখে নি।

কিন্তু জেফরি যখন তার দিকে একটি পত্রিকা বাড়িয়ে জানালো ব্ল্যাক রঞ্জুর জামিনের খবরটি পড়তে, তখন সে নিজেও ভিমরি খেয়েছিলো।

ব্ল্যাক রঞ্জুর জামিন?! অসম্ভব।

ছোট্ট রিপোর্টটা পড়তে খুব বেশি সময় লাগে নি কিন্তু যা পড়েছে তা এখনও হজম করতে পারছে না।

যাকে তারা ধরেছে সে ব্ল্যাক রঞ্জু না? এরচেয়ে হাস্যকর কথা আর কি হতে পারে। এসব কী হচ্ছে?

কয়েক মাস আগে বাস্টার্ড নামের খুনিটাকে যখন বর্তমান সরকার আনুকূল্য দেখিয়ে জামিনে মুক্ত করে দিলো তখন তার এই প্রিয়পাত্রটি চাকরি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলো। রেজিগনেশন লেটার টাইপ করে তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলো সে। অনেক কষ্টে, প্রায় দু'ঘণ্টা সময় ব্যয় করে জেফরিকে সিদ্ধান্ত বদলাতে সক্ষম হয়েছিলো অবশেষে।

এখন আবার ব্ল্যাক রঞ্জুকে এভাবে জামিনে মুক্ত করে দেয়ার মানে কি? এই সন্ত্রাসী কি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার পরিকল্পনা করে নি? প্রধানমন্ত্রীর কারারুদ্ধ স্বামীর ঘনিষ্ঠ এই সন্ত্রাসী কি নির্বাচনের আগে আগে জঘন্য একটি হত্যাকাণ্ড ঘটাতে যাচ্ছিলো না?

তাহলে?

বাস্টার্ডকে না হয় জামিনে ছেড়ে দেয়ার যুক্তি থাকতে পারে-ঐ খুনি ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের লোকজনকে একের পর এক হত্যা করে পুরো ষড়যন্ত্রটি নস্যাৎ করে দিয়েছিলো কিন্তু ব্ল্যাক রঞ্জুকে ছেড়ে দেয়ার মানেটা কি?

আবারো কি একটি ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে? বর্তমান সরকারের ভেতরে আরেকটি শক্তি ভিন্ন কিছু করার চেষ্টা করছে? রাজনীতিকদের কোনো বিশ্বাস নেই। সারাক্ষণ ক্ষমতার লোভে মত্ত থাকে তারা। এজন্যে যখন যা করার তাই করে। আর এসব অন্যায়কে তারা সুন্দর একটি আপ্তবাক্য দিয়ে জায়েজ করার চেষ্টা করে সব সময় : রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। একটা দার্শনিক উপলব্ধিকে কতো বাজেভাবেই না ব্যবহার করতে জানে এরা!

হয়তো নতুন সরকারের ভেতর আরেকটি ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে। ক্ষমতার কেন্দ্রে বসে আছে যারা তাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বের ফসল এটি। কিন্তু ফারুক আহমেদের মাথায় কিছুই ঢুকছে না। তার ধারণা, সামনে বসে থাকা জেফরিরও একই অবস্থা।

কিন্তু জেফরি বেগের অবস্থা একেবারেই ভিন্ন। কারণ ফারুক আহমেদের সাথে দেখা করার আগেই সে আরেকটি সত্য জানতে পেরেছে। রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে অফিসে ঢুকতেই তার সাথে দেখা হয় সহকারী জামানের। ছেলেটা তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো।

জামান তাকে কমিউনিকেশন্স রুমে নিয়ে গিয়ে গতরাতে রেকর্ড করা হোমমিনিস্টারের স্ত্রীর একটি ফোনালাপ শুনতে দেয়।

সকালের পত্রিকার রিপোর্ট আর হোমমিনিস্টারের স্ত্রীর ফোনালাপ তার কাছে একটা বিষয় একদম স্পষ্ট করে তোলে : সেন্ট অগাস্টিনের জুনিয়র ক্লার্ক হাসানকে কে খুন করেছে-কেন খুন করা হয়েছে।

তবে জেফরি বেগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফারুক আহমেদকে এই ব্যাপারটা জানাবে না। এখনও সে সময় আসে নি।

"পত্রিকার রিপোর্টটি যে সত্যি সেটা কি খতিয়ে দেখেছো?" অনেকক্ষণ পর এমন একটি প্রশ্ন করলো ফারুক আহমেদ যার উত্তর তার ভালো করেই জানা।

"আমি এখানে আসার পথেই ডিসি প্রসিকিউশনে ফোন করেছিলাম, স্যার...খবরটা

একদম সত্যি," স্থিরচোখে চেয়ে বললো জেফরি বেগ।

বাম কপালটা হাত দিয়ে ঘষতে ঘষতে মাথা নেড়ে সায় দিলো মহাপরিচালক।

"শুধু তা-ই নয়, হোমমিনিস্টার থেকে ডিসি প্রসিকিউশনকে বলা হয়েছিলো, এ ব্যাপারে কাউকে যেনো না জানানো হয়। একটু চুপ থেকে আবার বললো সে, "বিশেষ করে আমাদেরকে।"

"মাইগড!" ফারুক আহমেদ নিজের ডেস্কের উপর একটা ঘুষি মারলো। কী বলবে বুঝতে পারছে না।

"নিয়ম অনুযায়ী আমাদেরকে জানানোর কথা ছিলো। রঞ্জুকে আমরাই ধরেছিলাম, আমাদের কনসার্ন ছাড়া তার জামিন কী করে হলো, স্যার?"

"এসব কী হচ্ছে, জেফ?" মহাপরিচালক বললো।

"স্যার...এর আগে বাস্টার্ডকে যখন জামিন দেয়া হলো তখনও একই কাজ করেছে এই হোমমিনিস্টার।" জেফরি তার বসকে মনে করিয়ে দিলো আগের একটি ঘটনা।

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো ফারুক আহমেদ। একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকা দু-দু'জন খুনিকে এভাবে ছেড়ে দেয়ার নিশ্চয় কোনো মানে আছে।

"আমি আর সহ্য করবো না," শান্তকণ্ঠে বেশ দৃঢ়তা নিয়ে বললো জেফরি বেগ।

হোমিসাইডের মহাপরিচালক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে চেয়ে রইলো তার দিকে। "প্লিজ, মাথা ঠাণ্ডা রাখো..."

"আপনাকে কিছু একটা করতেই হবে, স্যার...নয়তো..."

ফারুক আহমেদ বুঝতে পারলো জেফরি কী বলতে চাচ্ছে। এবার বুঝি তার পদত্যাগ আর আটকানো যাবে না। অবশ্যই করবো। এবার আমি চুপ করে বসে থাকবো না," জেফরিকে আশ্বস্ত করে বললো সে।

"কি করবেন, আপনি?"

ফারুক আহমেদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। "ইয়ে মানে...কী করবো?" একটু চুপ থেকে আবার বললো সে, "জানতে চাইবো কেন এরকম হলো...আই ডিমান্ড প্রোপার এক্সপ্লনেশন-"

"কার কাছ থেকে?" কথার মাঝখানে বলে উঠলো জেফরি বেগ।

ফারুক আহমেদ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। "অথথারিটির কাছে..."

মাথা দোলালো জেফরি। "স্যার, আপনি কি এখনও বুঝতে পারছেন না? হোমমিনিস্টার নিজে এ কাজে জড়িত, তিনি সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছেন?"

আস্তে করে মাথা নেড়ে সায় দিলো তবে মুখে কিছু বললো না।

"আপনি সরাসরি হোমমিনিস্টারের কাছে এটা জানতে চাইবেন!" উত্তেজিত হয়ে বললো সে। "আর কারো কাছে না। সব কিছু উনার নির্দেশেই হয়েছে। সুতরাং জিজ্ঞেস যদি করতেই হয় উনাকেই করবেন।" একটু চুপ থেকে জেফরি আবার বললো, "আপনি কি করবেন আমি জানি না, স্যার। কিন্তু আমি রুটিরুজির ধান্দায় নিজের ডিগনিটি বিসর্জন দিয়ে এভাবে চাকরি করতে পারবো না।"

জেফরির মনে হলো ফারুক আহমেদ সমস্ত ভয় আর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে বসলো চেয়ারে। গভীর করে দম নিয়ে বলতে শুরু করলো সে, "আমিও এই চাকরির পরোয়া করি না, জেফ। মোটেই না। হয়তো মানুষ হিসেবে আমি তেমন শক্ত নই, হতে পারে আমি সব সময় ম্যানেজ করার পক্ষপাতি কিন্তু আমিও তোমার মতো ডিগনিটি বিসর্জন দেবার লোক নই।"

"আমি জানি, স্যার," বললো জেফরি। কিন্তু আপনি যেভাবে যে পদ্ধতিতে লড়াই করতে চান সেটা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। কখনও কখনও আমাদেরকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, সাহসের সাথে মোকাবেলা করতে হয়।"

"রাইট, মাইবয়, দৃঢ়ভাবে বললে মহাপরিচালক। "আমি হোমমিনিস্টারের কাছেই এই

ঘটনার প্রোপার এক্সপ্লানেশন চাইবো।”

“কবে, স্যার?” ছোট্ট করে বললো জেফরি বেগ।

“দরকার হলে আজই!” জোর দিয়ে বললো মহাপরিচালক।

“অবশ্য আজকে। আপনার উচিত ইমার্জেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়া। এখনও ঐ বদমাশটাকে গ্রেফতার করে জেলে ঢোকানোর সময় আছে। এক মুহূর্তও দেরি করা ঠিক হবে না।”

“আমি তাই করবো। আজকেই দেখা করবো। উনার যতো কাজই থাকুক না কেন, পনেরো মিনিটের জন্য হলেও আমাকে সময় দিতে হবে আজ। হোমিসাইডের মহাপরিচালক হিসেবে এটুকু দাবি আমি করতেই পারি।”

নিজের বসের এমন দৃঢ়তা দেখে জেফরি খুশি হলো। “আমার একটা অনুরোধ আছে, স্যার...” বললো সে।

“কি?”

“আপনার সাথে আমিও যাবো।”

ফারুক আহমেদ জেফরির দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

“আমি অনেক কষ্ট করে ঐ ব্ল্যাক রঞ্জু আর বাবলুকে অ্যারেস্ট করেছিলাম...”।

“বাবলুটা কে?” অবাক হয়ে জানতে চাইলো মহাপরিচালক।

“বাবলু মানে বাস্টার্ড।” জেফরি বুঝতে পারলো ফারুক আহমেদ বাবলু নামটার সাথে খুব বেশি পরিচিত নয়।

“ও!”

“স্যার,” জেফরি খুবই সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো, “আমারও অধিকার আছে এটা জানার, কেন উনি এরকম কাজ করলেন। সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা না পেলে আমি আর হোমিসাইডে থাকবো না।”

মহাপরিচালক কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে সায় দিলো। “অবশ্যই তোমার অধিকার আছে। তুমি আমার সাথে যাচ্ছো।” একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবারও বললো, “তুমি না থাকলে ঐ রঞ্জু বদমাশটা বাস্টার্ড নামের খুনিকে শেষ করে দিয়ে নিজের মিশনে নেমে যেতো। তার হাত থেকে আমাদের এখনকার প্রধানমন্ত্রী বাঁচানো সম্ভব হতো কিনা কে জানে। তোমার কারণেই বাস্টার্ডের বাড়ি থেকে রঞ্জুকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে।”

জেফরি তার বসের দিকে চেয়ে রইলো। এর আগে তাকে কখনও এতোটা ঋজু আর দৃঢ়চেতা দেখে নি।

অধ্যায় ৫৫

হোমমিনিস্টারের সাথে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে খুব কষ্ট হলো। প্রথমে মিনিস্টারের পিএস দু'দিন পর দেখা করার কথা বললে ফারুক আহমেদ জানায়, ব্যাপারটা খুব জরুরি, কোনোভাবেই অপেক্ষা করা যাবে না। যে করেই হোক, আজই দেখা করতে হবে।

হোমিসাইডের মহারিচালকের চাপাচাপিতে অবশেষে সন্ধ্যার পর মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়। তবে ফারুক আহমেদ অবাক হয়েছিলো যখন তাকে বলা হয় মিনিস্টারের অফিসে নয়, তাকে আসতে হবে মিন্টো রোডে মিনিস্টারের সরকারী বাসভবনে।

এখন ফারুক আহমেদ আর জেফরি বেগ বসে আছে ড্রইংরুমে। বিশাল ড্রইংরুমটায় কম করে হলেও চার জোড়া সোফা সেট রয়েছে। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু চেয়ার। তারা ছাড়াও আরো অনেক লোকজন বসে আছে দেখা করার জন্য। এরা সবাই মিনিস্টারের পার্টির লোকজন। তবে তাদের মধ্যে চাপা ফিসফাস শোনা যাচ্ছে, মিনিস্টার সাহেব নাকি আজও কারো সাথে দেখা করবেন না।

প্রায় দশ মিনিট বসে থাকার পর হোমমিনিস্টারের পিএস ড্রইংরুমে প্রবেশ করলো।

"আপনারা আসুন," ফারুক আহমেদ আর জেফরি বেগকে বললো ভদ্রলোক।

লোকটার কণ্ঠ শুনে তার দিকে চেয়ে রইলো জেফরি, কিন্তু ফারুক আহমেদ সেটা লক্ষ্য করলো না। ঘরের অন্য লোকগুলোও ঈর্ষার দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তাদের দুজনের দিকে।

তাদেরকে নিয়ে পিএস ঢুকে পড়লো বাড়ির ভেতরে।

মিন্টো রোডের এই বাড়িগুলো বেশ পুরনো, খুব সম্ভবত বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা যখন প্রাদেশিক রাজধানী হলো তখন এগুলো নির্মাণ করা হয়েছিলো নতুন রাজধানীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য। বলাবাহুল্য, সেইসব কর্মকর্তাদের প্রায় সবাই ছিলো ইংরেজ। বাড়িগুলোর নক্সা, এর ভেতরকার সাজগোজ এখনও ইংরেজদের রুচির বহিপ্রকাশ ঘটাচ্ছে।

মিনিস্টারের পিএসের পিছু পিছু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরতলায় উঠে গেলো তারা দু'জন। সুদীর্ঘ হলওয়ে পেরিয়ে ষষ্ঠভূজাকৃতি একটি ঘরে ঢোকার আগে পিএস তাদের দিকে ফিরে বললো, "মাত্র পনেরো মিনিট। এর বেশি সময় নেবেন না।"

পিএসের পেছনে পেছন ঘরে ঢুকে পড়লো ফারুক আহমেদ আর জেফরি বেগ।

হোমমিনিস্টার মাহমুদ খুরশিদ পাঞ্জাবি-পাজামা পরে সোফায় বসে আছেন। ঘরে তারই সমবয়সী আরেকজন লোক বসে আছে, ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে মিনিস্টারের বন্ধুস্থানীয় কেউ হবে। কিংবা নিকট আত্মীয়।

ফারুক আহমেদ আর জেফরি বেগ সালাম দিলে মিনিস্টার চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। জেফরিকে দেখে তিনি অবাক হয়েছেন বলে মনে হলো, তবে পরক্ষণেই নিজের বিস্মিত হবার অভিব্যক্তিটা লুকিয়ে ফেললেন। তাদেরকে বসার জন্য ইশারা করলেন তিনি।

"খুব জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছেন, কারণটা কি?" শান্তকণ্ঠে ফারুক আহমেদকে বললেন মিনিস্টার মাহমুদ খুরশিদ। তার মুখে কোনো হাসি নেই। এক ধরণের তিক্ততা ছড়িয়ে আছে।

হোমিসাইডের মহাপরিচালক বুঝতে পারলো মিনিস্টার সাহেব এভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়াতে খুশি হন নি। আরে বাবা, আমিও তো খুশি না। আমার অসন্তোষের খবর কে রাখে? মনে মনে বললো সে।

"জি, স্যার...খুবই জরুরি একটা ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি," ফারুক আহমেদ বললো।

"বলুন, কি ব্যাপার?"

মিনিস্টারের পাশে বসা লোকটার দিকে তাকালো ফারুক আহমেদ। "একটু প্রাইভেটলি

বলতে চাচ্ছিলাম, স্যার। কনফিডেনশিয়াল ম্যাটার।”

নির্বিকার মুখে চেয়ে রইলেন মিনিস্টার, তারপর ফিরলেন পাশে বসা লোকটার দিকে। বিড়বিড় করে কী যেনো বললেন তাকে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা উঠে ঘর থেকে চলে গেলো।

“হুম...এবার বলুন।”

“স্যার, গতকাল ব্ল্যাক রঞ্জু জামিনে মুক্তি পেয়েছে...আপনি নিশ্চয় জানেন?”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিনিস্টার। “হ্যাঁ, জানি।”

“কাজটা করা হয়েছে আমাদের কনসার্ন ছাড়া, ডিসি প্রসিকিউশন থেকে এ ব্যাপারে আমাদেরকে কিছুই জানানো হয় নি। আমাদেরকে না জানিয়ে তাকে জামিন দেয়া হয়েছে, স্যার।” বেশ সতর্কভাবে বললো ফারুক আহমেদ। একজন মিনিস্টারের কাছে সরাসরি জবাবদিহিতা চাওয়া যায় না।

“ওই লোকটা নাকি ব্ল্যাক রঞ্জু না...তার আইনজীবিরা এটা আদালতে প্রমাণ করতে পেরেছে...তাদের কাছে হার্ড এভিডেন্স ছিলো, বুঝতেই পারছেন, আমাদের কিছু করার ছিলো না।” কাটাকাটাভাবে বললেন মাহমুদ খুরশিদ।

“কিন্তু আমাদের কাছে অনেক এভিডেন্স আছে, স্যার,” পাশ থেকে আস্তে করে বললো জেফরি বেগ। মিনিস্টার তার দিকে তাকালেন। “ওই লোকটাই যে ব্ল্যাক রঞ্জু সেটা আমরা আদালতে প্রমাণ করতে পারতাম...যদি আমাদেরকে জানানো হতো।”

“ওরা আদালতে আসল ব্ল্যাক রঞ্জুর ডেথ সার্টিফিকেট দেখিয়েছে। কোলকাতা মেট্রোপলিটান পুলিশের টেস্টিমোনিও সাবমিট করেছে। সেখানে আপনার রেফারেন্সও দেয়া আছে...মি: বেগ।”

মিনিস্টারের মুখে নিজের নামটা শুনে একটু অবাকই হলো জেফরি। তবে তারচেয়েও বেশি অবাক হলো কোলকাতার পুলিশের কথাটা শুনে।

“রঞ্জুর আইনজীবি কিভাবে এটা জানতে পারলো, স্যার?” নিজের বিস্ময় আর লুকিয়ে রাখতে পারলো না। এটা তো শুধুমাত্র আমরা জানি!”

মিনিস্টার একটু বিব্রত হলেন। চকিতে পিএস আলী আহমেদের দিকে তাকালেন তিনি। “আপনি আর আমাদের ডিজি সাহেব কোলকাতার পুলিশ কমিশনারকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন ব্ল্যাক রঞ্জুকে অ্যারেস্ট করার জন্য।”

ফারুক আহমেদ কিছু বলার আগেই জেফরি বলে উঠলো, “জি, স্যার...কিন্তু যে লোক খুন হয়েছিলো সে ব্ল্যাক রঞ্জু ছিলো না। রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ এক সহযোগী ছিলো।”

“এ কথা বললে কাজ হতো না। ওই লোকটার আইনজীবি কোলকাতা পুলিশের কাছ থেকে ব্ল্যাক রঞ্জুর ডেথ সার্টিফিকেট যোগাড় করেছে। আদালত সেটা বিশ্বাসও করেছে। আপনি আদালতে গিয়ে এ কথা বললেও কোনো লাভ হতো না। আপনার কাছে তো হার্ড এভিডেন্স নেই।”

“আছে, স্যার। আমি যদি জানতাম রঞ্জু জামিন নেবার চেষ্টা করছে তাহলে অবশ্যই সেসব এভিডেন্স সাবমিট করতে পারতাম,” জোর দিয়ে বললো জেফরি বেগ।

“এখন আর এটা বলে কোনো লাভ নেই। হাইকোর্ট জামিন দিয়েছে, আমরা কী করবো?”

“কিন্তু স্যার, আমাদেরকে কেন জানানো হলো না সেটা কি জানতে পারি?” বেশ দৃঢ়ভাবেই কথাটা বললো ফারুক আহমেদ।

মিনিস্টার তার দিকে চেয়ে রইলেন স্থিরদৃষ্টিতে। “আপনি আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত চাচ্ছেন?” শান্তকণ্ঠে বললেন তিনি।

“আপনি যদি এটাকে কৈফিয়ত মনে করেন, তাহলে তাই...” ফারুক আহমেদ কিছু বলার আগেই জেফরি বলে উঠলো।

মিনিস্টার গোল গোল চোখে চেয়ে রইলেন জেফরি বেগের দিকে। “হাউ ডেয়ার ইউ আর!” রেগেমেগে তাকালেন তিনি। “বিহেইভ ইউর সেলফ!” ধমকের সুরে বললেন

জেফরিকে।

"স্যার, প্লিজ, ফারুক আহমেদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললো। "ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। ও আসলে মিন করে কথাটা বলে নি..."

"আমি মিন করেই বলেছি," দৃঢ়ভাবে বললো জেফরি।

ফারুক আহমেদ হতভম্ব হয়ে জেফরি বেগের দিকে তাকালো আবার। মিনিস্টার আর তার পিএস যেনো আকাশ থেকে পড়লো কথাটা শুনে।

"আপনি কার সাথে কথা বলছেন, হুঁশজ্ঞান আছে?" মিনিস্টারের পিএস ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো জেফরিকে।

"জি, আছে। উনি আমাদের হোমমিনিস্টার।"

জেফরির এ কথা শুনে ফারুক আহমেদ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। তার এই প্রিয়পাত্র কী বুঝতে পারছে কার সামনে সে কথা বলছে? জেফরির কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো?

"কয়েকটা সাফল্য আর পত্রপত্রিকায় ছবি ছাপা হবার পর আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মি: বেগ," দাঁতে দাঁত পিষে বললেন মিনিস্টার। "ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। এবার ফারুক আহমেদের দিকে ফিরলেন তিনি। "আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত চাইবার জন্যেই কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছেন?"

কিন্তু ফারুক আহমেদ কিছু বলার আগেই জেফরি আবারো বলে উঠলো, "না, স্যার। আরেকটা জরুরি কারণে আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি।"

মিনিস্টার আর হোমিসাইডের মহাপরিচালক দু'জনেই অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে। পিএস লোকটা ভুরু কুচকে জেফরিকে দেখে যাচ্ছে।

"সেটা কি, বলেন?" মিনিস্টার গম্ভীরকণ্ঠে বললেন। "আমার হাতে বেশি সময় নেই।"

পাশে বসে থাকা পিএসের দিকে তাকালো জেফরি। "কথাটা আমি একান্তে বলতে চাই, স্যার।"

"বলুন, কোনো সমস্যা নেই," কাটাকাটাভাবে বললেন মাহমুদ খুরশিদ।

"কিন্তু আমি একান্তেই কথাটা বলতে চাই, স্যার।" জেফরি অনড়।

মিনিস্টার যেনো বিশ্বাসই করতে পারছেন না। অসহায়ের মতো জেফরির দিকে চেয়ে রইলো ফারুক আহমেদ। কিন্তু সে চেয়ে আছে সরাসরি মিনিস্টারের দিকে।

নিজের চেপে রাখা ক্রোধ নিঃশ্বাসের সাথে বের করে দিলেন মিনিস্টার। বোঝা গেলো জোর করে রাগ দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন তিনি। "ও আমার পিএস...আমার সাথে ওর সম্পর্ক বহুদিনের। বলতে পারেন আমার পরিবারেরই।"।

"ঠিক আছে, স্যার, আমি চলে যাচ্ছি, নো প্রবলেম," পিএস উঠে দাঁড়ালো। "উনি হয়তো আমার সামনে কথাটা বলতে চাচ্ছেন না।"

"তুমি বসো," মৃদু ধমকের সুরে বললেন মিনিস্টার। তারপর জেফরির দিকে ফিরলেন। "যা বলার জলদি বলুন, মি: বেগ। আপনাদেরকে একটু পরই উঠতে হবে।" পিএসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বসার জন্য ইশারা করলেন তিনি।

জেফরি পাশ ফিরে দেখলো ফারুক আহমেদ মাথা নীচু করে হাত দিয়ে কপাল ঘষছে। তাকে এখানে নিয়ে এসে যে ভুল করেছে সেটাই যেনো এখন টের পাচ্ছে হাড়ে হাড়ে।

"ব্যাপারটা আপনার ছেলে তুর্যকে নিয়ে।"

জেফরির কথাটা যেনো ঘরের মধ্যে এক ধরণের আলোড়ন তুললো। চমকে উঠলেন মিনিস্টার। পিএস চট করে তাকালো জেফরির দিকে। তার চোখেমুখে বিস্ময়। আর ফারুক আহমেদ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো শুধু। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?" রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেন না হোমমিনিস্টার।

"আপনার ছেলে তুর্য কোথায়?" জেফরি শান্তকণ্ঠে জানতে চাইলো।

পিএস আর ফারুক আহমেদ বিস্ময়ে চেয়ে রইলো তার দিকে। হোমমিনিস্টার ভুরু

কুচকে জেফরিকে দেখে নিলেন।

"আমার ছেলে তুর্য কোথায় মানে?" যেনো আগ্নেয়গিরি ফুঁসে উঠছে।

"আপনার ছেলে তুর্য এখন কোথায় আছে?" কথাটা পুণরাবৃত্তি করলো সে।

পিএসের সাথে মিনিস্টারের দৃষ্টি বিনিময় হলো। হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ এতোটাই ভড়কে গেছে যে মূর্তির মতো বসে রইলো কেবল। তার চোখের পলক পড়ছে না। নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে যেনো।

"হঠাৎ তুর্যের কথা জানতে চাইছেন কেন?" পিএস জিজ্ঞেস করলো।

"দরকার আছে।" ছোট্ট করে জবাব দিলো জেফরি।

তীক্ষ্ণ চোখে মিনিস্টার চেয়ে রইলেন হোমিসাইডের ইভেস্টিগেটরের দিকে। "আমি মনে করি না আমার ছেলে কোথায় আছে না আছে সেটা আপনার জানার দরকার আছে।"

"স্যার, আমি জানি আপনার ছেলে কোথায় আছে," আস্তে করে বললো জেফরি বেগ।

কথাটা শুনে মিনিস্টার আর তার পিএস চমকে উঠলো। ফারুক আহমেদ আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না। চাপাকণ্ঠে জেফরির হাতটা ধরে সে বললো, "জেফ, তুমি এসব কি বলছো!"

জেফরি তার বসের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে আশ্বস্ত করে মিনিস্টারের দিকে ফিরলো আবার।

"স্যার, আমি জানি সেন্ট অগাস্টিনের জুনিয়র ক্লার্ক হাসানকে কারা খুন করেছে...কেন ব্ল্যাক রঞ্জুর মতো সন্ত্রাসীকে আপনি জামিনে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন।"

হোমমিনিস্টার মাহমুদ খুরশিদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে জেফরির দিকে তাকালেন। "আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?"

"ব্ল্যাক রঞ্জু আপনার ছেলেকে কিডন্যাপ করেছে, স্যার।"

অধ্যায় ৫৬

এক অসহ্য নীরবতায় ডুবে আছে হোমমিনিস্টারের ড্রইংরুমটা।

জেফরির মুখ থেকে কথাটা শুনে মিনিস্টার মাহমুদ খুরশিদ আর তার পিএস একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়েছিলো। ফারুক আহমেদ বাকরুদ্ধ হয়ে চেয়ে আছে জেফরির দিকে।

ঘরের চারজন মানুষ বুঝতে পারছে না কে এই নীরবতা ভাঙবে, কিভাবে ভাঙবে।

জেফরি বেগই মুখ খুললো আবার। "বদমাশটা জেলে বসেই তার লোকজনদের সাহায্যে তুর্যকে সেন্ট অগাস্টিন থেকে কিডন্যাপ করেছে।"

ফারুক আহমেদ থ বনে গেলো।

"এ কারণেই আপনি ব্ল্যাক রঞ্জুকে জামিনে মুক্ত করেছেন। করতে বাধ্য হয়েছেন।"

"স্যার, জেফরি এসব কী বলছে?" বিস্মিত হয়ে ফারুক আহমেদ বললো।

"মি: বেগ ঠিকই বলেছেন, অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে করে বললেন মিনিস্টার।

"স্যার, আপনি এতো বড় ভুল করলেন কেন?"

জেফরির কথাটা শুনে মিনিস্টার বুঝতে পারলেন না। "ভুল!"

"আপনি হোমমিনিস্টার হয়ে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিভাবক হয়ে তাদের সাহায্য নিলেন না...তাদের উপর নির্ভর করলেন না। পুরো ব্যাপারটা গোপন করে রাখলেন। ঐ জঘন্য সন্ত্রাসী-খুনি জেল থেকে বসে যে দাবি করেছে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন।" মাথা দোলালো জেফরি। "আপনি নিজেই যদি আপনার বাহিনীর উপর আস্থা রাখতে না পারেন তাহলে জনগণ কিভাবে আস্থা রাখবে?"

মিনিস্টার চোখ বন্ধ করে ফেললেন আবার।

"তুর্য স্যারের একমাত্র সন্তান," আস্তে করে পাশ থেকে বললো পিএস। "যেভাবে ঘটনা ঘটেছে, যেভাবে ব্ল্যাক রঞ্জু চাপ দিয়েছে..." কথাটা শেষ না করে মাথা দোলালো সে। "আমরা সবাই ভীষণ ভড়কে গেছিলাম।"

"ঐ সন্ত্রাসী কতো ক্ষমতা রাখে আমি জানি না," মিনিস্টার উদাস হয়ে বললেন, "কিন্তু সে এ পর্যন্ত যা করেছে সেটা একেবারেই অকল্পনীয়..."

"কি করেছে, স্যার? প্লিজ, আমাকে সব খুলে বলুন।" তাড়া দিয়ে বললো জেফরি বেগ।

মিনিস্টার স্থিরচোখে চেয়ে রইলেন ইনভেস্টিগেটরের দিকে। তারপর পিএসের দিকে ফিরে বললেন, "তুমিই বলো, ঐ দিন কি হয়েছিলো।"

পিএস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। মিনিস্টারের চেয়ে তার মানসিক অবস্থা যেনো আরো বেশি খারাপ।

ব্যাপারটা জেফরির কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হলো।

"গত বৃহস্পতিবার বিকেলের পর, সন্ধ্যার দিকে হবে হয়তো," বলতে শুরু করলো পিএস। "আমার কাছে একটা ফোন আসে..."

সপ্তাহের অন্যসব দিনের চেয়ে বৃহস্পতিবার হোমমিনিস্টারের অফিসে কাজের চাপ বেশি থাকে। পিএস আলী আহমেদ যথারীতি খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিলো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামি নামি করছে তখন। নিজের রুমে বসে একজনের সাথে কথা বলছিলো সে। লোকটা পুলিশের উর্ধতন এক কর্মকর্তা। সরকার দলের সমর্থক হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে বদলীর তদবির করতে এসেছে।

এমন সময় আলী আহমেদের মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে।

আকরাম? একটু অবাক হয় পিএস। আকরাম মিনিস্টারের ছেলে তুর্যের দেহরক্ষি। এসবি'র একজন কনস্টেবল। ড্রাইভারসহ সার্বক্ষণিক বডিগার্ড হিসেবে সে দায়িত্ব পালন করে। তুর্যকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, স্কুল থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়া, এসব কাজ করে সে।

এই লোক তাকে কেন ফোন করেছে?

কলটা রিসিভ করে পিএস।

ওপাশ থেকে আকরাম নামের লোকটা জানায় তুর্যকে স্কুলের ভেতর পাওয়া যাচ্ছে না। স্কুল ছুটির পর তুর্য বাস্কেটবল কোর্টে প্র্যাকটিস করছিলো। তার সব সঙ্গিসাথি প্র্যাকটিস শেষে একে একে বেরিয়ে আসার পরও তুর্যকে না পেয়ে সে স্কুলের ভেতরে প্রবেশ করে। সেখানে তুর্য নেই। আকরাম জানায় তুর্যের সব বন্ধুবান্ধব চলে যাবার পরও তাকে বের হতে না দেখে সে তার মোবাইল ফোনে কল দেয়, কিন্তু ফোনটা বন্ধ পেয়েছে। তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। তুর্য গেলো কোথায়?

পিএস আলী আহমেদও অবাক হয়। এটা কি করে সম্ভব?

আকরামকে ভালো করে খোঁজ নিতে বলে দেয় সে। স্কুলের দারোয়ান , কর্মচারি সবাইকে জিজ্ঞেস করতে বলে। কিন্তু আকরাম জানায়, সে সবাইকে জিজ্ঞেস করেছে। কেউ কিছু জানে না। সারা স্কুল তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে, তুর্য কোথাও নেই।

আশ্চর্য! ছেলেটা গেলো কোথায়? ভাবনায় পড়ে যায় পিএস। তার মনে পড়ে যায় কয়েক মাস আগের সেই ঘটনাটি। হয়তো মিনিস্টারের বখে যাওয়া ছেলেটা আবারো কোনো আকাম-কুকামে...।

সঙ্গে সঙ্গে আকরামকে বলে, সে যেনো স্কুলভবনের প্রতিটি রুম চেক করে দেখে। টয়লেট, স্টোররুম, সবখানে। নিশ্চয় কোথাও না কোথাও আছে তুর্য। কয়েক মাস আগে অগাস্টিনের স্টোররুম থেকে ছেলেটাকে ও তার সহপাঠিনি সহ হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলো ঐ স্কুলের ক্লার্ক। বিরাট কেলেংকারির ব্যাপার হয়েছিলো সেটা। যাইহোক, খুব সহজেই সে ঘটনা ধামাচাপা দেয়া গেছে। এখন আবার ছেলেটা নতুন কোনো ঝামেলা পাকায় নি তো?

আকরামও ঐ ঘটনার সবই জানে, সুতরাং তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেয় সে। সবগুলো রুম যেনো চেক করে দেখে। আর এই ব্যাপারটা নিয়ে উচ্চবাচ্য না করে চুপচাপ কাজটা করার পরামর্শ দিয়ে ফোন রেখে দেয় পিএস।

পনেরো মিনিট পরই আকরাম আবার কল করে। উদভ্রান্ত কণ্ঠে সে জানায় তুর্যকে খুঁজতে গিয়ে ভয়ঙ্কর একটি জিনিস আবিষ্কার করেছে স্কুলের টয়লেটের ভেতর একটা লাশ পড়ে আছে। সেই লাশটা আর কারোর নয়, ঐ ক্লার্ক ছেলেটির, যার সাথে কয়েক মাস আগে তুর্যের ঝামেলা হয়েছিলে।

কথাটা শুনে পিএস ঘাবড়ে যায়। রাগের মাথায় হাসানকে খুন করে ফেললো না তো ছেলেটা?

আকরাম দারুণ শংকিত হয়ে পড়ে। পিএস নিজেও ভড়কে যায়। কথাটা মিনিস্টারকে জানাতে হবে। নিশ্চয় বড় কোনো ঘাপলা হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সে চলে যায় মিনিস্টারের অফিসে। রুমে ঢোকার ঠিক আগেই তার কাছে আরেকটা ফোন আসে। এবারের ফোনটা অজ্ঞাত এক নাম্বার থেকে।

মিনিস্টারের রুমের বাইরে দাঁড়িয়েই পিএস কলটা রিসিভ করে।

কিছুক্ষণ পর যখন মিনিস্টারের রুমে ঢোকে তখন তার অবস্থা খুবই করুণ। রীতিমতো বিপর্যস্ত।

মিনিস্টার মাহমুদ খুরশিদ তার বহুদিনের পুরনো পিএস আলী আহমেদকে দেখে বুঝতে পারেন কিছু একটা হয়েছে। তার কাছে জানতে চান ঘটনা কি। তাকে কেন এমন দেখাচ্ছে?

আলী আহমেদ ধপাস করে চেয়ারে বসে মিনিস্টারের দিকে চেয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপরই বলে, একটু আগে তাকে ফোন করে জানানো হয়েছে তুর্যকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।

কথাটা শুনে মিনিস্টার হতভম্ব হয়ে পড়েন। এটাও কি সম্ভব? এ দেশের হোমমিনিস্টারের ছেলেকে কিডন্যাপ? এতো বড় আস্পর্ধা কার?

পিএস সব খুলে বলে : একটু আগে আকরাম ফোন করে জানিয়েছে তুর্যকে স্কুলে

খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর অজ্ঞাত এক নাম্বার থেকে এক লোক নিজেকে ব্ল্যাক রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচয় দিয়ে ফোনে জানিয়েছে তুর্য এখন তাদের জিম্মায় আছে।

ব্ল্যাক রঞ্জু?!

অসম্ভব! সে তো এখন জেলে। হুইলচেয়ারে চলাফেরা করে। তার শারিরীক অবস্থা খুবই খারাপ। তার পক্ষে কিভাবে এরকম একটি কাজ করা সম্ভব হলো?

পিএস জানায়, ব্ল্যাক রঞ্জু খুবই ভয়ঙ্কর এক সন্ত্রাসী। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচনের আগে খুন করার মতো দুঃসাহসও এই লোক দেখিয়েছিলো। আরেকটুর জন্যে মিশনটাতে সফল হয়ে যেতো সে। মাহমুদ খুরশিদ নিজে সেটা নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন এক পেশাদার খুনিকে রঞ্জুর পেছনে লেলিয়ে দিয়ে।

পিএস আলী আহমেদ তার বসকে জানায়, রঞ্জু বেশ প্রস্তুতি নিয়েই তার লোকজনকে মাঠে নামিয়েছে। তুর্যের এই কিডন্যাপের কথা তারা দু'জন বাদে অন্য কেউ জানলে ছেলেটাকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে বলেও হুমকি দেয়া হয়েছে। আলী আহমেদ বলে, সে নিজে বিশ্বাস করে যারা হোমমিনিস্টারের ছেলেকে কিডন্যাপ করার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তাদেরকে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না।

পিএসের কথায় এতো সহজে দমে যান নি হোমমিনিস্টার। তিনি যখন এ ব্যাপারে কিছু একটা করার কথা যখন ভাবছিলেন ঠিক তখনই আরেকটা কল আসে পিএসের ফোনে।

ফ্যাসফ্যাসে একটি কণ্ঠ জানায়, ব্যাপারটা তৃতীয় কারো কানে যাওয়া মাত্রই তুর্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। আরো বলা হয়, তাদের জন্য একটি উপহার আছে। একটু পর একটা এসএমএস পাঠানো হবে। সেটা ব্যবহার করলেই তারা তুর্যকে দেখতে পাবে।

কলটা শেষ হতেই একটা এসএমএস চলে আসে পিএসের ফোনে। প্রথমে এসএমএসটার অর্থ বুঝতে পারে নি আলী আহমেদ সাহেব, কিন্তু তারপই বুঝতে পারে ব্ল্যাক রঞ্জুর দল তাদের কাছে কি পাঠিয়েছে।

"কি পাঠানো হয়েছিলো?" সব শুনে অবশেষে জানতে চাইলে জেফরি বেগ।

মিনিস্টার আর তার পিএস কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইলো।

"একটা লিংক," আস্তে করে বললো পিএস আলী আহমেদ।

"কিসের লিংক?"

"ইউ-টিউবের।"

"বলেন কি," আস্তে করে বললো জেফরি বেগ। চট করেই সে ধরতে পারলো ব্যাপারটা।

ফারুক আহমেদ কিছুই বুঝতে পারলো না। সে জেফরির দিকে চেয়ে বললো, "ইউ-টিউবের লিংক মানে?"।

হাত তুলে নিজের বসকে চুপ থাকার ইশারা করলো জেফরি। "আমি ভিডিওটা দেখতে চাই," পিএসকে বললো সে।

মিনিস্টারের দিকে তাকালো পিএস। মাহমুদ খুরশিদ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন কেবল। "স্যার, উনাকে দেখাবো?"

"দেখাবেন?" পাল্টা প্রশ্ন করলেন মিনিস্টার।

"উনি তো সব জেনেই গেছেন," বললো পিএস। আর কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়ালেন আলী আহমদ।

জেফরি বেগ লক্ষ্য করলো হোমমিনিস্টার তার পিএসের উপর দারুণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। বলতে গেলে তার কথায় এখন সব কাজ করেন।

পাশের একটি ডেস্ক থেকে ল্যাপটপ তুলে এনে জেফরির সামনে রাখলেন পিএস। ইন্টারনেট কানেকশানটা অন করে কিছু টাইপ করতেই পর্দায় ভেসে উঠলো জনপ্রিয় ভিডিও সাইট ইউটিউবের লিঙ্কটা।

বাফারিং হবার সময় ভিডিওটার লিংক মুখস্ত করে ফেললো জেফরি।

একটু পরই সেখানে ভেসে উঠলো একটি ভিডিও।

অল্প বয়সী এক ছেলে একটা চেয়ারে বসে আছে। তার দু'হাত চেয়ারের হাতলের সাথে শক্ত করে বাধা। মাথার চুল এলোমেলো। বাম ঠোঁটটা ফোলা। চোখের জলে গাল ভিজে একাকার।

তুর্য!

জেফরি টের পেলো তার বস ফারুক আহমেদ ভিডিওটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, জেফরির এক হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে সে আনমনে। ফারুক আহমেদের সাথে তার চোখাচোখি হয়ে গেলো।

একটা অদ্ভুত ঘরে তুর্য বসে আছে। তার হাত বাধা চেয়ারের হাতলের সাথে। সম্ভবত পা দুটোও চেয়ারের পায়ার সাথে বেধে রাখা হয়েছে তবে সেটা ভিডিওর ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে না। জেফরি সেটা আন্দাজ করে নিলো।

তুর্য একাই বসে আছে। চিৎকার করে বলছে : "প্লিজ, আমাকে মারবেন। না। প্লিজ!"

অমনি পেছন থেকে একটা হাত চেপে ধরলো তুর্যের মুখ। লোকটাকে দেখা গেলো না, শুধু হাত আর বুকের কিছু অংশ ছাড়া। লোকটার হাত থেকে নিজেকে ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলো তুর্য, কোনো লাভ হলো না। যেনো শক্ত কোনো কিছু দিয়ে তার চেয়ারটাও আটকে রাখা হয়েছে। তুর্য তার হাত দুটো ছাড়ানোর জন্য ছটফট করতে লাগলো কিন্তু ওগুলো এতো শক্ত করে বাধা যে একটুও নড়াতে পারলো না।

পেছন থেকে যে হাতটা তুর্যের মুখ চেপে রেখেছিলো সেটা হঠাৎ করেই ছেড়ে দিলো। হাফিয়ে উঠলো ছেলেটা। চিৎকার করে বলে উঠলো : "বাবা, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে...বাবা আমাকে বাঁচাও!"

তুর্যের চিৎকাররত মুখটা ফ্রিজ হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। শেষ হয়ে গেলো ছোট্ট অথচ বিভীষিকাময় একটি ভিডিও।

কয়েক মুহূর্ত ঘরের কেউ কোনো কথা বললো না। জেফরি চেয়ে দেখলো মিনিস্টার দুচোখ বন্ধ করে রেখেছেন।

নীরবতা ভাঙলো পিএস আলী আহমেদ। "প্রথম দুদিনে এরকম প্রায় পাঁচ-ছয়টি ভিডিও পাঠিয়েছে তারা।"

"তাই নাকি?" অবাক হয়ে বললো জেফরি বেগ। একটু চুপ থেকে মিনিস্টারের দিকে ফিরলো। এখনও চোখ বন্ধ করে রেখেছেন তিনি। "স্যার, ব্ল্যাক রঞ্জুর সাথে কি আপনি নিজে কথা বলেছেন?"

আলী আহমেদের দিকে তাকালেন মাহমুদ খুরশিদ। ভদ্রলোক মাথা নেড়ে সায় দিলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "হুম।"

"ফোনে?"

মিনিস্টার তার কপালের বাম পাশটা হাত দিয়ে ঘষলেন, লাল টকটকে চোখে তাকালেন জেফরি বেগের দিকে। "না।"

বৃহস্পতিবার তুর্য কিডন্যাপ হবার পর থেকে হোমমিনিস্টার মাহমুদ খুরশিদ আর তার পরিবারের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যায় সেটা কল্পনাতীত। এতো ক্ষমতাধর একজন ব্যক্তি জেলে বন্দী ব্ল্যাক রঞ্জুর হাতে জিম্মি হয়ে পড়েন। ছেলের জীবন রক্ষা করার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি আর ক্ষমতার কিছুই ব্যবহার করতে পারেন নি। একেবারে অসহায় হয়ে পড়েন।

ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের এক অজ্ঞাত লোক যোগাযোগ করতে থাকে তাদের সাথে।

ইউ-টিউবের বেশ কয়েকটি ভিডিওতে তুর্যের বন্দীদশা, টচারের দৃশ্য দেখে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন মিনিস্টার। তার স্ত্রী ঘটনার পর থেকে শয্যাসায়ী হয়ে যান। একজন ব্যক্তিগত চিকিৎসক ঘুমের ওষুধ দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। ঘুম ভাঙলেই তুর্যের মা এমনভাবে কান্নাকাটি করেন যে, ব্লাডপ্রেসার উঠে অবস্থা খারাপের দিকে চলে যায়।

শুক্রবার সারাটা দিন শুধু এই ভাবনায় কাটিয়ে দিয়েছেন, ইউ-টিউবের ভিডিও আর ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের যে লোক ফোন করে, তার নাম্বারটা ট্র্যাক ডাউন করার চেষ্টা করবেন কিনা। অবশেষে যখন সিদ্ধান্ত নিলেন গোয়েন্দা সংস্থায় তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজনকে দিয়ে কাজটা করাবেন তখনই তার মোবাইলে একটা কল আসে।

রঞ্জুর লোকটা জানায়, ইউটিউবের ভিডিও লিংক আর তার ফোন নাম্বারটা ট্রাক ড্রাউন করার বৃথা চেষ্টা যেনো তিনি না করে। যদিও করলে কোনো লাভ হবে না, তারপরও এ কাজটা করলে নিজের ছেলের হত্যাকাণ্ডের ভিডিও দেখতে পাবেন শীঘ্রই।

মিনিস্টার যারপরনাই ভড়কে যান। রঞ্জুর দলের লোকজন টের পেয়ে গেলো কী করে, ভেবে পেলেন না তিনি।

একটু পরই তুর্যের আরেকটি নতুন ভিডিও আপলোড করা হয় ইউ টিউবে। সেখানে দেখা যায় তুর্য ক্যামেরার দিকে চেয়ে বলছে, তার বাবা যেনো কিডন্যাপারদের দাবি তাড়াতাড়ি মেনে নেয় সে ব্যাপারে কান্নাজড়িত কণ্ঠে আবেদন জানায় ছেলেটা।

এরপরই মিনিস্টার মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়েন। পিএস আলী আহমেদকে তিনি জানান, জেলে বন্দী ব্ল্যাক রঞ্জুর সাথে দেখা করবেন। আলী আহমেদ অবাক হয়েছিলো কথাটা শুনে, কিন্তু মিনিস্টার দৃঢ়প্রতীজ্ঞ ছিলেন এ ব্যাপারে।

শুক্রবার রাত একটার পর পাতাকাবিহীন একটি পাজেরো জিপ প্রবেশ করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। জিপে হোমমিনিস্টার মাহমুদ খুরশিদ আর তার পিএস ছাড়া অন্য কেউ ছিলো না। মিনিস্টারের নিরাপত্তায় নিয়োজিত গাড়ি দুটো জেলখানার বাইরে অপেক্ষায় থাকে।

জেলারকে আগে থেকেই জানানো হয়েছিলো ব্যাপারটা। তবে তাকেও পুরো ঘটনা খুলে বলা হয় নি। শুধু বলা হয়েছিলো ব্ল্যাক রঞ্জুর সাথে মিনিস্টারের একটি কনফিডেন্সিয়াল মিটিংয়ের আয়োজন করতে হবে তার রুমে। তিনি যেনো অত্যন্ত গোপনে এটার ব্যবস্থা করেন।

জেলার খুব অবাক হলেও কোনো প্রশ্ন করেন নি। মিনিস্টারের আদেশমতো সব ব্যবস্থা করে রাখেন ভদ্রলোক।

রাত ১টা দশ মিনিটে জেলারের রুমে বসে আছেন হোমমিনিস্টার মাহমুদ খুরশিদ। তার পাশে পিএস আলী আহমেদ। আর কেউ নেই ঘরে। এমনকি জেলার নিজেও এই মিটিংয়ে থাকতে পারবেন না বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো আগে থেকে।

রাত সোয়া একটার দিকে জেলখানার এক রক্ষী হুইলচেয়ার ঠেলতে ঠেলতে ঘরে প্রবেশ করে। সেই হুইলচেয়ারে বসা কুখ্যাত সন্ত্রাসী বহু খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্ল্যাক রঞ্জু।

কুৎসিত একটা মুখ। কালো কুচকুচে। চোখ দুটো লাল। ঠোঁট দুটোতে লালসা আর

ভোগের অসীম আকাঙ্খা বহন করছে। মুখে যে বাঁকা হাসিটা ঝুলে আছে সেটা আরো বেশি কুৎসিত, তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে ওঠে সারা মুখে লেগে থাকা বন্যহিংস্রতা।

মিনিস্টার বসে আছেন জেলারের অফিসরুমের সোফায়। হুইলচেয়ারটা ঘরের মাঝখানে রেখেই রক্ষী লোকটা চুপচাপ চলে গেলো।

রঞ্জুর মুখে হাসির ঝিলিক।

"আহ...আপনাকে অবশ্য আশা করি নি!" বললো ব্ল্যাক রঞ্জু। "রাতবিরাতে হোমমিনিস্টার একজন বন্দীর কাছে ছুটে এসেছেন! ঐতিহাসিক ঘটনা!"

মিনিস্টার মাহমুদ খুরশিদ চোখ কুচকে চেয়ে রইলেন রঞ্জুর দিকে। রাগে ঘৃণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে আছে।

"ইউ সন অব অ্যা বিচ!" মিনিস্টার দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠলেন।

"আহ, কৃত্রিম অতনাদ করে উঠলো রঞ্জু। "আলোচনা করতে এসে গালাগালি করতে নেই, মিনিস্টার সাহেব..." একটু থেমে আবার বললো, "আপনি একজন পলিটিশিয়ান। পলিটিক্স হলো আর্ট অব কম্প্রোমাইজ, এটা আপনি আমার চেয়েও ভালো জানেন। কম্প্রোমাইজ করতে এসে গালাগালি করাটা কি ঠিক হচ্ছে?"

পিএস আলী আহমেদ মিনিস্টারের হাতে হাত রেখে তাকে শান্ত থাকার ইশারা করলো।

"পিএস সাহেব নাকি?" আলী আহমেদের দিকে চেয়ে বললো রঞ্জু।

তার এ কথার কোনো জবাব দিলো না পিএস।

"তুমি কি চাও?" সরাসরি বললেন হোমমিনিস্টার।

চারপাশে তাকালো রঞ্জু। "আমি কখনও এতোদিন জেলে থাকি নি। কী একটা জেলখানারে বাবা, জাহান্নামও এর চেয়ে ভালো। দশ বছর আগে যখন এক মাসের জন্য ঢুকেছিলাম তখনও একই অবস্থা ছিলো। কোনো পরিবর্তন নেই।"

"তুমি কি চাও?" কথাটা পুণরাবৃত্তি করলেন মাহমুদ খুরশিদ। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি।

"আহা, অধৈর্য হচ্ছেন কেন?" আশেপাশে তাকালো আবার। "কেউ তো নেই। একটু মন খুলে কথা বলি, মিনিস্টার সাহেব..." জিভ কেটে আবার বললো সে, "যা, মাননীয়' শব্দটা ব্যবহার করতে ভুলে গেছি! আসলে অভ্যেস নেই..."

"তোমার সাথে আমি এখানে গল্প করতে আসি নি...তুমি কি চাও সেটা বলো।"

মাথাটা একদিকে কাত করলো রঞ্জু। "আমার লোক কি আপনাকে বলে নি আমি কি চাই?"

"বলেছে, কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়," মিনিস্টার বললেন।

"কেন সম্ভব নয়, মাননীয় মিনিস্টার?" টেনে টেনে বললো কথাটা।

"তোমার বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা। ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশটি খুনের...একশোটার উপরে চাঁদাবাজির...এছাড়াও আরো কতো মামলা আছে তার কোনো সঠিক হিসেব নেই। তুমি হাতেনাতে পুলিশের কাছে ধরা পড়েছো। তোমার বিরুদ্ধে এতো সাক্ষি আর এভিডেন্স রয়েছে যে, এই পৃথিবীর কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আমি কেন, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না। তুমি নির্ঘাত ফাঁসিতে ঝুলবে। আর আমার মনে হয় না এ দেশের কোনো রাষ্ট্রপতি তোমাকে জীবন ভিক্ষা দেবে..." এক দমে কথাগুলো বলে গেলেন মাহমুদ খুরশিদ।

মাথা নেড়ে সায় দিলো রঞ্জু। "ঠিক বলেছেন। আমার আইনজীবি, ঐ ব্যারিস্টার গর্দভটাও আমাকে এসব কথা বলেছে। খুবই চিন্তার বিষয়।" চিন্তিত হবার ভান করলো সে। "আমাকে কেউই বাঁচাতে পারবে না। এটা নাকি অসম্ভব একটি ব্যাপার। কিন্তু অসম্ভব কথাটা তো বোকাদের ডিকশনারিতে থাকে," হা হা করে হেসে উঠলো রঞ্জু। "ভাববেন না এসব জ্ঞানগর্ভ কথা আমার নিজের... জ্ঞানীদের কোটেশন ব্যবহার করলাম একটু।"

পিএস আর মিনিস্টার একে অন্যের দিকে তাকালো। তারা অপেক্ষা করলো এরপর রঞ্জু

কী বলে শোনার জন্য।

"ব্যাপারটা যেনো সম্ভব হয় সেজন্যেই আমি আপনাকে বেছে নিয়েছি। আমি জানি এই কাজটা আপনি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।"

"অসম্ভব!" তেতে উঠলেন মিনিস্টার। "আমি কী করে পারবো?" পিএসের দিকে তাকালেন তিনি। "আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। আইনী প্রক্রিয়ার বাইরে আমি তোমাকে জেল থেকে বের করতে পারবো না। আমার অনেক ক্ষমতা আছে মানি...কিন্তু তাই বলে ইচ্ছে করলে যাকে খুশি তাকে জেল থেকে বের করে দেবো সেই ক্ষমতা আমার নেই। অন্তত, তোমার মতো কাউকে জেলে থেকে বের করে দেবার ক্ষমতা আমি রাখি না।"

"আহ, আমার মতো কাউকে?" নিঃশব্দে হেসে ফেললো রঞ্জু। মিনিস্টার আর পিএস এক অন্যের দিকে তাকালো।

"কিন্তু আমার মতো একজনকে আপনি বের করেছেন, মাননীয় হোমমিনিস্টার..."

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলেন মাহমুদ খুরশিদ, কিছু বলতে পারলেন না।

"এরকম কাজ শুধু আপনিই করতে পারবেন, একটু থেমে আবার বললো সে, "এবং সেটা আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই...আপনি আমাকে জামিনের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।"

"জামিন?" বিস্ময়ে চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো মিনিস্টারের। "তোমাকে কোন্ আদালত জামিন দেবে? কেউ দেবে না। আইনী প্রক্রিয়ায় তোমাকে বের করার কোনো সুযোগই নেই। আর বেআইনীভাবে যদি বের করার চেষ্টা করি তাহলে সে কাজে সফল তো হবেই না, মাঝখান থেকে আমার মন্ত্রীত্বটাও যাবে।"

"না না, মিনিস্টার সাহেব...আপনি এখনও না বোঝার ভান করছেন। একটা উপায় আছে," বেশ জোর দিয়ে বললো রঞ্জু।

রেগেমেগে উঠে দাঁড়ালেন মাহমুদ খুরশিদ। "কোনো উপায় নেই। নো চান্স। অনেক ভেবে দেখেছি...এটা আমি কোনোভাবেই করতে পারবো না।"

"আপনিই পারবেন," মিটিমিটি হেসে বললো হুইলচেয়ারে বসা লোকটি।

"আমি পারবো?" রেগেমেগে বললেন মিনিস্টার। "কিভাবে? কিভাবে তোমার মতো জঘন্য সন্ত্রাসীকে আমি জেল থেকে বের করবো?"

মাথা দোলালো প্যারালাইজড সন্ত্রাসী। হুইলচেয়ারের চাকা ঠেলে একটু সামনে চলে এলো। সরাসরি তাকালো মিনিস্টারের চোখের দিকে।

"ঠিক যেভাবে কয়েক মাস আগে ঐ বাস্টার্ডকে জেল থেকে বের করেছেন..."

ধপাস করে সোফায় বসে পড়লেন মিনিস্টার। এই বাস্টার্ডটা এ খবর জানলো কী করে?

"ভাবছেন আমি কী করে জানলাম?" যেনো মিনিস্টারের মনের কথা পড়ে ফেলেছে সে, মিটি মিটি হাসলো ব্ল্যাক রঞ্জু।

মিনিস্টার স্থিরচোখে চেয়ে রইলেন কেবল।

"আপনার এই জেলখানাটা খুবই অদ্ভুত জায়গা। এখানে সবই পাওয়া যায়। সবই জানা যায়। শুধু টাকা খরচ করতে হয়। একটু থেমে আবার বললো রঞ্জু, "কিভাবে কি জানলাম সেই লম্বা ইতিহাস বলে সময় নষ্ট করবো না।"

মিনিস্টার মাহমুদ খুরশিদ যেনো বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন।

"শুধু জেনে রাখেন, আমি জানি ঐ বাস্টার্ডকে কিভাবে জেল থেকে বের করেছেন। ওকে যেভাবে বের করেছেন আমাকেও সেভাবে বের করুন। এজন্যে আপনাকে খুব বেশি সময় আমি দিতে পারবো না। হয় আমাকে ভালো ট্রিটমেন্ট নিয়ে সুস্থ হতে হবে নয়তো আপনি একটু আগে যা বললেন তাই হবে-ফাঁসির দড়িতে লটকে যাবো। কিন্তু মাঝখান থেকে আপনার ছেলেটা..." নিঃশব্দ হাসি দিলো সে। কুৎসিত আর হিংস্র এক হাসি।

মিনিস্টার তার পিএসের দিকে তাকালেন।

"আমার হারানোর কিছু নেই, মাননীয় মিনিস্টার। এরকম পঙ্গু জীবন বয়ে বেড়ানোর চেয়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে যাওয়াই ভালো। সুতরাং আমাকে কোনো রকম ভয় দেখাবেন

না। ভাববেন না আমি আপনার জেলে আছি, আপনার মুঠোর মধ্যে আছি। মনে রাখবেন, আপনার ছেলেকে শেষ করে দিলেও আমি একবারই ফাঁসিতে ঝুলবো...” কথাটা বলে মিনিস্টারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলো সে।

চোখ বন্ধ করে ফেললেন হোমমিনিস্টার মাহমুদ খুরশিদ।

“কিন্তু আপনার ছেলেটা বেঁচে যেতে পারে...আমিও বেঁচে যেতে পারি। সবটাই এখন নির্ভর করছে আপনার উপর।”

মাহমুদ খুরশিদ ভেবে গেলেন। তিনি বুঝতে পারছেন, এই হারামিটা বাস্টার্ডের মুক্তির ব্যাপারে বিস্তারিত সবই জানে। কিভাবে জানলো কে জানে।

এটা ঠিক যে, বাস্টার্ডকে আইনের ফাঁক গলিয়ে বের করার কাজে এককভাবে তার ভূমিকাই ছিলো বেশি। বাস্টার্ডের পরিচয়টাই তিনি পাল্টে দিয়েছিলেন। এই আইডিয়াটা দিয়েছিলো তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পরামর্শদাতা অমূল্য বাবু। কিন্তু সেটার পেছনে শক্ত কারণও ছিলো। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো তারই জেলেবন্দী স্বামী, আর সেই মিশনটা পুরো বিগড়ে দিয়েছিলো বাস্টার্ড নামের পেশাদার এক খুনি। তিনি নিজেই তো এর ব্যবস্থা করেছিলেন অমূল্য বাবুর সাহায্যে। নির্বাচনে জেতার পর সরকার গঠন করলে বাস্টার্ডকে জেল থেকে বের করার জন্য অমূল্য বাবু প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। তিনি নিজে হোমমিনিস্টার হবার দরুণ কাজটা খুব সহজেই করা সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু এই হারামিটা তো সেই লোক, যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচনের প্রাক্কালে খুন করার মিশনে নেমেছিলো। বাস্টার্ডকে ছেড়ে দেয়া আর তাকে ছেড়ে দেয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

“আহত হয়ে ধরা পড়ার পর আমার জীবনের আর কোনো আশা ছিলো,” বলতে লাগলো ব্ল্যাক রঞ্জু, “আমার আইনজীবি সব খুলে বলেছিলো আমাকে। স্পাইনাল কর্ড ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে আমি পঙ্গু হয়ে গেছি। ভালো চিকিৎসা করাতে পারলে সেরে উঠবো...ডাক্তারও সেরকম কথাই বলেছে, কিন্তু তার জন্য সবার আগে আমাকে জেলখানা থেকে বের হতে হবে। ভালো করেই জানতাম আর কোনোদিন জেলের বাইরে বেরোতে পারবো না। কিন্তু সুযোগটা এনে দিলেন আপনি।”

রঞ্জুর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন মিনিস্টার।

“হ্যাঁ, আপনি।” কথাটা বলে হুইলচেয়ারটা নিয়ে একটু দূরে চলে গেলো। “অনেকগুলো খুনের মামলা থাকার পরও ঐ বাস্টার্ডকে বের করে দিলেন। কিন্তু কিভাবে?” আবারো কুৎসিত হাসি। “অসাধারণ আপনাদের আইডিয়া। প্রথম যখন শুনলাম খুব খারাপ লেগেছিল। ঐ বানচোতটা আমার অনেক ঘনিষ্ঠ লোকজনকে হত্যা করেছে। আর কেউ আমার এতো বড় ক্ষতি করতে পারে নি। সেই খুনি এভাবে বের হয়ে গেলো!”

মিনিস্টার কপালে হাত রেখে মাথা নীচু করে ফেললেন। এসব কথা শুনতে ভালো লাগছে না তার।

“তারপরই বুঝতে পারলাম, আমারও আশা আছে। এই জঘন্য জেলখানা থেকে বের হওয়া সম্ভব। ঠিক যেভাবে ঐ শুয়োরের বাচ্চাটা বের হয়েছে আমিও সেভাবে বের হতে পারি। কিন্তু আমার প্রতি তো আপনাদের সুনজর দেবার কোনো কারণ নেই। তাই ঠিক করলাম, আপনাদেরকে একটু বাধ্য করি।” হা হা করে হেসে উঠলো রঞ্জু।

মিনিস্টার উঠে দাঁড়ালে তার পিএসও উঠে দাঁড়ালো।

“চলে যাচ্ছেন?” মিটিমিটি হেসে জানতে চাইলো রঞ্জু। “আমার দাবিগুলো তো এখনও সব বলি নি...”

“তোমার যা বলার ওকে বলো,” কথাটা বলেই পিএসকে থাকার জন্য ইশারা করে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

পেছন থেকে শুনতে পেলেন রঞ্জু চিৎকার করে বলছে, “মনে রাখবেন, আমার হারানোর কিছু নেই...কিন্তু আপনার আছে!”

মাত্র পনেরো মিনিটের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো, বহু আগেই সেই পনেরো মিনিট শেষ হয়ে গেছে। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এখানে বসে আছে তারা।

সব শোনার পর জেফরি বেগ আর ফারুক আহমেদ চুপ মেরে রইলো কিছুক্ষণ।

"আর তাই তার দাবিমতো কাজ করলেন আপনি?" অবশেষে নীরবতা ভাঙলো জেফরি।

মুখ তুলে তাকালেন মাহমুদ খুরশিদ, তবে কিছু বললেন না।

"একজন হোমমিনিস্টার হিসেবে আপনি এরকম একটা কাজ কিভাবে করলেন, স্যার?"

জেফরির দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলেন মিনিস্টার।

"একটা পঙ্গু সন্ত্রাসীর ভয়ে এভাবে চুপসে গেলেন? আপনার এতো ক্ষমতা, এতো প্রতিপত্তি...সব ঠুনকো হয়ে গেলো?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিনিস্টার। "ওই বদমাশটা পঙ্গু হয়ে জেলে পচে মরছে, ওর তো হারাবার কিছু নেই। কিছুদিনের মধ্যেই ওর ফাঁসি হয়ে যেতো। কিন্তু আমার হারাবার অনেক কিছু আছে, মি: বেগ!"

দু'পাশে মাথা দোলালো জেফরি। একমত হতে পারলো না সে।

"আপনি বিয়ে করেছেন? সন্তান-সন্তুতি আছে?" বেশ শান্তকণ্ঠে জানতে চাইলেন মিনিস্টার।

"না, স্যার।"

"তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না। উনারা বুঝতে পারবেন, হোমিসাইডের মহাপরিচালক আর পিএসের ইঙ্গিত করে বললেন। "একজন বাবা হিসেবে এছাড়া আর কিছু করার ছিলো না।"

"কিন্তু মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবার সময় কী বলেছিলেন, স্যার? ভয়-ভীতি কিংবা রাগ অনুরাগের বশবর্তী না হয়ে..."

চোখ বন্ধ করে ফেললেন মাহমুদ খুরশিদ। "সেটা আমি ভালো করেই। জানি, মি: বেগ।"

"জানেন কিন্তু মানেন না।"

জেফরির এ কথায় মিনিস্টার দু'পাশে মাথা দোলালেন।

"একজন মিনিস্টার হয়ে, জনগণের নেতা হয়ে, তাদের জানমালের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে আপনি এরকম কাজ করতে পারেন না। পিতৃ-মাতৃত্ব এসবের দোহাই দিয়ে আপনি রঞ্জুর মতো জঘন্য এক খুনি-সন্ত্রাসীকে ছেড়ে দিতে পারেন না, স্যার। লোকটা কত মানুষ খুন করেছে, সেটা ভালো করেই জানেন। আপনি এতোটা অসহায় নন যতোটা বোঝাতে চাচ্ছেন। আপনি নিজেই যদি একজন সন্ত্রাসীর কাছে জিম্মি হয়ে যান তাহলে সাধারণ জনগণ কোথায় যাবে?"

"বললাম তো, এছাড়া আমার কিছু করার ছিলো না।"

মাথা দোললো জেফরি। ঘরের সবাই চুপ মেরে গেলে আবার। অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথা বললো। এবার তার কণ্ঠ বেশ শান্ত আর ধীরস্থির।

"অনেক কিছু করার ছিলো আপনার। রঞ্জুকে মুক্তি দিতে, ওর জামিনের ব্যবস্থা করতে কমপক্ষে এক সপ্তাহ লেগেছে, এই এক সপ্তাহের মধ্যে তুর্যকে খুব সহজেই উদ্ধার করা যেতো। আপনার নিজের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীই এটা করতে পারতো। কিন্তু আপনার বোধহয় নিজের বাহিনীর উপরেই আস্থা নেই।"

মিনিস্টার কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে তাকালেন জেফরির দিকে। বহু কষ্টে রাগ দমন করে বললেন, "আমি প্রথমে তাই করতে চেয়েছিলাম কিন্তু...

"কিন্তু কি, স্যার?"

"রঙুর লোকজন কিভাবে যেনো টের পেয়ে গেলো। আমাকে ফোন করে হুমকি

দিলো...মানে তুর্যকে মেরে ফেলার হুমকি।"

"এটা কি করে সম্ভব?" অবাক হয়ে জানতে চাইলো জেফরি বেগ।

"আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। আমার কাছে মনে হচ্ছে রঞ্জুর দলের লোকজন যেনো আমার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা যেনো সব দেখছে।"

মিনিস্টারের এ কথা শুনে জেফরি নিজেও অবাক হলো। "আপনি কি পুরো বাড়িটা সার্চ করিয়েছেন?...মানে আড়িপাতার কোনো ডিভাইস প্লান্ট করা নেই তো?"

মাথা দোলালেন মিনিস্টার। পুরো বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে, সেরকম কিছু পাওয়া যায় নি।"

একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলো জেফরি বেগ, "রঞ্জুর দলের কে ফোন করে যোগাযোগ করে, স্যার?"

মিনিস্টারের হয়ে জবাব দিলো তার পিএস। "তা তো বলতে পারবো না। একেক সময় একেক নাম্বার থেকে কল করে। আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি না...তারাই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে।"

"সব সময় কি একজনই ফোন করে?"

আলী আহমেদ একটু ভাবলো। "মনে হয় একজনই, তবে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।"

কয়েক মুহূর্ত ভেবে গেলো জেফরি বেগ, তারপর জানতে চাইলো, "স্যার...ব্ল্যাক রঞ্জুকে তো ছেড়ে দিলেন...আপনার ছেলেকে তারা মুক্তি দিচ্ছে না কেন?"

মিনিস্টার আর তার পিএস চেয়ে রইলো তার দিকে। সাহায্যের আশায় আলী আহমেদের দিকে তাকালেন মাহমুদ খুরশিদ।

"ওরা তুর্যকে আগামীকাল ছেড়ে দেবে..." আলী আহমেদ বললো।

"আগামীকাল কেন?" নড়েচড়ে উঠলো জেফরি।

পিএস এবং মিনিস্টার দু'জনেই বুঝতে পারছে না কিভাবে কথাটা বলবে।

"আপনি তো রঞ্জুর দাবি মিটিয়েছেন, গতকালই ওকে ছেড়ে দিয়েছেন...তাহলে ওরা কেন তুর্যকে আগামীকাল মুক্তি দেবে?"

মিনিস্টার আর পিএসকে চুপ থাকতে দেখে জেফরি অস্থির হয়ে উঠলো। "প্লিজ, স্যার...আমাকে সব খুলে বলুন। আর কিছু লুকাবেন না। এতে আপনাদেরই ক্ষতি হবে। তুর্যেরও ক্ষতি হয়ে যাবে..."

কথাটা শুনে মিনিস্টার ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

"প্লিজ, স্যার?"

"রঞ্জুর আরেকটা দাবি আছে," পিএস শান্তকণ্ঠে বললো।

"আরেকটা দাবি? সেটা কি?" অস্বস্তিতে পড়ে গেলো মিনিস্টার আর পিএস।

"প্লিজ, বলুন, ব্ল্যাক রঞ্জুর আরেকটা দাবি কি ছিলো?"

অবশেষে মুখ খুললেন মিনিস্টার মাহমুদ খুরশিদ। "ঐ বাস্টার্ডকে তুলে দিতে হবে তার হাতে।

"কি?"

জেফরি বেগ যেনো আকাশ থেকে পড়লো। এসব কী শুনতে পাচ্ছে সে। বাস্টার্ড! এসবের মধ্যে বাস্টার্ডও আছে! পরক্ষণেই বুঝতে পারলো, কেন থাকবে না! জেল থেকে বেরিয়ে রঞ্জু যদি একজন ব্যক্তিকে খুন করতে চায় তাহলে সেটা অবশ্যই বাস্টার্ড।

"কিন্তু সে তো দেশেই নেই। আপনারাই তাকে জামিনে মুক্ত করে বিদেশে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। এখন রঞ্জুর হাতে তাকে কিভাবে তুলে দেবেন?" মিনিস্টার চুপ করে থাকলে জেফরি তাড়া দিলো। "আপনি চুপ করে থাকবেন না, প্লিজ?"

"বাস্টার্ড কোথায় থাকে সেটা আমি জানি," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মিনিস্টার।

"আপনি সেটা জানেন?" জেফরির যেনো বিস্মিত হবার কোনো শেষ নেই। "তার মানে

আপনারাই ওকে বিদেশের মাটিতে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছেন?"

মিনিস্টার কিছু বললেন না।

"এখন আবার তাকে তুলে দিয়েছেন রঞ্জুর হাতে?"

বিব্রত হয়ে পিএসের দিকে তাকালেন মাহমুদ খুরশিদ।

"তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে রঞ্জু ওকে কিভাবে...?" কথাটা শেষ করার আগেই জেফরি বেগ বুঝে গেলো। "রঞ্জু এখন কোথায়? ও কি দেশে আছে নাকি বিদেশে চলে গেছে?"

"আগামীকাল সকালে বিদেশ চলে যাবে...চিকিৎসার জন্য," আস্তে করে বললো পিএস।

"মাইগড!" বিস্ময়ে বলে উঠলো সে।

পিএস তাকালো মিনিস্টারের দিকে।

"সেটা বলা যাবে না," মাহমুদ খুরশিদ বললেন। "অন্তত তুর্য রিলিজ পাওয়ার আগে তো নয়ই..."

"আশ্চর্য!" জেফরি বেগ রাগেক্ষোভে ফুঁসতে লাগলো। "রঞ্জু বিদেশ চলে যাচ্ছে?" মাথা দোলালো দু'পাশে। "আপনি এটা কি করেছেন, স্যার? ও যদি একবার বিদেশ চলে যায় তাহলে তার নাগাল পাবেন?"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন মিনিস্টার।

"তুর্যকে যদি মুক্তি না দেয় তখন কী করবেন?"

"তুর্য কিংবা মিনিস্টারের উপর তো ওর কোনো আক্রোশ নেই," বললো পিএস। "রঞ্জুর শেষ শর্তটা ছিলো বাস্টার্ড নামের খুনিটাকে ওর হাতে তুলে দেয়া। মানে ওর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেয়া।"

"আপনারা তো সেটা করেছেন, তাহলে ওরা তুর্যকে রিলিজ দিচ্ছে না কেন?"

"আগামীকাল রঞ্জু বিদেশ চলে যাবে...বাস্টার্ডের ব্যাপারে আমরা যে তথ্যটা দিয়েছি সেটা সঠিক কিনা নিশ্চিত হবার পরই তুর্যকে ছেড়ে দেয়া হবে।"

মাথা দোলাতে লাগলো জেফরি বেগ। এরকম স্টুপিড লোকজন ক্ষমতার কেন্দ্রে বসে আছে! এদের হাতে আমরা তুলে দিয়েছি কোটি কোটি মানুষের জানমালের নিরাপত্তা? এই গর্দভগুলোকে কতো সহজেই না রঞ্জুর মতো ক্রিমিনাল হাতের মুঠোয় নিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নিচ্ছে। এদের কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই?

জেফরিকে চুপ থাকতে দেখে মিনিস্টার কথা বললেন : "আপনি কিভাবে এসব জানলেন আমি জানি না। এটা আমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকছে। কিন্তু আমি চাইবো তুর্য ছাড়া পাওয়ার আগে আপনি এ ব্যাপারে আর কিছু করবেন না।"

হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর চেয়ে রইলো মিনিস্টারের দিকে। "আজকের সকালের আগেও আমি আপনার ছেলের কিডন্যাপের ব্যাপারে কিছু জানতাম না, স্যার," বললো সে। ফারুক আহমেদ মাথা নেড়ে সায় দিলো। "আমি সেন্ট অগাস্টিনের জুনিয়র ক্লার্ক হাসানের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছি...আপনিও সেটা ভালো করেই জানেন।"

জেফরির শেষ কথাটা শুনে মিনিস্টার মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

"আপনারা অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যালকে চাপ দিয়েছিলেন," জেফরি বেগ এই কথাটা বললো পিএসের দিকে তাকিয়ে। "হাসানের ঘটনায় যেনো কোনোভাবেই তুর্যের নামটা চলে না আসে..."

মিনিস্টার স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ইনভেস্টিগেটরের দিকে, তবে তিনি কিছু বলার আগেই জেফরি আবার বলতে শুরু করলো।

"...অবশ্যই সেটা ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের চাপে পড়েই। তারা হুমকি দিচ্ছিলো, তুর্যের ঘটনা যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে ছেলেটাকে মেরে ফেলা হবে।"

মিনিস্টার উঠে দাঁড়ালে ফারুক আহমেদ আর জেফরি বেগও উঠে দাঁড়ালো। তারা

লক্ষ্য করলো মিনিস্টারের শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে।

"আমার প্রেসার বেড়ে গেছে মনে হয়। খুব খারাপ লাগছে। আমি উপরে চলে যাচ্ছি।" জেফরির দিকে তাকালেন তিনি। "আপনার মতো ইনভেস্টিগেটরের জন্য আমি গর্বিত, মি: বেগ। সবই তো জেনে গেছেন...আমার আর কিছু বলার নেই। শুধু একটা কথা বলবো...এ ব্যাপারে আর কিছু করবেন না। আমি চাই না তীরে এসে তরী ডুবুক। আপনি নিশ্চয় আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন?"

"পুরোপুরি বুঝতে পারি নি, স্যার," সরাসরি বললো জেফরি বেগ।

মিনিস্টার গোল গোল চোখে চেয়ে রইলেন। তার শ্বাসপ্রশ্বাস আরো দ্রুত হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

"এটা কি আপনার অর্ডার নাকি অনুরোধ?"

"আপনার যেটা খুশি ধরে নিন," কথাটা বলেই পিএসের দিকে ফিরলেন তিনি। "তুমি উনাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিও।"

দরজার কাছে থেমে ফিরে তাকালেন জেফরির দিকে।

"আমি হয়তো মিনিস্টার হবার যোগ্যতাই রাখি না। হয়তো এরকম পদে আমার থাকা উচিত নয়..." তারপর মাথা নীচু করে ঘর থেকে চলে গেলেন তিনি।

মিনিস্টার চলে যাবার পর জেফরি বেগ, ফারুক আহমেদ আর পিএস আলী আহমেদ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো।

প্রথমে মুখ খুললো পিএস। "স্যারের অবস্থাটা তো বুঝতেই পারছেন। একমাত্র সন্তান। বিয়ের দশ বছর পর হয়েছে। তাছাড়া উনার স্ত্রীর অবস্থা খুবই খারাপ। ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে রাখা হয়েছে। ছেলেটাকে ফিরে না পেলে উনার যে কী হবে আল্লাহই জানে।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগলো পিএস, "এতো ক্ষমতা থাকার পরও তিনি কতোটা অসহায় হয়ে পড়েছেন, ভাবুন একবার।"

"আমি ভাবতেই পারি নি এরকম ঘটনা ঘটে গেছে," বললো ফারুক আহমেদ। "আমি তো কিছুই জানতাম না। জেফরি আমাকে কিছু বলে নি।"

"স্যার, সেজন্যে আমি সরি..." বললো জেফরি। "আসলে আমি নিজেও জানতাম না। ভেবেছিলাম অগাস্টিনের ক্লার্ক হাসানের খুনের সাথে তুর্য জড়িত। আমি সেদিকেই এগোচ্ছিলাম। আরো শক্ত প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এক পর্যায়ে নিশ্চিত হলে আপনাকে জানাবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কিন্তু হঠাৎ করে রঞ্জুর জামিনের খবরটা শোনার পর সব কিছু পরিস্কার হয়ে ওঠে আমার কাছে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ফারুক আহমেদের ভেতর থেকে। মনে হলো না এ কথায় পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পেরেছে।

"আমি কি কিছু কথা বলতে পারি?" পিএস বললো জেফরিকে।

"জি, বলুন।"

"স্যারের শেষ কথাটা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন?"

মুচকি হাসলো জেফরি বেগ। "অবশ্যই বুঝতে পেরেছি।"

"আশা করি আপনি এসব থেকে বিরত থাকবেন।"

ফারুক আহমেদের দিকে তাকালো জেফরি। হোমিসাইডের মহাপরিচালক বিব্রত হলো। একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের কোনো তদন্তকারীকে এভাবে ডিকটেট করা অশোভন, বিশেষ করে সেটা যখন হোমমিনিস্টারের মতো কেউ করে।

"আমি তো এসবের মধ্যে নেই, মি: আহমেদ।

জেফরির কথাটা শুনে পিএস চেয়ে রইলো তার দিকে।

"প্রথম থেকেই আমি হাসানের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছি, তুর্যের কিডন্যাপ নিয়ে নয়। কিন্তু মার্ডার কেসটা তদন্ত করতে গিয়েই একে একে সব বেরিয়ে এসেছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আলী আহমেদ।

"এখন আপনার মিনিস্টার আর আপনি কি আমাকে সেই তদন্ত কাজ থেকে বিরত থাকতে বলছেন?"

জেফরির দিকে তাকিয়ে থাকলে পিএস।

"যদি সেটা করে থাকেন, তাহলে আমি বলবো, দুঃখিত। আমার কাজ থেকে আমাকে কেউ বিরত রাখতে পারবে না। আপনারা যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু আমি আমার ডিগনিটি হারিয়ে চাকরি করবো না।"

"ব্যাপারটা ডিগনিটির নয়, মি: বেগ," আস্তে করে বললো পিএস। "ইটস অ্যা ম্যাটার অব লাইফ অব অ্যা চাইল্ড..."

"অন্য কারোর সন্তান হলে কি আপনারা তার জন্যে এতোটা করতেন?" মাথা দোলালো সে। "করতেন না। আপনাদের কাছে নিজেদের জীবনের মূল্য যতোটুকু অন্যদের মূল্য তার একশ ভাগের এক ভাগও না।"

পিএস মাথা নীচু করে ফেললো। যেনো জেফরির চোখে চোখ রাখতে পারছে না।

"তাছাড়া যেভাবে আপনারা ব্ল্যাক রঞ্জুর দাবি দাওয়া মিটিয়েছেন তাতে করে মনে হয় না আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হবে..."

পিএস মুখ তুলে তাকালো জেফরির দিকে। "মানে?" ঘাবড়ে গিয়ে বললো পিএস। "আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?"

"ভিডিওতে দেখা গেছে তুর্যের চোখ বাধা ছিলো না," জেফরি বললো। "অথচ তার আশেপাশেই ছিলো কিডন্যাপাররা।"

কথাটা শুনে কিছু বুঝতে পারলো না পিএস। "হ্যাঁ। কিন্তু..."

"এর মানে বুঝতে পারেন নি?"

মাথা দোলালো ভদ্রলোক।

"তুর্য কিডন্যাপারদের চিনে ফেলেছে।"

এখনও বুঝতে পারলো না পিএস।

"এটা কিন্তু খুবই খারাপ কথা, মি: আহমেদ," হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর গুরুগম্ভীর মুখে বললো।

পিএস লোকটা ফারুক আহমেদ আর জেফরির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো বার কয়েক। "কেন?"

"কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি," জেফরি বলতে শুরু করলো, "বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিডন্যাপাররা মুক্তিপন পাবার পরও জিম্মিকে হত্যা করে। এটাই আজকালকার ট্রেন্ড। তার কারণ, যাকে জিম্মি করা হয়েছে সে তাদের মুখ চিনে ফেলে। অনেক কিছু জেনে যায়। আমাদের মিনিস্টারের ছেলেও কিডন্যাপারদের অনেক কিছু জেনে গেছে, তাদের মুখ চিনে ফেলেছে...সুতরাং বুঝতেই পারছেন।"

পিএসের মুখ থমথমে হয়ে গেলো। ভয়ে ঢোঁক গিললো লোকটা।

"বিগত পাঁচ বছরের একটা হিসেব আমার কাছে আছে," ফারুক আহমেদ বললো। "শতকরা ৯০টি কিডন্যাপ কেসে মুক্তিপণ পাবার পরও জিম্মিকে হত্যা করা হয়েছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি বেগ।

"আপনারা মনে করছেন, তুর্যকে মুক্তি দেয়া হবে না?" পিএস উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলো।

"আমি একশ' ভাগ নিশ্চিত, কিডন্যাপাররা তুর্যকে জীবিত অবস্থায় ফেরত দেবে না।" কথাটা বলতে জেফরির খুব খারাপ লাগলো কিন্তু না বলেও পারলো না।

"কী বলছেন?" ভয়ে পিএসের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। "হোমমিনিস্টারের ছেলেকে খুন করার মতো সাহস দেখাবে ওরা??"

"তারা এখন পর্যন্ত যা করেছে তারপর আপনি এ কথা কি করে বলেন, মি: আহমেদ?"

জেফরির কথাটা শুনে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো পিএস।

"এখন অপেক্ষা করে দেখুন কী হয়।"

ঘরের মধ্যে অসহ্য এক নীরবতা নেমে এলো। অনেকক্ষণ ধরে কেউ কথা বললো না।

পিএস মাথা নীচু করে রাখলো বেশ দীর্ঘক্ষণ। তারপর মুখ তুলে তাকালো। প্রায় ম্রিয়মান কণ্ঠে জানতে চাইলো সে, "আপনি কি স্যারের অনুরোধটা রাখবেন না?"

"আগেই বলেছি, আমি তুর্যের কেসটা নিয়ে কাজ করছি না। ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের যে লোকটা তুর্যকে কিডন্যাপ করার আগে হাসানকে খুন করেছে, আমার সহকর্মী জামানকে গুলি করেছে..." একটু চুপ করে আবার বললো সে, "এমন কি আমাকেও গুলি করেছে... তার সম্পর্কে আমার কাছে যথেষ্ট তথ্য আছে, তার ছবিও আমরা তৈরি করেছি। আমার ধারনা ওকে ট্র্যাক-ডাউন করতে পারলেই জানা যাবে তুর্যকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু সে সময় আমি পাবো কিনা জানি না। তবে হাসানের কেসটা নিয়ে আমি থেমে থাকবো না। এটা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি।"

পিএস একটু ভেবে নিলো। "আপনি আমার ফোন নাম্বারটা রাখুন। যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে পারেন আমাকে জানাবেন। আমি আপনাকে সর্বোচ্চ সাহায্য করার চেষ্টা করবো। স্যারকে নিয়ে ভাববেন না। উনাকে আমি ম্যানেজ করবো।"

পিএসের ফোন নাম্বারটা নিয়ে নিলো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর। "আগামীকাল তুর্যকে মুক্তি দিলো কি না দিলো সে খবরটা আমাকে জানালে খুব খুশি হবো," বললো জেফরি বেগ।

"ঠিক আছে, আমি জানাবো।"

জেফরি বেগ আর ফারুক আহমেদ হোমমিনিস্টারের বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতেই পিএস আলী হোসেন তাদের পেছন পেছন চলে এলো বাড়ির সামনে খোলা লনের কাছে। চেয়ে দেখলো ড্রাইভওয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। ডান দিকে তাকিয়ে হাত তুলে একজনকে ইশারা করলো সে।

লনের শেষমাথায় একটা বৈঠকখানার মতো আছে, সেটার বারান্দা থেকে নেমে এলো এক লোক।

গাড়িতে বসে আছে জেফরি আর তার বস্ ফারুক আহমেদ। রাত প্রায় আটটা বাজে। হোমমিনিস্টারের বাড়ি থেকে ফিরছে তারা। পনেরো মিনিটের মিটিংটা দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলেছে।

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ফারুক আহমেদ।

উদাস হয়ে ভাবতে লাগলো জেফরি বেগ। বাস্টার্ড কোথায় আছে সেটা মিনিস্টার জানে। এখন সেই তথ্যটা রঞ্জুর হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি। নিজের ছেলেকে বাঁচানোর জন্য এমন একজনকে বলি দিয়েছেন যার কারণে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেঁচে আছেন, নির্বাচনে জয় লাভ করে সরকার গঠন করেছেন, আর মাহমুদ খুরশিদের মতো দুর্বল চরিত্রের লোকেরা হোমমিনিস্টার হতে পেরেছেন।

জেফরির মনে পড়ে গেলো বাংলায় একটা শব্দ আছে : কৃতঘ্ন। স্কুলের পাঠ্যবইয়ে তারা পড়েছিলো। এর অর্থ, উপকারীর ক্ষতি করে যে লোক। চমৎকার! বহুকাল আগে থেকেই হয়তো এই জনপদে এরকম লোকজনের দেখা মিলতো।

কোথায় যেনো পড়েছিলো, রাজনীতিকদের বিশ্বাস করলে তুমি ঠকবে, কিন্তু তাদেরকে উপকার করলে তোমার জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

কথাটা একদম সত্যি।

তার বস্ ফারুক আহমেদকে বাসায় ড্রপ করে তাকেও তার বাড়িতে নামিয়ে দেবে অফিসের এই গাড়িটা।

রাগেক্ষোভে জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকালো সে।

হঠাৎ করেই তুর্য নামের বখে যাওয়া ছেলেটার জন্য খুব মায়া হলো তার। এমনকি বাস্টার্ড নামের খুনিটার জন্যেও তার মধ্যে উৎকণ্ঠা তৈরি হলো বলে একটু অবাকই হলো।

সম্পূর্ন ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন ধরণের দুটো মানুষের জীবন আজ হুমকির মুখে। তাদেরকে রক্ষা করার মতো কোনো উপায়ই নেই।

যদি এরকম কোনো উপায় থাকতো তাহলে কি জেফরি বেগ চেষ্টা করে দেখতো? এই দু'জনের জীবন বাঁচানোর জন্য সে কি কোনো পদক্ষেপ নিতো?

জেফরি নিশ্চিত করেই জানে, অবশ্যই চেষ্টার কোনো ত্রুটি করতে না সে।

"একটা সত্যি কথা বলবে?"

ফারুক আহমেদের কথায় ফিরে তাকালো জেফরি বেগ। "বলুন, স্যার।"

"শুধুই কি ব্ল্যাক রঞ্জুর জামিনে বেরিয়ে আসার খবরটা জানার পর তুমি এটা বুঝতে পেরেছো?...মানে, হোমমিনিস্টারের ছেলেকে ওরা কিডন্যাপ করেছে?"

একটু চুপ করে থেকে বললো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর, "না, স্যার।"

"তাহলে এটা কিভাবে জানলে?"

"আমি ফোন ট্যাপ করেছিলাম," আস্তে করে বললো সে।

"কি!" যারপরনাই বিস্মিত হলো ফারুক আহমেদ। "তুমি হোমমিনিস্টারের ফোন ট্যাপ করেছো??"

"না, স্যার।"

"তাহলে?"

"আমি সেন্ট অগাস্টিনের প্রিন্সিপ্যাল অরুণ রোজারিওর ফোন ট্যাপ করেছিলাম..."

"ওই লোকের ফোন ট্যাপ করে তুমি এসব জেনেছো?"

"উনার ফোনে হোমমিনিস্টারের বাড়ি থেকে ফোন করা হয়েছিলো। সেখান থেকে অনেক কিছু জানতে পারি।"

"মিনিস্টার ফোন করেছিলেন ঐ প্রিন্সিপ্যালকে?" বিস্ময়ে জানতে চাইলো ফারুক আহমেদ।

"প্রথমে তাই ভেবেছিলাম কিন্তু..."

“কিন্তু কি?”

“এখন আমি নিশ্চিত, ফোনকলটা আলী আহমেদ করেছিলেন। ভদ্রলোকের কণ্ঠ শুনে বুঝতে পেরেছি।”

“তাহলে ঐ পিএসের ফোন কল থেকে তুমি এটা বুঝতে পারলে?”

“ঠিক তাও নয়। উনার সাথে প্রিন্সিপ্যালের কথাবার্তা থেকে জানতে পেরেছিলাম হাসানের হত্যাকাণ্ডে তুর্যের নামটা যেনো চলে না আসে। উনি প্রিন্সিপ্যালকে চাপ দিচ্ছিলেন।” জেফরি একটু থেমে তার বসের দিকে তাকালো। আমি আসলে তুর্যের অবস্থান জানার জন্য মিনিস্টারের ওয়াইফের ফোন ট্যাপ করার সিদ্ধান্ত নেই। সেখান থেকেই পুরো ব্যাপারটা জানি।”

হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলো ফারুক আহমেদ।

“মিনিস্টারের ওয়াইফের ফোন ট্যাপ করাটা নিশ্চয় বেআইনী নয়?”

“মাইগড! তুমি করেছো কি!” অস্ফুটস্বরে বললো হোমিসাইডের মহাপরিচালক।

“ইনভেস্টিগেশন করতে গেলে কখনও কখনও একটু দুঃসাহসী হতে হয়, স্যার!” কথাটা বলেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো জেফরি বেগ।

ফারুক আহমেদ তার প্রিয়পাত্রের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখটা সরিয়ে নিলো।

গড়িটা এখন পিজি হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালটি চোখে পড়তেই জেফরির মাথায় একটা ভাবনা খেলে গেলো।

একটা নাম। তারপরই উঁকি দিলো একটা সম্ভাবনা।

সঙ্গে সঙ্গে জেফরি সিদ্ধান্ত নিলো আগামীকাল সকালে অফিসে যাওয়ার আগে এই হাসপাতালে আসবে।

তুর্যকে বাঁচানোর একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা এখনও রয়েছে। কিন্তু তার আগে ঐ পেশাদার খুনি বাবলু, অর্থাৎ বাস্টার্ডকে বাঁচাতে হবে।

তুর্যের বেঁচে থাকার যদি কোনো সম্ভাবনা থেকে থাকে তাহলে সেটা পুরোপুরি নির্ভর করছে বাস্টার্ডের উপর।

একমাত্র বাস্টার্ডই পারে তুর্যকে বাঁচাতে।

অধ্যায় ৬০

ছোট্ট একটা ঘরে আজ কয়দিন ধরে বন্দী হয়ে আছে বুঝতে পারলো না তুর্য। সব সময় হাত আর মুখ বেধে রাখা হয়। এভাবে অন্ধকার ঘরে দিনের পর দিন পড়ে থাকা যে কী ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা সেটা কেউ বুঝতে পারবে না। যখনই দরজা খুলে লোকগুলো তার ঘরে ঢোকে তখনই মৃত্যুর বিভীষিকা তাকে গ্রাস করে। অসাড় হয়ে আসে হাত-পা।

ভয়ঙ্কর লোকগুলো তাকে নিয়ে কী করতে চাচ্ছে সেটা তার কাছে একদম স্পষ্ট নয়। হোমমিনিস্টারের ছেলে সে, তার বাবার অগাধ ক্ষমতা, তারপরও এই লোকগুলো তাকে দিনের পর দিন আটকে রেখেছে অথচ তার বাবা কিছুই করছে না! বাবার উপর খুব রাগ হলো তার। ইচ্ছে করলে চিৎকার করে কাঁদবে, কিন্তু কান্না চেপে রাখলো। ভয়ঙ্কর লোকগুলো কান্নাকাটি করলে ঠিকমতো খেতে দেয় না। বিশেষ করে চাপদাড়িওয়ালা লোকটা কথায় কথায় তাকে চড়-থাপ্পড় মারে। সাকার্সের পশুদের যেভাবে চাবুক পেটা করে বশ মানানো হয় তাকেও ঠিক সেভাবে রেখেছে।

এ কয়দিনে গোসল করা হয় নি, শরীর থেকে বোটকা গন্ধ বের হচ্ছে। শীতের দিনে কয়েক ঘণ্টা জুতা-মোজা পরে থাকলে যেখানে উটকো গন্ধ বের হতে থাকে সেখানে আজ কয়দিন ধরে যে গোসল করতে পারে নি তারও কোনো হিসেব নেই।

যে ঘরে বন্দী হয়ে আছে সেটার জানালাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়েছে। খালি ঘরে সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমিয়ে থাকে একটা তোষকের উপর। মাঝেমধ্যে দু'তিনজন লোক এসে তাকে ঘরের এককোণে রাখা একটা চেয়ারে বসায় হাত-পা বেধে, তারপর টেবিলের উপর ল্যাপটপ চালিয়ে তার ভিডিও করে। লোকগুলো যেভাবে বলে ঠিক সেভাবেই তাকে কথা বলতে হয়। না করতে চাইলে চড় থাপ্পর কিলঘুষি জোটে, আর এ কাজটা সব সময় করে চাপদাড়িওয়ালা বদমাশ লোকটা।

সেন্ট অগাস্টিন থেকে তাকে ধরে আনার পর কয় দিন কেটে গেছে হিসেব করার চেষ্টা করলো আবার। পাঁচ দিন? ছয় দিন? নাকি এক সপ্তাহ? কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলো না।

আগে যেখানে চার বেলা খাবার খেতো এখন সেখানে মাত্র দু'বেলা খাবার দেয়া হচ্ছে তাকে। তার ধারণা শরীরের ওজনও অনেক কমে গেছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় পুরো ঘরটা দুলে উঠছে। ভূমিকম্প? প্রথম যখন টের পেলো তখন খুব ভয় পেয়েছিলো। কিন্তু এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তার ধারণা ঘরটা আসলে দোলে না, ক্ষিদের চোটে তার মাথা ঘোরায়।

প্রতিদিন তাকে একটা করে ইনজেকশন দেয়া হয় আর তারপরই ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। কততক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে সেটাও জানে না। ঘুম থেকে উঠলে কিছু খেতে দেয়া হয়। একেবারে যাচ্ছেতাই খাবার। তার বাড়ির চাকর-বাকরেরাও এরচেয়ে ভালো খাবার খায়।

ইনজেকশনের প্রভাব কেটে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেলেও আজ সে শব্দ করে নি। ভয়ঙ্কর লোকগুলোও আজ তার ঘরে ঢুকে উঁকি মারে নি। তাদের সাড়াশব্দও পাচ্ছে না। তারা হয়তো আশেপাশে নেই।

লোকগুলো শেষ পর্যন্ত তার সাথে কী করবে সে জানে না। তাদের ভাবভঙ্গি দেখলে তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। তাকে মেরে ফেলবে? কথাটা ভাবতেই ভয়ে তার গা কাটা দিয়ে উঠলো। বুক ফেটে কান্না বের হতে চাইলেও জোর করে আটকে রাখলো তুর্য।

আব্বু...আম্মু...আমাকে বাঁচাও!

বানরের গাড়িটা ঢুকতেই পুরো মহল্লায় হৈচৈ শুরু হয়ে গেলো। আতঙ্কিত বাসিন্দারা ছাদ থেকে ছাদে, রাস্তা থেকে ল্যাম্পপোস্টে, বাড়ির কার্নিশ থেকে লাফিয়ে চলে গেলো যে যেদিকে পারে।

একটু নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে অপেক্ষাকৃত সাহসী আর মুরুব্বি টাইপের 'বাসিন্দারা থমকে দাঁড়িয়ে ভুরু কুচকে দেখার চেষ্টা করছে পরিস্থিতি। হয়তো নিশ্চিত হতে চাইছে, এটাই বানরের গাড়ি কিনা।

দুদিন ধরে জ্বরের ঘোরে পড়েছিলো বাবলু। তাকে দেখার মতো কেউ নেই এখানে। একা একা দুটো দিন ঘরের মধ্যেই কাটিয়ে দিয়েছে। আজ সকালে ঘুম ভাঙতেই টের পেলো ভালো বোধ করছে। হৈচৈয়ের শব্দে ঘুম ভাঙার পর থেকে তার ঘরে জানালার সামনে বসে এসব দেখে যাচ্ছে সে।

এই বানরের গাড়িটা এলেই মহল্লায় এমন দৃশ্যের অবতাড়না হয়। পুরো এলাকাটি প্রাণচাঞ্চল্য খুঁজে পায় যেনো। নইলে, বাকি সময়টাতে এখানকার সত্যিকারের বাসিন্দারা নির্জীব-নিষ্প্রাণ জীবনযাপনেই অভ্যস্ত।

বাবলুর ঘরটা তিন তলার উপর একটি চিলেকোঠা। নীচে একটা বইয়ের লাইব্রেরি আছে। দোতলা আর তিনতলা একটি কসমেটিকসের গোডাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তার বিল্ডিংয়ের আশেপাশের বাড়িগুলো একতলা নয়তো দোতলা। ফলে তার ঘরের চারদিকে বিশাল বড় বড় চারটি জানালা দিয়ে যথেষ্ট আলো বাতাসের আনাগোনা। বাড়িটার দু'দিকে এল আকৃতির দুটো রাস্তা চলে গেছে। জানালা দিয়ে সেসব রাস্তার দৃশ্যও দেখা যায়। এখানে আসার পর থেকে জানালার পাশে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তার কর্মকাণ্ড দেখা তার অবসরের একমাত্র বিনোদন হয়ে উঠেছে। আর অবসর নামক জিনিসটা এখন তার দিনমান জুড়েই বিরাজ করে।

বানরের গাড়িটা ঠিক তার বাড়ির নীচে এসে থামলো। ড্রাইভারের পাশে যে লোকটা বসে আছে উপর থেকে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু বাবলু জানে ওখানে কে বসে আছে।

দরজা খুলে নেমে এলো চল্লিশ বছরের হ্যাংলা মতো দেখতে এক লোক। ছোটো করে চুল ছাটা, মুখে পাতলা গোঁফ, গায়ের রঙ গাঢ় শ্যামবর্ণ। পান। চিবোচ্ছে সে। হাতে একটা বেত।

আশেপাশে চোখ বুলিয়ে সোজা তাকালো উপরের দিকে। বাবলুর সাথে চোখাচোখি হতেই হাত তুলে সালাম জানালে বাবলুও তার জবাব দিলো।

"ক্যায়সে হায়, তওফিক ভাই?" চিৎকার করে হিন্দিতে বললো লোকটা।

"থি তো হাম বুড়া, লেকিন আপকো দেখুকার সব কুছ আচ্ছা হো গায়া," নিখুঁত হিন্দিতে বললো সে। এ কয়েক মাসে ভাষাটা বেশ রপ্ত করে ফেলেছে।

পান খাওয়া লালচে দাঁত বের করে হাসি দিলো রমেশ মিশ্রা।

বাবলুর সাথে রমেশের বেশ সখ্যতা তৈরি হয়ে গেছে এই অল্প কদিনেই। কাজ ছাড়াও মাঝেমধ্যে আড্ডা মারতে চলে আসে।

বাবলু এখানে তওফিক নামে পরিচিতি। তার আসল পরিচয় বাংলাদেশের দূতাবাসের মাত্র দুজন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জানে না।

অমূল্য বাবুর চাপাচাপিতেই নতুন সরকারের হোমমিনিস্টার তাকে জেল থেকে মুক্তি দিতে অনেকটা বাধ্য হয়। এই মিনিস্টার লোকটাই মি: টেন পার্সেন্টের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য তাকে লেলিয়ে দেয় ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের পেছনে।

রঞ্জুর গুলির আঘাতে আরেকটুর জন্য তার ভবের লীলা সাঙ্গ হতে বসেছিলো। জেলে ঢোকার সাথে সাথেই অমূল্য বাবু তার উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন পর্দার আড়াল থেকে। নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে বাবু আর দেরি করেন নি। এক জাঁদরেল উকিল নিয়োগ করেন। সেই উকিল আদালতে প্রমাণ করে সে অন্য একজন ব্যক্তি-পেশাদার খুনি বাস্টার্ড

নয়। ভুল করে তাকে ধরা হয়েছে। বাবলুর ধারণা, এটা অমূল্য বাবুর আইডিয়া।

যাইহোক, জামিনে মুক্ত হতেই অমূল্য বাবু তাকে কিছুদিনের জন্য বিদেশে চলে যেতে বলে। প্রথমে সে রাজি ছিলো না। কিন্তু বাবু তাকে বোঝাতে সক্ষম হন, ইনভেস্টিগেটর মি: বেগ তার পিছু ছাড়বে না। লোকটা নাকি তার জামিন লাভের কথা শুনে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো। তাছাড়া মামলাগুলো পুরোপুরি তুলে নেবার আগে তার একটু দূরে থাকাই ভালো।

অবশেষে বাবলু রাজি হয়। তবে খুব বেশি দূরে যেতে চায় নি। কেন যেতে চায় নি সেটা অবশ্য অমূল্য বাবুকে বলে নি। কারণটা ছিলো উমা। ভারতে থাকলে খুব সহজেই বর্ডার পাড়ি দিয়ে দেশে আসা যাবে-উমার সাথে দেখা করা যাবে মাঝেমধ্যে।

বাবু অবশ্য এ নিয়ে আপত্তি করে নি। কোলকাতায় তার থাকাটা নিরাপদ হবে না, কারণ ওখানে ব্ল্যাক রঞ্জুর অনেক কন্ট্যাক্ট আছে, সুতরাং দিল্লিতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

এখানে থাকার সমস্ত আয়োজন অমূল্য বাবুই করেন হোমমিনিস্টারের মাধ্যমে। বাংলাদেশের দূতাবাসের এক উর্ধতন কর্মকর্তা কারোলবাগের এই বাড়িটি ভাড়া করে দেয় তার থাকার জন্য। এখানকার যাবতীয় ব্যয় বহন করছে দূতাবাস। সত্যি বলতে কি, তাকে দূতাবাসের একটি ছোটোখাটো পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে পুরো ব্যাপারটি আড়াল করার জন্য। যদিও টাকা নামক জিনিসটা তার কাছে বেশ ভালো পরিমাণেই আছে তারপরও দিল্লিতে যতো দিন থাকবে তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে অমূল্য বাবু আর হোমমিনিস্টার।

তাকে আশ্বস্ত করা হয়েছে, আর মাত্র দু'তিন মাস পরই দেশে ফিরতে পারবে সে। নতুন সরকার আগের সরকারের করা অসংখ্য মামলা প্রত্যাহারের কাজ সবে শুরু করেছে। আশা করা যাচ্ছে, খুব জলদিই সবকটি মামলা থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। তখন সে মুক্ত মানুষ হিসেবে দেশে ফিরে যাবে। উমাকে নিয়ে সংসার পাতবে। দিল্লির অধ্যায় খুব দ্রুতই শেষ হতে যাচ্ছে তার জন্য।

ভারতের রাজধানীর দিল্লির এই আবাসিক এলাকাটির নাম কারোলবাগ। এখানেই দিল্লিবাসীর নতুন গর্ব মেট্রো রেলের সেন্ট্রাল স্টেশন। কাছেই বড় বড় অসংখ্য শপিংমল আর বেশ কিছু আবাসিক হোটেল।

কারোলবাগ এলাকাটি বেশ অভিজাত তা বলা যাবে না। তবে এটা পুরনো দিল্লির মতো ঘিঞ্জি এলাকা নয়, আবার নতুন দিল্লির আবাসিক এলাকার মতো পশ এরিয়াও বলা যাবে না একে।

অপেক্ষাকৃত পুরনো এই এলাকাটি বেশ ছিমছাম আর চমৎকার। বেশ কয়েকটি মহল্লা নিয়ে তৈরি হয়েছে এই আবাসিক এলাকাটি। বাড়িগুলো গায়ে গায়ে লেগে না থাকলেও রাস্তাগুলো বেশ সরু। দিল্লির পুরনো বাসিন্দারাই মূলত এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবে এ ব্যাপারে বাবলু নিশ্চিত নয়। আরেকদল 'বাসিন্দা' আছে পুরো মহল্লায়। বাবলুর ধারণা তারাই এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী। রমেশ আর তার গাব্বার-বাসন্তি জুটি হলো এদের বড় শত্রু।

পরিহাসের বিষয় হলো, বানর দুটোর নাম যে জনপ্রিয় সিনেমা থেকে নেয়া হয়েছে সেখানে বাসন্তি নায়িকা হলেও গাব্বার কিন্তু তার নায়ক ছিলো না। সে ছিলো খলনায়ক।

রমেশ কাজ করে দিল্লির মিউনিসিপ্যালিটিতে। তার পদবীর চেয়ে কাজটা অনেক বেশি অদ্ভুত-দুটো প্রশিক্ষিত বানরের কেয়ারটেকার। গাব্বার আর বাসন্তি নামের দুটো বড় বড় হুলো বানরের ওস্তাদ সে। তার কথায় এরা দু'জন ওঠে আর বসে।

বানরের গাড়ি থেকে গাব্বার আর বাসন্তিকে বের করে আনলো রমেশ। কাজে নামার আগে দুটো কলা খেতে দিলো তাদেরকে। গপাগপ সাবাড় করে দিলো কলা দুটো। বাবলুর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রমেশ আবারো হাসলো, তারপর হাক দিলো : "গাব্বার! বাসন্তি! তওফিক ভাই কে স্যালুট কার..."

সঙ্গে সঙ্গে গাব্বার আর বাসন্তি চমকে উপরের দিকে তাকালো। বাবলুকে দেখামাত্রই

মিলিটারি স্টাইলে সেলুট দিলো প্রশিক্ষিত বানর দুটো।

বাবলু হেসে সেলুটের জবাব দিলো।

রমেশ এবার আশেপাশে বাড়িঘরের ছাদে তাকালো। এখনও দূর থেকে অনেক বানর ভীতসন্ত্রস্ত চোখে চেয়ে আছে তাদের দিকে। তুড়ি বাজালো রমেশ। বানর দুটোকে তাড়া দিয়ে বললো, "কাম্ পে লাগ যা! কাম্ পে লাগ যা!"

গাব্বার আর বাসন্তি দাঁত বের করে অদ্ভুত এক শব্দ করতে করতে ছুটে গেলো গলির দুদিকে। আশেপাশে শুরু হয়ে গেলো কানফাটা হৈচৈ। বিভিন্ন বাড়ির ছাদে যেসব বানরের দল জড়ো হয়েছিলো তারা নিজেদের বীরত্ব ভুলে যে যেদিকে পারলো কাপুরুষের মতো পালাতে শুরু করলো।

ল্যাম্পপোস্ট বেয়ে গাব্বার আর বাসন্তি উঠে পড়লো বাসা বাড়ির ছাদে। তাদের ভাবভঙ্গি মারাত্মক রকমেরই আগ্রাসী। আক্রমণের ভঙ্গিতে ছুটে গেলো পশ্চাদধাবন করা বানরের দলের দিকে।

যথারীতি বাবলু দেখতে পেলো মাত্র দুটো বানরের ভয়ে পুরো মহল্লার সব বানর কিভাবে লেজ গুটিয়ে প্রাণপণে পালাতে শুরু করছে। এক সপ্তাহের মধ্যে আর নিজ এলাকায় ফিরে আসবে না বানরের দলটি।

পনেরো মিনিটের অভিযান সফলতার সাথে শেষ করে বীরদর্পে ফিরে এলো গাব্বার আর বাসন্তি। রমেশ তাদের জন্য অনেকগুলো কলা খেতে দিলে বিজয়ী সেনানায়কের মতো গুরুগম্ভীর ভাব নিয়ে কলা খেতে শুরু করলো প্রাণী দুটো।

পুরনো ঢাকার অনেক মহল্লার মতো দিল্লির অনেক এলাকায়ই অযাচিত বাসিন্দা হিসেবে অসংখ্য বানরের দেখা পাওয়া যায়। শত শত বছর ধরেই এরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে বসবাস করে আসছে। মাঝেমধ্যে খাবার চুরি করা, শুকাতে দেয়া জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলার মতো ঘটনা ঘটলেও এখানকার বাসিন্দারা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রায়ই তাদের সংখ্যা বেড়ে যায়। অধিকহারে প্রজননের ফলে নয়তো আশেপাশের এলাকা থেকে খাবারের সন্ধানে আসা বানরের কারণে এই সংখ্যাটা ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে গেলে বানরের উৎপাতও বেড়ে যায়। এলাকার লোকজন খুব দ্রুতই অতীষ্ঠ হয়ে পড়ে। ছোটো ছোটো বাচ্চারা বাইরে বেরোতে পর্যন্ত পারে না। খাবার কেড়ে নেয়ার মতো ঘটনা ঘটতে থাকে অহরহ। একে ওকে খামচে দেয়া, দল বেধে লোকজনকে দাবড়ানো যেনো বানরের দলের জন্য বিনোদন হয়ে ওঠে।

এলাকার লোকজন ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা জানালে রমেশের ডাক পড়ে। বানর তাড়ানোর জন্যে সে ছুটে আসে দু দুটো প্রশিক্ষিত বানর নিয়ে। আকারে এবং স্বভাবে এরা মহল্লার বানরগুলোর চেয়ে অনেক বেশি বড় আর আগ্রাসী।

মজার কথা হলো, এই প্রশিক্ষিত বানর দুটো রমেশের মতোই দিল্লি মিউনিসিপ্যালের কর্মচারি! কথাটা একদম সত্যি। তাদের পদবী আছে, বেতন ভাতাও রয়েছে।

রমেশ ঠাট্টা করে বলে, এরা হলো ভারত সরকারের নতুন বুরোক্র্যাট!

তবে দিল্লির বাসিন্দারা অন্য বুরোক্র্যাটদের চাইতে এই নতুন বুরোক্র্যাট দুটোকে বেশি পছন্দ করে। কারণটা খুব সহজ : এসিরুমে অফিস করা, সুট টাই পরা বুরোক্র্যাটরা সরাসরি কোন উপকারে আসে তা নিয়ে সবার সন্দেহ থাকলেও গাব্বার আর বাসন্তির সার্ভিস নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।

কিছু মহিলা বাসা থেকে খাবার-দাবার নিয়ে এসে রমেশের হাতে তুলে দিলো গাব্বার আর বাসন্তিকে দেবার জন্য। খাবার পেয়ে প্রাণী দুটো মানুষের ভঙ্গিতে সেলুট জানালো মহিলাদেরকে। সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে জড়ো হওয়া মানুষ হাত তালি দিয়ে উঠলো।

বানর দুটোর ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেললো বাবলু। যখনই বানর পর্যবেক্ষণ করে তখনই তার মনে হয়, চার্লস ডারউইন বোধহয় সঠিকভাবেই মানুষের পূর্বপুরুষদের চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন।

ঘড়িতে দেখলো ৯টা বাজে। তার মানে দেশে এখন সাড়ে নয়টা। উমা তার কাজে চলে গেছে। তার ডিউটি শুরু হয় সকাল আটটা থেকে। খুব ইচ্ছে করছে উমাকে ফোন করতে কিন্তু তার ফোনে ব্যালান্স নেই। দুদিন ধরে জ্বরের কারণে বাইরে গিয়ে ব্যালান্স ভরারও সুযোগ পায় নি। নাস্তা করে ব্যালান্স ভরে নেবে তারপর সন্ধ্যার পর উমা ডিউটি শেষ করে বাসায় ফিরলে ফোন করবে তাকে।

আজ দু'দিন ধরে মেয়েটার সাথে তার যোগাযোগ নেই। হয়তো খুব দুশ্চিন্তা করছে। তাকে নিয়ে ভাবার মতো লোক পৃথিবীতে এখন ওই একজনই আছে।

বাবলু টের পেলো খুব খিদে পেয়েছে। দু'দিন ধরে ঘরে থাকা দুধ আর পাউরুটি খেয়েছে। তার ঘরেই ছোট্ট মাইক্রোওভেনে গরম করে নিয়েছে সেগুলো।

ঘরটার দিকে তাকালো। যাচ্ছেতাই অবস্থা। সব এলোমেলো হয়ে আছে। ঠিক করলো আজ দিল্লির সবচাইতে প্রসিদ্ধ রেস্তোরাঁ করিম-এ নাস্তা করবে। ইচ্ছেমতো কাবাব আর পরোটা খাবে। শরীরটা খুব দুর্বল হয়ে গেছে জ্বরের কারণে।

বাথরুমে ঢুকে পড়লো বাবলু।

সকালে হাসপাতালে এসে রুটিনমাফিক কিছু কাজ করে ক্যান্টিনে গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে এলো উমা। চার তলায় উঠে সুদীর্ঘ করিডোর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এখন। গত দু'দিন ধরে বাবলুর কোনো ফোন পায় নি। অথচ বিদেশ চলে যাবার পর কয়েক দিন আগে যখন হুট করে একদিন হাজির হলো, তার পরের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একসাথে এক ঘরে কাটালো, সেই ঘটনার পর থেকে বাবলু তাকে নিয়মিত প্রতিদিনই ফোন করে আসছে। ইদানিং ছুটির দিনগুলোতে ভিডিও চ্যাটিংও করে তারা।

তাহলে কি তার শরীর খারাপ? হতে পারে। বিদেশে একা একা আছে। জ্বরটর হলে তাকে দেখার মতো কেউ থাকবে না। বাবলুই তাকে সব সময় ফোন করে, তবে এর আগে মাত্র একবার বাবলুকে ফোন করেছিলো সে। বাবলু আচমকা দেশে আসার পরের ঘটনা সেটি। তার মনটা খুব খারাপ ছিলো। মা-বাবা বিয়ের জন্য খুব চাপ দিচ্ছিলো তখন। সে ভেবে পাচ্ছিলো না কী করবে। তখন নিজে থেকেই বাবলুকে সে ফোন করে। খুব অবাক হয়েছিলো বাবলু। কিছুটা ভয়ও পেয়ে গেছিলো তার ফোন পেয়ে।

মনে মনে ঠিক করলো আজ বিকেলের পর, বাসায় ফেরার পথে বাবলুকে ফোন করবে।

উমা প্রায়ই আশায় থাকে, হয়তো আবারো বাবলু হুট করে হাজির হবে তার সামনে। তাকে সারপ্রাইজ দেবে। ভালোবাসার তীব্রতা নিয়ে কাটিয়ে দেবে সারাটা দিন।

মুচকি হাসলো সে। ভালো করেই জানে, এটা খুব সহসা ঘটবে না। তবে সে জানে, বাবলু নিজেও তার মতোই ব্যাকুল। তাদের মধ্যে শারিরীক মিলন হবার পর থেকে বাবলুর মধ্যে যেনো ব্যাকুলতা আরো বেড়ে গেছে। এখন সে প্রতিদিনই কথা বলতে চায়, তাকে পেতে চায়। তার সঙ্গে সময় কাটাতে চায়।

উমা হেসে ফেললো। বাবলুর মধ্যে এতো তীব্র ভালোবাসা আছে সেটা কি অন্য কেউ বিশ্বাস করবে?

হঠাৎ দূরে, একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন করিডোর দিয়ে একজনকে আসতে দেখে তার গা ছমছম করে উঠলো।

বাবলু!

ভালো করে তাকালো। চেহারাটা এবার দৃষ্টির গোচরে এলে থমকে দাঁড়ালো সে।

"কেমন আছেন?"

জেফরি বেগের প্রশ্নটা শুনে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো উমা। "আপনি?"

"অবাক হয়েছেন?" বললো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর।

উমা কোনো জবাব দিলো না। তার মনে আশংকা, কিছু দিন আগে বাবলু যে দেশে এসে তার সাথে দেখা করে গেছে সে খবর হয়তো এই লোকটা জেনে গেছে। এখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছে। কিন্তু উমা দৃঢ়প্রতীজ্ঞ, সে একটুও মুখ খুলবে না।

"আপনি আমার কাছে এসেছেন?" জানতে চাইলো উমা।

"হ্যাঁ।"

"কি জন্যে?"

"বলছি, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলবো?" একটু থেমে আবার বললো সে, "কোথাও বসতে পারি আমরা?"।

একটু ভেবে নিলো উমা। এই লোকের সাথে যতো বেশি কথা বলবে ততোই বিপদ। "আসলে আমি ডিউটিতে আছি...বুঝতেই পারছেন। যা বলার এখানেই বলুন।"

জেফরি বেগ চুপ করে রইলো কয়েক মুহূর্ত। উমাও কিছু বললো না। সে অপেক্ষা করলো হোমিসাইডের লোকটা কী বলে শোনার জন্য।

"মিস্ উমা, বাবলু খুব বিপদের মধ্যে আছে," সরাসরি বললো জেফরি বেগ। "ভয়ানক বিপদে!"

উমা শুধু চেয়ে রইলো, কিছু বললো না।

ব্ল্যাক রঞ্জু তার হুইলচেয়ারটা নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। জেল থেকে বের হবার পর নতুন এই হুইলচেয়ারটা পেয়েছে সে। তার খুব পছন্দ হয়েছে জিনিসটা। বিদেশ থেকে অর্ডার দিয়ে আগেই কিনে রাখা হয়েছিলো এটি। ইলেক্ট্রিক এই চেয়ারটি যেনো ছোটোখাটো কোনো মটরগাড়ি। বাচ্চারা খেলনা হাতে পেলে যেমনটি করে রঞ্জু এখন তেমনই করছে। সারা ঘর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হুইলচেয়ারটা নিয়ে। জেলখানায় খুব কমই তাকে হুইলচেয়ারে বসতে দেয়া হতো। দিনের বেশিরভাগ সময় ছোট্ট সেলের ভেতরে শুয়ে থেকে থেকে হাপিয়ে উঠেছিলো সে।

জেলখানায় বসে যে পরিকল্পনা করেছিলো তাতে দারুণভাবেই সফল হয়েছে। একটি অসম্ভব পরিকল্পনা কতো সুন্দরভাবেই না সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পুরো পরিকল্পনার একমাত্র ত্রুটি হলো সেন্ট অগাস্টিনের ক্লার্ক ছেলেটিকে হত্যা করা। এর ফলে হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর আবারো ঢুকে পড়েছে এই ঘটনায়। রঞ্জুর সমস্ত পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেবার ক্ষমতা রাখে এই জেফরি বেগ। এরইমধ্যে মিলনের নাগাল পেয়ে গেছে সে। অল্পের জন্যে ছেলেটা বেঁচে গেলেও তার ভালোবাসার মানুষটি রক্ষা পায় নি। ইনভেস্টিগেটরের বুলেট মেয়েটার জীবন কেড়ে নিয়েছে।

বিশাল এই ঘরে মিলন ছাড়াও আছে রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ লোক ঝন্টু। তারা বসে আছে সোফায়। রঞ্জু দেশ ছাড়ার আগে তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার জন্য সবাই একত্রিত হয়েছে এই গোপন আস্তানায়। শেষবারের মতো পুরো পরিকল্পনাটি গুছিয়ে নেয়া দরকার। তার পরিকল্পনা সফলভাবে এগিয়ে গেলেও শেষ মুহূর্তে এসে মিলনের উপর কিছুটা মনোক্ষুণ্ণ সে। প্রতিশোধ নিতে চাইছে ঐ ইনভেস্টিগেটরের উপর। অনেকক্ষণ ধরেই তাকে বুঝিয়ে চলেছে রঞ্জু। কিন্তু মিলন হ্যাঁ-না কিছুই বলছে না।

রঞ্জু চাচ্ছে মিলন যতোদ্রুত সম্ভব দেশ ছাড়ুক। তা না হলে ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে। এরইমধ্যে মারাত্মক একটি ভুল করে ফেলেছে। পলিকে মুক্ত করার জন্য ছেলেমানুষির মতো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটরকে হুমকি দিয়েছিলো; তার পরিণতি পলির মর্মান্তিক মৃত্যু।

রঞ্জুর মাথায় এখন অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। আগামীকাল দেশ ছাড়ার পরই বাস্টার্ড হারামজাদা চলে আসবে তার হাতের মুঠোয়। ইতিমধ্যেই একটা দল চলে গেছে দিল্লিতে। তারা খুব জলদিই খবর পাঠাবে বাস্টার্ড কোথায় আছে। বাস্টার্ডকে শেষ করা এখন সময়ের ব্যাপার। তারপর তারা সবাই চলে যাবে ব্যাঙ্ককে। ওখানেই শুরু হবে তাদের দ্বিতীয় জীবন। এসব জানার পরও মিলন অবুঝের মতো আচরণ করছে।

হুইলচেয়ারে বসা রঞ্জুর দিকে তাকালো মিলন। ঘরের এককোণে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে। মিলনের পাশে বসা ঝন্টু কয়েক পেগ হুইস্কি খেয়ে ঝিম মেরে আছে।

আজ থেকে কয়েক মাস আগে ব্ল্যাক রঞ্জুর সাথে মিলনের দেখা হয় জেলখানায়। রঞ্জু তখন কিছুটা সুস্থ হয়ে জেলহাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। কিছুদিন পরই ঈদুল ফিতর চলে এলে জেলের কয়েদিরা সবাই একসাথে নামাজ পড়েছিলো ঐদিন। নামাজ শেষে একে অন্যের সাথে কোলাকুলি করার সময়ই রঞ্জুর সাথে তার দেখা হয়ে যায়। রঞ্জুই প্রথমে তাকে দেখে চিনতে পেরেছিলো। হুইলচেয়ারে চলাফেলা করা রঞ্জুকে দেখে সে চিনতেই পারে নি। প্রায় আট-নয় বছর আগে ব্ল্যাক রঞ্জু দেশ ছাড়ার পর থেকে তার সাথে মিলনের আর দেখা হয় নি।

অবশ্য তাদের পরিচয়টা দীর্ঘদিনের। একই এলাকায় বসবাস করেছে। ব্ল্যাক রঞ্জু ছিলো পুরনো ঢাকার এক সময়কার হোমরাচোমড়া রঞ্জু ভায়ের ডান হাত আর মিলন ছিলো সেই রঞ্জু ভায়ের প্রতিবেশী। সেই সময়টাতে কারাতে আর মার্শাল আর্ট নিয়ে মগ্ন ছিলো মিলন। মজার ব্যাপার হলো ব্ল্যাক রঞ্জু তার কাছেই কিছুদিন মার্শাল আর্ট শিখেছিলো। তখনই তাদের মধ্যে পরিচয়। সেই সূত্রে ঘনিষ্ঠতা। তবে রঞ্জু ভাইকে খুন করে ব্ল্যাক রঞ্জু যখন সর্বেসর্বা

হয়ে গেলো তখন মিলন বিদেশে চলে যায়। কিছুদিন অবৈধভাবে জাপানে থেকে ধরা পড়ে যায় দুভার্গ্যক্রমে। নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসে দেশে।

ব্ল্যাক রঞ্জু তখন পুলিশের তালিকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী। বিশাল একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলেছে। ঢাকা শহরে সবচাইতে সুসংগঠিত সন্ত্রাসী চক্রের প্রধান হয়ে উঠেছে সে। বিপুল বিত্তবৈভবের মালিক রঞ্জু চলচ্চিত্রেও লগ্নি করতে শুরু করেছে তখন। এছাড়াও বেনামে অসংখ্য ব্যবসা-বাণিজ্য তো ছিলোই।

দেশে ফিরে আসার পর এক দিন ব্ল্যাক রঞ্জুর সাথে সে দেখা করে। কোনো রকম সাহায্য চাওয়ার আগেই রঞ্জু তাকে প্রস্তাব দেয়, চলচ্চিত্রে কাজ করার জন্য। সে তো ভালো ফাইট জানে, তাহলে একটা ফাইটিং গ্রুপ করছে না কেন?

ব্যস, শুরু হয়ে গেলো তার অন্য রকম একটি ক্যারিয়ার। ব্ল্যাক রঞ্জুর আশীর্বাদ পেয়ে দ্রুত চলচ্চিত্র জগতে ঠাঁই করে নেয় মিলন। 'সুনামি' নামের একটি ফাইটিং গ্রুপ গঠন করে ফেলে তার আরো দুই বন্ধু সুহাস আর নাহিদকে নিয়ে।

এক অন্যরকম জগতের বাসিন্দা হয়ে যায় সে টাকা আর গ্ল্যামারের স্বপ্নময় দুনিয়া। উঠতি নায়িকা আর এক্সট্রা মেয়েদের সাথে লাগামহীন যৌনতায় মেতে থাকা, আস্তে আস্তে মদ-গাঁজা, ফেন্সিডিল সেবন করতে শুরু করা, আউটডোর লোকেশনে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে শুরু করে মাঝেমধ্যে বিদেশেও ঘুরে বেড়ানো, এফডিসিতে মাস্তানি করা, ভালোই চলছিলো সব। কিন্তু হুট করে এক এক্সট্রা মেয়ের সাথে ঝামেলা পাকিয়ে ফেলায় তাকে বাধ্য হয়েই বিয়ে করতে হয়। মেয়েটার পেটে নাকি তার সন্তান এসে গেছিলো। পরে অবশ্য পেটের বাচ্চাটি মৃত প্রসব হয়েছিলো। মিলনের বিশ্বাস, ওটা তার নিজের ছিলো না।

তার প্রথম বউ আম্বিয়া খুবই ধূর্ত প্রকৃতির এক মহিলা, এফডিসির এক্সট্রা মেয়েদের লিডার ছিলো সে। চলচ্চিত্র শিল্পের অনেকের সাথেই তার ছিলো অন্যরকম সম্পর্ক। বিভিন্ন ছবিতে অভিনয় করতো ছোটোখাটো ভ্যাম্প চরিত্রে। অশ্লীল ছবি করার অপরাধে তাকে দুএকবার এফডিসি থেকে নিষিদ্ধ করাও হয়েছিলো কিন্তু ব্ল্যাক রঞ্জুর তিন নাম্বার বউ মিনার আত্মীয় হবার সুবাদে বার বার সে পার পেয়ে যায়। চলচ্চিত্রে কাজ করার পাশাপাশি ফেন্সিডিল, পেথেড্রিন থেকে শুরু করে মেয়েদের দিয়ে দেহব্যবসাও চালাতো। সে নিজেও পেথেড্রিনে আসক্ত।

এরকম একটা মেয়েকে বিয়ে করার কোনো প্রশ্নই উঠতো না যদি ব্ল্যাক রঞ্জুর তিন নাম্বার বউয়ের সাথে আছিয়ার ভালো সম্পর্ক না থাকতো। রঞ্জুর স্ত্রী মিনার দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলো আম্বিয়া। তারচেয়েও বড় কথা মিনার দেহব্যবসার সাথে জড়িত ছিলো সে। উঠতি নায়িকা হবার স্বপ্ন নিয়ে যেসব মেয়ে এফডিসিতে আসতো তাদের মধ্যে থেকে কাউকে কাউকে মিনার অন্ধকার দুনিয়ায় পৌঁছে দিতো এই আম্বিয়া।

যাইহোক, মিনা আর রঞ্জুকে খুশি করার জন্যেই আম্বিয়াকে বিয়ে করা হয়েছিলো, কিন্তু বিয়ের প্রথম দিন থেকেই তার সাথে বনিবনা হচ্ছিলো না। প্রায়ই তারা মারামারি করতো। মিনা তাদের দু'জনকে ডেকে ধমক দিয়ে ভালোমতো সংসার করতে বলতো। ধমক খেয়ে বড়জোর এক সপ্তাহ ঠিক থাকতো আম্বিয়া, তারপরই ফিরে আসতো পুরনো রুপে।

পেথেড্রিনে আসক্ত আম্বিয়ার মেজাজ খিটখিটে থাকতো সব সময়। মিলনকে সন্দেহ করতো অন্য কোনো মেয়ের সাথে লটরপটর করছে কিনা। বাড়িতে এলেই তার শার্টের গন্ধ শুকতো, মেয়েমানুষের চুল খুঁজে বেড়াতো। এ নিয়ে শুরু হতো বিশ্রি ভাষায় গালাগালি। কিন্তু মিলন এরকম জঘন্য জীবন চায় নি। এরকম নোংরা আর বাজে মুখের একটা মেয়ে তার বউ, ব্যাপারটা ভাবতেই ঘেন্না লাগতো। কিন্তু কিছু করার ছিলো না। অবস্থা বেগতিক হয়ে উঠলে এক পর্যায়ে আলাদা থাকতে শুরু করে তারা।

ঠিক তখনই পরিচয় হয় নায়িকা হবার স্বপ্ন নিয়ে এফডিসিতে আসা পলির সাথে। মিলন জানতো মেয়েটার দিকে কতোগুলো মানুষের কুনজর পড়েছে। তাদের হাত থেকে অভাবি এই মেয়েটাকে সে রক্ষা করে। বেশ কয়েকটি ছবিতে সাইড নায়িকা হিসেবে কাজ জুটিয়ে

দেয় মিলন। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্কও তৈরি হয়। মিলন তখন আম্বিয়ার সাথে এক বাড়িতে থাকতো না, সুতরাং পলিকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে ওঠায়।

খবরটা আম্বিয়ার কানে গেলে সে কিছু করার সাহস পায় নি কারণ তার খুঁটি ততোদিনে নড়বড়ে হয়ে গেছে। ব্ল্যাক রঞ্জু অপারেশন ক্লিনহার্টের সময় দেশ ছেড়ে কোলকাতায় আশ্রয় নেয়। অবশ্য রঞ্জুর স্ত্রী মিনা মিলনকে এ ব্যাপারে অনেক শাসিয়েছিলো। পলিকে ছেড়ে দিয়ে আম্বিয়ার কাছে যেনো ফিরে আসে সে, কিন্তু মিলন তাতে কান দেয় নি। ততো দিনে পলিতে দারুণ মজে গেছে মিলন। আম্বিয়াকে তালাক দিয়ে পলিকে বিয়ে করার প্রস্তুতি নিলে মিনা বাগড়া দেয়। মিলনকে জানিয়ে দেয়, আম্বিয়াকে ডিভোর্স করার কথা যেনো ভুলেও চিন্তা না করে। তো, বিয়ে না করেই পলির সাথে বসবাস করতে শুরু করে মিলন। এক পর্যায়ে চলচ্চিত্র শিল্পে মন্দা নেমে এলে ইয়াবার ব্যবসায় নামে তারা দু'জন। সবই ভালো চলছিলো। আম্বিয়ার সাথেও একটা অলিখিত বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিলো তার। পলির সাথে মিলন থাকতে পারবে কিন্তু তাকে বিয়ে করতে পারবে না। আর আম্বিয়াকে যাবতীয় ভরণপোষণ দিতে হবে মাসে মাসে।

মিলন তাই করে যাচ্ছিলো। আম্বিয়া তার স্ত্রী হলেও সে বসবাস করতো পলির সাথে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় পলি খুশি হতে পারে নি। সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তাকে বিয়ে না করলে সে মিলনের সন্তান ধারণ করবে না। আগে বিয়ে তারপর সন্তান। মিলন পলিকে বোঝায়, আর কটা দিন অপেক্ষা করতে। এভাবে বেশ কিছুটা সময় চলে যায়। নানান টানাপোড়েন, ঝগড়া-ঝাটির পরও মিলন-পলির সম্পর্ক অটুট থাকে। তবে পলি আর মিলন দু'জনেই ইয়াবা আসক্ত হয়ে পড়ে।

এক সময় ইয়াবা নিয়ে ধরা পড়ে তারা দু'জন। পলিকে জামিনে মুক্ত করা গেলেও মিলন বের হতে পারে নি। কারণ তার কাছে পিস্তল পাওয়া গেছিলো। জেলে বসে দিন গুণছিলো সে। আর বাইরে বেরিয়ে এসে পলি খুব চেষ্টা করতে থাকলেও মিলনকে বের করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্টের লাখ টাকা দামের ব্যারিস্টার ছাড়া এটা সম্ভব হতো না।

ঠিক তখনই জেলের ভেতর ব্ল্যাক রঞ্জুর সাথে মিলনের দেখা হয়ে যায়। তারপর নতুন করে সখ্যতা গড়ে উঠতে বেশি সময় লাগে নি।

ব্ল্যাক রঞ্জুর পুরো দলটার কোমর ভেঙে দিয়েছিলো বাস্টার্ড নামের এক প্রফেশনাল কিলার। দেশে তার দলের সব হোমরাচোমরাকে খুন করে বদমাশটা কোলকাতায় গিয়ে হানা দেয়। কথাটা শোনার পর মিলনের বিশ্বাসই হতে চাইছিলো না। ব্ল্যাক রঞ্জুর মতো একজনকে খুন করার জন্যে কোলকাতায় চলে গেছে। এরকম লোকও আছে এ দুনিয়াতে?

ঐ বাস্টার্ডও নাকি পুলিশের কাছে ধরা পড়ে জেলে ছিলো। রঞ্জুর গুলিতে আহত হলেও হারামির বাচ্চাটা জানে বেঁচে যায়। কিন্তু নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে তাদের আশীর্বাদ পেয়ে জামিনে মুক্ত হয়ে বিদেশে চলে যায় বাস্টার্ড।

স্বাভাবিকভাবেই মিলন জানতে চায়, বাস্টার্ড কেন তার দলের বিরুদ্ধে লাগলো? আর নতুন সরকারই বা কেন এরকম এক খুনিকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো?

রঞ্জু তখন সব খুলে বলে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর জেলেবন্দী স্বামী নির্বাচনের আগে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলো, আর সেই দায়িত্ব দিয়েছিলো রঞ্জুর উপর। কথাটা শুনে মিলন দারুণ অবাক হলেও রঞ্জুর প্রতি সমীহটা আরো বেড়ে যায়।

রঞ্জুর ধারণা, পেছন থেকে কেউ কলকাঠি নেড়েছে। তাদের পরিকল্পনার কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে পাল্টা এক ষড়যন্ত্র করে বাস্টার্ডকে তাদের বিরুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছিলো পর্দার আড়ালে থাকা এক লোক। যদিও ব্ল্যাক রঞ্জু জানে কে সেই লোক তবে মিলনকে সেটা বলে নি।

যাইহোক, বাস্টার্ডের কারণেই রঞ্জুর এই অবস্থা। পঙ্গু, হুইলচেয়ারে বন্দী এক লোক। তার তৈরি করা বিশাল নেটওয়ার্কটি প্রায় ভেঙে পড়েছে। হাতেগোনা যে কয়জন বাইরে

ছিলো তারাও পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তখন। কিন্তু ব্ল্যাক রঞ্জুর বিশাল সাম্রাজ্যটা তো আর কতোগুলো লোকের সমাহারে তৈরি হয় নি, তৈরি হয়েছে রঞ্জুর মতো দুঃসাহসী একজন সন্ত্রাসী আর বিপুল পরিমাণের টাকার মাধ্যমে।

সেই রঞ্জু বেঁচে আছে, তারচেয়েও বড় কথা তার কাছে যে বিপুল পরিমাণ টাকা আর সহায়সম্পত্তি ছিলো সেগুলো অক্ষত আছে, সুতরাং জেলে পচে মরার চাইতে শেষ একটা চেষ্টা করবে না কেন?

টাকা যা লাগে লাগুক, রঞ্জুর চাই মুক্তি। মুক্তি পেলে সে নিজের অসুস্থ শরীরটা ভালো করতে পারবে। আবার শুরু করতে পারবে সব কিছু। হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়া তখন কোনো ব্যাপারই না।

কিন্তু জেল থেকে রঞ্জুর মুক্তিলাভ কিভাবে সম্ভব? ব্যাপারটা এমন নয় যে লাখ লাখ টাকা খরচ করে নামি-দামি ব্যারিস্টার ধরলেই তার মুক্তি মিলে যাবে। তাহলে?

ঠিক তখনই রঞ্জু তার পরিকল্পনার কথা জানায় মিলনকে। প্রথমে সবটা শুনে ভড়কে গেছিলো। কিন্তু রঞ্জু যখন জানালো এর জন্যে সে কোটি কোটি টাকা খরচ করতেও দ্বিধা করবে না, তখন মিলন ভরসা পায়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ ঝন্টুকে জেল থেকে মুক্ত করা হয় প্রচুর টাকা খরচ করে নামি এক ব্যারিস্টার ধরে। ঝন্টু জেল থেকে বের হয়েই একে একে বের করে আনে মিলনসহ অনেককে। বাইরে এসে তারা সুসংগঠিত করে পুরো দলটি। প্রচুর নতুন লোককে দলে ভেড়ায়। আগের মতো স্বল্পশিক্ষিতদের বদলে অপেক্ষাকৃত স্মার্ট আর আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত লোকজনকে যোগাড় করতে শুরু করে ঝন্টু আর মিলন।

বিশাল অঙ্কের টাকা লগ্নি করে রঞ্জু। জেলে থেকে সব ধরণের কলকাঠি নাড়তে থাকে সে। বাইরে থেকে সবকিছু গুছিয়ে নেয় মিলন আর ঝন্টু। মূলতঃ তারা দুজনেই হয়ে ওঠে রঞ্জুর দুটো হাত-সত্যিকার অর্থে রঞ্জুর অকেজো হওয়া দুটো পা। তাদের সাহায্যেই অকেজো আর বন্দী রঞ্জু সচল হয়ে ওঠে। খুব দ্রুত, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে মিলন আর ঝন্টু একেবারে নতুন একটি দল তৈরি করে ফেলে। পুরনোদের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন বাদে এই দলের সদস্যরা একে অন্যেকে ঠিকমতো চেনেও না। প্রত্যেককে নিজেদের কাজ ভাগ করে দেয়া হয়। যারা তথ্য যোগাড় করে তারা জানে না ক্যাডারগ্রুপে কারা কাজ করে। আবার ক্যাডার গ্রুপের কাছেও তথ্য সংগ্রহকারী গ্রুপটি একেবারে অদৃশ্য।

বিশাল এক কর্মীবাহিনী। প্রত্যেকের জন্য মাসে মাসে মোটা অঙ্কের বেতন আর সব ধরণের সুযোগ সুবিধা। ধরা পড়লে লাখ টাকা দামের ব্যারিস্টার মাঠে নেমে পড়বে সময়ক্ষেপন না করেই। বিনিময়ে যা করতে বলা হবে বিনা বাক্য ব্যয়ে তা পালন করতে হবে সবাইকে। একেবারে রোবটের মতো।

অনেকগুলো স্তরে বিভক্ত এই দলটি কোনো গুপ্ত সংস্থার মতোই। দলের সাথে বেঈমানি করলে মৃত্যুদণ্ড, আর দলের হয়ে কাজ করলে ভোগ-বিলাসের সব উপকরণই মিলবে।

কাউকে কারো কাছে কিছু চাইতে হয় না। যার যা পাওনা পৌঁছে যায় নিজেদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে। কাজের অর্ডার চলে আসে ফোনে কিংবা ই-মেইলে। দেখা সাক্ষাতের খুব একটা দরকারও পড়ে না। সুতরাং ধরা পড়লে পুলিশের কাছে খুব বেশি ফাঁস করার ঝুঁকিও নেই।

মিলন আর ঝন্টু দিনরাত পরিশ্রম করে দলটি তৈরি করেছে। তারপর ব্ল্যাক রঞ্জুর কথামতো নিজেদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টে তারা ভালোমতোই সফল হয়। হোমমিনিস্টারের ছেলেকে কিডন্যাপ করে সেন্ট অগাস্টিন স্কুল থেকে। উদ্দেশ্য খুব সহজ-সরল : জেলে বন্দী ব্লাক রঞ্জুকে মুক্তি দিতে হবে। তাকে বিদেশে চলে যেতে কোনো রকম বাধা দেয়া হবে না। সেইসাথে ঐ বাস্টার্ড কোথায় আছে সেই তথ্য জানাতে হবে।

তাদেরকে অবাক করে দিয়ে হোমমিনিস্টার খুব দ্রুতই সব দাবিদাওয়া মেনে নিয়েছে। মুক্তি পেয়েছে রঞ্জু। আর কয়েক ঘণ্টা পরই সে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। তারপর

বাস্টার্ডকে হাতে মুঠোয় নিয়ে ইচ্ছেমতো প্রতিশোধ নেবে সে।

"প্রতিশোধের ফল কখন সুস্বাদু হয় জানো?" হঠাৎ মিলনের উদ্দেশ্যে বললো রঞ্জু। হুইলচেয়ারটা নিয়ে তার সামনে চলে এলো। "পুরনো হলে। এটা স্প্যানিশ প্রবাদ। কথাটা সব সময় মনে রাখবে।"

মাথা নীচু করে মিলন চুপচাপ শুনে গেলো, কোনো প্রতিবাদ করলো না।

"আমরা যে ধরণের কাজ করি সেখানে কোনো একটা মেয়ের জন্য এভাবে মরিয়া হয়ে যাওয়াটা মানায় না, মিলন।"

কথাটা শুনে মিলন তাকালো রঞ্জুর দিকে।

"আমার বউ মিনা, মঞ্জুভাইসহ কতোজনকে ঐ বানচোতটা খুন করেছে। তুমি জানো?" কথাটা বলে রঞ্জু মাথা দোলালো। হুইলচেয়ার থেকে বসেই মিলনের হাতটা ধরলো সে। "কিন্তু আমি অপেক্ষা করেছি। কারণ এসব খেলা কিভাবে খেলতে হয় সেটা আমি ভালো করেই জানি।"

মিলনও এসব জানে কিন্তু একবার ব্যাঙ্ককে চলে গেলে এই জীবনে আর দেশে ফিরে আসতে পারবে কি না কে জানে। তার প্রতিশোধটা আর কখনই নেয়া হবে না।

"তুমি চেয়েছিলে পলিকে নিয়ে দেশে থাকতে...আমি তো মানা করি নি। করেছি?"

মিলন মাথা দোলালো।

"কিন্তু স্কুলের ঐ ছেলেটা খুন হয়ে যাবার পর মি: বেগ তোমার পেছনে লাগলো, আর তুমিও মাথা গরম করে লোকটার পেছনে লাগতে গেলে," দু'পাশে মাথা দোলালো আক্ষেপে। "মাঝখান থেকে মারা গেলো পলি।" একটু থেমে আবার বললো, "পুলিশ তোমার পেছনে লেগেছে। এখানে থাকলে বিশাল বিপদে পড়ে যাবে।"

মিলনকে চুপ থাকতে দেখে রঞ্জুর মেজাজ কিছুটা খারাপ হয়ে গেলো। সে তাকালো ঝন্টুর দিকে। মদ খেয়ে ঝিমুচ্ছে সে।

"ঝন্টু, তুই ওরে একটু বোঝা।"

চোখে টেনে ঝন্টু তাকালো মিলনের দিকে। "আরে আমি তো কইছি...তোমার এইখানে থাকন যাইবো না। ব্যাঙ্ককে যাইতেই অইবো... ওইখানে গেলে কতো মাইয়া মানুষ পাইবা... খামোখা এইসব পাগলামি করতাছে ক্যান...আজব!"।

"আমি তোমার কোনো কথা শুনবো না। তোমাকে কালই ব্যাঙ্ককে চলে যেতে হবে। টিকেট রেডি। সব কিছু ঠিকঠাক করা আছে। বড়ভাই হিসেবে এটা আমার অর্ডার।"

"ডাইরেক্ট অর্ডার," কথাটা বলেই ঢেকুর তুললো ঝন্টু। "সব ফাইনাল...খালি প্লেনে উঠবা...আর ফোঁস!" টেনে টেনে কথাটা বলেই হাত দিয়ে প্লেন ওড়ার ভঙ্গি করলো সে।

"আমার ভাই, অবুঝ হয়ো না," বললো রঞ্জু। মিলন কোনো জবাব দিলো না। শুধু মুখ তুলে তাকালো। "তোমার টিকেট পাসপোর্ট সব রেডি আছে। সোজা ব্যাঙ্ককে চলে আসো। মাথা গরম করে কিছু কোরো না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মিলন।

রঞ্জু এবার ঝন্টুর দিকে ফিরলো। "কিরে...সব ঠিক আছে তো?"

ঝন্টু চোখ টেনে তাকালো তার দিকে। "পুরা ঠিক আছে, ভাই।"

মুচকি হাসলো রঞ্জু। "বাস্টার্ডকে হাতে পাওয়ার পর সব ক্লিয়ার করে ফেলতে হবে..." কথাটা বলেই চোখেমুখে অন্যরকম একটা ইঙ্গিত করলো সে।

বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে হাই-ফাইভ করলো ঝন্টু। "আপনে টেনশন নিয়েন না। সময়মতো সব অয়া যাইবো।"

মিলন দারুণ অবাক হলো। রঞ্জু কি হোমমিনিস্টারের ছেলেকেও খুন করার কথা ভাবছে নাকি!

"আপনি ওই ছেলেটাকেও?–"

মিলনের কথা শেষ হবার আগেই রঞ্জু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো, "এর কি কোনো

দরকার আছে, ভাই?"

"আছে।" কথাটা বলেই ইলেক্টক হুইলচেয়ারটা নিয়ে ঘরের মধ্যে একটা চক্কর দিলো রঞ্জু। "ওই ছেলেটার বাপই বাস্টার্ডকে ভাড়া করেছিলো।"

কথাটা শুনে মিলন চুপ মেরে রইলো। এটা সে জানতো না। এর আগে রঞ্জু তাকে এ কথাটা বলে নি। তবে রঞ্জু কোত্থেকে এটা জানতে পেরেছে সেটা আর জিজ্ঞেস করলো না। ব্ল্যাক রঞ্জুর কতো মিত্র আছে এটা তারা নিজেরাও জানে না। যে লোকের শত্রুরা প্রকাশ্য কিন্তু বন্ধুরা একেবারেই গোপন তার ক্ষমতা আন্দাজ করা খুব কঠিন।

"আমি চাই ওই মিনিস্টার আগামী কয়েকটা দিন শোকে বিপর্যস্ত থাকুক।"

তারপরই নিঃশব্দ হাসি দিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরতে লাগলো রঞ্জু। ইলেক্ট্রিক হুইলচেয়ারের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কিছু শোনা গেলো না।

অধ্যায় ৬৪

সব শুনে উমা চুপ মেরে আছে। তারা এখন বসে আছে নার্সদের ক্যান্টিনে। চায়ে চুমুক দিচ্ছে জেফরি বেগ, অনেকক্ষণ কথা বলে তার গলা শুকিয়ে গেছে।

উমা বুঝতে পারছে না, তার সামনে বসা লোকটি সত্যি বলছে নাকি তাকে ফাঁদে ফেলে বাবলুকে ধরার চেষ্টা করছে।

একটু আগে এই লোক যা বলেছে সেটা কি বিশ্বাস করার মতো?

ব্ল্যাক রঞ্জু নাকি জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে জামিনে। আর এ কাজে সাহায্য করেছে স্বয়ং হোমমিনিস্টার। একজন মিনিস্টার কেন এ কাজ করতে যাবে-সেই প্রশ্নের জবাবে এই লোক যা বলেছে সেটা আরো বেশি লোমহর্ষক। হোমমিনিস্টারের ছেলেকে নাকি ব্ল্যাক রঞ্জুর দল অপহরণ করেছে

"আপনি বলছেন, মিনিস্টার রঞ্জুকে সব বলে দিয়েছে?...মানে বাবলু কোথায় থাকে?" উমা অবশেষে বললো।

"হ্যাঁ।" ছোট্ট করে বললো জেফরি।

"কিন্তু মিনিস্টার আপনাকে বলে নি বাবলু কোথায় আছে?"

"আমি জানতে চেয়েছিলাম, উনি বলেন নি।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেফরি আবার বললো, "উনার ছেলে তুর্য মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত এসব ব্যাপারে মুখ খুলবেন না।"

উমা একটু ভেবে নিলো। "আপনি তো বাবলুকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে আছেন...আপনি কেন তাকে বাঁচাতে চাইছেন এখন?"

মুচকি হাসলো জেফরি। সে জানতো এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

"আমি বাবলুকে ধরতে চাই সেটা ঠিক...কিন্তু আমি চাই না ব্ল্যাক রঞ্জুর মতো জঘন্য কোনো খুনি-সন্ত্রাসীর হাতে সে মারা যাক।"

উমা চেয়ে রইলো ইনভেস্টিগেটরের দিকে, কিছু বললো না। এই ইনভেস্টিগেটরের কথা বিশ্বাস বরকে কিনা বুঝতে পারছে না। তার মনের একটা অংশ বলছে বিশ্বাস করতে, কিন্তু অন্য অংশটা সতর্ক।

একটু থেমে আবার বললো জেফরি, "আপনার জন্যে যেটা জরুরি সেটা হলো বাবলুকে বাঁচাতে হবে। আমাদের হাতে একদম সময় নেই। যা করার দ্রুত করতে হবে। দেরি করলে বাবলুকে আর জীবিত পাবেন না।"

উমা স্থিরচোখে চেয়ে রইলো জেফরির দিকে।

জেফরি আর উমা যে টেবিলে বসে কথা বলছে তার থেকে একটু দূরে, কর্নারের একটি টেবিলে বসে চা খাচ্ছে এক লোক, তবে চায়ের কাপে তার মনোযোগ নেই, তার সমস্ত মনোযোগ হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর আর নার্স মেয়েটির উপর নিবদ্ধ।

গতকাল থেকেই সে ইনভেস্টিগেটরের পেছনে লেগে আছে। একটা বিরক্তিকর কাজ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তাকে কিছু বলা হয়, তবে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছে, কাজটার গুরুত্ব আছে।

যারা মানুষের পেছনে লেগে থাকে তাদের পেছনে লেগে থাকাটা নিশ্চয় কোনো সাধারণ ঘটনা নয়!

অধ্যায় ৬৫

জেফরি বেগ অফিসে ফিরে এলো ব্যর্থমনোরথে। উমাকে শেষ পর্যন্ত রাজি করাতে পারলেও কাজ হয় নি। বাবলুর ফোন বন্ধ। উমার সামনেই কয়েক বার চেষ্টা করে দেখেছে।

ফোন বন্ধ দেখে উমার মতো সেও চিন্তায় পড়ে গেছে-তাহলে কি রঞ্জুর দল এরইমধ্যে বাবলুকে?...

না। অসম্ভব। ব্ল্যাক রঞ্জু গতপরশু ছাড়া পেয়েছে। তবে এটাও তো ঠিক, বদমাশটা

জেলে বসে থেকেই তার দলটা নতুন করে তৈরি করে নিয়েছে। এখন তারা আগের চেয়েও শক্তিশালী, আরো বেশি ভয়ঙ্কর, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেকোনো কিছু করতে মরিয়া। কোলকাতায় তার লোকজনও আছে, তারা খুব সহজেই দিল্লি চলে যেতে পারবে।

উমা তাকে জানিয়েছে, ইদানিং বাবলুর সাথে তার মাঝেমধ্যে ভিডিও চ্যাটিংও হয় তবে সেটা সব সময়ই ছুটির দিনে নয়তো রাতের বেলায়। ফোনে আগে থেকে ঠিক করে নেয় কখন চ্যাটিং করবে।

জেফরি সঙ্গে সঙ্গে তার মোবাইল থেকে বাবলুকে একটা ই-মেইল করে সব জানিয়ে দিয়েছে। ভাগ্য ভালো থাকলে রঞ্জুর দলের হাতে মারা পড়ার আগেই বাবলু ওটা পড়ে নেবে। কিন্তু জেফরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না, তার আশংকা এরইমধ্যে কিছু একটা হয়ে গেছে।

"স্যার, কখন এসেছেন?" জামান দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বললো।

"এই তো এলাম," বললো সে।

"আজ এতো দেরি করলেন যে?"

জেফরি আসল কথাটা বলতে চাইছে না তবে সে ভালো করেই জানে অফিসের গাড়িতে করে পিজি হাসপাতালে গেছিলো, কথাটা হয়তো গোপন নাও থাকতে পারে। "এক বন্ধুকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম, তাই দেরি হয়ে গেছে।"

জামান তার সামনের চেয়ারে বসে পড়লো। "মিনিস্টারের সাথে কী কথা হলো, স্যার?"

"সবই স্বীকার করেছেন, আর বলে দিয়েছেন আমরা যেনো এ ব্যাপারে কোনো কিছু না করি।"

"তাই নাকি?"

"হুম," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো জেফরি বেগ। "এই হলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অবস্থা।"

জামান একটু চুপ থেকে বললো, "স্যার, আমি একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করিয়েছি... বলবো?"

"বলো।"

"হাসান সাহেব তুর্যের কিডন্যাপের ব্যাপারে মিলনকে সাহায্য করেছিলো। কাজ শেষ হবার পর মিলন কোনো সাক্ষী না রাখার জন্য হাসানকে খুন করে।"

জেফরি তার সহকারীর দিকে চেয়ে রইলো। খুব একটা খারাপ বলে নি ছেলেটা। "হতে পারে।" কথাটা বলেই হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর চুপ মেরে গেলো। তার মাথায় এখন অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে।

"আপনি তাহলে কি করবেন, স্যার?" অনেকক্ষণ পর বললো জামান।

"যা আমরা করছিলাম..." একটু থেমে আবার বললো সে, "আমি মিনিস্টারকে বলে দিয়েছি, তুর্যের কিডন্যাপ হওয়ার ঘটনা নিয়ে আমরা তদন্ত করছি না। আমরা তদন্ত করছি অগাস্টিনের ক্লার্ক হাসানের হত্যাকাণ্ডটি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জামান। "তুর্যের খবর কি?"

"এখনও মুক্তি দেয় নি।"

"বলেন কি!" বিস্মিত হলো জামান। "ব্ল্যাক রঞ্জু তো গত পরশু ছাড়া পেয়ে গেছে, তাহলে ওরা তুর্যকে ছাড়ছে না কেন?"

জেফরি পুরো ঘটনাটা খুলে বললো জামানকে। সব শুনে ছেলেটা চুপ। মেরে রইলো কিছুক্ষণ।

"আমরা এখন কি করবো, স্যার?"

"মিলনকে ট্র্যাক ডাউন করবো।"

"কিভাবে? আপনার কাছে কি নতুন কোনো ইনফর্মেশন আছে?"

"আছে।"

কথাটা শুনে জামান সোজা হয়ে বসলো চেয়ারে। "কি রকম?"

"তুর্যকে ধরার পর ভিডিও পাঠিয়েছে ওরা, মিনিস্টার বলছেন প্রতিদিনই আপগ্রেড ভিডিও পাঠাচ্ছে। আমরা ওই ভিডিওগুলো দেখে অ্যানালিসিস করে দেখতে পারি, ওটা দিয়ে মিলনকে ট্র্যাক ডাউন করা যায় কিনা..."

জেফরির কথাটা শুনে জামান মাথা নেড়ে সায় দিলো। "কিন্তু ভিডিও অ্যানালিসিস করার দরকার নেই, স্যার। আমরা খুব সহজেই বের করতে পারবো ভিডিওটা কোত্থেকে আপলোড করা হয়েছে...কোন ওয়েবসাইট থেকে এটা ব্রডকাস্ট করা হচ্ছে।"

"ওরা ইউ-টিউব ব্যবহার করছে, জামান," জেফরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো।

"কি!"

"আমার মনে হয় না এতো সহজে ওটা ট্র্যাক ডাউন করা যাবে...ওরা অনেক বেশি স্মার্ট।"

"তাহলে ভিডিও দেখে কী করবেন, স্যার?"

"আগে তো, দেখি...তারপর বোঝা যাবে কিছু পাওয়া যায় কিনা। মিনিস্টারের ওখানে ভিডিওটা ভালো করে দেখার সুযোগ পাই নি।"

জেফরির কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলো জামান।

ডেস্কের উপর ল্যাপটপটা ওপেন করে দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিলো সে। "আমি নিশ্চিত, ওরা ছেলেটাকে মেরে ফেলবে..." ল্যাপটপটা চালু করে ইন্টারনেটে ঢুকে বললো জেফরি বেগ।

জামান কিছু বললো না তবে সেও জানে কথাটা সত্যি হবার সম্ভাবনাই বেশি। আজকাল খুব কম কিডন্যাপ কেসেই জিম্মিকে জীবিত অবস্থায় মুক্তি দেয়া হয়।

"পাশে এসে বসো," জামানকে বললো জেফরি। ইউ-টিউবের একটা লিঙ্ক টাইপ করলো সে।

জামান চেয়ারটা তুলে নিয়ে তার বসের পাশে বসে ল্যাপটপের পদার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

ভিডিওটা বাফারিং হবার আগেই চা চলে এলো কিন্তু দু'জনের কেউই কাপটা ছুঁয়ে দেখলো না। তাদের দৃষ্টি ল্যাপটপের পর্দায় নিবদ্ধ।

ইউ-টিউবের কালো ভিডিও স্ক্রিনটায় একটা ছবি ভেসে উঠলো :

তুর্য বসে আছে একটা চেয়ারে। তার চারপাশের ঘরটা বেশ অদ্ভুত। ঠিক পরিচিত কোনো ঘরের মতো মনে হয় না। ভিডিওটা প্রথম দেখার সময়ও জেফরির এটা মনে হয়েছিলো।

তুর্যের চোখেমুখে আতঙ্ক। মাথার চুল এলোমেলো। ঠোঁটের এককোণ ফোলা। ছবিটা সচল হলো এবার।

তুর্য চিৎকার করে বললো : "প্লিজ, আমাকে মারবেন না। প্লিজ!"

হঠাৎ পেছন থেকে একটা হাত চেপে ধরলো তুর্যের মুখ। হাত আর বুকের কিছু অংশ ছাড়া লোকটাকে দেখা গেলো না। লোকটার হাত থেকে নিজেকে ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে তুর্য। উদভ্রান্তের মতো হাত-পা ছোঁড়ার চেষ্টা করলেও কোনো লাভ হলো না। এতো শক্ত করে বাধা যে একটুও নড়াতে পারলো না। এমনকি চেয়ারটাও নড়ে উঠলো না, যেনো শক্ত কোনো কিছু দিয়ে সেটা আটকে রাখা হয়েছে।

পেছন থেকে তুর্যের মুখ ধরে রাখা হাতটা হঠাৎ করেই ছেড়ে দিলো। হাফিয়ে উঠলো ছেলেটা। চিৎকার করে বলে উঠলো : "বাবা, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে...বাবা আমাকে বাঁচাও!"

দৃশ্যটা ফ্রিজ হয়ে গেলো। ভিডিওটা এখানেই শেষ। ছোট্ট আর ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য, বিশেষ করে ছেলেটার বাবা-মায়ের জন্য।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে পাঁচচল্লিশ সেকেন্ডের ভিডিওটা পর পর তিনবার দেখে গেলো

জেফরি আর জামান।

অবশেষে জামানের দিকে ফিরলো সে। "কি বুঝলে?"

"ঘরটা খুবই অদ্ভুত..." বললো জামান।

জেফরি খুশি হলো। ছেলেটার অবজার্ভেশন দিন দিন তীক্ষ্ণ হচ্ছে। "গুড।"

"দেখে মনে হয় না এটা কোনো বাসাবাড়ি।"

"হুম।"

"ছেলেটা চিৎকার করলে মুখ চেপে ধরেছে কিডন্যাপারদের কেউ। তার মানে জায়গাটা একেবারে আইসোলোটেড নয়।"

জেফরি অবশ্য এটা মনে করে না। তার ধারণা, হোমমিনিস্টারকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করার জন্য এটা করা হয়েছে। তারপরও সহকারীর কথাটা গুরুত্ব দিলো সে।

"ভিডিওটা আপলোড করার টাইম আর ডেটটা দেখেছো?"

জামান ল্যাপটপের পদার দিকে তাকালো। "গত বৃহস্পতিবার ছেলেটা কিডন্যাপ হবার দিনই এটা আপলোড করা হয়েছে, স্যার..."

"হুম।" আর কিছু বললো না। দেখতে চাচ্ছে জামান কতোটুকু বের করতে পারে।

"টাইমিং বলছে, ৫: ৪৮..."

"আরেকটা টাইমিং মিস্ করেছো তুমি," বললো জেফরি বেগ।

জামান পর্দার দিকে তাকালো। তুর্যের আর্তনাদরত ছবিটা ফ্রিজ হয়ে আছে। সে কিছু ধরতে পারলো না।

জেফরি ভিডিওটা চতুর্থবারের মতো প্লে করলো। "এবার খেয়াল করো..."

জামান ভালো করে চেয়ে রইলো। পাঁচচল্লিশ সেকেন্ডের ভিডিওটা শেষ হবার আগেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

"স্যার, কিডন্যাপারের হাতঘড়ির সময়টা?" উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো সে। যেনো মজার কোনো ধাঁধার উত্তর দিতে পেরেছে।

হাসলো জেফরি বেগ। "ঠিক ধরেছো। কিডন্যাপারের হাতঘড়িতে সময়টা বলছে ৫: ৩৬।"

"তার মানে ভিডিওটা আপলোড করতে বারো মিনিট সময় লেগেছে," বললো জামান।

"আমি আপলোডের সময় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।"

জামান কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলো তার দিকে। "তাহলে?"

"আমি ভাবছি তুর্যকে কিডন্যাপ করার কতোক্ষণ পর ভিডিওটা করা হয়েছে?"

জামান এবার ধরতে পারলো। এখানেই একজন দক্ষ আর নবীন ইনভেস্টিগেটরের মধ্যে পার্থক্য। অসংখ্য গলি আছে তোমার সামনে কিন্তু তুমি জানো না কোন গলিটা দিয়ে বের হতে পারবে। ভুল গলিতে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

"আমাদের কাছে হাসানের খুন হবার ফরেনসিক রিপোর্ট আছে, স্যার। ওখানে বলা আছে, হাসানের হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে আনুমাণিক সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে," বললো জামান।

"যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে হাসান খুন হবার পরই তুর্যকে কিডন্যাপ করে মিলন আর তার সঙ্গি স্কুল থেকে বের হয়ে গেছে। মনে রেখো, ওরা প্রাইভেটকার ব্যবহার করেছিলো।"

"জি, স্যার।"

"আমরা যদি সাড়ে চার আর পাঁচের মধ্যে গড় করে ধরে নেই চারটা পাঁচচল্লিশে ওরা স্কুল থেকে বের হয়ে গেছিলো তাহলে কতো সময় পরে ওরা নিরাপদ আস্তানায় পৌঁছালো?"

জামান একটু হিসেব করে নিলো মনে মনে। "প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের মতো হবে, স্যার।"

"এ থেকে তুমি আরো দশ মিনিট কেটে দিতে পারো। তুর্যকে নিরাপদ আস্তানায় নিয়ে যাওয়ার পর ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটার চালু করতে, ছেলেটার হাত-পা বেধে নিতে এটুকু সময় নিশ্চয় লাগবে?"

“জি, স্যার...তাহলে আমাদের হাতে থাকে চল্লিশ মিনিট।”

“আমার আরেকটা অনুমাণ হলো, ওরা তুর্যকে স্কুল থেকে অপহরণ করার সময় ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করেছে। তুর্যের চোখমুখ দেখে এটা আমার মনে। হয়েছে। তাছাড়া, এটা ব্যবহার না করলে ছেলেটা বেশ ভোগাতো ওদের।”

“ঠিক বলেছেন, স্যার,” বললো জামান। “তাহলে আমরা কি আরো দশ মিনিট কেটে দিতে পারি?...তুর্যের হুঁশ ফেরানোর জন্য এটুকু সময় তো লাগতেই পারে?”

“অবশ্যই।”

“তার মানে ত্রিশ মিনিট, স্যার!”

“মাত্র ত্রিশ মিনিট। ঢাকা শহরের জ্যামের মধ্যে ত্রিশ মিনিটে তুমি কততদূর যেতে পারবে, জামান?”

জেফরির কথাটা শুনে নড়েচড়ে বসলো তার সহকারী। “তুর্যকে এই ঢাকা শহরেই আটকে রাখা হয়েছে!”

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। “এবং সেটা সেন্ট অগাস্টিন স্কুল থেকে মাত্র ত্রিশ মিনিটের পথ!”

“মাইগড!” অবাক হয়ে বললো জামান। “একেবারে মেইন সিটিতেই!”

“তুর্যের স্কুলটা আসাদ গেটের খুব কাছে...সেখান থেকে মাত্র ত্রিশ মিনিটের কোনো গোপন জায়গায় ছেলেটাকে আটকে রাখা হয়েছে।” আপন মনে বলে গেলো জেফরি বেগ। “এখন আসো তোমার প্রথম কথাটা নিয়ে ভাবি।”

“জি, স্যার। ঘরটা খুবই অদ্ভুত,” বললো জামান।

“অদ্ভুত কেন মনে হচ্ছে?”

যদিও ভিডিওতে খুব বেশি দেখা যায় নি তবুও এটা স্পষ্ট ঘরটার দেয়াল ইট কিংবা কংক্রিটের নয়। তুর্যের পেছনে বেশ কিছুটা খালি জায়গা আছে, সেখানে দেখা গেছে ছাদটাও বেশ নীচু। “স্যার দেয়ালগুলো ইটের তৈরি না, ছাদটাও বেশ নীচু মনে হয়েছে।”

“গুড। তার মানেটা কি দাঁড়ালো?”

“বুঝতে পারছি না, স্যার।”

“সম্ভবত ঘরটা পোর্টেবল কিংবা কোনো ফ্যাক্টরির অফিসরুম,” বলে গেলো জেফরি বেগ। “তবে এটা নিশ্চিত, ঘরটা সাধারণ কোনো বাসাবাড়ি নয়।”

“একদম ঠিক বলেছেন, স্যার।”

জেফরি একটু ভাবতে লাগলে জামান আবার বললো, “স্যার, ভিডিওটা আরেকবার দেখি?”

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ভিডিওটা পঞ্চম বারের মতো প্লে করলো সে।

জামান একটু এগিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলো ভিডিওটা। জেফরির চোখ ভিডিওর দিকে নিবদ্ধ থাকলেও তার মনোযোগ অন্যখানে।

ভিডিওটা শেষ হবার আগেই ব্যাপারটা জেফরির চোখে ধরা পড়লো। এর আগে যে কয়বার দেখেছে এটা তার চোখে তেমনভাবে ধরা পড়ে নি। অথচ এখন খুব একটা মনোযোগ না থাকা সত্ত্বেও ব্যাপারটা চোখে পড়েছে।

“জামান?”

ভিডিও থেকে চোখ সরিয়ে তার দিকে তাকালো ছেলেটা। “কি, স্যার?”

ভিডিওটা এখনও শেষ হয় নি। চলছে। “তুর্যকে ভালো করে লক্ষ্য করো!”

জেফরির কথার মধ্যে কীসের যেনো একটা তাড়না অনুভব করতে পারলো জামান। ল্যাপটপের পর্দায় আবার তাকালো। বোঝার চেষ্টা করলো তার বস কিসের ইঙ্গিত করছে।

কিন্তু ভিডিওটা শেষ হবার পরও জামান কিছু ধরতে পারলো না। “স্যার, ঘটনাটা কি?”

“ভালো করে খেয়াল করেছো?”

“জি, স্যার।”

“কিছু ধরতে পারো নি?” মাথা দোলালো সে।

“তুর্য ছোটার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু...” নিজের ভাবনায় ডুবে গেলো যেনো জেফরি বেগ।

“ওর হাত-পা চেয়ারের হাতলের সাথে বাধা, স্যার।”

“হ্যাঁ, সেটা ঠিক...কিন্তু চেয়ারটা একটুও নড়ে নি! আজব ব্যাপার!”

জামান এখনও বুঝতে পারলো না। হাত-পা বাধা থাকলে নড়বে কিভাবে?

“স্যার, ছেলেটার হাত-পা তো বাধা, নড়বে কিভাবে?”

যেনো সম্বিত ফিরে পেলো জেফরি বেগ। জামানের দিকে সরাসরি তাকালো। “তুর্যের হাত-পা বাধা কিন্তু চেয়ারের তো বাধা নয়। চেয়ারটা কেন একটুও নড়লো না??”

তাই তো! জামান এবার বুঝতে পারলো। “কারণটা কি, স্যার?”

“চেয়ারটা ফ্লোরের সাথে আটকানো!”

এবার বুঝতে পারলো জামান। কিন্তু এটা আর এমন কি? তার বস যেরকম আচরণ করছে তাতে মনে হচ্ছে বিশাল একটি ক্লু পেয়ে গেছে।

“তাই হবে, স্যার। সেজন্যেই চেয়ারটা নড়ে নি।”

জেফরি বুঝতে পারলো তার সহকারী এখনও ব্যাপারটা ধরতে পারছে না। “জামান, খুব কম জায়গাতেই ফ্লোরের সাথে চেয়ার-টেবিল আঁটকানো থাকে!”

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো জামান। এটা তার আরো আগেই বোঝা উচিত ছিলো, কারণ তার দেশের বাড়ি বৃহত্তর বরিশাল জেলায়!

অধ্যায় ৬৬

দুপুরের লাঞ্চের পর জামান আর জেফরি বেগ আবারো বসলো অফিসে। বেলা বারোটার আগেই দারুণ একটি জিনিস জানতে পেরেছে তারা : খুব সম্ভবত হোমমিনিস্টারের ছেলে তুর্যকে কোনো জাহাজ কিংবা বড়সড় লঞ্চের ভেতরে আটকে রাখা হয়েছে।

একমাত্র লঞ্চ আর জাহাজের কিছু ভিআইপি কেবিনে চেয়ার টেবিল আটকানো থাকে। কিন্তু ঢাকা শহরে লঞ্চ থাকলেও জাহাজ পাওয়া যাবে না, এ ব্যাপারে জেফরি নিশ্চিত। জামান অবশ্য জানিয়েছে, বরিশালগামী বড় বড় লঞ্চে মালিকপক্ষের জন্য বিশেষ কিছু কেবিন থাকে, সেগুলো বেশ বড় আর দেখতে অনেকটাই তুর্যের ভিডিওতে দেখা ঘরটার মতো হয়।

"স্যার, আমি নিশ্চিত বরিশালগামী কোনো লঞ্চই হবে," আবারো নিজের অভিমত প্রকাশ করলো জামান। "ঐ লাইনে আমি চলাচল করি...বেশ বড় বড় কিছু লঞ্চ আছে।"

"তাহলে লঞ্চটা এখন কোথায় থাকতে পারে?" জেফরি বললো।

"সেটাই সমস্যা। অসংখ্য লঞ্চ আছে। কোন্ লঞ্চে তুর্যকে আটকে রেখেছে কে জানে।"

"জামান, আমি নিশ্চিত, লঞ্চটা কোথাও স্টেশন করা আছে। ওটা চলছে না। মনে রেখো, লঞ্চ থেকে নিয়মিত ভিডিও আপলোড করা হয়েছে, যোগাযোগ করা হচ্ছে রঞ্জুর লোকজনের সাথে।"

"তাহলে লঞ্চটা বুড়িগঙ্গার কোথাও নোঙর করা হয়েছে," বললো জামান।

"আসাদ গেট থেকে বুড়িগঙ্গা..." আপন মনে বললো জেফরি। "দূরত্বটা কি ত্রিশ-চল্লিশ মিনিটের পথ?"।

"এটা নির্ভর করে আপনি কিভাবে যাচ্ছেন।"

"ওরা প্রাইভেট কার ব্যবহার করেছে। ধরে নাও গাড়িটা আর বদল করে নি, কারণ তুর্য ছিলো তাদের সাথে। অপহৃত একজনকে ট্রান্সপোর্ট করা খুবই ঝামেলার, সুতরাং তারা গাড়ি বদল করে নি।"

জামান একটু ভেবে বললো, "সেক্ষেত্রে ত্রিশ মিনিটে বুড়িগঙ্গায় যাওয়া অসম্ভব। আসাদ গেট থেকে সদরঘাট...নট পসিবল।"

একটু ভেবে বললো জেফরি বেগ, "কোনো শর্টকাট নেই?"

"আমার জানামতে নেই," কথাটা শেষ করতেই আবার বলে উঠলো সে, "না, স্যার। ভুল বলেছি। একটা শর্টকাট আছে।"

"সেটা কি?"

"আসাদ গেট মানে মোহাম্মদপুর, ঠিক আছে?"

"হুম।"

"মোহাম্মদপুরের পশ্চিম দিক ঘেষে বুড়িগঙ্গা চলে গেছে।"

"গুড। সেন্ট অগাস্টিন থেকে খুব দ্রুত আর কম সময়ে মোহাম্মদপুর যাওয়া যাবে।"

"সেখান থেকে তারা যদি গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে নদীপথ ব্যবহার করে তাহলে সদরঘাটের আশেপাশে থাকা লঞ্চগুলোর কাছে খুব সহজেই পৌঁছানো যাবে।"

একটু ভেবে জেফরি বললো, "নদীপথে এতো তাড়াতাড়ি যাওয়া কি সম্ভব?"

"সম্ভব, যদি স্পিডবোট ব্যবহার করা হয়," বললো জামান।

"অনেক বেশি 'যদি কিন্তু ভালো লক্ষণ নয়। তারপরও তোমার কথায় যুক্তি আছে। স্পিডবোট তারা ব্যবহার করতেই পারে।"

"জি, স্যার। তারা যদি দ্রুত লঞ্চের কাছে পৌঁছাতে চায় তাহলে অবশ্যই স্পিডবোট ব্যবহার করেছে।" একটু থেমে আবার বললো জামান, "আমি নিশ্চিত, তারা আসাদগেট থেকে গাড়িতে করে সদরঘাটে যায় নি। তার কারণ, গাড়ি থেকে তুর্যকে নামিয়ে লঞ্চে ওঠানোটা খুব সহজ কাজ হবে না। বিশেষ করে তুর্য যদি অজ্ঞান থাকে..."

“স্পিডবোট থেকে তুর্যকে লঞ্চে তোলাটা কি বেশি সুবিধাজনক?” জানতে চাইলো জেফরি।

“জি, স্যার,” কথাটা বলে হেসে ফেললো জামান। “প্রতি ঈদে দেশের বাড়িতে যাবার সময় আমি নিজেও এ কাজটা করি...”

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো জেফরি বেগ।

“...টার্মিনাল দিয়ে হাজার হাজার লোকজনের ভীড় ঠেলে লঞ্চে ওঠাটা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন। তাছাড়া অনেক লঞ্চ নদীর মাঝখানে নোঙর করে রাখা হয়। সেগুলোর সিট দখল করার জন্য অনেকেই ঘাট থেকে নৌকা ভাড়া করে মাঝনদীতে গিয়ে লঞ্চে উঠে পড়ে।”

“হ্যাঁ, আমি পত্রপত্রিকা আর টিভিতে এরকম ছবি দেখেছি,” বললো জেফরি।

“আমার ধারণা কিডন্যাপাররা স্পিডবোটে করে তুর্যকে কোনো লঞ্চে তুলেছে।”

“ত্রিশ-চল্লিশ মিনিটে কি কাজটা করা সম্ভব?”

“সম্ভব।”

ঠিক আছে, ভাবলো জেফরি। তাহলে বুড়িগঙ্গার বুকে কোনো লঞ্চের ক্যাবিনে তুর্যকে আটকে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে ওয়েবক্যামের মাধ্যমে তুর্যের ভিডিও রেকর্ড করে ইউটিউবে আপলোড করা হয়। ভিডিওটা কোত্থেকে আপলোড করা হয় সেটা ট্র্যাক ডাউন করা সম্ভব। যদিও জেফরির ধারণা ব্ল্যাক রঞ্জুর এই দলটি এতো কাঁচা কাজ করবে না তারপরও ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে দোষ কী।

“জামান, তুমি ইউটিউবের ভিডিওটা কোত্থেকে আপলোড করা হয় সেটা ট্র্যাক ডাউন করার চেষ্টা করো।”

কথাটা শুনে জামান মাথা নেড়ে সায় দিলো। “এখনই করছি, স্যার।”

“আমার ধারণা এ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না, তবে ওরা যদি ভুল করে থাকে সে সুযোগটা তো আমাদের নেয়া উচিত, তাই না?”

“অবশ্যই, স্যার,” দৃঢ়ভাবে বললো জামান। কথাটা বলেই সে চলে গেলো কমিউনিকেশন্স রুমে।

জেফরি অনেকটা নিশ্চিত, আজ তুর্যকে ব্ল্যাক রঞ্জুর দল মুক্তি দেবে না। যদি না দেয় তার একটাই অর্থ : তুর্যকে খুন করে গুম করে ফেলা হবে।

হাতে যদি আর কয়েকটা দিন সময় থাকতো, মনে মনে আক্ষেপ করে উঠলো জেফরি।

অধ্যায় ৬৭

পুরনো দিল্লির প্রসিদ্ধ করিম হোটেল থেকে নাস্তা করে মেট্রোরেল দিয়ে খামোখাই দিল্লি শহরটা ঘুরেছে সময় কাটানোর জন্য। এই শহরে সময় কাটানোটাই হচ্ছে তার জন্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা। অবশেষে আবারো জ্বর জ্বর লাগতে শুরু করলে ফিরে আসে কারোলবাগে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসছে। ইচ্ছে করছে ঘুমাতে। শরীরটা এখনও দুর্বল। তার উচিত ছিলো ডাক্তার দেখানো। দিল্লির শীত অনেক বেশি তীব্র। এখানে যখন এসেছিলো তখন ছিলো গ্রীষ্মকাল। শীতের প্রকোপ এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সে। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-জ্বর হয়ে গেছে। মনে মনে ঠিক করলো, আগামীকাল যদি জ্বরটা সেরে না ওঠে তাহলে ডাক্তারের কাছে যাবে।

তার বাড়ির নীচে একটা লাইব্রেরি আছে। এখানে ইংরেজি বই ধারে পাওয়া যায়। বেশিরভাগই পেপারব্যাক সংস্করণ। মাত্র দশ রুপিতে একটা পেপারব্যাক বই এক সপ্তাহ নিজের কাছে রাখতে পারে লাইব্রেরির সদস্যরা। তবে বিদেশী পর্যটকেরাও এই সুবিধা পেতে পারে, সেক্ষেত্রে বইটার গায়ের মূল্যের পুরোটাই জামানত হিসেবে রাখতে হবে। বই ফেরত দিলে দশ রুপি রেখে বাকি টাকাটা ফেরত নেয়া যাবে।

বাবলু লাইব্রেরি থেকে নিয়মিত বই নিলেও তাকে কোনো টাকা-পয়সা দিতে হয় না। কারণ এর মালিক মুলিন্দার সিংয়ের সাথে তার বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছে। বয়সে তার চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের বড় হবে মুলিন্দার, তবে একেবারেই প্রাণখোলা। বাবলুর সাথে তার কথোপকথন চলে ইংরেজিতে, খুব কমই হিন্দি বলে সে।

বাবলু দেখতে পেলো মুলিন্দর তার লাইব্রেরির কাউন্টারে বসে আছে। তাকে দেখতে পেয়ে মুলিন্দর ডাকলো। ইংরেজিতেই চললো তাদের কথোপকথন।

"আরে তওফিক ভাই, আপনি কখন ফিরে এলেন?" মুলিন্দর তাকে দেখে যারপরনাই বিস্মিত। "আপনি না শহরের বাইরে গেছিলেন?"

গত সপ্তাহে বাবলু আগ্রায় গিয়েছিলো তাজমহল দেখতে। তিনদিন আগে রাতে জ্বর নিয়ে সেখান থেকে বাড়ি ফিরে আসে। মুলিন্দরের লাইব্রেরিটা তখন বন্ধ ছিলো।

"আমি তো ফিরেছি দুদিন হলো।"

"বলেন কি? তাহলে এ দুদিন আপনাকে দেখলাম না যে?"

"জ্বর ছিলো..." বললো বাবলু। "আগ্রা থেকে জ্বর নিয়ে ফিরেছি। দু'দিন ঘর থেকে বেরই হই নি।"

"তাই নাকি," বললো মুলিন্দর। "আহ, আগে জানলে তো দেখতে যেতাম আপনাকে।"

বাবলু কাষ্ঠ হাসি দিলো।

"এখন কি অবস্থা?"

"ভালো।" ছোট্ট করে বললো সে।

"যাক, শুনে খুশি হলাম।" একটু থেমে আবার বললো মুলিন্দর, "এখন কোত্থেকে এলেন?"

"করিমে গিয়েছিলাম নাস্তা করার জন্য। তারপর অ্যাম্বাসিতে জরুরি একটা কাজ করে চলে এলাম।"

মিথ্যে বললো সে। আসলে এই শহরে তার কোনো কাজ নেই। প্রথম দিকে ঘরে বসে বই পড়ে, ইন্টারনেটে সময় কাটাতো, এখন আর ভালো লাগে না। মাঝেমধ্যে কোনো কারণ ছাড়াই দিল্লির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। মাঝেমধ্যে আগ্রা, ফারিদাবাদ কিংবা জয়পুরে গিয়ে ঘুরে আসে।

"আমি তো ভেবেছিলাম আপনি দিল্লির বাইরেই আছেন," বললো মুলিন্দর। "আপনাকে খুঁজতে এক লোক এসেছিলো একটু আগে..."

কি?! আকাশ থেকে পড়লো বাবলু। তাকে এখানে কেউ কোনো দিন খুঁজতে আসে নি।

আসার কথাও না। তার এই জায়গার কথা শুধুমাত্র দূতাবাসের দুএকজন জানে। কিন্তু তাদের কারো এখানে আসার কথা নয়।

“কখন?” বিস্মিত হবার ভাবটা লুকিয়ে জানতে চাইলো সে।

“এই তো একটু আগেই,” বললো মুলিন্দর সিং।

“দেখতে কেমন? কি বললো?”

“বয়স আপনার মতোই হবে, দেখতে মাঝারি গড়নের, গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ...গোঁফ আছে। বললো, তওফিক সাহেব উপরতলায় থাকেন কিনা। আমি তাকে বলে দিয়েছি আপনি শহরের বাইরে আছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই,” কথাটা বলেই হা হা করে হেসে ফেললো মুলিন্দর। “কিন্তু এখন তো দেখছি আপনি দুদিন আগেই ফিরে এসেছেন।”

ভাবনায় পড়ে গেলো বাবলু। কে তার খোঁজে এসেছিলো?

“দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন,” বললো মুলিন্দর। “নতুন কিছু বই তুলেছি, নিয়ে যাবেন নাকি একটা?”

গায়ে এখনও জ্বর আছে, বই পড়তে ইচ্ছে করছে না। “থ্যাঙ্কস, পাজি...” পাঞ্জাবি স্টাইলে বললো সে। কাউন্টারের সামনে একটা টুলের উপর বসে পড়লো।

“চা খাবেন?”

“না। চা খেয়েই এসেছি।” বাবলুর মাথায় একটাই চিন্তা, এতোদিন ধরে এখানে আছে, তাকে কেউ খুঁজতে আসে নি, এখন হঠাৎ করে কে খুঁজতে এলো? দূতাবাসের কেউ? হলেও হতে পারে।

বাবলুকে আনমনা দেখে মুলিন্দর সিং তার দিকে চোখ কুচকে তাকালো। “কোনো কিছু হয়েছে, তওফিক ভাই? মানে দেশ থেকে খারাপ কোনো সংবাদ?”

মুলিন্দর সিং জানে বাবলু বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন মাঝারিগোছের কর্মকর্তা।

“না। সেরকম কিছু না। হয়তো দূতাবাস থেকে নতুন কোনো কর্মচারি এসেছিলো আমার সাথে দেখা করতে।” উঠে দাঁড়ালো সে। “এখন যাই, শরীরটা ভালো লাগছে না। পরে এসে গল্প করবো।”

মুলিন্দর সিংয়ের লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরে চলে এলো সে। জ্বরের কারণে দুদিন ধরে তার মোবাইল ফোনটাও বন্ধ রেখেছে, সুতরাং দূতাবাস থেকে কেউ হয়তো ফোন করে তাকে পায় নি, তাই খোঁজ নিতে চলে এসেছে তার বাড়িতে।

ঘরে ঢুকে মোবাইল ফোনটার পাওয়ার অন করে রাখলো। তার ফোনে মিস কল্ড অ্যালার্ট অপশনটি অফ করে রাখা। এটার কোনো প্রয়োজনীয়তা

এর আগে অনুভব করে নি। কারণ একমাত্র উমা ছাড়া আর কারো সাথে তার ফোনে যোগাযোগ হয় না। দেশে শুধুমাত্র মেয়েটার কাছেই তার ফোন নাম্বার থাকলেও এর আগে দু'একবার ছাড়া উমা ফোন করে নি, সে নিজেই উমাকে ফোন করে প্রতিদিন। ফোনটা চালু রাখলো এই আশায়, হয়তো তাকে যে খুঁজতে এসেছিলো সে আবার ফোন করতে পারে।

জ্বরটা পুরোপুরি যায় নি। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছে। গায়ে চাদর টেনে শুয়ে পড়লো বাবলু।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে একটা কথাই তার মাথায় ঘুরতে লাগলো : কে এসেছিলো তাকে খুঁজতে?

ইউ-টিউবের ভিডিও লিঙ্কটা ট্র্যাক-ডাউন করে কিছুই পাওয়া গেলো না। ভিডিওটা আপলোড করা হয়েছে কোনো মোবাইল ফোন কোম্পানির ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ভিডিও ফাইলটা হয়তো ল্যাপটপ থেকে আপলোড করা হয়েছে।

জেফরি জানতে এমনটাই হবে। এই ব্যাপারটা নিয়ে তার মধ্যে বাড়তি কোনো উচ্চাশা ছিলো না। রঞ্জুর দল বুঝে গেছে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কিভাবে কাজ করে। এখন বেশ সতর্ক আর সাবধানী তারা।

নিজের অফিসে বসে আছে শেষ বিকেলে। মন মেজাজ ভালো নেই। একবার ভাবলো রেবাকে ফোন করে দেখা করার কথা বলবে, পরক্ষণেই বাতিল করে দিলো সেটা। কিছুই ভালো লাগছে না। অনেক তথ্য তার কাছে আছে কিন্তু সময় নামক জিনিসটা একদম নেই। আর যদি একটু সময় পেতো, তাহলে হয়তো তুর্যকে বাঁচানোর একটা চেষ্টা করতে পারতো। ঐ ভয়ঙ্কর মিলনকেও ধরা সম্ভব হতো।

সে এখন মোটামুটি নিশ্চিত, হোমমিনিস্টারের ছেলেকে এই ঢাকা শহরের কোথাও আটকে রাখা হয়েছে। খুব সম্ভবত বুড়িগঙ্গা নদীতে স্টেশন করা কোনো লঞ্চ। জামান মনে করছে, বরিশালগামী কোনো লঞ্চই হবে সেটা। ঐ লাইনের লঞ্চগুলো আকারে বেশ বড় হয়ে থাকে।

একটু আগে তারা ব্ল্যাক রঞ্জুর পুরনো ফাইল ঘেঁটে দেখেছে, রঞ্জুর বিভিন্ন ব্যবসার মধ্যে লঞ্চ ব্যবসাও আছে। বরিশাল লাইনে তার দুটো লঞ্চ ছিলো, তবে বছরখানেক ধরে ওই দুটো লঞ্চ যাত্রি বহন করছে না। বিআইডটিসি'তে খোঁজ নিয়ে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে জামান। তবে লঞ্চ দুটি এখন কোথায় থাকতে পারে সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কিছু জানাতে পারে নি। নারায়ণগঞ্জ আর ঢাকা, এই দুই জায়গা লঞ্চ মেরামতের জন্য কিছু ডকইয়ার্ড আছে, হয়তো লঞ্চ দুটো সেখানেই আছে, রিপেয়ারিংয়ের কাজ করানো হচ্ছে। কিন্তু নিশ্চিত তথ্য না পেলে কোনো কিছুই করা যাবে না।

তারপরও জামানকে বলে দিলো, ব্ল্যাক রঞ্জুর লঞ্চ দুটোর নাম কি, সেগুলো এখন কোথায় আছে সেটা যেনো খুঁজে বের করে।

ঘড়িতে সময় দেখলো : বিকেল ৫টা ১৫। তুর্যকে মুক্তি দেবার কথা ছিলো আজই। রঞ্জুর দল কি ছেলেটাকে মুক্তি দিয়েছে?

না। মুক্তি দিলে অন্তত পিএস তাকে জানাতো। তাদের মধ্যে সেরকমই। কথা হয়েছে।

ঠিক তখনই জেফরির ফোনটা বেজে উঠলো। পকেট থেকে বের করে দেখলো রেবা ফোন করেছে।

"হ্যালো, কেমন আছো?" বললো সে।

"এই তো, তুমি কি করছো?" জানতে চাইলো রেবা।

"কিছু না। অফিসে বসে আছি।"

"আসবে?"

"কোথায়?"

"তুমি বলো..."

"আজ রিক্সায় করে ঘুরে বেড়াবো। তারপর যেখানে খুশি সেখানে থেমে খেয়ে নেবো।"

"ঠিক আছে। তুমি তাহলে আমার বাসার সামনে চলে এসো।"

"ওকে।"

কলটা শেষ হলে মুচকি হাসলো সে। তার ইচ্ছে ছিলো না আজ দেখা করার কিন্তু রেবা নিজ থেকে বলাতে মন ভালো হয়ে গেলো মুহূর্তে।

অফিস থেকে বের হবার আগে কী মনে করে যেনো ফোনটা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগলো, বাবলুকে আরেকবার ফোন করার চেষ্টা করবে কিনা। এর আগে তার ফোনটা বন্ধ

পেয়েছিলো।

দিল্লির নাম্বারটা ডায়াল করলো সে।

উমা হাসপাতাল থেকে একটু আগেভাগে ছুটি নিয়ে বের হয়ে পড়েছে। বাবলুর কি হলো সে চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে সকাল থেকে। ইনভেস্টিগেটর মি: বেগ ফোন করে পায় নি। ফোনটা বন্ধ ছিলো। আশ্চর্য, ফোন বন্ধ থাকবে কেন? তারচেয়ে বড় কথা বাবলু দুদিন ধরে তাকে ফোন করে নি। ঘটনা কি? তার মন বলছে, বাবলুর খারাপ কিছু হয়েছে। ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে আছে

তারা এখন থাকে সেগুনবাগিচায়, পিজি হাসপাতাল থেকে হেঁটেই বাড়ি পৌঁছায় উমা। আজও তাই করলো। শিশুপার্ক আর টেনিস কমপ্লেক্সের পাশ দিয়ে রমনা পার্কের ভেতর ঢুকে পড়লো। পার্কের পূর্ব দিকের প্রবেশপথ দিয়ে বের হলেই সেগুনবাগিচা। প্রতিদিন সে এ পথটাই ব্যবহার করে।

পার্কের ভেতর দিয়ে যাবার সময় ফোনটা বের করে বাবলুর নাম্বারে ডায়াল করলো সে।

রিং হচ্ছে!

খুশিতে তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ফোনটা কানে চেপে পার্কের নির্জন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো সে। কয়েক মুহূর্ত বাদে তার মুখের উজ্জ্বলতা ফিকে হয়ে গেলো। আশংকা আর ভয় জেঁকে বসলো তার মধ্যে।

রিং হচ্ছে অথচ বাবলু তার কলটা ধরছে না!

এটা তো অসম্ভব!

অধ্যায় ৬৯

ছোট্ট একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে খোলা মাঠে। চারপাশে জনমানুষের কোনো চিহ্ন নেই। ছেলেটা অবাক হয়ে চারপাশ দেখছে। প্রবল বাতাস বয়ে যেতে লাগলো। একটা ঝড় আসন্ন। ভয় পেয়ে গেলো ছেলেটি। কেঁদে উঠলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। একবার সামনে দৌড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো, পরক্ষণেই পিছু হটে তাকালো ডানে-বায়ে। কাউকে খুঁজছে। কারোর আশ্রয় পেতে চাইছে। কিন্তু তার চারপাশে কেউ নেই।

বাতাসের তীব্রতা বাড়তে শুরু করলো। ধূলোর ঝড় ধেয়ে আসলো ছেলেটার দিকে। এবার জোরে জোরে কাঁদতে লাগলো ছেলেটি।

"মা!"

চিৎকারটি প্রতিধ্বণিত হলো। তারপর প্রবল বাতাস সেটা উড়িয়ে নিয়ে গেলো দূরে কোথাও।

"মা!"

ছেলেটার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। ভয়ে উপুড় হয়ে মাটিতে বসে পড়লো সে। বাতাস আরো প্রবল বেগে বইছে এখন। দু'হাতে মাথাটা ঢেকে কুকঁড়ে গেলো ছেলেটি। শুনতে পাচ্ছে বাতাসের শো শো আওয়াজ। . ভয়ে কাঁপতে লাগলো সে। তার বোবা কান্নার শব্দ শোনা গেলো না। চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললো।

হঠাৎ কেঁপে উঠলো সে। টের পেলো তার পিঠে, মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। মুখ তুলে তাকালো ছেলেটা। সাদা ধবধবে শাড়ি পরা এক তরুণী তার দিকে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটে মৃদু হাসি। সেই হাসি যেনো তাকে আশ্বস্ত করছে।

"মা" এবার আনন্দে বলে উঠলো ছেলেটা।

তরুণী তাকে বুকে জড়িয়ে নিলো। শক্ত করে মাকে ধরে রাখলো ছেলেটি।

এমন সময় আবার বাতাসের শব্দটা জোরালো হতে শুরু করলে ছেলেটা চোখ বন্ধ করে ফেললো। শো শো শব্দটা এখন তীক্ষ্ণ হতে হতে কানের পর্দা বিদীর্ণ করে ফেলছে যেনো। ছেলেটা দারুণ ভয় পেয়ে গেলো। চোখ খুলবে কিনা বুঝতে পারছে না। শব্দটা আরো জোরালো হতেই চোখ খুলে দেখে সে বসে আছে ভোলা মাঠে। তার মা উধাও হয়ে গেছে। বিশাল শূন্যতায় ডুবে গেলো সে। বুকটা হু হু করে উঠলো।

চিৎকার দিয়ে উঠলো আবার, "মা!"

কিন্তু তার চিৎকারকে ছাপিয়ে গেলো বাতাসের তীক্ষ্ণ শব্দটা।

বিছানায় লাফ দিয়ে উঠে বসলো বাবলু। ঘেমেটেমে একাকার। দম ফুরিয়ে হাপাচ্ছে। টের পেলো হৃদস্পন্দন লাফাচ্ছে রীতিমতো। কিন্তু অবাক করার বিষয় তীক্ষ্ণ শব্দটা এখনও হচ্ছে।

বালিশের পাশে মোবাইলফোনটায় যে রিং হচ্ছে সেটা বুঝতে আরো কয়েক সেকেন্ড সময় লাগলো তার।

ঝটপট ফোনটা তুলে নিতেই দেখতে পেলো একটা অপরিচিত নাম্বার থেকে কলটা করা হচ্ছে। আর কলটা এসেছে বাংলাদেশ থেকে!

কিন্তু এটা তো উমার নাম্বার নয়!

অবশ্য অন্য কোনো নাম্বার থেকেও উমা ফোন করে থাকতে পারে। দ্বিধা ঝেড়ে কলটা রিসিভ করলো সে।

বরাবরের মতোই নিজে থেকে কিছু বললো না।

"হ্যালো?"

ওপাশ থেকে যে পুরুষ কণ্ঠটা বলে উঠলো সেটা খুবই পরিচিত বলে মনে হলো তার কাছে। তারচেয়েও বড় কথা, কণ্ঠটা যেনো খুব তাড়ার মধ্যে আছে। কে? কিছু বললো না বাবলু। অপেক্ষা করলো।

"হ্যালো...বাবলু?" ওপাশ থেকে বললো উদ্বিগ্ন একটি কণ্ঠ।

"কে?" আস্তে করে বললো সে।

"প্লিজ, কলটা কেটে দিও না...ব্যাপারটা খুবই জরুরি!" তারপর বুক ভরে দম নিয়ে আবার বললো, "তুমি ভয়ানক বিপদে আছে"।

"কে?!" কথাটা শেষ করার আগেই আবারো জানতে চাইলো সে। তার কাছে খুবই চেনা চেনা লাগছে কণ্ঠটা, কিন্তু ধরতে পারছে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওপাশ থেকে কণ্ঠটা বললো : "আমি জেফরি বেগ।"

"কি!" বাবলু যারপরনাই বিস্মিত।

ব্ল্যাক রঞ্জু ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু তুর্যকে মুক্তি দেয়া হয় নি। হোমমিনিস্টার অসহায় হয়ে পড়েছেন। কী করবেন বুঝতে পারছেন না। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে মন্ত্রীত্ব তো যাবেই এমন কি তার বিরুদ্ধে মামলাও হবে। এতোদিনের অর্জিত রাজনৈতিক অবস্থান ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে এই এক ঘটনায়।

আর ভাবতে পারলেন না। বাড়িতেই আছেন তিনি, তুর্য কিডন্যাপ হবার পর থেকেই বলতে গেলে কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। সচিব আর প্রতিমন্ত্রীকে দিয়ে মন্ত্রণালয় চালাচ্ছেন। মন্ত্রণালয়ে চাপা ফিসফাস শুরু হয়ে গেছে তাকে নিয়ে-মিনিস্টার সাহেবকে এতো মনমরা দেখায় কেন? কী হয়েছে তার?

রঞ্জুর কথামতো সব করেছেন, পুরো ব্যাপারটা গোপন রেখেছেন, কিন্তু এখন? সব দাবি মিটিয়ে দেবার পরও ওরা তুর্যকে ছাড়ছে না। এমনকি যে লোকটা ফোনে যোগাযোগ রাখতো সেও ফোন করছে না। তাহলে কি ঐ ইনভেস্টিগেটর, মি: বেগের কথাই ঠিক?

দুপাশে মাথা দোলালেন মিনিস্টার। তিনি যে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন সেটা বুঝতে পারছেন। গভীর এক খাদ। শুধুমাত্র তার ক্যারিয়ার নয়, ব্যক্তি জীবনটাও ধ্বংস হয়ে যাবে। সব শেষ হয়ে নিঃস্ব হয়ে যাবেন তিনি।

তার সামনে পিএস আলী আহমেদ বসে আছে। সেও বুঝতে পারছে না কী করা উচিত এখন।

"এরকম কেন হলো?" পিএসের দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মতো বললেন মিনিস্টার।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আলী আহমেদের বুকের ভেতর থেকে।

"মি: বেগ সব গুবলেট করে দিয়েছে, স্যার।"

"কি??" কথাটা বলেই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন মিনিস্টার।

"আমি নিশ্চিত সে ঐ বাস্টার্ডকে সব জানিয়ে দিয়েছে। রঞ্জুর দল ওকে খুঁজে পায় নি হয়তো। ওরা যদি ওকে খুঁজে না পায় তাহলে কি হবে বুঝতে পারছেন?"

"কিন্তু বাস্টার্ড কোথায় আছে এটা তো ওই লোক জানে না। তাহলে সে কিভাবে ওর সাথে যোগাযোগ করলো?"

আলী আহমেদ যে জেফরি বেগের পেছনে এক লোক লাগিয়ে রেখেছে সে কথাটা বললো না। "যেভাবেই হোক সে জেনে গেছে," একটু থেমে আবার বললো, "বাস্টার্ডকে এটা জানিয়ে দিয়ে আমাদের যে কতো বড় সমস্যায় ফেলে দিয়েছে সেটা যদি ঐ লোক বুঝতো..."

ঢোক গিললেন মিনিস্টার। "এখন আমার তুর্যের কি হবে?"

শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো পিএস। দীর্ঘদিন ধরে মিনিস্টারকে নানান ধরণের পরামর্শ দিয়ে এসেছে, বিভিন্ন সমস্যায় উপায় বাতলে দিয়েছে কিন্তু এখন তার মাথায়ও যেনো কিছুই ঢুকছে না। তার অবস্থা মিনিস্টারের চেয়েও করুণ কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে পারছে না।

"কিছু একটা বলো?" তাড়া দিলেন হোমমিনিস্টার।

পিএস দু'পাশে মাথা দোলালো আক্ষেপের সাথে। পুরো ব্যাপারটা এমন অবস্থায় চলে এসেছে...কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

কপালে হাত দিলেন মিনিস্টার। "আমার ছেলেটার কী হবে?" কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন তিনি।

ছলছল চোখে চেয়ে রইলো পিএস।

"আমি তো এখন কাউকে কিছু বলতে পারছি না!" মিনিস্টার আস্তে করে বললেন। "নিজের জালে নিজেই ফেঁসে গেছি।"

পিএস আলী আহমেদের চোখ দুটোও ছলছল করে উঠলো। কিছু বলতে যাবেন ঠিক তখনই ড্রইংরুমে ঢুকলো এক কাজের লোক।

ছেলেটার দিকে তাকালেন মিনিস্টার। তার স্ত্রী হয়তো ঘুম থেকে জেগে উঠেছে,

কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে আবার। তুর্যের কথা জানতে চাইছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কি হয়েছে?"

"স্যার, অমূল্য বাবু নীচের রুমে ওয়েট করছেন..."

কথাটা শোনামাত্রই পিএসের দিকে তাকালেন মাহমুদ খুরশিদ। তারপরই একান্ত অনিচ্ছায় তাড়া দিয়ে বললেন, "উনাকে উপরে নিয়ে আসো।"

ছেলেটা চলে যেতেই পিএস অবাক হয়ে বললো, "অমূল্য বাবু এ সময়ে?"

মৃদু কাঁধ তুললেন মিনিস্টার।

অমূল্য বাবু তার এমন একজন বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষি যাকে না বলা যায় না। ব্যবসায়িক কাজ থেকে শুরু করে রাজনীতি-সবখানেই এই লোকের বুদ্ধিপরামর্শকে তিনি খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এই জীবনে এতো ঠাণ্ডা মাথার মানুষ আর দেখেন নি। তার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ এই লোক হঠাৎ কি মনে তার বাড়িতে চলে এলো?

এই প্রশ্নের জবাবটা তিনি পেলেন কয়েক সেকেন্ড পরই।

"আপনার ফোন বন্ধ...তাই না এসে পারলাম না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্বভাবসুলভ মৃদুস্বরে বললো অমূল্য বাবু।

হোমমিনিস্টার উঠে দাঁড়ালেন। "আসুন, আসুন..."

বাবু কাছে এসে মিনিস্টারের দিকে ভালো করে তাকালো, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসে পড়লো তার পাশে।

"আ-আপনি হঠাৎ?" মাহমুদ খুরশিদ তোতলালেন।

"তুর্যকে ওরা এখনও ছাড়ে নি দেখছি..."

হোমমিনিস্টার আর পিএস স্থিরচোখে চেয়ে রইলো বাবুর দিকে। ঘরে নেমে এলো সুকঠিন নীরবতা। অমূল্য বাবু এ কথা জানলো কি করে?

পরক্ষণেই মাহমুদ খুরশিদ আর তার পিএস বুঝতে পারলো জেফরি বেগ অবশ্যই বাস্টার্ডকে সব বলে দিয়েছে। তার কাছ থেকেই শুনেছে ভদ্রলোক।

"আপনি যদি আমাকে সত্যিকারের বন্ধু ভাবতেন, ঘটনাটা প্রথমেই জানাতেন তাহলে আজ এমন পরিস্থিতি হতো না," আস্তে করে বললো মৌনব্রত পালন করা লোকটি।

দু'চোখ বন্ধ করে মিনিস্টার কেবল মাথা দোলালেন। এই লোকের কাছে মিথ্যে বলা খুব কঠিন হবে তাই চুপচাপ মেনে নিলেন কথাগুলো।

অমূল্য বাবু এবার পিএস আলী আহমেদের দিকে তাকালো অন্তর্ভেদি দৃষ্টিতে। আপনার অবস্থাও দেখছি খুব একটা ভালো না।"

পিএস ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। "ইয়ে, মানে..."

"আমি ভেবেছিলাম আপনার মাথাটা অন্যদের মতো নয়, কিছু কাণ্ডজ্ঞান আছে।" বলেই আক্ষেপে মাথা দোলালো বাবু।

"ওর কোনো দোষ নেই," পাশে বসে থাকা অমূল্য বাবুর একটা হাত ধরে বললেন মিনিস্টার। "আমি আসলে কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। আমি শুধু তুর্যকে বাঁচানোর জন্য যা করার..." আর বলতে পারলেন না তিনি।

"ক্রিমিনালদের সাথে কিভাবে ডিল করতে হয় আপনি জানেন না," আস্তে করে বললো বাবু। "আর কিডন্যাপাররা হলো সবচাইতে জঘন্য ক্রিমিনাল।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন মাহমুদ খুরশিদ। এখন তিনি এটা ভালো করেই জানেন। জঘন্য আর পিশাচ তারা!

"যে ছেলেটা আপনাদের এতো বড় উপকার করলো তাকে রঞ্জুর হাতে এভাবে তুলে দিলেন?"

মাহমুদ খুরশিদ ফ্যাল্যফ্যাল করে চেয়ে রইলেন অমূল্য বাবুর দিকে, কিছু বলতে পারলেন না।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় ডুবে রইলো, তারপরই জানতে চাইলো বাবু, "রঞ্জু এখন

কোথায়?”

মিনিস্টার আর পিএস একে অন্যের দিকে তাকালো, তারা দু’জনেই বুঝতে পারছে না কী বলবে।

“দেশের বাইরে,” পিএস আলী আহমেদ বললো অবশেষে।

কথাটা শুনে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো অমূল্য বাবু।

মিনিস্টার মাহমুদ খুরশিদ এই প্রথম দেখতে পেলেন কম কথা বলা মানুষটির চোখে যেনো আগুন জ্বলছে।

জ্বরটা পুরোপুরি না গেলেও এখন আর বিছানায় শোয়া নেই। নিজের ঘরে পায়চারি করছে বাবলু। একটা অবিশ্বাস্য কথা জানতে পেরেছে কয়েক ঘণ্টা আগে।

ব্ল্যাক রঞ্জু জেনে গেছে সে দিল্লিতে আছে। বদমাশটা জামিনে মুক্তি পেয়ে গেছে!

এই অসম্ভব কাজটা কিভাবে সম্ভব হলো?

খোদ হোমমিনিস্টারের ছেলেকে নাকি অপহরণ করেছে তার দল। মুক্তিপণ হিসেবে নিজের মুক্তি আদায় করে নেবার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস বাগিয়ে নিয়েছে দিল্লিতে তার অবস্থানের কথা।

এসবই বলেছে এমন এক লোক যে তাকে ধরার জন্য হন্যে আছে। এই লোকটাই আহত অবস্থায় ব্ল্যাক রঞ্জু আর তাকে গ্রেফতার করেছিলো। তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করানোর জন্য, তাদের অপরাধের শক্ত প্রমাণ যোগাড় করার জন্য লোকটা দৃঢ়প্রতীজ্ঞ।

ঐ ইনভেস্টিগেটর তাকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে উমার কাছে গিয়েছিলো! মেয়েটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার ফোন নাম্বার নিয়ে ফোন করেছে। ফোন বন্ধ পেয়েও সে হাল ছেড়ে দেয় নি। শেষে বিকেলে আবারো ফোন করে তাকে পেয়ে যায়।

বাবলু অবশ্য লোকটার কথা এতো সহজে বিশ্বাস করে নি। ইনভেস্টিগেটর ফোন রাখতেই উমাকে ফোন করে সে। মেয়েটা তাকে আশ্বস্ত করে জানায়, ইনভেস্টিগেটরের কথা সে বিশ্বাস করেছে।

উমার মতো সহজ-সরল মেয়েকে বিশ্বাস করানো কঠিন কাজ নয়। জেফরি বেগের মতো স্মার্ট লোকের পক্ষে এটা মামুলি ব্যাপার। পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্য সে হাজার মাইল দূরে অমূল্য বাবুকে ফোন করেছিলো একটু আগে।

সব শুনে অমূল্য বাবুও যে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছে সেটা হাজার মাইল দূর থেকেও বুঝতে পেরেছে সে।

"তুমি এসব কী বলছো?" বাবু বলেছিলো সব শুনে। "এটা কি সম্ভব?"

"আমার কাছেও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে..." বাবলু একমত পোষণ করে বলেছিলো।

"তোমাকে ঐ ইনভেস্টিগেটর কিভাবে খুঁজে পেলো?"

বাবুর এ কথায় চুপ মেরে যায় বাবলু।

"মানে, তোমার ফোন নাম্বার সে পেলো কি করে?"

"আ-আমার একজন...ঘনিষ্ঠ লোকের কা-কাছ থেকে..." অবশেষে এই জীবনে প্রথমবারের মতো তোতলায় বাবলু।

কথাটা বলামাত্রই ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে নীরবতা নেমে আসে।

অমূল্য বাবু তাকে বার বার বলে দিয়েছিলো, দিল্লিতে তার অবস্থানের কথা যেনো ঘুণাক্ষরেও কেউ না জানে। কিন্তু বাবুর কথা পুরোপুরি রাখতে পারে নি সে।

"ঐ নার্স মেয়েটা?" আস্তে করে বলেছিলো কম কথার মানুষটি।

বাবলু বরফের মতো জমে যায় কথাটা শুনে। বাবু কী করে এটা জানলো? তারপরই মনে পড়ে গেলো, অমূল্য বাবু এমন একজন মানুষ যার পক্ষে এসব জানা মোটেও কঠিন কোনো কাজ নয়।

"কাজটা তুমি ঠিক করো নি," বাবলুর জবাবের অপেক্ষা না করেই বলে বাবু। তারপর যথারীতি মৌনতা।

"আমার মনে হচ্ছে ঐ ইনভেস্টিগেটর একটা ফাঁদ তৈরি করেছে..." প্রসঙ্গটা পাল্টানোর জন্য বলেছিলো বাবলু।

"না। মনে হচ্ছে ঐ ইনভেস্টিগেটর ঠিকই বলেছে।"

বাবুর এ কথা শুনে সে একমত হতে পারে নি। "ঐ ইনভেস্টিগেটর হয়তো ফোন নাম্বার দেখে বুঝতে পেরেছে আমি দিল্লিতে আছি...।

"হুম," ছোট্ট করে বলে বাবু। ফোনের অপর পাশ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে

পায় সে। "ঐ ইনভেস্টিগেটর বলেছে হোমমিনিস্টার তোমার দিল্লির ঠিকানা রঞ্জুকে দিয়ে দিয়েছে,.."

"হ্যাঁ, কিন্তু..." বাবলু তখনও বুঝতে পারে নি অমূল্য বাবু কি বোঝাতে চাইছে। আবারো ওপাশ থেকে দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায় সে।

"শুনেছি প্রেমে পড়লে নাকি পুরুষমানুষের কাণ্ডজ্ঞান কমে যায়," আস্তে করে বলে বাবু। "এখন দেখছি কথাটা সত্যি।"

বাবলু বিব্রত হয়ে ওঠে। কোনো কথা বের হয় না তার মুখ দিয়ে।

"তুমি যে দিল্লিতে আছে সেটা হোমমিনিস্টার ভালো করেই জানে...সে-ই এটার ব্যবস্থা করেছে।"

ঠিক তখনই ব্যাপারটা ধরতে পারে বাবলু। এটা তার আগেই বোঝা উচিত ছিলো। মি: বেগ যদি ধাপ্পাবাজি করে থাকে, কিংবা তার ফোন নাম্বার দেখে বুঝে থাকে তাহলে এটা কিভাবে বলা সম্ভব হলো? জেল থেকে জামিনে বেরিয়ে আসার পর তার দিল্লিতে চলে আসার কথা হোমমিনিস্টার জানে-এটা ঐ ইনভেস্টিগেটরের পক্ষে জানা অসম্ভব, যদি না হোমমিনিস্টার মি: বেগকে এ কথা বলে থাকে। কিন্তু মিনিস্টার কেন ঐ লোককে এটা বলতে যাবে?

"বুঝতে পেরেছি," আস্তে করে বলে বাবলু। যদিও পুরোপুরি বুঝতে পারছিলো না সে।

"খুশি হলাম। এখনও কিছু কাণ্ডজ্ঞান আছে তাহলে..."

একটু শ্লেষের সাথে বলে অমূল্য বাবু। এটা তার চারিত্রিক বৈশিষ্টের বাইরে একটা কাজ।

"ঐ ইনভেস্টিগেটর কি হোমমিনিস্টারের সাথে দেখা করেছিলো?" বাবলু জানতে চায় বাবুর কাছে। "যদি দেখা করে থাকে...মানে, মিনিস্টার তাকে কথাটা বলে থাকে, তাহলে মি: বেগের কথাই সত্যি।"

"হুম।" একটু চুপ থেকে বাবু আবারো বলে ওঠে। "কিন্তু হোমিসাইডের ঐ ইনভেস্টিগেটরকে মিনিস্টার কেন এটা বলতে যাবে? যদি ধরেও নেই তার ছেলেকে ব্ল্যাক রঞ্জু কিডন্যাপ করেছে তারপরও হিসেব মিলছে না। ঐ ইনভেস্টিগেটর তো অপহরণ কেস দেখাশোনা করে না। সে কিভাবে এই ঘটনায় জড়িয়ে পড়লো?"

"আমারও একই প্রশ্ন। সে কি করে আবারো জড়িয়ে পড়লো।"

একটু ভেবে বাবু বলে ওঠে, "ঠিক আছে, আমি দেখছি। যা শুনলাম তা সত্যি কিনা নিশ্চিত হতে হবে।"

"কিন্তু কিভাবে নিশ্চিত হবেন?"

তার এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাবু শুধু বলে, "আমি তোমাকে একটু পর ফোন করছি।"

তারপরই ফোনটা রেখে দেয়া হয় ওপাশ থেকে।

একটু আগে বাবু তাকে ঠিকই ফোন করেছিলো। কোনো রকম ব্যাখ্যা না দিয়ে শুধু বলেছে, ঐ ইনভেস্টিগেটরের কথা পুরোপুরি সত্যি। বাবলু ইচ্ছে করলে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে।

বাবলুর মনে হয়েছে অমূল্য বাবু যেনো বলতে চাচ্ছিলো রঞ্জুর দলকে বিনাশ করে দিতে, কিন্তু কথাটা বলতে পারে নি স্বল্পভাষী লোকটা। শুধু বলেছে, "অবশ্য আমি ভালো করেই জানি তুমি পালাবে না।"

এ কথাটা বলেই বাবু ফোন রেখে দেয়।

বাবুর মতো ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগও মনে করে সে পালাবে না। রঞ্জুর দলকে মোকাবেলা করবে।

তার একটা বাড়তি সুবিধা আছে-সে জেনে গেছে ব্ল্যাক রঞ্জুর লোকজন সুদূর দিল্লিতে এসে গেছে তাকে হত্যা করার জন্য।

নীচের লাইব্রেরির গুলিন্দর সিং বলেছে, দুপুরের পর এক লোক এসেছিলো তাকে খুঁজতে। তার মানে এরইমধ্যে রঞ্জুর লোকজন নিশ্চিত হয়ে গেছে এই বাড়ির চিলেকোঠার উপর সে থাকে।

দিল্লিতে বাংলাদেশী দূতাবাসের যে দু'জন লোক তার অবস্থানর কথা জানে তাদের মধ্যে কয়েক দিন আগে একজনের বদলী হয়ে গেছে নেপালে। অন্য লোকটাকে ফোন করলে সে জানায় দূতাবাস থেকে তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করার প্রশ্নই ওঠে না।

ব্ল্যাক রঞ্জু তাহলে আবার উদয় হয়েছে! আগুনের ভস্ম থেকে ফিনিক্স পাখির মতো বদমাশটা জেগে উঠেছে। আগের চেয়েও নাকি ভয়ঙ্কর আর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তার দল, অন্তত জেফরি বেগ তা-ই মনে করে।

হুইলচেয়ার ছাড়া যে লোক চলতে পারে না সে এখন তাকে শিকার করার জন্য হাজার মাইল দূরে লোকজন পাঠিয়েছে। যেকোনো সময় তারা আঘাত হানবে।

বাবলু ভেবে পাচ্ছে না এখন সে কী করবে। তার হাতে কোনো অস্ত্র নেই। এই দিল্লি শহরে এমন কেউ নেই যে তাকে এরকম কিছু যোগাড় করে দিতে পারবে। তাছাড়া একজন বাংলাদেশী হিসেবে কারো কাছে অস্ত্রের কথা বললেই তাকে সন্দেহ করবে উগ্রপন্থী ইসলামী দলের সদস্য হিসেবে। দেখা যাবে, সেই লোক পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে আর দিল্লির অ্যান্টি টেরোরিস্ট ব্যাটেলিয়ন ছুটে এসেছে তাকে ধরার জন্য।

তারচেয়েও বড় কথা তার হাতে একদম সময় নেই।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে সে। আগের সেই বাবলু, লোকজন যাকে বাস্টার্ড নামে চিনতো, সে আর এখন নেই। এই কয়েক মাসে তার মধ্যে বাস করা খুনি বাস্টার্ড নেতিয়ে পড়েছে। মানসিকভাবে খুনখারাবির মতো কর্মকাণ্ডে নিজেকে আর জড়াবে না বলেই পণ করেছিলো। হাসপাতালের প্রিজনসেলে বসে একটা প্রতীজ্ঞাই করেছিলো সে : বের হতে পারলে জীবনটাকে সম্পূর্ণ নতুন করে সাজাবে। সেখানে তার অতীত থাকবে না। থাকবে স্বাভাবিক একজন মানুষের জীবন। আট-দশজন মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে সেও ঠিক তাই করবে।

এই প্রতীজ্ঞাটা শুধু নিজের কাছেই সে করে নি। উমাকেও কথা দিয়েছিলো-এই জীবনে আর খুনখারাবির মতো কাজে নিজেকে জড়াবে না। এখন থেকে সে শুধুই বাবলু। তার জীবন থেকে বাস্টার্ডকে হয়তো মুছে ফেলা যাবে না, তবে তাকে আর জেগে উঠতেও দেবে না কখনও।

কিন্তু এখন সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর ঠাণ্ডা মাথার খুনি বাস্টার্ডই পারে তাকে বাঁচাতে।

যেকোনো কাজের দক্ষতা নির্ভর করে চর্চার উপর। দীর্ঘদিন চর্চা না করার ফলে দক্ষতার উপর মরচে পড়ে যায়।

তবে এটাও ঠিক, সাঁতার কিংবা সাইকেল চালানোর মতো ব্যাপারও আছে। দীর্ঘদিন সাঁতার না কাটলে, সাইকেল না চালালেও সেটা কেউ ভুলে যায় না। নতুন করে শিখতেও হয় না।

পায়চারি করতে করতে মাথা খাটাতে লাগলো সে। হাতে খুব বেশি সময় নেই। ব্ল্যাক রঞ্জুর দল ঠিক কখন হানা দেবে সে জানে না। যেকোনো সময় ঘটতে পারে। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে পড়বে।

সবচাইতে সহজ বুদ্ধি হলো, এই জায়গাটা ছেড়ে চলে যাওয়া, যেমনটি অমূল্য বাবু তাকে বলে দিয়েছে। অন্য কোনো রাজ্যে যাওয়ার দরকার নেই, দিল্লির মতো বড় শহরে পালিয়ে থাকার জন্য অসংখ্য জায়গা রয়েছে। ইচ্ছে করলে আজরাতটা অন্য কোথাও কাটিয়ে আগামীকাল ভারতের অন্য কোনো শহরেও চলে যেতে পারে। এখানকার এয়ারলাইন্সের টিকেট খুবই সহজলভ্য। মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পাঁচ-ছয়শ' মাইল দূরের কোনো শহরে চলে গেলে ব্ল্যাক রঞ্জু তার টিকিটাও খুঁজে পাবে না।

কিন্তু এটা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট নয়। পালিয়ে যাওয়ার লোক সে কখনও ছিলো না।

আমি পালাবো না।

যারা তোমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাদেরকে তুমি তাড়িয়ে বেড়াও! ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো। শিকার না, শিকারী হও!

পরিস্থিতিটা সহজ-সরলভাবে ভাবতে শুরু করলো এবার।

ব্ল্যাক রঞ্জু তার একটি ঘাতক দলকে পাঠিয়েছে দিল্লিতে। বাবলু কোথায় আছে সে খবর এরইমধ্যে জেনে গেছে ওরা। এখন যেকোনো সময় আঘাত হানা হবে।

তাদের কাছে অবশ্যই অস্ত্র থাকবে, অন্যদিকে তার কাছে কিছুই নেই। অস্ত্র থাকলে নিজেকে এতোটা অসহায় মনে হতো না। নিরস্ত্র বাবলু কী করে ভয়ঙ্কর একদল লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করবে?

হঠাৎ ঘরটা অন্ধকারে ডুবে যেতেই একটা বিপ করে শব্দ হলো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বাবলু। তারপর নিয়মিত বিরতি দিয়ে বিপটা বেজে চললো।

অন্ধকার ঘরের এককোণে তাকালো সে। ছোট্ট একটা লাল বিন্দু জ্বলছে নিভছে, সেইসাথে বিপ বিপ করে শব্দ করছে।

লোডশেডিং। দিল্লি শহরে মাঝেমধ্যে দশ মিনিটের জন্যে লোডশেডিং হয়ে থাকে। এর বেশি না। ঠিক দশ মিনিট পরই বিদ্যুৎ চলে আসবে।

অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে থেকে লাল আলোক বিন্দুটার দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপরই মাথায় একটা আইডিয়া চলে এলো তার। এতো দ্রুত এলো যে, নিজেই অবাক হয়ে গেলো। কঠিন চাপের মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা রাখলে এ রকম দারুণ আইডিয়া চলে আসে তার মাথায়। মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে বড় কোনো অস্ত্র আর হয় না, সেই মস্তিষ্কটা তার আছে।

ঘরের এককোণে রাখা ডেস্কটপ কম্পিউটারটার কাছে এগিয়ে গেলো সে।

বিপ করতে থাকা লাল বিন্দুটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো সে। এই জিনিসটার ভিন্নধর্মী ব্যবহার খুব ভয়াবহ হতে পারে। শব্দহীন একটি মারণাস্ত্র!

দারুণ! মনে মনে বলে উঠলো বাবলু।

সন্ধ্যার পর কিছুটা নির্ভার হয়েই অফিস থেকে বের হয়ে গেলো জেফরি বেগ। বাবলুকে ফোনে যা বলার বলে দিয়েছে, কিন্তু টেলিফোনের ওপাশ থেকে বাবলুর যে প্রতিক্রিয়া সে পেয়েছে তাতে খুব একটা আস্থা রাখতে পারছে না। বাবলুকে সংক্ষেপে সব বলে দেবার পর ছোট্ট একটা অনুরোধ করেছে। সম্ভব হলে এইটুকু উপকার যেনো সে করে। বাবলু হ্যাঁ-না কিছুই বলে নি। চুপচাপ শুনে গেছে শুধু।

এর বেশি সে আর কীইবা করতে পারতো? দিল্লি আসলেই বহু দূর-বিশেষ করে শত্রুর আস্থা অর্জন করবার জন্য।

এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। তার আশংকা, তূর্যকে হয়তো এরইমধ্যে হত্যা করা হয়েছে। ছেলেটার জন্য খুব মায়া হচ্ছে তার।

অফিসের গাড়ি কখনও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে না জেফরি। আজও করলো না। গাড়িটা রেখে একটা রিক্সা নিয়ে সোজা চলে এলো রেবার বাসার সামনে। আজ রিক্সায় করে ঘুরে বেড়াবে। বাসার সামনে এসে ফোন করার মিনিটখানেক বাদে রেবা বের হয়ে এলো।

"মুড অফ কেন?" রেবা জানতে চাইলো।

"মুড অফ?" হেসে বললো সে। না। একটু টায়ার্ড লাগছে হয়তো," ছোট্ট করে বললো! জেফরি সাধারণত নিজের কাজের ব্যাপারে রেবার সাথে খুব বেশি কথা বলে না।

"কোনো কেস নিয়ে আপসেট?" রেবা ঠিকই ধরতে পেরেছে।

মেয়েটার দিকে তাকালো সে। কোনো রকম সাজগোজ করে নি, তবে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। "কিছুটা।"

জেফরির বাহুটা ধরে বললো রেবা, "টেক ইট ইজি।"

জেফরির ঠোঁটে কাষ্ঠহাসি দেখা গেলো। মাথা নেড়ে সায় দিলো শুধু।

"খুব বেশি আপসেট?"

"বুঝতে পারছি না।"

"ওকে, অফিসের চিন্তা অফিসে কোরো...এখন তুমি আমার সাথে ডেট করছো। ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগকে রেখে আমার প্রেমিক হবার চেষ্টা করো।"

"কোথায় রাখবো ওকে?" হেসে জানতে চাইলো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর।

"আমার কাছে।" কথাটা বলেই হাত পাতলো রেবা। "এখানে রেখে দাও। আমি যত্ন করে রেখে দেবো ওকে। যখন তোমার দরকার হবে আবার ফিরিয়ে দেবো।"

রেবার হাতে কল্পিত কিছু রাখার ভান করলো জেফরি। "রাখলাম। কিন্তু তুমি ওকে কোথায় রাখবে?"

কামিজের গলার ফাঁকে রেখে দেবার ভান করলো রেবা। "এখানে।"

"সর্বনাশ!" কৃত্রিম বিস্ময়ে বলে উঠলো সে।

"সর্বনাশ? কেন?"

"ওখানে রাখলে কি সে আর বের হতে চাইবে," মাথা দোলাললা জেফরি। মরে গেলেও বের হতে চাইবে না। স্বর্গ থেকে কোন পাগল বের হতে চায়, বলো?"

"বের হতে না চাইলে বের হবে না," রেবাও নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো।

"বাপরে!" হাফ ছাড়লো সে। "ঐ ইনভেস্টিগেটরের জন্যে এতো দরদ?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে হাসলো রেবা। "কেন হিংসে হচ্ছে?"

"অবশ্যই হচ্ছে। ওই হারামজাদা ওখানে থাকবে আর আমি রিক্সায় পাশে বসে হাওয়া খাবো...হিংসে হবে না?"

"তোমাকে হাওয়া খেতে বলেছে কে?"

"তাহলে কি চুমু খাবো?"

রেবা আশেপাশে তাকালো। তারা এখন ইডেন কলেজের সামনে আছে। রাস্তাটা বেশ ফাঁকা, কিছুটা অন্ধকারাচ্ছন্নও। আচমকা জেফরিকে অবাক করে দিয়ে খপ করে চুমু খেয়ে

বসলো সে। একেবারে স্বল্প দৈর্ঘের চুমু। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্র মেয়ের মতো সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো, যেনো কিছুই হয় নি।

জেফরি কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলো রেবার দিকে। তারপরই লক্ষ্য করলো সামনের দিকে তাকিয়ে রেবা মিটিমিটি হাসছে।

"দিলে তো ক্ষিদেটা বাড়িয়ে..." বলেই রেবার কানের কাছে মুখ এনে বললো, "এখন তো আমাকে মন ভরে চুমুর ডিনার করতে হবে।"

"চুপচাপ ভদ্রছেলের মতো বসে থাকো," তার দিকে তাকিয়ে বললো রেবা।

"তাই তো ছিলাম, কিন্তু যা করেছে তারপর কি আর ভদ্র থাকা যায়?"

"তোমাকে ভদ্র থাকতে বলেছে কে?"

জেফরি ভিমরি খেলো। তারপর কাছে এসে চুমু খাবার চেষ্টা করতেই বাধা দিলো রেবা।

"এতোক্ষণ রাস্তা খালি ছিলো, কিন্তু এখন না," বলেই রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করলো।

তারা এখন নিউমার্কেট-নীলক্ষেতের চার রাস্তার মোড়ে চলে এসেছে। যানবাহন আর লোকজনের ভীড়।

"ইউ জাস্ট মিস দ্য ট্রেন!" রেবা হেসে বললো।

হেসে ফেললো জেফরিও। "কিন্তু আমি এখনও প্রাটফর্মেই দাঁড়িয়ে আছি...যেকোনো সময় আরেকটা ট্রেনে উঠে পড়তে পারবো।"

"আশা করি তোমার আশা পূরন হবে।" মুখ চাপা দিয়ে হেসে ফেললো রেবা।

তাদের রিক্সাটা সায়েন্স ল্যাবরেটরি ছাড়িয়ে চলে এলো ধানমণ্ডি চার নাম্বারে।

"অ্যাই রিক্সা, সামনে ডানে গিয়ে রেখে দাও," হাসতে হাসতেই রিক্সাওয়ালাকে বললো জেফরি।

"এখানে কী করবে?" অবাক হয়ে জানতে চাইলো রেবা।

"চুমু তো খেতে পারলাম না তাই চটপটি খাবো," বললো জেফরি।

তাদের রিক্সাটা ডানে মোড় নিয়ে ফুটপাতের উপর একটা চটপটির দোকানের সামনে এসে থামলো। বেশ কিছু চেয়ার পাতা। মাত্র একজোড়া ছেলেমেয়ে বসে গল্প করছে। চটপটির দিকে তাদের মনোযোগ নেই।

রিক্সা থেকে নেমে দাঁড়ালো জেফরি, মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করতে যাবে, ঠিক তখনই ব্যাপারটা তার চোখে পড়লো।

রাস্তার ওপারে, ঠিক তাদের বিপরীতে একটা মোটরসাইকেল দাঁড়িয়ে আছে। মোটরসাইকেল আরোহীর মাথায় সানক্যাপ। লোকটা তাদের দিকেই চেয়ে ছিলো, কিন্তু চোখে চোখ পড়তেই সরিয়ে ফেললো সে।

সেটুকুই যথেষ্ট। জেফরির গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেলো মুহূর্তে। রাস্তার ওপার থেকে কাউকে দেখে চট করে চেনার কথা নয়, যদি না বিপরীত দিক থেকে আসা কোনো বাসের হেডলাইটের আলো এসে পড়তো মোটরসাইকেল আরোহীর উপর।

কয়েক সেকেন্ডের মতো হেডলাইটের আলোটা পড়েছিলো, তাতেই সানক্যাপের নীচে জ্বলজ্বলে চোখ দুটো ধরা পড়ে তার কাছে।

এই চোখ ভোলার মতো নয়।

মিলন!

"স্যার?"

রিক্সাওয়ালা ডাকলে সম্বিত ফিরে পেলো সে। রেবা কিছু বুঝতে পারে নি। সে রিক্সা থেকে নেমে ওড়নাটা ঠিকঠাক করছে।

মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে দিলো জেফরি কিন্তু চোখ রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা মোটরসাইকেল আরোহীর দিকে।

"কতো রাখমু, স্যার?"

"রাখো," রিক্সাওয়ালার দিকে না তাকিয়েই বললো জেফরি।

"অ্যাই, কি দেখছো?" রেবা তার বাহু ধরে জিজ্ঞেস করলো।

চট করে তাকালো মেয়েটার দিকে। "তুমি বসো...আমি আসছি।" আবারো তাকালো রাস্তার ওপারে। মোটরসাইকেল আরোহী একটুও নড়ছে না, তবে এখন সে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরানোর চেষ্টা করছে।

রেবা রাস্তার ওপারে তাকালো, তার চোখে কিছুই ধরা পড়লো না। কিছু একটা বলতে গিয়েও বললো না সে। চুপচাপ ফুটপাতের উপর চটপটির দোকানের সামনে রাখা একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে পড়লো।

রিক্সাওয়ালা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে তার দিকে। কতো ভাড়া রাখবে, কতো ফেরত দেবে বুঝতে পারছে না। তার দিকে চট করে তাকিয়ে জেফরি চলে যেতে ইশারা করলো হাত নেড়ে। লোকটা পঞ্চাশ টাকা নিয়েই চলে গেলো।

রেবার পাশে এসে বসলো জেফরি, কিন্তু বার বার চোখ চলে যাচ্ছে। ওপারে।

"অ্যাই, কি হয়েছে তোমার?" রেবা আবারো জানতে চাইলো। কিছু একটা বুঝতে পারছে সে।

"উমমম..." রেবার দিকে তাকালো। "কিছু না। তুমি অর্ডার দাও," বলেই আবার তাকালো রাস্তার ওপারে। মোটরসাইকেলটা দেখা যাচ্ছে না কারণ সেটার সামনে একটা বাস এসে থেমেছে। একটু পরই বাসটা চলে গেলে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

মোটরসাইকেলটা নেই!

চমকে উঠলো সে। রাস্তার এদিক ওদিক তাকালো। দেখতে পেলো না। রেবার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলেও বার বার রাস্তার দিকে তাকাতে লাগলো জেফরি বেগ।

হয়তো কিছুই না, সে খামোখাই আশংকা করছে। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলো।

"আমি ফুচকা খাবো। তুমি কি নেবে?" রেবা জানতে চাইলো। দোকানি ছেলেটা তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"চটপটি," ঝটপট বলেই আবারো তাকালো রাস্তার দিকে। কোনোভাবেই সে আশ্বস্ত হতে পারছে না।

রেবা দোকানিকে অর্ডার দিয়ে জেফরির দিকে তাকালো। "তুমি এভাবে রাস্তায় কী দেখছো?"

"কিছু না। এক পরিচিত লোককে দেখেছি মনে হয়, চিনতে পারছি না..."

"ও," কথাটা বলেই ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে মোবাইলফোনটা বের করলো। ওটা ভাইব্রেট করছে। "ওহ্, মোবাইলটা হাতে তুলে নিলো সে। "বাবা ফোন করেছে...একটু..." বলেই রেবা কলটা রিসিভ করলো।

জেফরি আবারো তাকালো রাস্তার দিকে। রেবার ফোনালাপের দিকে তার একটুও মনোযোগ নেই। অজানা আশংকা জেঁকে বসেছে তার মনে।

রেবা নীচুস্বরে তার বাবার সাথে কথা বলে যাচ্ছে।

জেফরি চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে গেলো। সে কোনোভাবেই চিন্তামুক্ত হতে পারছে না। তার ধারণা মিলন আশেপাশেই আছে। হয়তো একা নয়। তাদের উপর নজর রাখছে। রেবা সঙ্গে না থাকলে এতোটা চিন্তিত হতো না। এখন যদি রিক্সা করে ফিরে যাবার চেষ্টা করে তাহলে সহজ টার্গেট হয়ে যাবে। বাইকের লোকটা যদি সত্যি মিলন হয়ে থাকে তাহলে সে রেবাকে নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়ে গেছে।

তার মাথায় অন্য একটা আইডিয়া এলো।

ফোনটা রাখতেই রেবা দেখলো জেফরি রাস্তার এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। "কী ব্যাপার... তোমার হয়েছে কি?" দারুণ অবাক হয়ে বললো সে।

হাসি হাসি মুখে জেফরি তাকালো রেবার দিকে। হঠাৎ তাকে অবাক করে দিয়ে চেয়ারটা টেনে একটু সামনে এগিয়ে এসে তার কানের পাশে চুলে হাত বোলাতে লাগলো। "তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে তো!"

জেফরি বেগের এমন দ্রুত পরিবর্তনে যারপরনাই অবাক হলো রেবা। আশ্চর্য! হঠাৎ কী এমন হলো? মনে মনে ভাবলো সে।

মিলন দাঁড়িয়ে আছে একটা কসমেটিক শপের ভেতর। কাঁচের দরজার পাশে থরে থরে সাজানো পণ্য নেড়ে চেড়ে দেখে যাচ্ছে সে। কাউন্টারে বসা দোকানি মনে করছে খুব মনোযোগ দিয়ে ওগুলো দেখছে একজন কাস্টমার।

কিন্তু মিলনের তীক্ষ্ণ চোখ কাঁচের দরজার ভেতর দিয়ে রাস্তার ওপারে নিবদ্ধ। ধানমণ্ডি চার নাম্বারের ফুটপাতে যে চটপটির দোকানটা আছে সেখানে বসে আছে জেফরি বেগ আর তার প্রেমিকা।

একটু আগে রিক্সা থেকে নামার সময় জেফরি বেগের সাথে অনেকটা চোখাচোখি হয়ে গেছিলো তার। তবে তার ধারণা ঐ ইনভেস্টিগেটর তাকে দেখে চিনতে পারে নি। না পারারই কথা। হয়তো একটু সন্দেহ হয়েছিলো, এই যা।

সামনে একটা বাস এসে দাঁড়ালে মিলন দ্রুত তার মোটরবাইকটা নিয়ে সটকে পড়ে পাশের একটা গলিতে। ভাগ্য ভালো, পাঁচগজ সামনেই গলিটা ছিলো। তিন-চারটা প্রাইভেটকারের পাশে বাইকটা রেখে এই কসমেটিক শপে ঢুকে পড়েছে সাইডদরজা দিয়ে। শপের আরেকটা দরজা আছে মেইনরোডের দিকে মুখ করে। সেটা দিয়েই এখন তার টার্গেটকে দেখে যাচ্ছে সে।

তার ধারণাই ঠিক, জেফরি বেগের মনে একটু সন্দেহ তৈরি হলেও এখন সে পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত। প্রেমিকাকে নিয়ে চটপটি-ফুচকা খাবে। লজ্জাশরম ভুলে প্রকাশ্যেই প্রেমিকার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। মেয়েটার চুলে হাত বোলাচ্ছে, তার কানে কানে কী যেনো বলছে। কথাটা শুনে মেয়েটা লজ্জা পেলো। জেফরি বেগকে আলতো করে ধাক্কা মেরে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে মোবাইলফোনটা বের করে কানে ধরলো সে। কেউ হয়তো কল করেছে তাকে। মেয়েটার চোখেমুখে চাপা হাসি। কিন্তু ইনভেস্টিগেটর মেয়েটার গালে আলতো করে টোকা দিলে কৃত্রিম রাগ দেখালো সে। তাদের সময় খুব ভালো যাচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে মিলনের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। পলির মুখটা ভেসে উঠলো তার মনের পর্দায়।

তারাও এভাবে ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত উপভোগ করেছে। এভাবে একে অন্যেকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। হয়তো শপিং করতে বের হয়েছে দুজন, ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ পলিকে খুব কাছে পাবার ইচ্ছে জেগে উঠতো। সব কিছু বাদ দিয়ে ফিরে যেতো বাড়িতে। তারপর প্রেমের চূড়ান্ত মুহূর্তে ডুবে যেতো তারা।

কিন্তু এসবই এখন অতীত। আর কখনও পলির সাথে ওভাবে কোনো মুহূর্ত কাটানো হবে না। ভালোবাসার তীব্রতায় মেয়েটা কখনও তার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলবে না : "আমাকে আরেকটু আদর করো!"

মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেললো সে। এখন এসব ভাবার সময় নয়। তবে একটু পর যে কাজ করবে তার জন্যে এরকম আবেগের, ক্রোধের দরকার আছে। প্রতিশোধের স্পৃহা না জাগলে কাজটা ভালোমতো করতে পারবে না।

জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে হাত ঢোকালো। সাইলেন্সার পিস্তলটার অস্তিত্ব টের পেলো আরেকবার। আজকের জন্যে এটাই ব্যবহার করবে। গুলির শব্দ হোক, লোকজন ভয়ে ছোটাছুটি করুক সেটা তার কাম্য নয়। নীরব ঘাতকের মতো দ্রুত কাজ করে সটকে পড়বে। ঐ ইনভেস্টিগেটর কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে।

কী করবে না করবে সেটা আরেকবার গুছিয়ে নিলো মনে মনে। দ্বিতীয় কোনো সুযোগ সে পাবে না। সুতরাং মাথা ঠাণ্ডা রেখে, সুন্দরভাবে কাজটা করতে হবে। কোনো ভুল করা চলবে না। আগামীকালই দেশ ছেড়ে চলে যাবে। বহু দূরে গিয়ে শুরু করবে এক নতুন জীবন।

মিলন যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিলো সে দরজা দিয়েই বের হয়ে গেলো। বাইকটা নিয়ে মেইনরোডের দিকে না গিয়ে সোজা চলে গেলো আবাসিক এলাকার ভেতরে। একটু ঘুরপথে চলে আসবে নির্দিষ্ট গন্তব্যে। মূল কাজটার জন্য মাত্র পাঁচ সেকেন্ড সময় বরাদ্দ রেখেছে।

এতেই হবে, মনে মনে বললো সে।

রেবা প্রথমে বুঝতে পারে নি। একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিলো। কিন্তু কানের কাছে মুখ এনে জেফরি যখন বললো-"মুখে হাসি হাসি ভাব করে রাখো। আমার কথার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাবে না- তখন সে বুঝতে পেরেছিলো বিরাট কোনো সমস্যা হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করার উপায় ছিলো না। বরং জেফরির কথামতো মুখে হাসি ধরে রেখে সে জানতে চেয়েছিলো কি হয়েছে।

দাঁত বের করে হেসে জেফরি বলেছিলো, "পরে বলছি। এখন তুমি মোবাইল ফোন বের করে জামানকে একটা কল করবে...কিন্তু ভাব করবে যেনো তোমার ফোনে কল এসেছে।"

মুখ টিপে রেবা জানতে চায় তখন, "তুমি কি খারাপ কিছু"।

রেবার কথা শেষ না হতেই তার কানে মুখ এনে জেফরি বলে, "এখন কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। যা বলছি তাই করো।"

রেবা জানতে চায়, "জামানকে কী বলবো?" তার মুখের অভিব্যক্তি একেবারেই বিপরীত।

"বলবে, জামান যেনো ধানমণ্ডি থানার পেট্রলকারকে এক্ষুণি চার নাম্বারের এই চটপটির দোকানের কাছে চলে আসতে বলে। ইমার্জেন্সি।"

কথাটা শুনে রেবার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও সে হাসি হাসি মুখে মাথা নেড়ে সায় দেয়। জেফরিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ফোনটা বের করে জামানের নাম্বারে ডায়াল করে সে।

পা দোলাতে দোলাতে রেবার গালে আলতো করে টোকা মারে জেফরি। "বলবে, আমার ব্যাকআপের দরকার। একটুও যেনো দেরি না করে।"

ভেতরে ভেতরে রেবা ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেও মুখে দুষ্টুমিমাখা হাসি এঁটে বলে, "ঠিক আছে।"

ওপাশ থেকে জামান কলটা রিসিভ করে যারপরনাই অবাক হয়। খুব প্রয়োজন না পড়লে রেবা তাকে কখনও ফোন করে না। জেফরি নিশ্চিত, জামান ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

জেফরির শিখিয়ে দেয়া কথাগুলো একদমে বলে যায় রেবা, তবে তার মুখে এমন অভিব্যক্তি লেগে থাকে যে কেউ বুঝতেই পারবে না কী বিষয় নিয়ে সে কথা বলছে।

ফোনটা রেখে যথারীতি হাসি হাসি মুখে বলে রেবা, "আমার খুব ভয় করছে!"

"ভয় পেয়ো না। আমি আছি," তাকে আশ্বস্ত করে রেবার হাতটা ধরে হাসি হাসি মুখে বলে জেফরি বেগ। "উল্টাপাল্টা কিছু হলে সোজা মাটিতে শুয়ে পড়বে।" ভয়ঙ্কর এই কথাটা এমনভাবে সে বলে যেনো মজার কোনো জোক বলেছে।

চটপটি আর ফুচকা চলে এলো তাদের সামনে। দোকানি ছেলেটা একটা টুল টেনে এনে তার উপর প্লেট দুটো রেখে চলে গেলো। দুজনের কেউই ফুচকা-চটপটি নিয়ে ভাবছে না এখন।

জেফরি জানে, ধানমণ্ডি থানার কোনো পেট্রলকার যদি আশেপাশে থাকে তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যে চলে আসতে পারবে। কিন্তু এই কয়েক মিনিটই হচ্ছে সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ।

তাদের সামনের রাস্তায় যানবাহনগুলো উত্তর দিক থেকে আসছে, সুতরাং সেদিকেই তীক্ষ্ণ নজর রাখলো জেফরি বেগ। সারি সারি প্রাইভেটকার আর বাস-মিনিবাস আসছে। একটা মোটরবাইককে দূর থেকে চিহ্নিত করাটা সহজ কাজ নয়।

এমন সময় সবগুলো যানবাহন থেমে গেলো একে একে।

সিগন্যাল পড়েছে।

তাদের সামনে অসংখ্য প্রাইভেটকার আর বড় বড় বেশ কয়েকটি বাস দাঁড়িয়ে আছে সবুজ বাতি জ্বলার অপেক্ষায়। জেফরি বেগ টের পেলো রেবা আস্তে করে তার একটা হাত ধরেছে। সে ফিরে তাকালো মেয়েটার দিকে। ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। "ভয় পেয়ো না।" আশ্বস্ত করলো তাকে।

"আমরা এখান থেকে চলে যাই...চলো," কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো সে।

"হ্যাঁ, চলে যাবো। একটু অপেক্ষা করো।" কথাটা বলেই থেমে থাকা যানবাহনের দিকে তাকালো আবার। মিলনের টিকিটাও দেখা যাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো, সে হয়তো ভুল দেখেছে। ওটা মিলন ছিলো না।

সিগন্যাল বদলে গেলে যানবাহনগুলো আবার চলতে শুরু করলো। প্রথমে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলো থেমে থাকা গাড়িগুলো।

একটা বাস তাদেরকে অতিক্রম করতেই হঠাৎ দেখতে পেলো সেটার পেছন থেকে একটা মোটরসাইকেল বেরিয়ে আসছে। খুব বেশি হলে তাদের থেকে মাত্র দশ গজ দূরে।

জেফরি বেগ নিশ্চিত, এই বাইকটাই একটু আগে দেখেছিলো রাস্তার ওপারে। আরোহীর মুখটা এবার নির্ভুলভাবে চিনতে পারলো। মাথায় সানক্যাপ।

মিলন!

জেফরি বেগ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এক ঝটকায় শোল্ডারহোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে আনলো।

"শুয়ে পড়ো, রেবা?" পেছনে না তাকিয়েই চিৎকার করে বলে উঠলো সে।

দেখতে পেলো মিলন একহাতে বাইকটার হ্যান্ডেল ধরে রেখেছে, তার অন্য হাতে একটা পিস্তল। তাদের দিকেই তাক করা!

প্রথম গুলিটা করলো মিলন। চলন্ত বাইক থেকেই। একেবারে ভোতা একটি শব্দ। জেফরি একটুও না সরে পাল্টা গুলি চালালো মিলনকে লক্ষ্য করে। প্রচণ্ড শব্দে প্রকম্পিত হলো চারপাশ। কিন্তু কারোর লক্ষ্যই ভেদ হলো না।

দ্বিতীয় গুলিটা যখন মিলন করবে তখন তাদের দুজনের মধ্যে মাত্র কয়েক গজের দূরত্ব। মিলন তার বাইকের গতি না কমিয়েই জেফরিকে অতিক্রম করার সময় গুলিটা চালালো।

ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো জেফরি বেগ। একটা পাস্টিকের চেয়ারসহ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মাটিতে। তবে সে নিশ্চিত, গুলিটা তার গায়ে লাগে নি। সঙ্গে সঙ্গে তাকালো রাস্তার দক্ষিণ দিকে।

মিলনের বাইকটা ততোক্ষণে ত্রিশ-চল্লিশ গজ দূরে চলে গেছে। রাস্তার লোকজন গুলির শব্দ শুনে আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে শুরু করে দিয়েছে। জেফরি উঠে দাঁড়ালেও আর গুলি করলো না। ভালো করেই জানে কোনো লাভ হবে না। মাঝখানে ক্রশফায়ারে পড়ে নিরীহ লোকজনের প্রাণহানি হবার আশংকা রয়েছে।

রাগেক্ষোভে তার শরীর কাঁপতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো রেবার কথা। এক ঝটকায় পেছনে ফিরে তাকালো সে। দৃশ্যটা দেখে তার হৃদস্পন্দন কয়েক সেকেন্ডের জন্য থেমে গেলো।

রেবা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। একটুও নড়ছে না সে।

"রেবা!" বুকের ভেতর থেকে চিৎকারটা ভেসে এলো জেফরি বেগের।

বড়জোর দুই মিনিট পরই ধানমণ্ডি থানার একটি টহলগাড়ি এসে পড়লেও ততোক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। সন্ত্রাসী মিলন দু' দুজন মানুষকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে পালিয়ে গেছে।

টহল গাড়ি থেকে পুলিশ নেমে এলে তোকজনের ভীড়টা সরে গেলো। কেউ কেউ পুলিশ দেখে কেটে পড়লো ঘটনাস্থল থেকে। একজন সাব ইন্সপেক্টর ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এসে দেখতে পেলো জেফরির কোলে

অচেতন রেবা। গ্লাস থেকে পানি নিয়ে তার মুখে ঝাঁপটা দিচ্ছে।

রেবাকে উপুড় হয়ে থাকতে দেখে জেফরি বেগ চিৎকার দিয়ে মাটিতে হাটু গেঁড়ে বসে পড়েছিলো। সে ভেবেছিলো রেবা গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তার হৃদস্পন্দন কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় তখন। কিন্তু দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রেবার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। শরীরে কোনো গুলির আঘাত নেই।

রেবা আসলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো। ঠিক সময়ে ঝাঁপ দিয়ে বেঁচে গেছে সে। কারণ মিলনের দুটো গুলিই বিদ্ধ হয়েছে রেবা যেখানে বসেছিলো ঠিক তার পেছনে। তবে মানসিক চাপটা নিতে পারে নি। মাটিতে ঝাঁপ দিয়েই জ্ঞান হারায়।

পুরো ঘটনায় ভীষণ মুষড়ে পড়েছে রেবা। মৃত্যুর খুব কাছ থেকে বেঁচে গেছে সে।

টহল পুলিশের জিপে করে রেবাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার সময় একটা বিষয় নিয়ে জেফরি ভেবে গেছে : মিলন তাকে এতো কাছে পেয়েও লক্ষ্যভেদ করতে পারলো না কেন? তার দু দুটো গুলি ব্যর্থ হয়েছে। অথচ এরচেয়ে অনেক দূর থেকে সে জেফরির বাম বুকে, ঠিক হৃদপিণ্ড বরাবর গুলি চালিয়েছিলো।

তাহলে কি রেবাই ছিলো টার্গেট?

না। মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিলো সে। রেবাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে চলে এলো হোমিসাইডে।

জামান তার জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলো। বেশিরভাগ কর্মকর্তা কর্মচারি চলে গেছে। হাতে গোনা কয়েকজন রাত্রিকালীন ডিউটি দিচ্ছে এখন। আজকে জামানের নাইট-ডিউটি ছিলো না, বাড়ি থেকে সোজা চলে এসেছে এখানে। রেবাকে দিয়ে যখন তাকে ফোন করানো হয়েছিলো তখন সে নিজের বাড়িতেই ছিলো।

মানসিকভাবে যতোটা বিদ্ধস্ত তারচেয়েও বেশি ক্ষুব্ধ জেফরি বেগ। ব্ল্যাক রঞ্জুর দল, বিশেষ করে মিলন তার পথে বাধা হিসেবে যে-ই আসুক না কেন তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে একটুও পিছ পা হচ্ছে না। প্রথমে তার সহকারী জামানকে গুলি করলো ঠাণ্ডা মাথায়, তার বুকেও গুলি চালালো, ভাগ্যের গুণে সে বেঁচে গেছে। এরপর হোমিসাইডে পলিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে আসা হলে ফোন করে রীতিমতো হুমকি দিতে শুরু করে। এখন আবার তার উপর হামলা চালালো। আরেকটুর জন্যে রেবাসহ সে নিজেও বড় কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে যেতে পারতো।

জামানকে নিয়ে নিজের অফিসে এসে বসতেই তার ফোনে রিং হলো। একটা অপরিচিত নাম্বার থেকে কল করা হয়েছে। জেফরির সত্তা বলছে, এটা মিলনের ফোন!

কলটা রিসিভ করলো সে, তবে কিছু বললো না। ওপাশ থেকে কয়েক মুহূর্ত কোনো সাড়া নেই। তারপরই সেই পরিচিত কণ্ঠটা বলে উঠলো :

"চোখের সামনে প্রেমিকাকে খুন হতে দেখে কেমন লাগছে?"

জেফরি ভুরু কুচকে তাকালো জামানের দিকে। ছেলেটা বিস্ময়ে চেয়ে আছে। মিলন মনে করছে রেবা মারা গেছে। তাহলে মিলনের টার্গেট ছিলো রেবা?

মাইগড! কিন্তু রেবা কেন?

মোবাইল ফোনটা লাউস্পিকার মোড়ে দিয়ে দিলো জেফরি বেগ "মিলন...আমি তোকে ছাড়বো না!" দাঁতে দাঁত পিষে বললো সে।

"আরে আমিই তো তোকে ছাড়বো না, শূয়োরের বাচ্চা!"

"তুই খুব জলদিই আমার দেখা পাবি, বানচোত!" জেফরির মুখ থেকে সচরাচর গালি বের হয় না তবে আজ তার ব্যতিক্রম হলো।

"ইচ্ছে করলে তোকে খুব সহজেই মেরে ফেলতাম, কিন্তু মারি নি। আমি চাই তুইও আমার মতো কষ্ট পা..."।

মিলনের এ কথাটা শুনে জেফরি একটু ধন্দে পড়ে গেলো। মানে কি?

"প্রেমিকার লাশ দেখতে কেমন লাগছে এখন?"

জেফরি চুপ মেরে রইলো।

"খুব খারাপ লাগছে?" মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলো মিলন।

"আমারও ঠিক এরকম খারাপ লেগেছিলে।"

"মানে?" জেফরি কথাটা না বলে পারলো না।

"মানেটা এখনও বুঝতে পারছিস না?" কথাটা বলামাত্রই উন্মাদগ্রস্তের মতো হাসি দিলো সে। "তুই আমার পলিকে খুন করেছিস, আমি তোরটাকে খুন করলাম। ভেবেছিস হিসেব চুকে গেছে?" আবারো উন্মাদগ্রস্তের হাসি। "না, না! হিসেব এখনও বাকি আছে..."

লাইনটা কেটে দিলো মিলন।

জেফরি চেয়ে রইলো জামানের দিকে। "মাইগড! জামান...মিলনের দ্বিতীয় স্ত্রী পলি নাকি আমার হাতে মারা গেছে!"

"কিন্তু কিভাবে? কখন?" জামানও কথাটা শুনে অবাক হলো।

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

"স্যার, পরিস্থিতি খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে," জামান আতঙ্কিত হয়ে বললো। "এভাবে বসে থাকলে হবে না। আমাদেরকে রিঅ্যাক্ট করতে হবে।"

গম্ভীরমুখে জেফরি বেগ মাথা নেড়ে সায় দিলেও বুঝতে পারলো না কিভাবে রিঅ্যাক্ট করবে।

"স্যার?" জেফরিকে চুপ থাকতে দেখে বললো জামান।

মুখ তুলে তাকালো সে।

"আমি ব্ল্যাক রঞ্জুর মালিকানাধীন দুটো লঞ্চের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিলাম..."

কথাটা শোনা মাত্রই জেফরির মনে পড়ে গেলো, জামানকে এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছিলো সে। "হ্যাঁ, হ্যাঁ...কিছু পেয়েছো?"

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে নিলো জামান। "লঞ্চ মালিক সমিতি থেকে জেনেছি, লঞ্চ দুটোর নাম হলো, এমভি আকাশ আর এমভি মেঘ..."

"মালিক সমিতি কি করে নিশ্চিত হলো ঐ দুটো লঞ্চ রঞ্জুর?" জেফরি জানতে চাইলো।

"লঞ্চ দুটোর মালিকানা রঞ্জুর বড় ভাই মঞ্জুর নামে...তাছাড়া বরিশাল লাইনে লঞ্চ দুটো এনলিস্ট করার জন্য ব্ল্যাক রঞ্জু নাকি সমিতির প্রেসিডেন্টকে চাপ দিয়েছিলো।"

"আচ্ছা," বললো জেফরি। "তাহলে তাদের অনুমানই ঠিক। ও দুটো অবশ্যই রঞ্জুর লঞ্চ। তার অনেক ব্যবসাই ভায়ের নামে ছিলো।"

"জি, স্যার...মালিক সমিতির অনেকেই এটা জানে। কাগজপত্রে মালিকানা রঞ্জুর ভাই মঞ্জু, যে বাস্টার্ডের হাতে খুন হয়েছে..."

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। "লঞ্চ দুটো এখন কোথায় আছে?"

"মালিক সমিতি এ ব্যাপারে কিছু জানে না তবে..."

"তবে কি?" জেফরি কিছুটা আশান্বিত হয়ে বলে উঠলো।

"সমিতির প্রেসিডেন্ট জানিয়েছে, লঞ্চ দুটো অবশ্যই কোনো ডকইয়ার্ডে অ্যাঙ্কর করা আছে।"

"কোন ডকইয়ার্ডে থাকতে পারে?"

জামান কাঁধ তুললো। "নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে নি। আমরা যেমন ধারণা করেছিলাম, ঢাকা কিংবা নারায়ণগঞ্জের কোনো ইয়ার্ডেই হবে।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো জেফরি। "ওটা ঢাকায়...নারায়ণগঞ্জে না। আমি নিশ্চিত।"

জামানও উঠে দাঁড়ালো। "জি, স্যার। সেন্ট অগাস্টিন থেকে নারায়ণগঞ্জ অনেক দূরের পথ..." একটু চুপ করে থেকে বললো, "স্যার কি বাসায় যাবেন এখন?"

জামানের দিকে চেয়ে রইলো জেফরি। "হুম।"

"একটা কথা বলবো, স্যার?"

"বলো।"

"স্টোররুম থেকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটটা নিয়ে যান।"

সহকারীর দিকে চেয়ে রইলো জেফরি বেগ।

"প্লিজ," বললো জামান।

"ঠিক আছে," মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো জেফরি।

জামান স্টোররুমে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটটা নিয়ে ফিরে ফিরে এসে দেখলো তার বস কী যেনো ভেবে যাচ্ছে।

"স্যার?"

অন্যমনস্কভাবটা কাটিয়ে উঠে সহকারীর দিকে তাকালো জেফরি। বুলেটপ্রুপ জ্যাকেটটা জামানের হাত থেকে নিয়ে নিলো সে। অফিস থেকে বের হয়ে যাবে ঠিক তখনই কী মনে করে যেনো থেমে গেলো।

"জামান, আজ রাতে তোমার ডিউটি নেই, তাই না?"

"জি, স্যার।"

"কিন্তু আমি চাই তুমি আজরাতে অফিসেই থাকো।"

জামান প্রশ্ন করতে গিয়েও করলো না। চুপচাপ বসের কথা মেনে নিলো। "ওকে, স্যার।"

আর কোনো কথা না বলে অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় জেফরি বেগ টের পেলো খুব ক্লান্ত লাগছে। একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার। কিন্তু সে জানে না, আজকের রাতটা তার জীবনে একেবারেই অন্যরকম একটি রাত হতে যাচ্ছে।

কারোলবাগে রাত নেমে এসেছে। বেড়ে গেছে শীতের তীব্রতা। লোকজন যে যার ঘরে ফিরে এসে রাতের খাবার খেয়ে টিভি দেখছে নয়তো গল্পগুজব করছে। কিছু কর্মহীন বয়স্ক মানুষ বাড়ির বাইরে চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছে গায়ে মোটা উলের সোয়েটার কিংবা কাশ্মিরি শাল চাপিয়ে। তবে বাবলু যেখানে থাকে সেই গলিতে কোনো চায়ের দোকান নেই। রাত দশটার মধ্যেই গলিটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। অবশ্য গলি থেকে এগিয়ে গেলে একটু সামনেই দুএকটি চা আর ফলের জুসের দোকান রয়েছে, সেখানটায় কিছু। লোকজনের দেখা মিলবে।

বাবলুর বাড়ির নীচে যে লাইব্রেরিটা আছে সেটা আর সব দিনের মতো রাত নটার পরই বন্ধ হয়ে গেছে। তার বাড়ির আশেপাশে কোনো দোকানপাট না থাকার কারণে গলিটা বেশ সুনশান।

একটা গাঢ় নীল রঙের মাইক্রোবাস এসে থামলো তার বাড়ির সামনে। গাড়ির কাঁচ একেবারে গাঢ় কালচে। ভেতরের বাতি নিভিয়ে রাখার কারণে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। প্রায় মিনিটখানেক পর সাইড দরজাটা আস্তে করে খুলে গেলে তিনজন যুবক বেরিয়ে এলো গাড়ি থেকে। তাদের সবার পরনে ফুলস্লিভ আর হাই কলারের কালো গেঞ্জি, তার উপর কালচে রঙের ব্লেজার আর কালো গ্যাবাডিনের ফুলপ্যান্ট। একজনের মাথায় সানক্যাপ। বাকি দু'জনের মধ্যে একজনের মাথাভর্তি কোকড়া চুল, অন্যজনের মাথার চুল একদম ছোটো ছোটো করে ছাটা। পুরু গোঁফ আছে মুখে।

তিনজন যুবকের শারিরীক গঠন বেশ ভালো। লম্বা আর সুগঠিত পেশি। সানক্যাপ বাকি দু'জনের দিকে তাকিয়ে আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলে কোকড়া চুলের যুবকটি ঢুকে পড়লো বাবলুর বাড়িতে। এই বাড়িতে কোনো দারোয়ান নেই। তিনটি ফ্লোরের মধ্যে নীচের ফ্লোরটার প্রায় পুরোটাই মুলিন্দরের লাইব্রেরি। দোতলা আর তিনতলা একটি কসমেটিকস ফ্যাক্টরির গোডাউন। বাবলু থাকে তিনতলার উপর চিলেকোঠায়।

মেইন গেটটা খোলা দেখতে পেয়ে কোকড়াচুল অবাক হলো। সে ভেবেছিলো এটার তালা আগে খুলতে হবে। মুচকি হেসে ফিরে তাকালো পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জনের দিকে, তারপর ঢুকে পড়লো ভেতরে। একটু পর গোঁফওয়ালা যুবকটিও অনুসরণ করলো তাকে। তবে সানক্যাপ দাঁড়িয়ে রইলো মাইক্রোটার সামনে।

তার নজর তিনতলার উপরে চিলেকোঠার দিকে। রাস্তার দিকে মুখ করে যে জানালাটা আছে সেটা দিয়ে দেখতে পেলো ঘরে টিভি চলছে-বিভিন্ন রঙের আলোর দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

মুচকি হাসলো সে। তারা এখন নিশ্চিত, বাস্টার্ড ঘরেই আছে। প্রথমে যখন তার খোঁজে এখানে লোক পাঠালো তখন খুব হতাশ হয়েছিলো। মনে করেছিলো বানচোতটা বোধহয় আগেভাগে খবর পেয়ে সটকে পড়েছে। তবে মিনিস্টারের পিএস দূতাবাসের মাধ্যমে খবর নিয়ে জেনেছে, বাস্টার্ড তার নিজের ঘরেই আছে। একদম পাক্কা খবর। কোনো ভুল নেই।

সানক্যাপ জানে, ভুল হবার ঝুঁকিটা কতো বড় হতে পারে। হাতঘড়িতে সময় দেখলো। ইতিমধ্যেই তার দু'জন লোক তিনতলায় চলে গেছে হয়তো। কাজটা খুব একটা কঠিন নয়। বিশেষ করে টার্গেট যখন কিছুই জানে না-এবং নিরস্ত্র। তারপরও সতর্ক থাকা দরকার। সহজ কাজেই গোলমাল বাধে বেশি।

একটু পায়চারি করলো সে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাটা সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। তাছাড়া দিল্লির শীতটাও শরীরে মানিয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে। মাইক্রোর ড্রাইভার ছেলেটাকে ইশারা করে কিছুটা সামনে এগিয়ে গেলো সে। একটু সময় লাগবে, কারণ তিনতলার উপর বাস্টার্ডের চিলেকোঠায় যেতে হলে একটা লোহার গ্রিলের দরজা খুলতে হবে। এর আগে যাকে পাঠিয়েছিলো, সেই কোকড়াচুলের ছেলেটা জানিয়েছে তিনতলার উপর সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে গ্রিলের গেটটার কথা। যদিও বাস্টার্ড ঘরে আছে তারপরও গ্রিলের

দরজায় তালা মারা থাকতে পারে। তালাটা নিঃশব্দে কাটার জন্য সরঞ্জাম রয়েছে তাদের কাছে। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। তারপরই খেল খতম।

মাইক্রো থেকে দশ গজ দূরে গিয়েই আবার ঘুরে দাঁড়ালো সানক্যাপ। আস্তে আস্তে এক পা দু'পা করে মাইক্রোর সামনে আসতেই মাথায় মাঙ্কিক্যাপ, গলায় মাফলার, চশমা পরা এক ভদ্রলোক তার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো। লোকটার কাঁধে শান্তি নিকেতনি ধরণের কাপড়ের ব্যাগ। হাতে চামড়ার দস্তানা। ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট ধরে রেখেছে।

"ভাইসাব, আপকো পাস ম্যাচেস হায়?" দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন জ্বালানোর ভঙ্গি করে বললো লোকটি।

হাত নেড়ে না করে দিলো সানক্যাপ। একটু সামনে এগিয়ে তাকালো তিনতলার উপরে। ভদ্রলোক এবার মাইক্রোবাসের ড্রাইভারের কাছে গিয়ে তার কাছেও একই ভঙ্গিতে দেয়াশলাই চাইছে।

সানক্যাপ ভালো করেই জানে কোনো রকম ধস্তাধস্তি হবে না। এই দিল্লিতে বাস্টার্ডের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। কিন্তু তাদের তিনজনের কাছেই অস্ত্র রয়েছে। যদিও সে নিশ্চিত, অস্ত্র ব্যবহার করার দরকার পড়বে না আজ।

ঘুরে আবারো মাইক্রোবাস থেকে একটু দূরে চলে গেলো হাঁটতে হাঁটতে। বাস্টার্ডের সাথে তার নিজেরও কিছু লেনদেন রয়ে গেছে। আজ সব লেনদেন চুকিয়ে ফেলা হবে।

রাত যতো বাড়ছে দিল্লির শীত ততো তীব্র হচ্ছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে দু'হাত ঘষলো। মাইক্রো থেকে বিশ গজ দূরে গিয়ে আবারো ঘুরে গাড়িটার দিকে এগোতে লাগলো সানক্যাপ। সিগারেট হাতে লোকটাকে আর দেখতে পেলো না। হয়তো ড্রাইভার তার সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছে। তাদের ড্রাইভার একজন চেইনস্মোকার। গাড়ি চালানোর সময়ও ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট রাখে।

পায়চারি করতে করতে অস্থির হয়ে গেলো সানক্যাপ। মাইক্রোটার সামনে এসে তিনতলার উপরে তাকালো অধৈর্য হয়ে। এখনও জানালা দিয়ে টেলিভিশনের রঙবেরঙের আলো দেখা যাচ্ছে। এতোক্ষণে তিনতলার ছাদে যে গ্রিলের দরজাটা আছে সেটার তালা খুলে ফেলার কথা।

অবশ্য ঐ বাস্টার্ড হারামজাদা যদি নিজের ঘরের দরজা ভেতর থেকে লক করে রাখে তাহলে আরেকটু সময় লাগবে। এরকম পরিস্থিতিতে পড়লে কি করতে হবে সেটাও শিখিয়ে দেয়া হয়েছে লোক দুটোকে।

তারপরও সানক্যাপের কাছে মনে হচ্ছে বেশ সময় নিয়ে নিচ্ছে ছেলে দুটো। মেজাজ কিছুটা বিগড়ে গেলো তার। পায়চারি বন্ধ করে মাইক্রোর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বার বার তাকাতে লাগলো তিনতলার উপরে বাস্টার্ডের চিলেকোঠার জানালার দিকে।

"ইয়ে আপকা গাড়ি হায়?"

কণ্ঠটা শুনে সানক্যাপ চমকে তাকালো। সেই মাঙ্কিক্যাপ পরা লোকটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। হিন্দি ভাষাটা বুঝলেও মুখে বলতে গেলে তার সমস্যা হয়।

"ইয়ে তো হাটানা পারে গা," লোকটি হেসে বললো তাকে।

গাড়িটা সরাতে বলছে কেন? সানক্যাপ একটু চুপ থেকে বললো, "প্রবলেম কেয়া হায়?"

গলায় মাফলার পেচিয়ে রাখার কারণে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। লোকটি আঙুল তুলে তার পেছন দিকে ইঙ্গিত করলো। বুঝতে না পেরে পেছনে তাকালো সানক্যাপ, সঙ্গে সঙ্গে খিচুনি দিতে শুরু করলো সে। মাঙ্কিক্যাপ চেয়ে রইলো তার দিকে। সানক্যাপের কাঁধে একটা কলমের মতো জিনিস ঠেসে রেখেছে সে। মৃদু বিন্ হবার শব্দ শোনা গেলো এবার।

মাত্র দশ সেকেন্ড। তারপরই সানক্যাপ লুটিয়ে পড়তেই মাঙ্কিক্যাপ তাকে

মাইক্রোবাসের সাথে ঠেসে ধরে ফেললো।

তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে কোনো সমস্যাই হয় নি। যে বাড়িতে দারোয়ান থাকে না সেই বাড়িতে প্রবেশ করা কী আর এমন ঝামেলার।

কোকড়া চুলের যুবকটির নাম যাদব, বিহারের ছেলে, থাকে দিল্লিতে। তার সঙ্গি শাকিল অবশ্য দিল্লির ছেলে। তিনতলার উপরে চিলেকোঠায় যাবার পথে একটাই বাধা-গ্রিলের দরজাটা।

তারা দু'জন সেই গ্রিলের দরজার সামনে এসে ভেতরে উঁকি মেরে দেখে নেয়। সামনের কিছুটা অংশ তিনতলার ছাদের খোলা জায়গা। দরজার বাম পাশে একটা চিলেকোঠা। সেখানেই তাদের শিকার আছে। নিজের ঘরে বসে টিভি দেখছে সে। ভলিউম একটু চড়া। কান পাতার দরকার হলো না, দরজার বাইরে থেকেই শুনতে পেলো হিন্দি সিনেমার গান বাজছে।

।যাদব আর শাকিল সময় নষ্ট না করে কাজে নেমে পড়ে। কাজটা তেমন কঠিন কিছু না। একটা মাঝারি সাইজের তালা খুলতে হবে। তবে ঝামেলা হলো, তালাটা ভেতর থেকে লাগানো।

সেটাই স্বাভাবিক। ঘরের লোকটি ভেতরে আছে, তাই ভেতর থেকেই তালা লাগাবে। অবশ্য গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে তালাটা খোলা যাবে, শুধু একটু সময় লাগবে, এই যা।

যাদব তালা খোলার কাজে লেগে পড়লে শাকিল চারপাশটা লক্ষ্য রাখতে শুরু করে। যাদবের কাছে এ ধরণের তালা খোলার জন্য মাস্টার কি আছে।

পাঁচ মিনিট পর তালাটা খুলে গেলো।

তারা দু'জন ঢুকে পড়লো ভেতরে। পা টিপে টিপে বাবলুর চিলেকোঠার সামনে চলে এলো দু'জন। দরজাটা বন্ধ নয়। একটু ফাঁক হয়ে আছে। শাকিল আর যাদব একে অন্যের দিকে তাকালো। তাদের ঠোঁটে বাঁকা হাসি। তাদের শিকার বেশ নিশ্চিন্তে ঘরে বসে টিভি দেখছে।

যাদব কোমর থেকে একটা পিস্তল বের করে হাতে তুলে নিলেও শাকিল পকেট থেকে একটা ছোটো শিশি আর রুমাল বের করে শিশি থেকে কিছু তরল ঢেলে রুমালটা সাবধানে ভিজিয়ে নিলো।

দরজাটার সামনে গিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো যাদব। শাকিল অন্যপাশে এসে যাদবকে ইশারা করলে যাদব মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দরজাটা একটু ফাঁক করে ভেতরে উঁকি মারলো। বিছানাটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেখানে কেউ নেই। ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো সে। তার পেছন পেছন শাকিল।

অন্ধকার ঘর, জানালা দিয়ে বাইরের আলো আসছে, কিন্তু সেই আলোকে ছাপিয়ে গেছে টিভির পর্দা থেকে ঠিকরে বের হওয়া আলো। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঘরে কেউ নেই।

শাকিল আর যাদব বিস্মিত হয়ে একে অন্যের দিকে তাকালো। কিছুক্ষণের জন্য ভড়কে গেলো তারা। তারপরই একটা শব্দ শুনতে পেলো, সেটা টিভি থেকে আসছে না।

পানি পড়ার শব্দ!

শাকিল ঘরের ডান দিকে অ্যাটাচড বাথরুমের দরজার দিকে তাকালো। দরজার নীচ দিয়ে আলো দেখতে পেলো সে। বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। দু'জন একসাথে বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে কান পাতলো।

তাদের শিকার এখন বাথরুমে!

দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো তারা।

তিন মিনিট পর যাদব আর শাকিল কিছুটা অধৈর্য হয়ে উঠলো। সন্দেহ হতে লাগলো তাদের। কিন্তু কী করবে বুঝতে পারলো না। আরো দুমিনিট পর ধৈর্য ধরে রাখতে পারলো

না তারা। শাকিল আস্তে করে দরজাটায় ধাক্কা মারতেই সেটা খুলে গেলো।

দরজাটা বন্ধ করা ছিলো না?!

দারুণ অবাক হলো তারা, কিন্তু তারচেয়ে বেশি অবাক হলো ভেতরে কেউ নেই দেখে।

দু'জনেরই ভিমরি খাবার যোগাড় হলো। একে অন্যের দিকে তাকালো অবাক হয়ে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না। তবে এটা বুঝতে পারলো কিছু একটা গড়বড় হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হবার জন্যে পা বাড়ালো তারা।

কিন্তু দরজার বাইরে আসতেই পর পর দুটো ভোতা শব্দ শোনা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো পান্ডা দু'জন। তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মাঙ্কিক্যাপ। তার হাতে সাইলেন্সর পিস্তল। পুরো মুখটা ঢাকা, শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। সেই চোখে হিমশীতল হিংস্রতা।

বাম হাতে মাঙ্কিক্যাপটা খুলে ফেললে বেরিয়ে এলো পেশাদার খুনি বাস্টার্ডের মুখটা।

অধ্যায় ৭৫

মাইক্রোবাসটা যখন বাবলুর বাড়ির সামনে এসে থামে তখন সে নিজের ঘরেই ছিলো না। বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখেছে।

মাইক্রো থেকে নেমে আসে তিনজন যুবক। তিনজনের পোশাকই কালো। তবে একজনের মাথায় ছিলো সানক্যাপ। লোকটাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারে নি। যাইহোক, তিনজনের মধ্যে দু'জন তার বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লে সানক্যাপ মাইক্রোর সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। মাইক্রোর ড্রাইভার গাড়িতেই ছিলো, সে একবারের জন্যেও নামে নি।

একটু পর সানক্যাপ মাইক্রোর সামনে পায়চারি করতে থাকলে সে ঠিক করে কাজে নেমে পড়তে হবে, কারণ সময় খুব বেশি নেই। বড়জোর দশ পনেরো মিনিট।

উলের সোয়েটারের উপর শার্ট পরার কারণে একটু মোটা দেখাচ্ছিলো তাকে, সেইসাথে মাথার মাঙ্কিক্যাপ, চোখে চশমা, গলায় মাফলার আর কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে রাখার ফলে গেটআপটা একদম বদলে যায়। কাপড়ের ব্যাগটি মুলিন্দর তাকে দিয়েছিলো, এরকম একটি ব্যাগ সব সময় ব্যবহার করে সে। কিন্তু এতোদিন এটা ব্যবহার করার মতো উপলক্ষ্য পায় নি বাবলু। এই ব্যাগটি শুধু গেটআপ বদলানোর জন্য ব্যবহার করে নি, এটার ভেতরেই আছে। হঠাৎ করে আবিষ্কার করা মারণাস্ত্রটি।

১২০০ ভোল্টের একটি ইউপিএস!

তার ঘরে একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার আছে। ঢাকার মতো না হলেও দিল্লিতে মাঝেমধ্যে লোডশেডিং হয়, তবে সবচেয়ে বেশি সমস্যা করে বিদ্যুতের ভোল্টেজের ওঠানামা। এ কারণে কম্পিউটারের সাথে একটি ইউপিএস রেখেছে। ১২০০ ভোল্টের এই ইউপিএসটিই হঠাৎ করে হয়ে উঠেছে তার একমাত্র অস্ত্র।

নিরাপদ, নিঃশব্দ আর কার্যকরী একটি হাতিয়ার।

যখন মনে হচ্ছিলো তার কাছে কোনো অস্ত্র নেই তখনই ইউপিএসটা মৃদু প্রতিবাদের সুরে বিপু করে ওঠে।

দশ মিনিটের লোডশেডিংটা তাকে নতুন আর ভয়ঙ্কর একটি অস্ত্রের সন্ধান দিয়েছে।

১২০০ ভোল্টের ইউপিএসটা শক্তিশালী কম্পিউটার আর মনিটরকে টানা পনেরো মিনিট বিদ্যুত সরবরাহ করতে পারে। এক পাউন্ড পাউরুটির আকারের এই জিনিসটা ওজনে একটু ভারি হলেও খুব সহজেই বহন করা যায় একটা ব্যাগে।

এরপর কিভাবে কি করতে হবে সেসব বুদ্ধি খুব দ্রুত চলে আসে তার মাথায়।

ইউপিএসটার আউটপুট ক্যাবলের শেষ প্রান্তটি কেটে তিনটি তার বের করে ফেলে সে। লাল রঙের তারটি বাদে বাকি দুটো তার স্কচটেপ দিয়ে মুড়িয়ে রাখে। লাল রঙের তারটি পজিটিভ, এটা দিয়েই বিদ্যুত প্রবাহিত হয়। তারটা একটু চেছে ভেতরের অংশ বের করে একটা ক্রু ড্রাইভারের ধাতব অংশে পেচিয়ে সেটাতে স্কচটেপ লাগিয়ে নেয় যেনো খুব সহজে বিচ্ছিন্ন না হয়। এবার ইউপিএসটা কাপড়ের ব্যাগে ভরে নেয় সে। ব্যাগের যে দিকটায় ইউপিএসের পাওয়ার বাটনটা পড়ে সেই জায়গাটিতে ছোট্ট করে একটা ফুটো করে নেয় ব্যাগের বাইরে থেকে সুইচ অন-অফ করার জন্য।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে প্রায় একগজ লম্বা আউটপুট ক্যাবলটি শরীরের পাশ ঘেষে, বগলের নীচ দিয়ে বাহুর সাথে আটকে নেয় স্কচটেপের সাহায্যে। ক্রু ড্রাইভারটি তার হাতের তালুতে এমনভাবে রাখে যাতে ফুলহাতার শার্ট পরার পর হাত মুঠি করে রাখলে সেটা দেখা না যায়। ইলেক্ট্রিক শক থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য হাতে পরে নেয় চামড়ার দস্তানা।

স্ক্রু ড্রাইভারের ধাতব অংশটি সাধারণ কোনো সিগারেটের চেয়ে সামান্য বড়। সেটার উপর সাদা কাগজের রোল পেচিয়ে আটকে রাখে। ফলে, আঙুলের ফাঁকে সিগারেট আটকে রেখেছে মনে হলেও আদতে সেটা ক্রুড্রাইভারের ধাতব অংশ। রোল করা কাগজটি

একটুখানি সরালেই বেরিয়ে আসবে আধ ইঞ্চির মতো ধাতব অংশ। সেটুকুই তার কাজের জন্য যথেষ্ট।

সানক্যাপের কাছে গিয়ে প্রথমে দেয়াশলাই চায়, লোকটা হাত নেড়ে তাকে না করে দিলে মাইক্রোবাসের ড্রাইভারের কাছে যায়। প্রথমে ড্রাইভারের কাছে গেলে সানক্যাপ হয়তো সন্দেহ করতো। যাইহোক, ড্রাইভার লোকটার হাতে সিগারেট ছিলো। দেয়াশলাই চাইতেই লোকটা তার সিগারেট বাড়িয়ে দেয়। সিগারেটটা নিতে গিয়েই লোকটার হাতে স্ক্রুড্রাইভারের ধতব অংশটা ঠেসে ধরে। অবশ্য তার ঠিক আগেই ইউপিএসের পাওয়ার বাটনটা অন করে নিয়েছিলো। বাম পাশে তাকিয়ে দেখে সানক্যাপ উল্টো দিকে হেঁটে যাচ্ছে। এদিকে ড্রাইভার লোকটি খিচুনি দিতে দিতে অসাড় হয়ে পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যে।

লোকটা নিস্তেজ হয়ে ড্রাইভিং সিটের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলে সে আস্তে করে মাইক্রোর বিপরীত দিকে চলে যায় কারণ সানক্যাপ ঘুরে গাড়ি কাছে চলে আসছিলো। লোকটা মাইক্রোর সামনে চলে এলে তার আশংকা হতে থাকে, ড্রাইভারকে বুঝি দেখে ফেলবে। দেখে ফেললে একটু সমস্যা হয়ে যেতো তার জন্য। এক এক করে কাবু করার পরিকল্পনাটা একটু এলোমেলো হয়ে যেতো।

কিন্তু না, সানক্যাপের নজর ছিলো তিনতলার উপরে, তার চিলেকোঠার দিকে। লোকটা মাইক্রোর গায়ে হেলান দিয়ে উপরে চেয়ে থাকে অধৈর্যের সাথে। ড্রাইভারের দিকে ফিরেও তাকায় নি।

এটা দেখে এবার হাফ ছেড়ে বাঁচে। আস্তে করে সানক্যাপের অলক্ষ্যে চলে আসে তার পাশে। লোকটাকে চমকে দিয়ে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করে এটা তার গাড়ি কিনা।

সানক্যাপ চমকে তার দিকে তাকায়। মাথা নেড়ে সায় দেয় শুধু।

“ইয়ে তো হাটানা পারে গা,” হেসে বলে ছদ্মবেশি বাবলু।

“প্রবলেম কেয়া হায়?” সানক্যাপ অবাক হয়ে বলে।

বাবলু পেছন দিকে হাত তুলে দেখালে নোকটা সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে তাকায়, আর ঠিক তখনই তার ঘাড়ে স্ক্রুড্রাইভারের ধাতব অংশটা চেপে ধরে। ভয়ঙ্করভাবে খিচুনি দিতে দিতে লোকটা যখন ঢলে পড়বে তখন ইউপিএসের পাওয়ার বাটনটা অফ করে দিয়ে তাকে দু’হাতে ধরে ফেলে তাকে।

মাইক্রোবাসের সাইডদরজাটা খুলে সানক্যাপকে সিটের উপর শুইয়ে দিয়ে কাপড়ের ব্যাগ থেকে দড়ি আর স্কচটেপ বের করে নেয়। দ্রুত লোকটার হাত পা বেধে মুখে টেপ লাগিয়ে সিটের উপর ফেলে রাখে। মাইক্রোবাসের ড্রাইভারকেও পেছনের সিটে টেনে এনে একইভাবে বেধে ফেলে সে। সানক্যাপের কোমর থেকে একটা সাইলেন্সর পিস্তল খুঁজে পেলে অনেকদিন পর কালো ধাতব জিনিসটার শীতলতা হাতে টের পায়। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ইউপিএসের ব্যাগটা গাড়িতে রেখে সানক্যাপের হাত-মুখ-পা বেধে ফেলে, তারপর দরজা বন্ধ করে তিনতলার উপরে চিলেকোঠার দিকে তাকায় সে। তার বিশ্বাস ঐ দুজন লোক এখন তার ঘরেই আছে। না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। একটা সাইলেন্সার পিস্তল তার কাছে আছে। তাদের সাথে যদি সিঁড়িতে দেখা হয়ে যায় তাহলে গুলি চালাতে একটুও দেরি করবে না।

আগের চেয়ে দ্বিগুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাবলু সিঁড়ি ভেঙে নিজের ঘরের কাছে চলে আসে পা টিপে টিপে।

তার ঘরের ভেতরে লোক দুটো আছে বুঝতে পেরে দরজার পাশে পিস্তল নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

গুলি করার পর পান্ডামতো দু’জন লোককে নিজের ঘরে টেনে এনে বাতি জ্বালিয়ে দেখে নেয়। না। এদেরকে সে চেনে না। লোকগুলোর কোমর থেকে আরো দুটো সাইলেন্সর পিস্তল খুঁজে পেলে সেগুলোও নিয়ে নেয়। তবে খেয়াল করে, গোঁফওয়ালা লোকটার হাতে একটা রুমাল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে ক্লোরোফর্ম মেশানো আছে তাতে।

লোকটার পকেট থেকে ক্লোরোফর্মের একটা ছোটো শিশিও খুঁজে পায়। শিশিটা হাতে নিয়ে একটু ভাবে। নতুন আরেকটি সত্য আবিষ্কার করে বাবলু।

এরপর দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নীচের মাইক্রোবাসে গিয়ে ড্রাইভারের হাত-পা-মুখ কাপড় দিয়ে বেধে রেখে সানক্যাপ পরা লোকটাকে কাঁধে করে নিয়ে আসে উপরে।

বিছানার উপর হাত-পা-মুখ বাধা সানক্যাপকে নামিয়ে রাখতেই লোকটার মুখ এই প্রথমবারের মতো স্পষ্ট চোখে পড়ে তার। সঙ্গে সঙ্গে মাথা থেকে সানক্যাপটা খুলে ফেলতেই চিনে ফেলে তাকে।

ঝন্টু।

এর আগেও এই ঝন্টুকে সে নিজের কজায় নিয়ে নিয়েছিলো। সেদিনও লোকটা তাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলো, আজও তাই করবে। তারচেয়েও বেশি করতে হবে। নইলে...

.

প্রথমে ঝাপসা দেখলেও কয়েক মুহূর্ত পর যে দৃশ্যটা ঝন্টু দেখতে পেলো সেটা একেবারেই অচিন্তনীয়। আৎকে উঠে চিৎকার দেবার চেষ্টা করলো কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না।

তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই ভয়ঙ্কর খুনি বাস্টার্ড!

এটা কি দুঃস্বপ্ন? মনে মনে ভাবলো সে। কোনো কিছু মনে করতে পারলো না হুট করে। শেষ যে কথাটা তার মনে আছে, মাইক্রোর গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এক লোক এসে গাড়িটা সরাতে বলে তাকে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

টের পেলো তার হাত-পা-মুখ শক্ত কিছু দিয়ে বাধা। একটা ঘরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। ভালো করে ঘরটার দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো একটু দূরেই যাদব আর শাকিলের নিথর দুটি দেহ পড়ে আছে। একদম নড়ছে না। মেরে ফেলেছে? হায় আল্লাহ!

ভয়ে আতঙ্কে কেঁপে উঠলো সে। নড়াচড়া করার চেষ্টা করতেই বাস্টার্ড নামক খুনিটা তার মাথার চুল খপ করে ধরে ঝাঁকুনি দিলো।

“একদম নড়বি না...” কথাটা বলেই তার মুখের কাছে মুখ এনে মুচকি হাসলো সে।

ঝন্টু বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো। সে জানে, এই আজরাইলটার হাত থেকে আজ আর রক্ষা পাবে না। জ্ঞান ফেরার পর থেকে খুব দুর্বল অনুভূত হচ্ছে। এই খুনি কি ধরণের অস্ত্র ব্যবহার করেছে বুঝতে পারলো না। তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্নও নেই।

চোখের সামনে ভয়ঙ্কর লোকটাকে দেখে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। তাকে কি চিনতে পেরেছে!

“অনেক দিন পর আবার দেখা হলো আমাদের,” আস্তে করে বললো বাবলু। “এখনও তুই রঞ্জুর সাথেই আছিস,” কথাটা বলে আক্ষেপের সাথে মাথা নাড়লো। “মনে হচ্ছে মৃত্যুর আগপর্যন্ত তুই রঞ্জুকে ছাড়তে পারবি না।”

নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেলো ঝন্টুর। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে কোটর থেকে যেনো ঠিকরে বের হতে উদ্যত হলো। আমি শেষ! মনে মনে চিৎকার করে বললো সে।

বাবলু উঠে দাঁড়ালো, ঘরের এককোণে রাখা ক্লোজেট খুলে একটা কিচেন নাইফ আর মাংস কাটার চাপাতি বের করলো।

গা শিউড়ে উঠলো রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ লোকটির।

হায় আল্লাহ...এই খুনি কি করবে! আর্তনাদ করে উঠলো ঝন্টু কিন্তু সেটা আর কেউ শুনতে পেলো না।

পেছন ফিরে হাত-পা-মুখ বাধা ঝন্টুকে দেখে নিলো এক পলক। খুব সম্ভবত প্যান্ট নষ্ট করে ফেলেছে এই জঘন্য সন্ত্রাসীটা। সে জানে, অচিরেই ঝন্টু তার জীবনের সবচাইতে বড় দুঃস্বপ্ন দেখবে।

খুব জলদি!

ব্ল্যাক রঞ্জুর এই চ্যালাটাকে নিয়ে সে কী করবে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে। এখন সেই পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করবে। তবে একটু সময় নিয়ে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজটা করতে হবে। কারণ নতুন একটি সত্য আবিষ্কার করেছে।

ঝন্টুর দিকে তাকালো সে। ছেলেটার অবস্থা এমন, আরেকটু হলে হার্ট অ্যাটাক করেই বুঝি মারা যাবে। কিন্তু সেটা হতে দেয়া যাবে না। রঞ্জুর এই শূয়োরটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য।

ব্ল্যাক রঞ্জু তাকে শেষ করার জন্য দিল্লিতে কিছু লোক পাঠিয়েছে, খবরটা জেফরি বেগের কাছ থেকে পাওয়ার পর প্রথমে বিশ্বাসই করে নি। পরে যখন বিশ্বাস হলো ঐ ইনভেস্টিগেটরের কথা সত্যি তখন নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়েছিলো তার। কিন্তু সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য। তারপরই নিজের ভেতরে ঝিমিয়ে থাকা বহু অভিজ্ঞ আর পুরনো মানুষটা মুহূর্তেই জেগে ওঠে। আর এখন, সব কিছু তার নিয়ন্ত্রণে!

হাত-পা বাধা অবস্থায় ঝন্টু পড়ে আছে ঘরের এককোণে। তার চোখেমুখে জান্তব ভীতি। রঞ্জুর ব্যক্তিগত জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য সে নিজেই এখন খুন হতে চলেছে। এর আগেও একবার তাকে বাগে পেয়েছিলো বাবলু, তখন হত্যা করে নি। কিন্তু আজ আর কোনো সুযোগ দেবে না।

এদিকে ঝন্টুর মাথায় ঢুকছে না কিভাবে বাস্টার্ড আগেভাগে সব জেনে গেলো। কে তাকে জানালো? এই অসম্ভব কাজটা কিভাবে সম্ভব হলো?

টের পেলো প্রচণ্ড মানসিক চাপে কানে ভো ভো শব্দ হচ্ছে। ঘরে টিভি চললেও সেটার আওয়াজ গুলিয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যুর কথা ভাবতেই দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো তার। এর সামনে কেঁদে ফেলা ঠিক হবে না জেনেও কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না নিজেকে।

"কাঁদছিস কেন?" ঝন্টুর সামনে হাটু গেড়ে বসে জানতে চাইলো বাবলু।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো সন্ত্রাসী।

"কাঁদবি না," বললো বাবলু। "আমি তোকে মেরে ফেলার কথা ভাবছি। সত্যি কথা বললে তোকে জানে মারবো না। কিন্তু মিথ্যে বললে..." বিছানার উপর রাখা চাপাতি আর চাকুটার দিকে তাকালো। "...ওগুলো ব্যবহার করবো।"

ঝন্টু ফ্যালফ্যাল করে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কেবল।

মুচকি হেসে ঝন্টুর গালে মৃদু একটা চাপড় মেরে তার মুখের বাধনটা খুলে দিলো। "আমি জানি ব্ল্যাক রঞ্জু এখন দিল্লিতে আছে। দিল্লিতে এসে মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছে ঐ বানচোতটা।" বলেই উঠে দাঁড়ালো সে। "তোরা আমাকে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলি...তাই না?"

"রঞ্জু এখন কোথায় আছে আমি জানি..." হরবর করে বলে উঠলো ঝন্টু।

"অবশ্যই জানিস।"

"আপনি চাইলে আমি আপনারে ওইখানে নিয়া যামু।"

মুচকি হাসলো বাবলু। "এই কাজটা তোদের গাড়ির ড্রাইভার খুব ভালোমতোই করতে পারবে। এর জন্য তোকে আমার দরকার হবে না।" ঝন্টু জানে কথাটা ঠিক। মাত্র গতকাল দিল্লিতে এসেছে, রঞ্জু যে বাড়িতে আছে সেটা চিনলেও এখান থেকে পথঘাট চিনে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না। বাস্টার্ডও এটা বুঝে গেছে। তাহলে তার কাছ থেকে কী জানতে চাইছে বদমাশটা?

ঝন্টুর মাথার চুল খপ করে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলো সে। "এখন যা জানতে চাইবো একদম ঠিক ঠিক জবাব দিবি। মিথ্যে বললে কি করবো তা কল্পনাও করতে পারবি না।"

"আপনি যা জানতে চান বলেন," ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো ঝন্টু। "আমি সত্যি কথাই বলবো, বিশ্বাস করেন।"

"তুই যদি ভেবে থাকিস এতো দূর থেকে তোর দেয়া ইনফর্মেশনটা আমি চেক করতে

পারবো না তাহলে বিরাট ভুল করে ফেলবি।”

জেফরি বেগ নিজের ঘরে এসে রেবার সাথে ফোনে একঘণ্টার মতো কথা বলে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছে। যে ট্রমার মধ্যে নিপতিত হয়েছিলো সেটা থেকে মেয়েটাকে বের করার দায়িত্ব তারই। রেবা এখন সেই ধকল থেকে কিছুটা সেরে উঠলেও নতুন এক দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হয়েছে। তার এই দুশ্চিন্তার নাম জেফরি বেগ।

তার ধারণা যেকোনো সময় তার উপর আবার আঘাত নেমে আসতে পারে। ভয়ঙ্কর সব লোকজন তার পেছনে লেগেছে। কথাটা মিথ্যে নয় কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব টেনশনে পড়ে গেছে রেবা।

জেফরি তাকে আশ্বস্ত করেছে সে অনেক বেশি সতর্ক এখন। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা গ্রহণ করা হয়েছে হোমিসাইডের পক্ষ থেকে। যদিও এরকম কিছুই করা হয় নি। রেবাকে আশ্বস্ত করার জন্য সত্যি-মিথ্যা যা বলার সবই বলেছে।

নিজের ঘরে একা একা বসে ভাবছে ব্ল্যাক রঞ্জুর দল আর কি করতে পারে।

মিলন যতোক্ষণ বাইরে ঘুরে বেড়াবে ততোক্ষণ তার আর রেবার কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। যেকোনো সময় বানচোতটা আবার আঘাত হানবে। এখনও সে জানে না রেবা বেঁচে আছে। জানামাত্রই যে আবার চেষ্টা করবে সে ব্যাপারে জেফরির মনে কোনো সন্দেহ নেই। খুব দ্রুত এই ব্যাপারটা সমাধান করতে হবে।

ব্ল্যাক রঞ্জু ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে। যদিও মিনিস্টার আর তার পিএস বলে নি কোথায় গেছে, কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ জঘন্য খুনি দিল্লিতে গেছে। প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত সে। হয়তো নিজের হাতেই বাবলুকে হত্যা করে মনের জ্বালা মেটাবে।

এদিকে মিনিস্টারের ছেলে তুর্য এখনও মুক্তি পায় নি। হয়তো এতোক্ষণে ছেলেটাকে খুন করে গুম করে ফেলেছে রঞ্জুর লোকজন। আর যদি বেঁচেও থাকে, আজ রাতের মধ্যেই ছেলেটাকে হত্যা করে ফেলবে তারা। জেফরি যতোই চেষ্টা করুক, ছেলেটাকে বাঁচাতে পারবে না। অথচ তুর্যের সম্ভাব্য অবস্থান প্রায় বের করে ফেলেছে, শুধু একটা দিন যদি বাড়তি পেতো তাহলে ছেলেটাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হতো।

তবে ছেলেটাকে বাঁচানোর একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে, আর সেই সম্ভাবনাটা অনেকগুলো যদি'র উপর নির্ভর করছে এখন।

বাবলু যদি তার সব কথা বিশ্বাস করে থাকে; রঞ্জুর দলের ভয়ে পিছু না হটে সে যদি তাদের মোকাবেলা করে; শেষ পর্যন্ত একদল ভয়ঙ্কর লোকের হাত থেকে যদি বেঁচে যেতে পারে; যদি রঞ্জুর দলের...

হঠাৎ তার ফোনটা বেজে উঠলে তার ভাবনায় ছেদ পড়লো। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হলো, মিলন ফোন করেছে।

কিন্তু ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটা ভেসে উঠেছে সেটা ভারতের। জেফরির সারা শরীরে উত্তেজনা বয়ে গেলো।

"হ্যালো!"

"মি: বেগ..." সুদুর দিল্লি থেকে বাবলুর কণ্ঠটা বলে উঠলো। "...আপনার জন্য আমার কাছে একটা দামি তথ্য আছে।"

রাতের এই সময়টায় পথঘাট সব ফাঁকা। ঘর কুয়াশা পড়ছে। দশ গজ সামনের দৃশ্যও দেখা যাচ্ছে না। হুডি পরা এক লোক পার্কের বাউন্ডারি গ্রিলের সামনে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। তিন ফুট উঁচু গ্রিলটা টপকালেই ফুটপাত। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাস্তার ওপারে ছয় তলার একটি অ্যাপার্টমেন্টের দিকে।

তিনতলার কর্নার ফ্ল্যাটটার বড় বড় জানালা দিয়ে আলো আসছে। তার মানে তার শিকার এখনও জেগে আছে। কোমরের পিস্তলটায় হাত রাখলো সে। এখন আর কেউ তাকে থামাতে পারবে না। ব্ল্যাক রঞ্জু চলে গেছে দেশের বাইরে। এতোক্ষণে হয়তো

বাস্টার্ডকে নিয়ে নির্মম খেলা শুরু করে দিয়েছে। প্রতিশোধের আগুন উগলে দিচ্ছে তার উপর।

সেও উগলে দেবে। মনের ভেতর যে আগুন জ্বলছে আজ দুদিন ধরে সেই আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে একজনকে।

অ্যাপার্টমেন্টের মেইনগেটটায় দারোয়ান আছে। সেটা কোনো ব্যাপার নয়। তবে এখনও দুএকজন বাসিন্দা রাত করে বাড়ি ফিরছে। হয়তো কাজ শেষে কিংবা ক্লাব-পার্টি থেকে ফিরে আসছে নিজের ঘরে।

মিলন আরেকটু অপেক্ষা করবে। তার টার্গেট বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেই সে কাজে নেমে পড়বে। সময় কাটানোর জন্য একটা সিগারেট ধরালো। পার্কের এদিকটায় কোনো মানুষ ভুলেও আসবে না, সুতরাং নিশ্চিন্তে গাছে হেলান দিয়ে সিগারেট খেতে লাগলো সে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলো পকেটে রাখা মোবাইলফোনটা ভাইব্রেট করছে। ফোনটা বের করে দেখলো একটা ইনকামিং মেসেজ এসেছে। ওপেন করলো সেটা। বোনাস টকটাইমের একটি অফার।

ফোনটা পকেটে রেখে আবারো সিগারেটে টান দিলো সে। তিনতলার বড় একটা জানালার দিকে চোখ যেতেই একটা জিনিস দেখতে পেলো। জানালার পর্দা একটু ফাঁক থাকার কারণে স্পষ্ট বুঝতে পারলো নোকটা কে। তার টার্গেট জেফরি বেগ।

কার সাথে যেনো ফোনে কথা বলছে আর পায়চারি করছে ঘরের মধ্যে।

আজ রাতটাই তোমার শেষ রাত, বানচোত! মনে মনে বললো মিলন। সিগারেটের ধোয়া ছেড়ে দিলে তার সামনের দৃশ্যটা কিছুক্ষণের জন্য ঝাপসা হয়ে এলো।

রাত বারোটার কিছু পরে হোমিসাইডের কমিউনিকেশন্স রুমে বসে আছে জামান। একটু আগে তার বস ফোন করে একটা নাম্বার ট্র্যাকডাউন করতে বলেছিলো এখন সেই কাজটাই করছে।

জেফরি বেগ যখন তাকে বলেছিলো আজরাতে ডিউটি দিতে হবে তখন সেটার কারণ খুলে বলে নি। জামানের মনে প্রশ্ন জেগেছিলো কিন্তু বসকে কিছু জিজ্ঞেস করে নি সে। এখন বুঝতে পারছে কেন তাকে হঠাৎ করে আজরাতে ডিউটি দিতে বলেছিলো।

নাম্বারটা নাকি ঐ ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী মিলনের। তার বস এটা কোত্থেকে যোগাড় করলো এতো রাতে সেটা বুঝে উঠতে পারছে না। তার বস একটু পরই হোমিসাইডে আসছে বলেও জানিয়েছে। জামান মনে মনে কিছু একটা আশংকা করছে।

যাইহোক, জেফরি বেগ তাকে বলে দিয়েছে ফিশিং করে সেলফোনটার লোকেশন জানতে হবে। জামান এখন সেটাই করছে। বোনাস কলরেটের খবর দিয়ে একটা সার্ভিস মেসেজ পাঠিয়েছে সে। এক মিনিটের মতো সময় লাগবে।

জামানের সামনে বিশাল প্লাজমা স্ক্রিন, তাতে ঢাকা শহরের ভার্চুয়াল মানচিত্রটি দেখা যাচ্ছে। অস্থির হয়ে কিবোর্ডের পাশে আঙুল দিয়ে তাল ঠুকে। গেলেও তার চোখ স্ক্রিন থেকে সরছে না।

বিপ!

এই শব্দটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। মানচিত্রের একটি জায়গায় লাল টকটকে বিন্দু জ্বলছে-নিভছে, সেই সাথে বিপ বিপ করে শব্দ করছে।

জামান মানচিত্রটা ব্লোআপ করলো মিলন এখন কোথায় আছে সেটা জানার জন্য।

কিছুক্ষণ পর যে দৃশ্যটা ভেসে উঠলো সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। জামান টের পেলো তার শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল ফোনটা নিয়ে জেফরি বেগকে একটা কল করলো সে।

রিং হচ্ছে।

একবার।

দু'বার।

তিনবার।

কেউ ধরছে না।

আবারো কল করলো সে। একই ফল।

উত্তেজনার চোটে উঠে দাঁড়ালো জামান। তাহলে কি দেরি হয়ে গেছে?

হায় আল্লাহ! জামান বুঝতে পারলো না কী করবে। কমিউনিকেশন্স রুম থেকে এক দৌড়ে বের হয়ে গেলো। যেতে যেতে একটা কথাই তার মনে। ঘুরতে লাগলো। জেফরি বেগ ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে গেছে।

মিলন পর পর চারটা সিগারেট শেষ করার পর দেখতে পেলো জেফরি বেগের ঘরে বাতি জ্বলছে না। তার শিকার বিছানায় গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে হয়তো।

আরেকটু অপেক্ষা করবে সে তারপর কাজে নেমে পড়বে। পঞ্চম সিগারেটটা জ্বালিয়ে টান দিলো। তাকে এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে, ধীরস্থিরভাবে কাজটা করতে হবে। সিগারেট টানতে টানতে নিজের ভেতরে জমে থাকা উত্তেজনাটা প্রশমিত করলো। পরিকল্পনাটা গুছিয়ে নিলো শেষবারের মতো। কোনো ভুল করা যাবে না। জেফরি বেগকে শেষ করে দেবার দ্বিতীয় কোনো সুযোগ সে আর পাবে না।

রঞ্জু এখন দিল্লিতে, ঝন্টু আছে তার সাথে। তাদের পুরো মিশনটা সফলভাবেই শেষ হয়েছে। তাকেও দ্রুত ঢাকা ছাড়তে হবে, পাড়ি দিতে হবে ব্যাঙ্ককে। মাঝরাতের আগেই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হবে। এরইমধ্যে তাদের নেটওয়ার্কের অনেকেই চলে গেছে, এখন যদি জেফরি বেগকে কিছু করতে না পারে তাহলে আর কোনো দিন হয়তো সুযোগটা পাবে না।

রঞ্জু বলেছে তারা বাকি জীবন ব্যাঙ্ককেই কাটিয়ে দেবে। দিল্লির কাজ শেষ করে ব্যাঙ্ককে চলে আসবে সে। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে থাকবে কিছুদিন। রঞ্জু বলেছে, ব্যাঙ্ককে তাদের জীবনটা আনন্দ আর ফুর্তিতে কেটে যাবে। টাকা-পয়সার কোনো অভাব থাকবে না।

হাতঘড়িটা মুখের কাছে এনে সিগারেটে জোরে টান দিয়ে আগুনের আলোয় ঘড়িটা দেখে নিলো। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। শিকারের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার মধ্যে এক ধরণের রোমাঞ্চ আছে। কিছুক্ষণ পর প্রতিশোধের আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে সব কিছু। নিজের ভেতরে আগুন জ্বালানোর জন্য পলির কথা ভাবলো সে। কিভাবে মেয়েটা মারা গেলো সেসব কথা ভাবলো। টের পেলো সমস্ত শরীর রাগে কাঁপছে। এ মুহূর্তে এটাই দরকার।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। তারপর তিনফুট উঁচু গ্রিলের বেড়াটা টপকে রাস্তাটা পার হয়ে গেলো মিলন।

জেফরি যে অ্যাপার্টমেন্টটায় থাকে সেটা এর আগেরদিনই রেকি করে গেছে। সবকিছু তার নখদর্পণে। একটা সুবিধা হলো, অ্যাপার্টমেন্টটা ব্যক্তি মালিকানাধীন। এর মালিক নিজেই এটা ডেভেলপ করে ফ্ল্যাটগুলো ভাড়া দিয়েছে। ফলে অন্যসব অ্যাপার্টমেন্টের মতো নিরাপত্তা-ব্যবস্থা অতোটা কড়াকড়ি না। বাউন্ডারি দেয়ালগুলো যেমন নীচু তেমনি মেইনগেটটার পাশে যে ছোট্ট একটা গেট আছে সেটা একেবারেই হাস্যকর। গেটটা গ্রিলের তৈরি। মাত্র ছয়-সাত ফুটের মতো উঁচু। এটা একটা মইয়ের মতোই কাজ করবে।

মিলন সেই গ্রিলের গেটটার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিলো। বাম দিকে, মেইনগেটের পাশে ছোট্ট একটা ঘর আছে, সেটাতেই দারোয়ান থাকে। মধ্য বয়সী এক লোক। খুব সহজেই তাকে কাবু করা যাবে। দারোয়ান কে গেটের পাশে দেখতে পেলো না। সম্ভবত নিজের ঘরে শুয়ে আছে।

দারুণ, মনে মনে বললো মিলন। গ্রিলের গেটটা বেয়ে টপকে গেলো সে। ঢুকে পড়লো ভেতরে। সতর্কভাবে চেয়ে দেখলো চারপাশ। পার্কিংলটে বেশ কিছু গাড়ি আছে। আস্তে করে এগিয়ে গেলো সিঁড়িঘরের দিকে। এই অ্যাপার্টমেন্টে কোনো লিফট নেই।

তিনতলার সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে এসে থামলো। একশ' ওয়াটের বাল্ব জ্বলছে। ডান দিকের দেয়ালে সুইচবোর্ড থেকে সুইচ টিপে বাতিটা নিভিয়ে দিলো। হাতের বাম দিকের দরজাটাই জেফরি বেগের। পকেট থেকে মাস্টার কিটা বের করে খুব সহজেই লকটা খুলে ফেললো সে। দরজাটা একটু ফাঁক করে ভেতরে উঁকি দিলো মিলন। ঘন অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দরজাটা আরেকটু ফাঁক করে নিঃশব্দে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

দরজা বন্ধ করে কোমর থেকে সাইলেন্সার পিস্তলটা হাতে তুলে নিলো এবার। একটু

অপেক্ষা করলো অন্ধকারে চোখ সয়ে নেবার জন্য। কয়েক মুহূর্ত পর, ফ্ল্যাটের ভেতরটা আবছা আবছা দেখতে পেলো।

সে এখন দাঁড়িয়ে আছে ড্রইংরুমে। তার সামনে ডানে আর বামে দুটো দরজা। দুটোই পুরোপুরি খোলা।

বাইরে থেকে যে জানালা দিয়ে জেফরি বেগকে দেখেছিলো সেটা বাম দিকের ঘর হবে। তারপরও নিশ্চিত হবার জন্য পা টিপে টিপে প্রথমে ডান দিকের দরজাটার কাছে চলে এলো। চোখ কুচকে ভালো করে তাকালো। কোনো বিছানা নেই। সোফা আর কিছু চেয়ার। দুদিকের দেয়ালে বড় বড় দুটো শেলফ।

এবার বাম দিকের দরজার কাছে এলো সতর্কতার সাথে। ভেতরে উঁকি দিতেই চোখে পড়লো শোবারঘরের বেডটা। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে জেফরি বেগ।

মিলন তার সাইলেন্সর পিস্তলটা সামনের দিকে তাক করে আরেকটু এগিয়ে গেলো। বিছানা থেকে তিন-চার ফুট দূরে যখন তখনই প্রথম গুলিটা চালালো সে।

ভোতা একটি শব্দ!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা শব্দ হলো। এই শব্দটা প্রকম্পিত করে তুললো ছোট্ট বেডরুমটা। মিলন কিছুই বুঝতে পারলো না। তার কাছে মনে হলো কেউ তাকে ধাক্কা মেরেছে পেছন থেকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো বিছানার উপর। টের পেলো কম্বলের নীচে কোনো মানুষ নেই। উদভ্রান্তের মতো হাতরে দেখলো কম্বলের নীচে একটা কোলবালিশ। পিস্তলটা যে তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেছে সেটা খেয়ালই করলো না।

সঙ্গে সঙ্গে বাতি জ্বলে উঠলে তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। বুঝতে পারছে না কি হয়েছে। তার কাছে মনে হচ্ছে নড়াচড়া করার শক্তি হারিয়ে ফেলছে।

শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে চিৎ হতেই দেখতে পেলো তার সামনে অদ্ভুত এক গগল্স পরে একজন দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার হাতে পিস্তল। গগলসটা খুলে ফেলতেই চেহারাটা চিনতে পারলো।

জেফরি বেগ!

মিলনের নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেলো। এবার বুঝতে পারলো ঘটনাটা। সে গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

"তু-তুই!..." আর কিছু বলতে পারলো না। মুখ দিয়ে রক্তবমি করে ফেললো। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো জেফরির দিকে। সে এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। যেনো পাথরে খোদাই করা কোনো মূর্তি।

গুলিটা লেগেছে পিঠে, বুকের উল্টো দিক দিয়ে ঢুকে বাম দিকের একপাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে সেটা।

কয়েক মুহূর্ত পরই মিলনের চোখ জোড়া স্থির হয়ে রইলো জেফরি বেগের দিকে, তবে সেই চোখে কোনো প্রাণ নেই।

জেফরি বেগ মিলনের নিষ্প্রাণ দেহটার কাছে ঝুঁকে দেখলো। নিশ্চিত হবার জন্য মিলনের ঘাড়ের শিরায় হাত রেখে পরীক্ষা করতে যাবে অমনি অদ্ভুত একটা শব্দ হলো। চমকে উঠে লাফ দিয়ে সরে গেলো সে। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটা তাক করলো মিলনের দিকে।

একটা গুঞ্জনের শব্দ। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হয়েছিলো মিলন বুঝি মরার ভান করে পড়ে ছিলো কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলো ব্যাপারটা।

মিলনের নিশ্চল দেহটা একটুও নড়ছে না। জেফরি তার পকেট হাতরে মোবাইলফোনটা বের করে আনলো। ফোনটা ভাইব্রেট করছে।

কোনো কিছু না ভেবেই কলটা রিসিভ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সে। ওপাশ থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠ কথা বলে উঠলো :

"হ্যালো?"

ওপাশ থেকে যে কণ্ঠটা সে শুনতে পেলো সেটা হোমমিনিস্টারের পিএসের। বোঝাই

যাচ্ছে মিলনের সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। অথচ এর আগে তাকে বলা হয়েছিলো রঞ্জুর দলের লোকজনের সাথে তাদের একতরফা যোগাযোগ হয়। একেক সময় তারা একেক নাম্বার থেকে ফোন করে। তাহলে কি তুর্যের কিডন্যাপারদের সাথে আলী আহমেদ জড়িত?

"হ্যালো? কথা বলছো না কেন?"

জেফরি চুপ মেরে রইলো। রীতিমতো বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে সে।

"হ্যালো?" ওপাশ থেকে আবারো তাড়া দিলো কণ্ঠটা।

"আলী আহমেদ সাহেব," অবশেষে বললো হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর। "আমি জেফরি বেগ?"

হুইলচেয়ারের মোটরটা গুঞ্জন করছে। চেয়ারটা নিয়ে বিশাল ঘরের এ মাথা থেকে ওমাথা চক্কর দিচ্ছে বার বার, অস্থির হয়ে উঠেছে ব্ল্যাক রঞ্জু। অপারেশন চলার সময় ফোন করা তার স্বভাব নয়, তারপরও খুব ফোন করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। তার কাছে কোনো ফোনই নেই। আজকের অপারেশনটা খুব দ্রুত শেষ করে চলে যাবে ব্যাঙ্ককে, সেখান থেকে সিঙ্গাপুরে, সুতরাং দু'একদিনের জন্য মোবাইলফোন রাখার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি। এখন বুঝতে পারছে ফোন থাকাটা দরকার ছিলো।

নিজের মনকে প্রবোধ দিলো, হয়তো বাস্টার্ড হারামজাদা তার ঘরে নেই। বাইরে কোথাও গেছে। ঝন্টু তার দল নিয়ে অপেক্ষা করছে। বদমাশটা ফিরে এলেই দ্রুত কাজ সেরে চলে আসবে।

দিল্লির মাদার তেরেসা স্ট্রিটের একটি দোতলা বাড়ির নীচ তলায় আছে সে। বাড়ির মালিক কোলকাতার এক ব্যবসায়ী। রঞ্জুর অন্য একটি ব্যবসার পার্টনার। লোকটার আজকের যে অবস্থান তার অনেকটাই রঞ্জুর কারণে। পেছন থেকে প্রচুর পরিমাণে টাকার জোগান দিয়েছে সে। তার ব্যবসা বাণিজ্যের ষাট ভাগ মালিকানাই রঞ্জুর। কিছুদিন আগে বিশাল এই বাড়িটা কেনা হয়েছে, উদ্দেশ্য মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং নির্মাণ করে অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করবে।

তার নিজের সাম্রাজ্যটা কত...তো দূর পর্যন্ত বিস্তৃত সেটা খুব কম লোকেই জানে। অপারেশন ক্লিনহার্টের কারণে যদি কোলকাতায় পালিয়ে না আসতো তাহলে এই সাম্রাজ্যটি ঢাকা শহরের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকতো। তার জন্যে দেশান্তরি হওয়াটা শাপে বর হয়েছে। হিজরত না করলে ভাগ্য বদল হয় না, তার বেলায়ও সত্যি হয়েছে এই পুরনো প্রবাদটি।

আবারো হাতঘড়িতে সময় দেখলো। ঘরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকলেও রেডিয়াম ডায়ালটা স্পষ্ট দেখতে পেলো। ঘরের একমাত্র যে বাতিটি জ্বলছে সেটা মৃদু আলোর ডিমলাইট। হালকা লালচে আভা ছড়িয়ে আছে পুরো ঘরে। যেনো একটু পর যে ভয়ঙ্কর কাজটা করবে সেটার আবহ ফুটিয়ে তোলার জন্য এই ব্যবস্থা।

তার আর তর সইছে না। বাস্টার্ডের সাথে মুখোমুখি হলে কী দারুণ শিহরণ বয়ে যাবে ভাবতেই পুলকিত হয়ে উঠলো। ঐ হারামিটাকে শুধু ভয়াবহ শারিরীক যন্ত্রণা দিয়ে মারবে না, তার জন্য তীব্র মানসিক যন্ত্রণা দেখারও ব্যবস্থা রেখেছে। রঞ্জু জানে, শারিরীক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারলেও যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করবে তার জন্যে বাস্টার্ড মোটেও প্রস্তুত নয়। এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে রঞ্জু কতোটা নির্মমভাবে প্রতিশোধ নিতে পারে।

বাস্টার্ড তার দলের অসংখ্য লোককেই শুধু খুন করে নি, খুন করেছে তার আপন বড় ভাই, স্ত্রীসহ ঘনিষ্ঠ অনেক লোককে। তারচেয়েও বড় কথা এই লোকের কারণেই বিশাল একটি পরিকল্পনা পণ্ড হয়ে গেছিলো। আর সে নিজে পরিণত হয় হুইলচেয়ারে বন্দী অথর্ব একজন মানুষে।

না! মনে মনে বলে উঠলো। সে মোটেই অথর্ব নয়। হুইলচেয়ারটা নিয়ে ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে বেড়ালো। খুব জলদিই সে উঠে দাঁড়াবে। হাঁটতে পারবে। ডাক্তার বলেছে, তার সেরে ওঠার সম্ভাবনা বেশ জোরালো। শুধু টাকা খরচ করতে হবে। এই জিনিসটা তার কাছে বেশ ভালো পরিমাণেই আছে।

মুচকি হাসলো সে। অচল রঞ্জুই যদি এতোবড় একটা কাজ করতে পারে তাহলে সচল রঞ্জু দেশের বাইরে থেকে কি করতে পারবে তা কেউ জানে না।

ঘরের এক কোণে টেবিলের উপর একটা ল্যাপটপ রাখা, সেটার পাশেই রয়েছে এক প্যাকেট সিগারেট। সময়ক্ষেপন করার জন্য সিগারেট খাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। ল্যাপটপের পর্দায় দেখা যাচ্ছে ইয়াহু মেসেঞ্জারটা অনলাইনে আছে। ভিডিও বক্সের

ইমেজটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো সে।

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে লাইটার দিয়ে ধরালো। জোরে জোরে টান দিয়ে হুইলচেয়ারটা নিয়ে চলে গেলো ফ্রেঞ্চ জানালার সামনে।

আর মাত্র কিছুক্ষণ পরই তার শিকার চলে আসবে তার হাতের মুঠোয়। বাস্টার্ড! আমি তোর জন্য অপেক্ষা করছি!

গাঢ় নীল রঙের মাইক্রোবাসটা কারোলবাগ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। গাড়ির গতি দেখে মনে হতে পারে কোনো তাড়া নেই, আয়েশী ভঙ্গিতে ছুটে চলেছে। গন্তব্যের দিকে। এর কারণ গাড়িটার গন্তব্য মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে। রাতের এ সময়টাতে রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা, ইচ্ছে করলে দ্রুতগতিতে ছোটা সম্ভব কিন্তু ড্রাইভার গতি বাড়াতে পারছে না। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গাড়ি চালাচ্ছে সে।

মাদার তেরেসা স্ট্রিটের একটি দোতলা বাড়ির সামনে এসে অল্প একটু সময়ের জন্য থামলো গাড়িটা। গাড়িতে লোকজন আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। গাড়ির ভেতর থেকে কোনো লোক বের হয়ে এলো না। একটু পরই গাঢ় নীল মাইক্রোবাসটা চলতে শুরু করলো আবার। দোতলা বাড়ি থেকে কিছুটা সামনে এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে মোড় নিলো। খুব ধীরগতিতে তিন-চারটা বাড়ি পেরিয়ে আবারো ডানে মোড় নিয়ে একটা উঁচু পাচিলের গা ঘেষে দাঁড়িয়ে পড়লো সেটা।

অনেকক্ষণ পর মাইক্রোবাস থেকে কালো পোশাকের এক লোক বেরিয়ে এলো। তার মাথায় মাঙ্কিক্যাপ। শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে।

মাইক্রো থেকে নেমে দোতলা বাড়িটার দিকে তাকালো এক ঝলক। এটা বাড়ির পেছন দিক।

মাইক্রোবাসের ড্রাইভিংসিটের দরজাটা খুলে সেটার উপর পা দিয়ে গাড়ির ছাদে উঠে পড়লো লোকটা। গাড়ি থেকে দোতলা বাড়ির বেষ্টনি দেয়ালটি মাত্র দুই ফুট উঁচু হবে, কোনো কাটা তার নেই। খুব সহজেই দেয়ালের উপর উঠে গেলো সে। তারপর উপুড় হয়ে দু'হাতে দেয়াল ধরে শরীরটা ঝুলিয়ে দিলো দেয়ালের ওপাশে, আস্তে করে হাতটা ছেড়ে দিতেই দেয়াল সংলগ্ন ঘাসের জমিনে নেমে পড়লো। ধুপ করে একটা শব্দ হলো কেবল।

ঝন্টুর মতে, এই বাড়িতে রঞ্জু ছাড়া কমপক্ষে আরো তিনজন আছে। তিনজনই সশস্ত্র। তাদেরকে কিভাবে মোকাবেলা করবে সেটা আগেই ঠিক করে রেখেছে সে। কোমর থেকে সাইলেন্সর পিস্তলটা বের করে নিলো। জিনিসটা রঞ্জুর লোকদের কাছ থেকে নেয়া।

দোতলা বাড়িটার পেছন দিকে এক চিলতে সবুজ ঘাসের লন, একটা মাত্র ইলেক্ট্রিক বাল্ব জ্বলছে সেখানে। বাড়ির ভেতর থেকে মৃদু টেলিভিশনের শব্দ ভেসে আসছে।

একটু পুরনো দিনের দোতলা বাড়ি। চারদিকে বারান্দা। বাড়ির পেছন দিকটা যে ব্যবহার করা হয় না সেটা বোঝা গেলো। বেশ কয়েকটি পরিত্যাক্ত গাড়ি আর শত শত তেলের ড্রাম রাখা। ড্রামগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় কেরোসিনের গন্ধ টের পেলো। সম্ভবত কেরোসিনের গোডাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় বাড়িটা।

মাটিতে যে ঘাস দেখতে পেলো সেগুলো আগাছায় পরিপূর্ণ। অনেকদিন ঘাস কাটা হয় নি। কিছু ঝোঁপঝাঁড়ও গজিয়ে উঠেছে এখানে সেখানে। মৃদু আলোতে স্পষ্ট বোঝা গেলো বাড়িটার রঙ বিবর্ণ হয়ে পড়েছে অনেক আগেই।

পা টিপে টিপে বাবলু এগিয়ে গেলো বাড়িটার কাছে।

একটা জানালার সামনে এসে কান পাতলো সে। টিভির আওয়াজটা এই ঘর থেকেই আসছে। কিন্তু জানালার কাঁচ এতো ঘোলা যে ভেতরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। তিন চার ফুট দূরে আরেকটা জানালা আছে, সেটার কাছে গিয়ে দেখার চেষ্টা করলো এবার। এই জানালাটার কাঁচ ঘোলা হলেও একটা কাঁচ ভাঙা, সেই ভাঙা কাঁচ দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলো ভেতরে দু'জন লোক চেয়ারে বসে টিভি দেখছে। তাদের হাতে বিয়ারের ক্যান। পায়ের কাছে আরো দশ বারোটা বিয়ারের ক্যান রাখা। তারা বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে আর টিভিতে একটা হিন্দি সিনেমা দেখছে। তাদের কোমরে কোনো অস্ত্র নেই। কিন্তু সে জানে তাদের কাছে অস্ত্র রয়েছে।

আরেকটু ভালো করে দেখলো ঘরের ভেতরটা। টিভির কাছে একটি টেবিলের উপর দুটো পিস্তল রাখা। তারা খারাপ কিছুর আশংকা করছে না, সুতরাং আয়েশ করে টিভি

দেখছে। কিন্তু আরেকজন লোক কোথায়?

উত্তরটা পেয়ে গেলো কয়েক সেকেন্ড পরই।

ঘরের দরজার কাছে আরেকজন লোকের আবির্ভাব ঘটলো। অপেক্ষাকৃত কম বয়সী ছেলেটা হিন্দিতে কী যেনো বললো চেয়ারে বসে থাকা লোক দুটোকে। তারপর ঘরে ঢুকে দুটো বিয়ারের ক্যান নিয়ে চলে গেলো!

বাবলু জানালা থেকে সরে গিয়ে বাড়ির সামনে যাবার জন্য পা বাড়ালো। তার টার্গেট বাইরের ছেলেটা।

পা টিপে টিপে বাড়ির সামনে আসতেই দেখতে পেলো দুটো বিয়ার নিয়ে অল্পবয়সী ছেলেটা মেইনগেটের কাছে এসে চেয়ারে বসে একটা ক্যান খুলছে।

দারুণ! মনে মনে বললো বাবলু।

অল্পবয়সী ছেলেটা আয়েশ করে বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে আর পা নাচাচ্ছে। তার কোমরে কিংবা হাতের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। মুচকি হেসে আবার আগের জায়গায় ফিরে এলো সে। একে নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এর দিক থেকে কোনো সমস্যা হবার সম্ভাবনা নেই।

জানালার ফুটো দিয়ে আবারো তাকালো ভেতরে। একই দৃশ্য। টিভি দেখছে আর বিয়ার খাচ্ছে দু'জন পান্ডা।

মনে মনে ঠিক করে নিলো কি করবে। দ্রুত আর ক্ষিপ্রগতিতে ঘরে ঢুকেই দুজনকে শেষ করে ফেলতে হবে। জানালা থেকে যে-ই না সরে যাবে অমনি শুনতে পেলো অন্য আরেকটা কণ্ঠ।

"অর্জুন!"

পাশের আরেকটা ঘর থেকে আওয়াজটা এসেছে। চতুর্থ আরেকজন আছে!

সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেলো তার। অবশ্যই আছে।

"অর্জুন!" আবারো ডাকটা শোনা গেলো।

বাবলু লক্ষ্য করলো টিভি দেখতে থাকা দুজনের মধ্যে একজন কিছুটা বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

নিজের পরিকল্পনাটা একটু বদলে নিলো বাবলু।

প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটা এই বাড়ির সবচাইতে বড় ঘর। ড্রইংরুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ডিমলাইটের মৃদু আলোয় একটা হুইলচেয়ারে বসে আছে ব্ল্যাক রঞ্জু। ঘরের শেষমাথায় একটি বিশাল ফ্রেঞ্চ জানালা দিয়ে চেয়ে আছে ড্রাইভওয়েয়ের দিকে। এখান থেকে বাইরের মেইনগেটটা দেখা না গেলেও ড্রাইভওয়েটা পরিস্কার দেখা যায়। বিগত এক ঘণ্টায় কম করে হলেও পঞ্চাশবার এই জানালার সামনে এসে দেখেছে। তার লোকগুলো দেরি করছে বলে অস্থির হয়ে আছে সে।

অর্জুন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গলা খাকারি দিলে রঞ্জু তার দিকে ফিরে তাকালো।

"বিয়ার হ্যায়?"

"কিতনে চাইয়ে, ভাই?" জানতে চাইলে অর্জুন।

"দো।"

"আতি হু," বলেই ঘর থেকে বের হয়ে গেলো সে।

রঞ্জু আবারো ফ্রেঞ্চ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো।

একটা বাজার চলতি হিন্দি গান গুনগুন করে গাইতে গাইতে অর্জুন চলে এলো নিজের ঘরে। দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখতে পেলো তার সঙ্গি, একটু আগেও যে বসে বসে বিয়ার খাচ্ছিলো সে এখন বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

মাথা দুলিয়ে মুচকি হাসলো অর্জুন। "কেয়া হুয়া?...খালাস?" বলেই উপুড় হয়ে মেঝে থেকে দুটো বিয়ার তুলতে গেলো সে, হঠাৎ তার মনে হলো পেছনে কেউ আছে, কিন্তু ঘুরে

দেখার আগেই থুতু ফেলার শব্দ হলো কেবল।

একটা অস্ফুট আওয়াজ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো অর্জুন।

মাথার পেছন থেকে, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি চালিয়েছে বাবলু।

অর্জন ঘরে থেকে বের হতেই সে দ্রুত এই ঘরের দিকে পা বাড়ায়। দরজার কাছে আসতেই চেয়ারে বসা লোকটি চমকে যায় তাকে দেখে। কিন্তু কিছু বলার আগেই গুলি চালিয়ে বসে সে। চেয়ার থেকে হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়তেই বাবলু ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলে। বিছানার উপর উপুড় করে রেখে দেয় তাকে, যেনো দেখে মনে হয় লোকটা ঘুমাচ্ছে। তারপর দরজার পেছনে লুকিয়ে থাকে অর্জুনের জন্য।

এবার ঘর থেকে বের হয়ে মেইনগেটের দিকে পা বাড়ালো সে। অল্পবয়সী ছেলেটা দ্বিতীয় বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে এখন। একটা খালি বিয়ারের ক্যান তার পায়ের কাছে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

একেবারে নিঃশব্দে বড় বড় পা ফেলে অল্পবয়সী ছেলেটার পেছনে চলে এলো। মৃত্যুর আগে ছেলেটা যেনো কিছু টের না পায়, কোনো রকম শব্দ না করে। আস্তে করে সাইলেন্সার পিস্তলটা তাক্ করলো মাথার ঠিক পেছনে। গুলি করার আগে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে।

তারপর শুধু থুতু ফেলার মতো ভোতা একটি শব্দ।

অল্পবয়সী ছেলেটা ঘোৎ করে আওয়াজ করে চেয়ার থেকে ঢলে পড়ে গেলো কংক্রিটের ফ্লোরে। বাবলু তাকে ধরলো না। ছেলেটার মুখ রক্তে একাকার। সদ্য পান করা বিয়ার বমি হয়ে বের হয়ে এলো।

ছেলেটাকে মারার কোনো ইচ্ছে তার ছিলো না কিন্তু নিজের জীবনের ঝুঁকি রাখার কোনো মানে হয় না। ভালো করেই জানে লোকগুলো কতোটা ভয়ঙ্কর।

মেইনগেট থেকে রঞ্জুর ঘরের দিকে যাবার সময় তার শরীর দিয়ে এক ধরণের উত্তেজনা বয়ে গেলো। সে জানে, এই দূর দেশে, বিশাল এই বাড়িতে রঞ্জু এখন একা। একা এবং অথর্ব। একটা হুইলচেয়ারে বসে অপেক্ষা করছে তার জন্য। প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত রঞ্জু ঘুণাক্ষরেও জানে না সে আসলে কিসের জন্য অপেক্ষা করছে।

দরজার সামনে আসতেই তার মনে হলো, তাকে এভাবে দেখে রঞ্জু কতোটা বিস্মিত হবে। কিন্তু বাবলুর কোনো ধারণাই নেই, তার নিজের জন্যে কতোটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে সেখানে।

অধ্যায় ৮০

জেফরি বেগ মোটরসাইকেলে করে ছুটে চলছে পুরনো ঢাকার আইজি গেট নামক এলাকার দিকে। বাইকটা চালাচ্ছে জামান।

একটু আগে জামানকে মোটরসাইকেল নিয়ে হোমিসাইড থেকে তার বাড়িতে চলে আসতে বলেছিলো। স্থানীয় থানার পুলিশের কাছে মিলনের ডেডবডিটা বুঝিয়ে দিয়ে জামানকে সাথে নিয়ে বের হয়ে যায় সে।

তার সহকারীকে পুরো ঘটনা খুলে বলে নি, বলার সুযোগও পায় নি। এখন তাকে অনেক জরুরি একটা কাজ করতে হবে। হাতে একদম সময় নেই।

তবে জামান ব্যাপারটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে। তুর্যকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা হয়তো মিলনের কাছ থেকে জেনে নিতে পেরেছে তার বস। কিন্তু জামান জানে না এই মূল্যবান তথ্যটা তার বসকে দিয়েছে বাস্টার্ড নামের পেশাদার সেই খুনি। জানলে সে দারুণ অবাক হতো।

একটু আগে হোমিসাইড থেকে ফোন করে জানিয়েছিলো মিলন এখন জেফরির বাড়ির সামনে অবস্থান করছে। জামান যখন প্রথম ফোন করে তখন সে টয়লেটে ছিলো। প্রস্তুতি নিচ্ছিলো হোমিসাইডে যাওয়ার জন্য। টয়লেট থেকে বেরিয়ে দেখে জামান পর পর দু'বার ফোন করেছে। কলব্যাক করতেই সহকারী অনেকটা হাফ ছেড়ে বাঁচে। সে খারাপ কিছুর আশংকা করেছিলো-মিলন হয়তো এরইমধ্যে কিছু একটা করে ফেলেছে। জেফরি কল করতে একটু দেরি করলেই জামান স্থানীয় থানায় ফোন করে বসতো, সে নিজেও ছুটে আসতো তার বাড়িতে। জেফরির ফোনটা তাকে এক ধরণের স্বস্তি এনে দিয়েছিলো।

জামানের কাছ থেকে সব শুনে জেফরি বেগ দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। মিলনকে সে একা একাই মোকাবেলা করবে। শিকার যখন নিজে থেকেই এসে পড়েছে শিকারটা সে একাই করবে।

দেরি না করে পুরো ফ্ল্যাটের বাতি নিভিয়ে দিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। রাস্তার ওপারে, পার্কের ঝোঁপের আড়ালে ছোট্ট একটা লালচে আলো দেখে ধারণা করে ওখানেই হয়তো মিলন দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় নাইটভিশন গগলসটা এখন তার ড্রয়ারে, কারণ সামনের সপ্তাহে শুটিংরেঞ্জে দ্বিতীয় সেশনের প্র্যাকটিস করার কথা।

গগলসটা বের করে পরে নেয় তারপর অন্ধকার ঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পায় রাস্তার ওপারে পার্কের ঝোঁপের কাছে এক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে।

ক্লোজেট থেকে পিস্তলটা বের করে নেয়, সেই সাথে বাড়তি সতর্কতার জন্য হোমিসাইডের স্টোররুম থেকে আনা বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটটাও পরে নেয় জেফরি বেগ। বিছানায় কোলবালিশটার উপর কম্বল মেলে রেখে চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে মিলনের জন্য।

"স্যার, আমার মনে হয় ব্যাকআপ ছাড়া ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না।" মোটরবাইকটা চালাতে চালাতে জোরে জোরে বললো জামান।

"ব্যাকআপ টিম রেডি করার মতো সময় এখন নেই," পেছন থেকে বললো জেফরি। "তাছাড়া হুট করে ব্যাকআপ টিম ডেকে এনে এরকম একটি কাজ করাও যাবে না। পুরো ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে। আমি এক পার্সেন্ট ঝুঁকিও নিতে চাচ্ছি না। ওরা টের পেয়ে গেলেই জিম্মিদের খুন করে পালানোর চেষ্টা করবে। এতোক্ষণে ছেলেটা জীবিত আছে কিনা কে জানে।"

এবার বুঝতে পারলো জামান। অপহরণ কেস খুবই সাবধানে সামলাতে হয়। ব্যাকআপ টিমে যারা থাকে তাদেরকে আগে থেকেই ব্রিফ করে বুঝিয়ে দিতে হয় পুরো পরিকল্পনাটা। এক্ষেত্রে অতোটা সময় তারা পাবে না। তার বস হয়তো জানতে পেরেছে খুব জলদিই রঞ্জুর লোকজন তুর্যকে খুন করে গুম করে ফেলবে।

"তাছাড়া লোকাল থানাকে আগেভাগে জানাতে চাচ্ছি না আমি।"

লুকিংগ্লাসের মধ্য দিয়ে জেফরির সাথে চোখাচোখি হলো জামানের।

“এই ঘটনায় মিনিস্টারের পিএস আলী আহমেদও জড়িত আছে।”

“কি!?” সঙ্গত কারণেই অবাক হলো জেফরির সহকারী।

“তারচেয়েও বড় কথা, ঢাকার অনেক থানায় রঞ্জুর পেইড-এজেন্ট রয়েছে।”

জামানের খুব জানতে ইচ্ছে করলো পিএসের জড়িত থাকার কথাটা জেফরি কিভাবে জানতে পারলো।

“আমি চাই ওরা যেনো কিছু টের না পায়। টের পেয়ে গেলেই সব শেষ, বুঝলে?”

জামান একটু চুপ থেকে বললো, “কিন্তু এরকম একটি কাজের জন্য আমরা দুজন কি যথেষ্ট, স্যার?”

“দু’জন না...একজন।”

“কি?!” বিস্মিত হলো জামান।

“শুধু আমি যাবো।”

প্রায় অন্ধকার একটি ঘর, মৃদু লালচে আলো জ্বলছে। ঘরের দরজার সামনে। দাঁড়িয়ে বাবলু দেখতে পেলো দূরে একটি ফ্রেঞ্চ জানালার সামনে হুইলচেয়ারে বসে আছে এক লোক।

রঞ্জু!

একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাইরে। একেবারে স্থির।

কয়েক মুহূর্ত বাবলু দাঁড়িয়ে রইলো দরজার সামনে। কিছু একটা টের পেয়ে দরজার দিকে তাকালো রঞ্জু।

“কেয়া হুয়া?” জানতে চাইলো শান্তকণ্ঠে। অন্ধকারে বুঝতে পারে নি কে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

বাবলু আস্তে করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। তার হাটার মধ্যে অস্বাভাবিক ধীরস্থিরতা বিরাজ করছে।

“কে?” ব্ল্যাক রঞ্জু যেনো বিপদের গন্ধ টের পেয়ে গেলো। সামনে এগিয়ে আসা অবয়বটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে এখন।

বাবলু জানে চোখ জোড়া ছাড়া তার মাথা আর মুখের সবটাই ঢাকা মাঙ্কিক্যাপে।

“কে?” প্রায় চিৎকার দিয়ে উঠলো রঞ্জু। “অর্জুন?...উপেন?”

মাথা দোলালো বাবলু। আরো কয়েক পা এগিয়ে গেলো সে।

চোখেমুখে ভয় আর বিস্ময় নিয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো রঞ্জু, “কে?”

“আমি!” শান্তকণ্ঠে বললো বাবলু।

আরেকটু সামনে এগিয়ে গেলো সে। রঞ্জু থেকে মাত্র পাঁচ-ছয় ফুট দূরে এখন। ঘরের এদিকটায় বিশাল ফ্রেঞ্চ জানালা দিয়ে বাইরে থেকে আলো এসে পড়েছে। মুখের উপর থেকে মাঙ্কিক্যাপটা এক টানে খুলে ফেললো।

বিস্ফারিত চোখে রঞ্জু চেয়ে রইলো তার দিকে। এ জীবনে এতোটা বিস্মিত কখনও হয় নি। তার সেই বিস্ময়ের প্রাবল্যে ঢাকা পড়ে গেলো আচমকা জেঁকে বসা ভীতি। অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য।

বাবলুর ঠোঁটে বাঁকা হাসি। আরেকটু এগিয়ে এলো সে।

ব্ল্যাক রঞ্জুর দু’ঠোঁট কেঁপে উঠলো।

“বাস্টার্ড!”

জেফরি বেগ আর জামান মোটরসাইকেলে করে পুরনো ঢাকার আইজিগেটের ইস্টার্ন হাউজিং এলাকায় এসে পড়লো। এই হাউজিং এলাকার দক্ষিণ দিকে বয়ে গেছে বুড়িগঙ্গা নদী। এখানে নৌকায় করে নদী পারাপারের জন্য ছোটোখাটো একটি ঘাটও রয়েছে।

জেফরির এক স্কুল বন্ধু থাকতো এখানে। কলেজ জীবন পর্যন্ত এই এলাকায় প্রচুর এসেছে। ভালো করেই জায়গাটা চেনে। পুরো আবাসিক এলাকাটি নিরব। কিছু কিছু বাড়ি থেকে টেলিভিশনের শব্দ ভেসে আসছে।

তারা মোটরসাইকেলে করে সোজা চলে এলো ঘাটের কাছে। প্রায় আট নয় ফুট উঁচু কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে নদীর তীর ঘিরে ফেলা হয়েছে এখন। ঘাটে যাবার জন্য সেই কংক্রিটের দেয়ালের মাঝে পাঁচ-ছয় ফুটের একটি খোলা অংশ আছে।

জেফরি মোটরসাইকেল থেকে নেমে পড়লো।

"স্যার, আপনি তাহলে একাই যাবেন?" মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন বন্ধ করে বললো জামান।

সহকারীর কাঁধে হাত রাখলো জেফরি। এর আগে মিলনকে ধরতে গিয়ে গুলি খেয়েছিলো ছেলেটা। এখন আর তাকে কোনো রকম ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে চাচ্ছে না। যা করার একাই করবে। তারচেয়েও বড় কথা, কাজটা একা করলেই বেশি ভালো হবে।

"চিন্তা কোরো না, তোমার সাথে আমার যোগাযোগ থাকবে। মোবাইল ফোনটা চালু রেখো।"

একান্ত অনিচ্ছায় মাথা নেড়ে সায় দিলো জামান।

"আমি যখন যা করতে বলবো শুধু তাই করবে...এর বেশি না। ঠিক আছে?" বলেই সহকারীর কাঁধে চাপড় মারলো।

"বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরা আছে। চিন্তা কোরো না।"

ঘাটের দিকে পা বাড়ালো জেফরি বেগ।

বিশাল ঘরটা এখন আলোকিত। বাবলু একটু আগে বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখনও ফ্রেঞ্চ জানালার সামনে হুইলচেয়ারটায় বসে আছে রঞ্জু, তার চোখেমুখে বিস্ময়ভাবটা যেনো স্থায়ী হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পর চোখমুখ শক্ত করে বলে উঠলো পঙ্গু সন্ত্রাসী: "ওদের সবাইকে মেরে ফেলেছিস?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাবলু। যে চারজনকে তার বাড়িতে পাঠিয়েছিলো তারা সবাই এখন মৃত। মাইক্রোবাসে চারজনের লাশ বয়ে নিয়ে এসেছে। তার চিলেকোঠায় ছিলো দুটো লাশ, ওগুলো ফেলে আসাটা ঠিক হতো না। পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে আসতো ঘরটা বাংলাদেশ দূতাবাস ভাড়া নিয়েছে। বিরাট কেলেংকারীর ব্যাপার হয়ে যেতো সেটা।

"শুধু তুই আর আমি...আর কেউ নেই।" কথাটা বলেই রঞ্জুর খুব কাছে চলে এসে মুচকি হাসি দিলো বাবলু।"

রাগে কাঁপতে লাগলো সন্ত্রাসী, কিছু বলতে পারলো না। আড়চোখে ল্যাপটপের দিকে তাকালো। যে কারণে ল্যাপটপটা রেখেছিলো এখন সেটা পুরোপুরি পাল্টে গেছে।

সাইলেন্সর পিস্তলটা রঞ্জুর কপালে ঠেকালো বাবলু। "বুঝতেই পারছিস তোর সময় শেষ!"

বাবলু যে-ই না টুগারে আঙুল রাখবে অমনি তার চোখ আটকে গেলো ঘরের এককোণে ছোটো টেবিলটার দিকে। ল্যাপটপের পর্দায় একটা ছবি দেখে তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। চট করে তাকালো রঞ্জুর দিকে।

রঞ্জুর মুখ ফসকে বের হয়ে গেলো : "উ-উমা!"

কথাটা শুনেই বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো হুইলচেয়ারে বসা লোকটার দিকে। তার

গলা দিয়ে কোনো কথা বের হলো না।

“উমা!” ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললো আবারো। “এখন আমার লোকদের হাতে বন্দী!”

রাতের এমন সময়ে কোনো যাত্রি নেই, তারপরও দু'তিনটা নৌকা ঘাটে ভেড়ানো আছে। জেফরিকে দেখে মাঝিগুলো নড়েচড়ে উঠলো। একসাথে সবাই ডেকে উঠবে-এটাই নৌকাঘাটের পরিচিত দৃশ্য। তাই হলো, দু'তিনজন মাঝি হাক দিলে মাঝিদের দিকে তাকালো সে। দু'জনের বয়স অনেক বেশি, এরা কোনো রকম ঝুঁকি নিতে রাজি হবে না। একজনের বয়স বেশ কম। বড়জোর বাইশ-তেইশ হবে।

বাই-তেইশের নৌকায় উঠে বসলো সে। নৌকাটা ঘাট থেকে বেরিয়ে নদী পার হবার জন্য এগিয়ে যেতেই জেফরি দেখতে পেলো সামনের ডান দিকে বেশ কিছুটা দূরে নদীর বুকে একটি লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। লঞ্চটা ডকইয়ার্ডের কাছে থাকলেও একদম তীরে ভেড়ানো নেই। বলতে গেলে নদীর বুকেই রাখা আছে সেটা। শুধু উপরের ডেকে আলো জ্বলছে। তাছাড়া পুরো লঞ্চে কোনো বাতি জ্বলছে না।

মাঝির সাথে কথা বললো সে।

"নাম কি?"

"আমির হোসেন, স্যার," বৈঠা বাইতে বাইতে বললো মাঝি।

"সুন্দর নাম," বলেই পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার একটি নোট বের করে মাঝির দিকে বাড়িয়ে দিলো। "পুরোটাই রাখো।"

মাঝি অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

"আমাকে তুমি ঐ লঞ্চটার কাছে নিয়ে যাবে..." আঙুল তুলে নদীর বুকে দাঁড়িয়ে থাকা লঞ্চটার দিকে ইঙ্গিত করলো।

মাঝি কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলো।

"ভয়ের কিছু নেই, আমি পুলিশের লোক।"

ঢোক গিললো মাঝি। তারপর মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"রাখো," টাকাটা মাঝির সামনে রেখে বললো জেফরি।

নৌকায় একটা হ্যারিকেন জ্বলছে, সেটা হাতে তুলে নিয়ে নিভিয়ে দিলো। "ভয়ের কিছু নেই...তুমি শুধু আমাকে ঐ লঞ্চের কাছে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে, ঠিক আছে?"

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো তরুণ মাঝি।

"ভয় পেয়েছো?" হেসে জানতে চাইলো জেফরি, কিন্তু সে নিশ্চিত হতে পারছে না তার হাসি অন্ধকার নদীর বুকে দেখা গেলো কিনা।

"না, ডরামু ক্যান," বললো আমির নামের মাঝি ছেলেটা। "আপনে তো পুলিশের লোক...গুণ্ডাবদমাইশ অইলে না হয় কথা আছিলো।"

মুচকি হাসলো সে। নিজেকে বহুকষ্টে শান্ত রাখতে পেরেছে। একটু পর একদল ভয়ঙ্কর লোকের ডেরায় ঢুকতে যাচ্ছে সে। তার এমন বেপরোয়া ভাবভঙ্গি দেখে জামান ছেলেটা যে খুব বিস্মিত হয়েছে সেটা বুঝতে পারছে।

গভীর করে দম নিয়ে মাঝির দিকে ফিরলো। "এমনভাবে যাবে লঞ্চের লোকগুলো যেনো টের না পায় আমরা আসছি।"

"ঠিক আছে, স্যার," বলেই নৌকাটা ডান দিকে ঘুরিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চললো । লঞ্চটা এখন তাদের বাম দিকে একশ' গজ দূরে। কোনো লোকজন দেখা যাচ্ছে না। মাঝি আস্তে আস্তে বৈঠা বাইতে লাগলো যেনো ছলাৎ ছলাৎ শব্দটা পর্যন্ত না হয়।

"ওই লঞ্চটার লগে একটা স্পিডবোট বান্দা আছে, স্যার," চাপাকণ্ঠে বললো ছেলেটা।

"তাই নাকি," বললো জেফরি বেগ। সে অবশ্য অবাক হয় নি। তারা তো এরকমই ধারণা করেছিলো।

"হ, স্যার," মাঝি তার গলা নামিয়ে আবারো বললো, "লঞ্চটার কাম অইতাছে...মনে হয় ইঞ্জিনে টেরাবল আছে।"

"তুমি কিভাবে জানলে?"

"কি যে কন না...আমি সারাদিন নদী পারাপার করি না?" হেসে বললো আমির হোসেন। "লাইনের লঞ্চে টেরাবল দিলে নদীর উপর রাইখ্যা দেয়। চালু লঞ্চ অইলে তো টিরিপ মারতো।"

"হুম," বলেই লঞ্চের দিকে তাকালো। এখন সেটা মাত্র ত্রিশ গজ দূরে আছে। নিঃশব্দে তাদের নৌকাটা এগিয়ে চলছে ধীরে ধীরে।

তুর্যের হাত এখন খোলা। মুখও বাধা নেই কারণ একটু আগে বহু কষ্টে হাতের বাধনটা খুলে ফেলেছে সে।

আজ যেনো পরিস্থিতি আচমকা পাল্টে গেছে। সকালে একটু খাবার দেয়ার পর দীর্ঘক্ষণ ধরে কোনো খাবারও দেয়া হয় নি তাকে। কয়েক ঘণ্টা আগে চাপদাড়ি এসে তার ঘর থেকে ল্যাপটপটা নিয়ে এই যে গেছে তারপর আর কারোর দেখা নেই।

ক্ষিদের চোটে হাত-পা কাঁপছে। তারচেয়েও বড় কথা মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। লোকগুলো তাকে মেরে ফেলবে, এরকম একটি আশংকা জেঁকে বসেছে তার মধ্যে। কিছুক্ষণ আগে বন্ধ দরজার ওপাশে তাদের কথাবার্তার কিছু অংশ শুনে ফেলেছে সে।

লোকগুলোর কথা শোনার পর থেকে ভয়ে কাঁপতে শুরু করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সিদ্ধান্ত নেয় শেষ একটা চেষ্টা করে দেখবে। এভাবে লোকগুলোর হাতে খুন হবার চেয়ে পালানোর চেষ্টা করাই ভালো। সিনেমাতে কতো দেখেছে, বন্দী অবস্থা থেকে তার চেয়েও কম বয়সী ছেলেমেয়েরা ভয়ঙ্কর সব লোকজনকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। তাহলে সে পারবে না কেন?

বয়সের তুলনায় সে নিজেকে অনেক বেশি বড় মনে করে। এই বয়সেই তার গার্লফ্রেন্ডের সংখ্যা অগুণতি। তাদের অনেকের সাথেই তার দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে। বন্ধুবান্ধবরা তাকে হিংসে করে এজন্যে। তাদের কাছে সে স্মার্ট একটা ছেলে। তার মতো একটা ছেলে কি পারবে না এই লোকগুলোকে ফাঁকি দিয়ে সটকে পড়তে?

অবশ্যই পারবে, মনে মনে বলে সে। তার হাত দুটো দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাধা। অনেক চেষ্টা করে হাত দুটো পায়ের নীচ দিয়ে সামনে নিয়ে আসতে পারে, তারপর খুব সহজেই দাঁত দিয়ে দড়িটার গিট খুলে ফেলে সে।

এখন তার হাত-মুখ খোলা। বন্ধ দরজাটা কিভাবে খুলবে, কিভাবে ভয়ঙ্কর লোকগুলোকে ফাঁকি দিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাবে, ভাবতে লাগলো।

কিছুক্ষণ আগে হাতটা খোলার পর দরজা খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলো, সফল হয় নি। খালি হাতে সফল হবার কথাও নয়।

যখন বাতি জ্বালিয়ে ল্যাপটপের সামনে বসিয়ে তার ভিডিও রেকর্ড করা হতো তখন সে দেখেছে, এই ঘরের দরজার লকটা পুরনো ধাঁচের। অনেকটা স্টিলের খিড়কির মতো। এরকম খিড়কি তাদের পুরনো বাড়ির দরজাগুলোতে ছিলো। তার বয়স যখন আট-নয় তখন দুষ্টুমি করলে তার মা একটা ঘরে আটকে রাখতো, আর সেই ছোট্ট তুর্য একটা প্লাঞ্জের সাহায্যে দরজাটার খিড়কি ভেতর থেকে খুলে চুপিসারে বাইরে চলে আসতো।

তো সেরকম খিড়কি দেখে চেষ্টা করেছিলো। ভেতর থেকে খিড়কিটার তিনটি নাট-বল্ট দেখা যায়। ছয় ইঞ্চি দূরত্বে দু'পাশে দুটো নাট, আর তার ঠিক তিন-চার ইঞ্চি নীচে তৃতীয় নাটটি। অনেকটা ত্রিভূজের আকার গঠন করেছে। সে জানে, নীচের নাটটা খুলে ফেলতে পারলেই খিড়কিটা অনায়াসে খোলা যাবে কিন্তু সেটা খালি হাতে সম্ভব নয়। চেষ্টা করে দেখেছে কিন্তু হাতের আঙুল থেতলে গেলেও নাটটা একটুও ঘোরাতে পারে নি।

আঙটার মতো কিছু থাকলে কাজে দিতে কিন্তু এ ঘরে সেরকম জিনিস কই?

একটু শীত শীত লাগলে তোষকের উপর গিয়ে শুয়ে পড়লো সে। কম্বলটা গায়ে টেনে দিলেও শীত মানছে না। শরীরটা কুকড়ে পকেটে হাত ঢোকাতেই টের পেলো একটা জিনিস। বেশ কয়দিন হলো সে বন্দী হয়ে আছে এখানে অথচ জিনিসটার অস্তিত্ব টের

পেলো এইমাত্র!

অধ্যায় ৮৩

ব্ল্যাক রঞ্জু হুইলচেয়ারসহ মেঝেতে পড়ে আছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বাবলু। টেবিলের উপর রাখা ল্যাপটপের পর্দায় ইয়াহু মেসেঞ্জারের ভিডিওবক্সে ভয়ঙ্কর একটি ছবি দেখা যাচ্ছে : হাত-মুখ বাধা উমা বসে আছে একটা চেয়ারে।

মেয়েটা এখন রঞ্জুর লোকজনের হাতে বন্দী।

তার বুঝতে অসুবিধা হলো না কতো ভয়ঙ্করভাবে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলো এই পঙ্গু সন্ত্রাসী। প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত রঞ্জু চেয়েছিলো বাবলুকে খুন করার আগে তার চোখের সামনে উমাকে খুন করে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা দেবে। এক পৈশাচিক আনন্দে মেতে উঠবে।

ল্যাপটপের পর্দায় বন্দী উমার ছবিটা দেখার পর কয়েক মুহূর্ত বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলো সে, তারপরই রঞ্জুকে এলোপাথারি ঘুষি মেরে মেঝেতে ফেলে দেয়। পিস্তল তাক করে জানতে চায়, উমা এখন কোথায়।

পঙ্গু সন্ত্রাসী কিছুই বলে নি, এখনও বলছে না।

উমার ভিডিওটা দেখা যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার আশেপাশে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। বাবলু বুঝতে পারছে না কী করবে। তবে ল্যাপটপের ইনবিল্ট ওয়েবক্যামটা বন্ধ করে দিয়েছে যাতে করে তার ছবি ব্রডকাস্ট না হয়।

"আমি জানি তুই আমাকে মেরে ফেলবি," মেঝেতে পড়ে থাকা রঞ্জু বললো।

বাবলু পেছন ফিরে তাকালো তার দিকে। তার চোখেমুখে ক্রোধ উপচে পড়ছে।

"আমার আর বেঁচে থাকার কোনো চান্স নেই।"

বাবলু কিছু বললো না। তার দিকে কঠিন দৃষ্টি হেনে চেয়ে রইলো শুধু।

"...তাহলে আমি কেন উমার খোঁজ তোকে দেবো?" বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো রঞ্জুর ঠোঁটে।

বাবলু বুঝতে পারলো জীবনে এই প্রথম মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারছে না। ধীরস্থিরভাবে কোনো কিছু ভাবতেও পারছে না সে। কিন্তু ভালো করেই জানে, এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য খুব সহজ একটি পথ আছে কিন্তু সেটা তার মাথায় আসছে না।

"তুই আমাকে যতোই টর্চার করিস, যতোই ভয় দেখাস, আমি কিছু বলবো না!" কথাটা বলেই উন্মাদগ্রস্তের মতো হাসি দিতে শুরু করলো সে।

বাবলু চেয়ে রইলো পঙ্গু সন্ত্রাসীর দিকে। তার ইচ্ছে করছে এক্ষুণি পিস্তলের সবগুলো গুলি বদমাশটার বুকে খরচ করে ফেলতে, কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলো।

রঞ্জুর মধ্যে মৃত্যুভয়ও জেঁকে বসেছে। বিকারগ্রস্তের মতো আচরণ করছে এখন।

বাবলু জানে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। কখন কে চলে আসে তার কোনো ঠিক নেই।

একটু আগে যখন ব্ল্যাক রঞ্জুর সামনে চলে এলো তখন ভেবেছিলো তাদের মোকাবেলাটা বড়জোর পাঁচ-দশ মিনিটের মতো স্থায়ী হবে। তারপরই জঘন্য সন্ত্রাসীটাকে চিরতরের জন্য স্তব্ধ করে দিয়ে চলে যাবে এখান থেকে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি একেবারেই পাল্টে গেছে। রঞ্জুকে খুন করতে পারছে না সে। অন্তত উমার ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু না জেনে রঞ্জুকে কিছু করতে পারছে না।

"উমাকে কোথায় আটকে রেখেছিস?" বেশ শান্ত কণ্ঠে বললো এবার।

খিকখিক করে হাসলো রঞ্জু। "আমি যদি বলি কোথায় আটকে রেখেছি তাহলে তুই কি করবি?" মাথা দোলালো সে। "কিছু করতে পারবি না। এখান থেকে ওকে কিভাবে বাঁচাবি?"

"তাহলে তোকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি?" পিস্তলটা তাক করলো বাবলু।

রঞ্জু একটুও ঘাবড়ালো না। মনে রাখিস, আমি মরলে উমাকে আর বাঁচাতে পারবি না।"

"তার মানে তোকে বাঁচিয়ে রাখলে উমা বেঁচে থাকবে?"

"সেটা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি...আলোচনা করতে পারি!"

বাবলু চেয়ে রইলো মেঝেতে পড়ে থাকা সন্ত্রাসীর দিকে।

“হুম,” কথাটা বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো সে।

“কোথায় যাচ্ছিস?” ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জানতে চাইলো রঞ্জু।

দরজার সামনে থেকে ফিরে তাকালো বাবলু। “কথা বলতে!”

মাঝির দিকে তাকালো জেফরি বেগ, অন্ধকারেও ছেলেটার চোখেমুখে রোমাঞ্চ দেখতে পেলো সে। “আস্তে করে লঞ্চটার গায়ের সাথে ভেড়াবে...”

মাঝি একহাত তুলে জেফরিকে আশ্বস্ত করলো। সাবধানে বৈঠা বাইতে বাইতে লঞ্চের গায়ের সাথে ভিড়িয়ে দিলো তার ছোট্ট খেয়া নৌকাটা। তারপর জেফরির উদ্দেশ্যে ইশারা করলো উঠে পড়ার জন্য।

ছেলেটার দিকে হাত তুলে বিদায় জানিয়ে লঞ্চের চারপাশে যে কার্নিশের মতো বিম থাকে সেটার উপর উঠে বসলো সে। মাঝি ছেলেটা নিঃশব্দে নৌকা ঘুরিয়ে চলে গেলো।

কার্নিশ সংলগ্ন সারি সারি খোলা জানালা। নীচের ডেকে উঁকি মারলো জেফরি। কাউকে দেখতে পেলো না। ভেতরটা ঘন অন্ধকার। আবছা আবছা দেখতে পেলো এখানে সেখানে মালপত্র স্তূপ করে রাখা আছে। সাইডব্যাগ থেকে নাইটভিশন গগলসটা বের করে পরে নিলো সে।

এবার নীচের ডেকটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। পুরো ডেকটা জুড়ে বড় বড় বাক্স আর মালপত্র রেখে দেয়া হয়েছে।

নীচের ডেকে নেমে পড়লো সে। ঘন অন্ধকার এখন তার বাড়তি সুবিধা। কোমর থেকে নাইন এমএমের পিস্তলটা হাতে তুলে নিলো। আজকের জন্যে সে সাইলেন্সর ব্যবহার করবে।

পিস্তল হাতে জেফরি বেগ সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চললো নীচের ডেকের পেছন দিকে। জামানের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে, এই লাইনের লঞ্চগুলোর কোথায় কি থাকে।

লঞ্চের পেছনে একটা বড়সড় ঘর, সেটার ভেতর থেকে মেশিনের শব্দ ভেসে আসছে। জেফরি বেগ দরজা খুলে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। নাইটভিশন গগলসের সবুজাভ আলোয় দেখতে পেলো একটা মাঝারি গোছের জেনারেটর চলছে।

পকেট থেকে জিনিসটা বের করে আনলো তুর্য : তার স্কুলের আইডিকার্ডটা। প্লাস্টিকের এই কার্ডটার সাথে লম্বা একটা চেইনও আছে গলায় ঝুলিয়ে রাখার জন্য। কার্ডটা বের করে অন্ধকারেই হাতরালো সে। কার্ডটা চেইনের সাথে আটকে রাখার জন্য একটা ধাতব আঙটার মতো ক্লিপ আছে। ক্লিপটা দিয়ে কি নাটটা খোলা যাবে? সঙ্গে সঙ্গে তুর্য ছুটে গেলো দরজার কাছে। চাপ দিয়ে কার্ড থেকে ক্লিপটা খুব সহজেই খুলে ফেললো। ক্লিপটার অন্য মাথা চেইনের সাথে লাগানো। সেটা না খুললেও চলবে। তুর্যের দরকার ক্লিপের সেই অংশটি, যেটা দিয়ে কার্ডটা আটকে রাখা হয়।

দরজার নীচ দিয়ে একটা বাল্বের আলো এসে পড়েছে। সেই আলোতে আবছা আবছা দেখতে পেলো নাটটা। ধাতব ক্লিপ দিয়ে নাটটা শক্ত করে ধরে একটা মোচড় দিলো সে। অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেলো ক্লিপটা ঘুরে গেছে একটুখানি। উত্তেজনায় রীতিমতো কেঁপে উঠলো তার শরীর। নাটটা খুলতে পারলেই ধাতব খিড়কিটা খুলে ফেলতে পারবে, আর খিড়কিটা খুলে যাবার অর্থ দরজা খুলে যাওয়া।

কিন্তু এখন এ কাজটা করা যাবে না। বাইরে যদি লোকগুলো থাকে তাহলে ধরা পড়ে যাবে। তাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে, লোকগুলো আশেপাশে নেই। হাতের কাছে একটা অস্ত্র থাকার পরও তুর্য বসে বসে ভেবে গেলো কীভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে। সে জানে, ধরা পড়লে তাকে খুন করে ফেলবে বদমাশগুলো।

ঠিক তখনই দরজার নীচ দিয়ে তাকিয়ে দেখলো বাতিটা জ্বলছে না। সঙ্গে সঙ্গে দরজার নীচে মাথাটা পেতে দিয়ে তাকালো। ঘন অন্ধকার।

লোডশেডিং হয়েছে ? ভাবলো তুর্য।

নীচের ডেক থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা লঞ্চের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত।

জেনারেটরের সুইচ অফ করার একটু পরই লোহার সিঁড়িটা দিয়ে কারো নেমে আসার শব্দ শুনতে পেলো সে। শব্দটা আরো জোরালো হচ্ছে। একটু পর দেখা গেলো ভারি শরীরের এক লোক টর্চলাইট হাতে নেমে আসছে নীচের ডেকে। তার মুখে সিগারেট।

জেফরি বেগ চুপচাপ জেনারেটররুমের বন্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। আস্তে করে খুলে গেলো জেনারেটর রুমের দরজাটা। সতর্ক হয়ে উঠলো সে।

সিগারেট মুখে লোকটা ঘরে ঢুকেই উপুড় হয়ে টর্চের আলো ফেললো জেনারেটরের উপর।

এখনই! নিজেকে তাড়া দিলো জেফরি। সে জানে এটাই মোক্ষম সময়। কিন্তু কী করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না। ঠাণ্ডা মাথায় পেছন থেকে কাউকে খুন করার মতো নার্ভ তার নেই। সে একজন ইনভেস্টিগেটর, পেশাদার কোনো খুনি নয়। তার পক্ষে নির্বিচারে মানুষ খুন করা অসম্ভব।

তার ইচ্ছে পেছন থেকে আঘাত করে ঘায়েল করা কিন্তু লোকটা যদি চেঁচিয়ে ওঠে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। গুলি করতে দ্বিধাগ্রস্ত সে।

লোকটা হয়তো বুঝে গেছে জেনারেটরের সুইচ অফ। একটু অবাক হয়ে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো : "সুইচ বন্ধ করলো কে?"

জেফরি বেগ এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। ভালো করেই জানে যা করার এখনই করতে হবে।

উপুড় হয়ে থাকা লোকটা হয়তো কিছু একটা টের পেয়ে গেলো। সম্ভবত জেফরির নিঃশ্বাসের শব্দ, কিংবা অন্য কিছু। হঠাৎ করে জমে গেলো সে। তারপর আচমকা ঘুরে দাঁড়ালো টর্চ হাতে। তার টর্চের তীব্র আলো এসে পড়লো জেফরির মুখের উপর। নাইটভিশন গগলস থাকার কারণে টর্চের আলো ঝলসে দিলো তার চোখ।

"কে?" অস্ফুট আর ভয়ার্তস্বরে বলে উঠলো লোকটা।

নাইটভিশন গগলসের সবুজাভ আলোয় একজোড়া বিস্ফারিত চোখ দেখতে পেলো জেফরি। চোখমুখ খিচে আছে সে। হয়তো অদ্ভুত দর্শনের গগলসটা তাকে ভুত দেখার মতো ভড়কে দিয়েছে।

জেফরি বেগ বুঝতে পারলো না সে গুলি করছে কিনা। গুলি করলে থুতু ফেলার মতো ভোলা একটি শব্দ হবার কথা কিন্তু তার বদলে শুনতে পেলো অন্য কিছু।

তার সামনের লোকটা ঢলে পড়ে গেলো।

টের পেলো তার পকেটে থাকা মোবাইলফোনটা ভাইব্রেট করছে। নিশ্চয় জামান ফোন করেছে। এরকম সময় ফোন করার কোনো মানে হয়! ছেলেটার উপর বিরক্ত হয়ে বুটুথ ইয়ারফোনের বাটন চেপে কলটা রিসিভ করলো সে।

ওপাশ থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো : "মি: বেগ?"

দেরি না করে কাজে নেমে পড়লো তুর্য। বিদ্যুৎ চলে আসার আগেই তাকে পালাতে হবে। ক্লিপটার সাহায্যে একটা নাট আটকে ঘোরাতে শুরু করলো। মাত্র পাঁচ-ছয়বার ঘোরানোর পরই নাটটা আলগা হয়ে এলে হাতের আঙুল দিয়েই খুলে ফেললো সে।

এখন আঙুল দিয়ে ধাক্কা মারলেই তালাসহ আঙটাটা খিড়কি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাইরের দরজার নীচে পড়ে যাবে। কিন্তু তুর্য সেটা করলো না। সে জানে আঙটাটা ভারি তালাসহ মেঝেতে পড়লে প্রচণ্ড জোরে শব্দ হবে। শব্দ হলেই লোকগুলো টের পেয়ে যাবে।

না। এটা করা যাবে না। মাথা খাটাতে লাগলো সে। মেঝে আর দরজার নীচে আধ ইঞ্চির মতো একটা ফাঁক আছে। দ্রুত ভাবতে লগলো তুর্য। ঘরে একটা কম্বল আছে।

হ্যাঁ, কম্বল! কম্বলটা নিয়ে দরজার কাছে চলে এলো সে। কম্বলের চার কোণার এককোণের কিছু অংশ ঢুকিয়ে দিলো দরজার নীচ দিয়ে। তালাসহ আঙটাটা যেনো কম্বলের ওইটুকু অংশের উপর পড়ে সেটা নিশ্চিত হয়ে আঙটাটা আঙুল দিয়ে ধাক্কা দিতেই ধুপ করে ছোট্ট একটা শব্দ হলো কেবল।

এবার ফুটোটার ভেতরে কড়ে আঙুল ঢুকিয়ে খিড়কির ডান্ডাটা বাম দিকে ঠেলতে লাগলো যতোক্ষণ না দরজাটা খুলে যায়। দরজাটা একটু ফাঁক হতেই তুর্যের সারা শরীর উত্তেজনায় কেঁপে উঠলো। সে পারবে। সে পেরেছে। এখন ঘর থেকে বের হয়ে তাকে পালাতে হবে। অন্ধকার থাকতে থাকতেই পালাতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বের হয়ে এলো না সে। একটু অপেক্ষা করলো। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো আশেপাশে কেউ আছে কিনা।

না, নেই, ভাবলো তুর্য। ঐ বদমাশগুলো হয়তো আশেপাশে কোথাও নেই। কোথায় গেছে কে জানে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে বুকে সাহস সঞ্চয় করলো তুর্য। গভীর করে দম নিয়ে দরজাটা খুলে যে-ই না বের হবে অমনি কারো পায়ের শব্দ পেয়ে তার রক্ত হিম হয়ে গেলো। ঠিক তার দরজার কাছে আসছে লোকটা। তুর্য জানে তার পালানোর শেষ সুযোগটা নষ্ট হয়ে গেলো। বুক ফেটে কান্না আসতে লাগলো তার।

হাজার মাইল দূর থেকে বাবলু ফোন করেছে জেফরি বেগকে। তার কণ্ঠে উদ্বিগ্নতা।

এক সময়কার ঠাণ্ডা মাথার খুনি বাস্টার্ড মানসিকভাবে ভেঙে পড়া প্রেমিকের মতো উদভ্রান্ত হয়ে জানায় উমা নামের নার্স মেয়েটি এখন রঞ্জুর লোকদের হাতে বন্দী!

কথাটা শুনে জেফরি যারপরনাই অবাক হয়। উমাকেও রঞ্জুর লোকজন কিডন্যাপ করেছে! ঐ পঙ্গু সন্ত্রাসী নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অপহরণের মতো অস্ত্র ব্যবহার করেছে, আর বলাবাহুল্য সেটা ভালোমতোই ব্যবহার করতে পেরেছে সে।

"তুমি কিভাবে এটা জানলে?" তাকে জিজ্ঞেস করে জেফরি।

"রঞ্জুর ওখানে ল্যাপটপে দেখেছি।"

রঞ্জুর ওখানে! তাহলে তার ধারণাই ঠিক, ব্ল্যাক রঞ্জুর গোপন আস্তানায় ঢুকে পড়েছে বাবলু। খুব সম্ভবত এই পেশাদার খুনির হাতে রঞ্জুর দলের বাকিরা এরইমধ্যে খুন হয়ে গেছে। হুইলচেয়ারের সন্ত্রাসীটাকে নিজের কজায় নেবার পরই এটা সে জানতে পেরেছে।

"ল্যাপটপে দেখেছো মানে?"

"বানচোতটার কাছে ল্যাপটপ আছে...ইয়াহু মেসেঞ্জারে উমার ভিডিও দেখেছি। রঞ্জুর লোকজন তাকে আটকে রেখেছে।

সর্বনাশ! জেফরি বেগ কয়েক মুহূর্ত ভেবে যায়। "রঞ্জু এখন তোমার কজায়, তাই না?"

"হুম।"

"ওর কাছ থেকে বের করতে পারো নি উমাকে কারা আটকে রেখেছে, কোথায় রেখেছে?"

"না। বানচোতটা কিছুই বলছে না...ওর কাছে কোনো ফোনও নেই," বাবলু একটু

থেমে আবার বলে, "তার ডানহাত ঝন্টুও এখন বেঁচে নেই...নইলে তার কাছ থেকে জেনে নিতে পারতাম।"

ওহ, জেফরি বেগ মনে মনে বলে উঠেছিলো।

"আমার ধারণা মিলন জানে উমাকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে।"

"মিলন মারা গেছে," আস্তে করে বলে জেফরি বেগ।

ওপাশ থেকে নীরবতা নেমে আসে।

"একটু আগে...আমার হাতেই..."

"তাহলে এখন কিভাবে জানা যাবে?" জানতে চায় বাবলু।

জেফরি বেগ একটু ভাবে। কিন্তু বুঝতে পারে না কী বলবে। সে নিজে এমন এক জায়গায় আছে, বেশি কিছু ভাবতেও পারছে না।

কয়েক মুহূর্ত এভাবে কেটে যাবার পর ওপাশ থেকে বাবলু তাড়া দিলো। "মি: বেগ?"

"শোনো, আমি এখন ঐ লঞ্চে আছি," সম্বিত ফিরে পেয়ে বললো জেফরি। ল্যাপটপের কথা শুনে একটা ব্যাপার অনুমান করলো সে। "তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমার মনে হচ্ছে উমাকেও এই লঞ্চে আটকে রেখেছে ওরা।"

"আপনি নিশ্চিত?" আশান্বিত হয়ে বললো বাবলু।

"আমার তাই মনে হচ্ছে। রঞ্জুকে কিছু কোরো না...যতোক্ষণ না"

ঠিক তখনই শুনতে পেলো কেউ একজন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছে। চুপ মেরে গেলো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর।

একটা বাজখাই কণ্ঠ হাঁক দিলো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে। "ওই শালার কালা... জেনারেটরের কি হইছে?"

"কেউ আসছে," ফিসফিসিয়ে বললো জেফরি। "আমি তোমাকে পরে ফোন করছি। রঞ্জুর কিছু কোরো না, প্লিজ।"

লাইনটা কেটে দিয়ে জেফরি বেগ সতর্ক হয়ে উঠলো। জেনারেটর রুমের সামনে থেকে সরে গিয়ে চট করে বড় বড় কিছু বাক্সের পেছনে লুকিয়ে পড়লো সে।

রাগে গজ গজ করতে করতে জেনারেটর রুমের দিকে এগিয়ে এলো লোকটি। তার হাতে কোনো টর্চ নেই।

জেফরি বেগ বাক্সগুলো থেকে উঁকি মেরে নাইটভিশন গগলস দিয়ে দেখতে পেলো লোকটার বাম হাতে একটা পিস্তল।

জেনারেটর রুমের কাছে এসে অন্ধকারের মধ্যেই আশেপাশে তাকালো লোকটা। ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে ডিসপ্লের আলোতে দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো সে।

"কালা?" কিছু আন্দাজ করতে পেরে একটু সতর্ক হয়ে উঠলো। পিস্তলটা তাক করে জেনারেটর রুমের দরজায় পা দিয়ে ধাক্কা মারতে যাবে অমনি পেছন থেকে একটা ভোতা শব্দ হলে হুরমুর করে সামনের দিকে পড়ে গেলো সে।

এবার আর জেফরি বেগ দ্বিধা করে নি। পেছন থেকে লোকটাকে সাইলেন্সার পিস্তল দিয়ে গুলি করেছে, কারণ লোকটার হাতে পিস্তল ছিলো। একদিনে দু'দুজন লোককে গুলি করে মারলো। যদিও ব্যাপারটা হজম করতে পারছে না এখনও। নিজেকে প্রবোধ দিলো : এছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না।

মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা লোকটার হাত থেকে মোবাইলফোনটা নিয়ে সেটা অফ করে দিয়ে জেফরি বেগ আর দেরি না করে উপরের ডেকের দিকে পা বাড়ালো। কারণ উপরে যারা আছে তারা একটু পরই সন্দেহ করতে শুরু করবে।

উপরের ডেকে উঠে দেখতে পেলো জায়গাটা একদম ফাঁকা। কিন্তু মাথার উপরে কারোর পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। লঞ্চের কেবিনগুলো উপরের ফ্লোরেই অবস্থিত।

জেফরি যতোটা সম্ভব নিঃশব্দে তৃতীয় ফ্লোরে চলে এলো। বাবলু তাকে যে তথ্য

দিয়েছে তাতে লঞ্চে মোট চারজন থাকার কথা। এরইমধ্যে দু'জন তার হাতে প্রাণ হারিয়েছে। বাকি আছে আরো দু'জন। সম্ভবত!

লঞ্চের ডান দিকের রেলিং ধরে এগোতে লাগলো এবার। সারি সারি কেবিন চলে গেছে কিন্তু কোন কেবিনে জিম্মিদের আটকে রাখা হয়েছে সেটা তার জানা নেই।

নীচের ফ্লোরগুলোর মতোই এ জায়গাটাও অন্ধকারে ঢেকে আছে। এই বাড়তি সুবিধা কাজে লাগাতে হবে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো সে। জামান তাকে বলেছে এ ধরণের লঞ্চের পেছন দিকে অপেক্ষাকৃত বিশাল সাইজের দু'তিনটি কেবিন থাকে মালিকপক্ষ কিংবা ভিআইপি লোকজনের ব্যবহারের জন্য। সে নিশ্চিত, এরকম কোনো কেবিনেই জিম্মিদের আটকে রাখা হয়েছে।

সাধারণ কেবিনগুলো বেশ ছোটো, জামানের মতে আট বাই ছয় ফুটের বেশি হবে না। তবে ভিডিওতে যে রুমটা তারা দেখেছে সেটা নিঃসন্দেহে আরো বড়। সেখানে টেবিল-চেয়ার পাতা আছে। আট বাই ছয় ফুটের ঘরে এসবের সংকুলান হবে না।

লঞ্চের একেবারে শেষের দিকে এসে জেফরি দেখতে পেলো বড় বড় তিনটি দরজা। এগুলোই কি ভিআইপি কেবিন? হতে পারে।

কিন্তু এইসব কেবিনের কোনটাতে তুর্য আর উমাকে আটকে রাখা হয়েছে সেটা বুঝতে পারলো না।

হঠাৎ খেয়াল করলো একটা ঘরের দরজা একটু ফাঁক হয়ে আছে। আস্তে করে সেই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

চাপদাড়ির মেজাজ খারাপ। জেনারেটরটা আচমকা বন্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকারে ঢেকে আছে পুরো লঞ্চটা। তার খুব ইচ্ছে ছিলো বাতি জ্বালিয়ে কাজটা করবে। সেটা বোধহয় হচ্ছে না।

রইস আর কালাকে পাঠিয়েছে জেনারেটরটা দেখে আসার জন্য কিন্তু তাদেরও কোনো খবর নেই। সব ক'টা হারামির বাচ্চা আছে মউজ করার তালে। বিশেষ করে কালা আর ভোটলাল এই মেয়েটাকে খুন করার আগে ফুর্তি করার জন্য অস্থির হয়ে আছে। তাদের আর তর সইছে না। অন্ধকারের মধ্যেই কেবিনের এককোণে তাকালো সে। কিছুই দেখতে পেলো না।

তর তো তারও সইছে না। সেও তো মউজ-ফুর্তি করতে চায়।

মেয়েটাকে ধরে আনার পর থেকেই শরীরের মধ্যে এক ধরণের শিহরণ বয়ে গেছিলো। সদ্য যুবতী একটা মেয়ে। দেখতেও বেশ। তাদের বস মিলনের কারণেই অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এতোদিন।

ইচ্ছেমতো ভোগ করার পর কালা আর ভোটলালের মতো হারামির বাচ্চার হাতে তুলে দেবে মেয়েটাকে। তারা যে কী করবে ভাবতেই গা শিউড়ে উঠলো। অবশ্য রইস এসবের মধ্যে নেই, তার মানে এই নয় যে সে তাদের চেয়ে ভালো কিছু। বরং বাকিদের চেয়ে সে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, আস্ত একটা পিশাচ। অনেকদিন আগে এক দুর্ঘটনায় পুরুষত্ব হারিয়েছে সে। এরপর থেকে মেয়েমানুষ তার জন্য হারাম হয়ে গেছে।

অন্ধকারে বসে হুইস্কি গিলছে চাপদাড়ি। একটু পর যে কাজটা করবে তার জন্য রক্তের মধ্যে নেশা ধরানো চাই। স্বাভাবিক অবস্থায় এসব কাজ করা খুব কঠিন।

তাদের কাজ তো প্রায় শেষই। এখন ক্লিয়ার করার সময় এসে গেছে। তার আগে একটু ফুর্তি করে নিলে দোষ কি? কেউ তো আর জানতে পারবে না মেয়েটাকে খুন করে গুম করার আগে তারা সবাই মিলে ভোগ করে নিয়েছে।

চাপদাড়ি মদের বোতলটা একপাশে রেখে বেল্ট খুলতে শুরু করলো। যদিও অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু তার মনে হচ্ছে হাত-মুখ বাধা মেয়েটি বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে তার দিকে।

এক পাও এগোয় নি অমনি কেবিনের দরজায় ঠকঠক আওয়াজ।

মেজাজটা আবার বিগড়ে গেলো তার।

"কে?"

একটু আগে যে ভয় পেয়েছিলো সেটা কেটে গেছে এখন। গভীর করে দম নিয়ে নিলো তুর্য। কিছুক্ষণ আগেও তার কাছে মনে হয়েছিলো ধরা পড়ে গেলো বুঝি। কিন্তু না। যে লোকটার পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলো সে কালা নামের একজনকে ডাকতে ডাকতে নীচের ডেকে চলে গেছে। জেনারেটরটায় বোধহয় সমস্যা দেখা দিয়েছে।

আচ্ছা, এজন্যেই বিদ্যুৎ চলে গেছে তাহলে! ভাবলো তুর্য। নতুন করে সাহস সঞ্চয় করে দরজাটা খুলে ফেললো আস্তে করে। আবছা আবছা দেখতে পেলো দরজার সামনে দিয়ে একটা প্যাসেজ চলে গেছে। কারো কোনো শব্দ শুনতে পেলো না। আবারো দম নিয়ে নিলো, যেভাবেই হোক এখান থেকে তাকে পালাতে হবে। এই অন্ধকারে যদি লোকগুলোকে ফাঁকি দিতে না পারে তাহলে আর কখনও পারবে না।

দরজা খুলে বাইরে পা রাখলো সে। আরেক পা বাড়ানোর আগেই টের পেলো শক্ত একটা হাত তাকে জাপটে ধরেছে। অন্য হাতটা তার মুখ চেপে ধরার কারণে চিৎকার দিতে পারলো না।

মা! আমাকে মেরে ফেলবে! মনে মনে চিৎকার করে কেঁদে ফেললো সে। ধরা পড়ে গেছে। এখান থেকে আর পালানোর সুযোগ সে পাবে না।

কানের কাছে লোকটার তপ্ত নিঃশ্বাসের আঁচ টের পেলো। তারপরই ফ্যাসফ্যাসে চাপাকণ্ঠটা।

“একদম চুপ!”

চাপদাড়ি দরজা খুলে দেখলো ভোটলাল দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা ছোটো টর্চলাইট। লাইটের আলোটা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তার জননেন্দ্রিয়ের দিকে প্রক্ষেপ করলো সে। বেল্ট খোলা দেখে তার মুখে ফুটে উঠলে হাসি।

"কি হইছে?" একটু রেগেমেগে বললো চাপদাড়ি।

"ল্যাপটপের ব্যাটারিতে চার্জ আছিলো না...অফ হয়া গেছে, ভাই।"

চাপদাড়ি জানে হাজার মাইল দূর থেকে রঞ্জু নিশ্চয় গালাগালি করছে তাদেরকে। বার বার বলে দিয়েছিলো কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইয়াহু মেসেঞ্জারটা চালু রাখতে। কিন্তু জেনারেটরের সমস্যা করবে কে ভেবেছিলো।

"জেনারেটরে টেরাবল দিছে, রইস আর কালা ঠিক করতাছে। একটু ওয়েট কর।"

"রঞ্জু ভায়ে তো রাইগা বোম অয়া আছে মনে অয়।"

"রঞ্জু ভায়েরে লইয়া তোর চিন্তা করা লাগবো না। আমি পরে বুঝায়া দেব।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো ভোটলাল।

"আর কিছু কইবি?" বললো চাপদাড়ি।

"না, মাইনে," ইতস্তত করলো ভোটলাল। "অনেক রাইত অয়া যাইতাছে, একটু পরই তো সব ক্লিয়ার করতে অইবো...তাই কইছিলাম..."

"বুঝছি," কপট রাগ দেখিয়ে বললো চাপদাড়ির। "তর সইতাছে না।"

ভোটলাল নিঃশব্দ হাসি দিলো।

"লাইন আয়া পড়লে করিস। একটু ওয়েট কর।"

"আমি কি নীচে গিয়া দেইহা আমু ওরা কি করতাছে?"

চাপদাড়ি একটু ভাবলো। "ঠিক আছে, যা।"

ভোটলাল আর কিছু না বলে ঘুরে চলে যেতেই পেছন থেকে তাকে ডাকলো আবার। "আমারে আর ডিস্টার্ব করিস না।"

ভোটলালের চোখেমুখে খুশির যে ঝিলিক দেখা গেলো সেটা অন্ধকারে দেখতে পেলো না চাপদাড়ি। "ঠিক আছে, ভাই," বলেই চলে গেলো সে।

দরজাটা ভিরিয়ে দিলো চাপদাড়ি। উত্তেজনার চোটে খিড়কি বন্ধ করতে ভুলে গেলো সে। ঝটপট প্যান্ট আর টি-শার্টটা খুলে ফেললো। তার সামনেই হাত-মুখ বাধা এক তরতাজা যুবতী মেয়ে ঘরের এককোণে পড়ে আছে। যদিও দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু সে জানে মেয়েটা তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। মেয়েটার করুণ চোখ তাকে দেখতে হচ্ছে না বলে খুশিই হলো। আজ অনেকদিন পর ইচ্ছেমতো নরীদেহ ভোগ করবে।

"কুনো আওয়াজ করবি না...আওয়াজ করলে খুন কইরা ফালামু," মেয়েটার উদ্দেশ্যে বললো।

জাপটে ধরলো মেয়েটাকে। দু'গালে চুমু খেতে শুরু করলো ক্ষুধার্ত পশুর মতো কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মেয়েটা মরা লাশের মতো পড়ে রইলো। কোনো প্রতিরোধ করলো না। জোরে কামড় বসিয়ে দিলো মেয়েটার গালে। তারপরও মেয়েটা নিথরই রইলো। শালি নড়ে না কেন? মনে মনে বললো চাপদাড়ি।

তুর্যকে বাগে আনতে তেমন কষ্ট করতে হলো না। জাপটে ধরার পরই অনেকটা হাল ছেড়ে দিয়েছে সে। ছোটার জন্য একটু হাসফাস করলে জেফরি তার কানের কাছে মুখ এনে বলেছে চুপ থাকতে। তারপরই নিজের পরিচয়টা দিলে ছেলেটা আর ছোটার চেষ্টা করে নি। একদম শান্ত হয়ে যায়।

তুর্য এখন আবারো সেই কেবিনে যেখানে তাকে কয়েক দিন ধরে আটকে রাখা হয়েছে। তবে এখন তার সাথে রয়েছে হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। ছেলেটা জানতোই না এতোদিন একটা লঞ্চের কেবিনে তাকে আটকে রাখা হয়েছিলো।

একটু আগে পাশের কেবিনের দরজায় জোরে জোরে টোকা মারার শব্দ শুনতে পেয়ে জেফরি বেগ সতর্ক হয়ে ওঠে।

তারপর দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখে ডান দিকের শেষ কেবিনটার দরজার সামনে এক লোক টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে কারো সাথে কথা বলেই লোকটা ঘুরে চলে যায় নীচের ডেকে।

"তুমি এখানেই থাকো, ঘর থেকে বের হবে না। কিছুক্ষনের মধ্যেই পুলিশ এসে পড়বে। ঠিক আছে?"

"আপনি কোথায় যাবেন?" ভয় মেশানো কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বললো তুর্য।

পিস্তলটা হাতে নিয়ে বললো সে, "আমি এক্ষুণি চলে আসবো।" তারপর ছেলেটার মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে বের হয়ে গেলো। দরজাটা বন্ধ করে বাইরে আসতেই পাশের কেবিন থেকে একটা নারীকণ্ঠের চাপা গোঙানি শুনতে পেলো সে।

উমা!

থমকে দাঁড়ালো। বুঝতে পারলো একটু আগে যে কেবিনের সামনে লোকটা কথা বলেছিলো সেখান থেকেই আওয়াজটা আসছে। উমা তাহলে ঐ কেবিনেই আছে।

আবারো মুখ চাপা আর্তনাদ ভেসে এলো কেবিনের ভেতর থেকে।

জেফরি বেগ সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলো কেবিনের সামনে। দরজাটা আস্তে করে ধাক্কা দিলো। ভেতর থেকে বন্ধ করা নেই। একটু ফাঁক হয়ে গেলো। স্পষ্ট শুনতে পেলো ভেতরে একজন পুরুষ মানুষের কণ্ঠ। আদিম উল্লাস। নারী কণ্ঠের চাপা গোঙানি।

তার আর বুঝতে বাকি রইলো না বন্দী উমার সাথে কি আচরণ করা হচ্ছে।

দরজাটা আস্তে করে ধাক্কা মারতেই খুলে গেলো সেটা। প্রচণ্ড উত্তেজনার চোটে খিড়কি লাগাতে ভুলে গেছে হয়তো।

জেফরি বেগ ঘরে ঢুকে পড়লো আস্তে করে। নাইটভিশন গগলসে স্পষ্ট দেখতে পেলো কেবিনের মেঝেতে এক লোক উপুড় হয়ে আছে, তার নীচে এক মেয়ে ছটফট করছে ছোটার জন্য। লোকটার সবল দু'হাত মেয়েটার দু'হাত ঠেসে রেখেছে মেঝের সাথে। লোকটার কারণে মেয়েটার মুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও জেফরি বেগ জানে এটা উমা।

একটু উপুড় হয়ে লোকটার মাথায় পিস্তলের বাট দিয়ে সজোরে আঘাত করলো। পর পর দুটো। একটা অস্ফুট শব্দ করে অচেতন হয়ে গেলো জানোয়ারটা। তার নীচে থাকা মেয়েটা কিছু বুঝতে না পেরে ছটফটানি থামিয়ে দিলো। জেফরি জানে উমা হয়তো কিছু বুঝতে না পেরে চিৎকার দিতে পারে।

"আমি জেফরি বেগ, উমা," চিৎকার কোরো না।" ফিসফিসিয়ে বললো সে। মেয়েটা তার শরীরের উপর থেকে অচেতন লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করলে জেফরি সাহায্য করলো। কিন্তু লোকটার শরীর সরাতেই নাইটভিশন গগল্‌সে যে চেহারাটা দেখতে পেলো সেটা একেবারেই অচিন্তনীয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার কাছে মনে হলো সে ভুল দেখছে।

"তুমি কে?" বিস্ময়ে বলে উঠলো জেফরি বেগ।

বাবলু দাঁড়িয়ে আছে ল্যাপটপের সামনে। তার ঠিক পেছনে হুইলচেয়ারের পাশে মেঝেতে পড়ে আছে রঞ্জু। একটু আগে জেফরি বেগকে ফোন করে ফিরে এসেছে ঘরে। রঞ্জু যেনো তাদের ফোনের কথাবার্তা শুনতে না পায় সেজন্যে ঘরের বাইরে গিয়ে ফোন করেছিলো।

ঘণ্টাখানেক আগে ঝন্টুর কাছ থেকে কিছু তথ্য জেনে নিয়ে জেফরি বেগকে দিয়েছিলো। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে ঐ ইনভেস্টিগেটর এখন তুর্যকে উদ্ধার করার জন্য লঞ্চে ঢুকে পড়েছে। তার ধারণা উমাকেও ঐ লঞ্চে আটকে রাখা হয়েছে। একটু অপেক্ষা করলেই সব জানা যাবে।

এখন সে অপেক্ষা করছে। জেফরি বেগ তাকে ফোন করে জানাবে ঘটনা কি। কিন্তু তার মন বলছে খুব বেশি সময় এই বাড়িতে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। যেকোনো সময় লোকজন চলে আসতে পারে। যা করার খুব দ্রুত করতে হবে। এক ধরণের সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে গেছে সে।

মাথা থেকে এসব চিন্তা বাদ দেবার চেষ্টা করলো। এই জীবনে প্রথমবারের মতো প্রার্থনা করলো, জেফরি বেগ যেনো সফল হয়। সে যেনো উমাকে উদ্ধার করতে পারে।

ঘরে ফিরে এসে দেখতে পাচ্ছে ইয়াহু মেসেঞ্জারটা অফলাইনে চলে গেছে। হয়তো নেটওয়ার্কের সমস্যা, কিন্তু তার মনে খারাপ আশংকাও উঁকি দিচ্ছে। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালো জঘন্য লোকটার দিকে।

"ইয়াহু মেসেঞ্জারটা অফলাইনে চলে গেলো কেন?" জানতে চাইলো সে।

রঞ্জু ভয়ার্ত চোখে চেয়ে রইলো তার দিকে। তবে মনে মনে সে খুশি, যেকোনো কারণেই হোক কিছুক্ষণ আগে বাস্টার্ড যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো তার পর পরই ঐ অ্যাকাউন্টটা অফলাইনে চলে যায়।

"আমি তো বুঝতে পারছি না," বললো রঞ্জু।

"তুই কিছু করেছিস?"

"আমি কিভাবে করবো?" বিস্মিত হয়ে বললো রঞ্জু।

"ওটা তো আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।"

বাবলু একটু ভাবলো। পঙ্গু সন্ত্রাসীটা যেখানে পড়েছিলো সেখানেই আছে, সুতরাং নেটওয়ার্কের সমস্যাই হবে।

মি: বেগের সাথে ফোনে কথা বলার পর তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছিলো। খুবই সহজ সরল একটি কৌশল। ইয়াহু মেসেঞ্জারের ওয়েবক্যাম বন্ধ করে চ্যাটবক্সে রঞ্জুর লোকগুলোর সাথে যোগাযোগ করবে। হাজার মাইল দূর থেকে তারা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারবে না কার সাথে যোগাযোগ করছে। মেসেঞ্জারটা অফলাইনে চলে যাওয়াতে বুঝতে পারছে না এখন কী করবে।

তার মনে হচ্ছে যেকোনো সময় এই বাড়িতে আরো লোকজন চলে আসতে পারে। কিছুক্ষণ আগে রঞ্জুকে মারপিট করে জানতে চেয়েছিলো অন্য কেউ আসবে কিনা। যদিও বদমাশটা বলেছে কেউ আসবে না কিন্তু বাবলুর আশংকা রঞ্জু মিথ্যে বলেছে। যা করার দ্রুত করে চলে যেতে হবে এখান থেকে। কিন্তু জেফরি বেগ তাকে অপেক্ষা করতে বলেছে।

মেঝেতে পড়ে থাকা ব্ল্যাক রঞ্জুর দিকে তাকালো সে। বদমাশটা চুপ মেরে আছে।

.

নাইটভিশন গগলস থাকার কারণে গাঢ় অন্ধকারেও জেফরি বেগ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার সামনে যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে সে উমা নয়, আঠারো-উনিশ বছরের এক তরুণী। তার ধারণা ছিলো এই লঞ্চেই উমাকে আটকে রাখা হয়েছে।

মেয়েটা এতোক্ষণে জেনে গেছে জেফরির পরিচয়। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে তার একটা হাত ধরে রেখেছে।

জেফরি তাকে অভয় দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বের করে নিয়ে এলো পাশের কেবিনে। অন্ধকারে তুর্য গুটিসুটি মেরে বসে আছে। দরজা খুলতেই ছেলেটা ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, "কে?"

"আমি জেফরি বেগ," চাপা কণ্ঠে বললো সে।

অন্ধকারেও তুর্য বুঝতে পারলো জেফরির সাথে একটা মেয়ে আছে।

"আপনার সাথে কে?" জানতে চাইলো তুর্য।

অমনি পর পর তিনটি গুলির শব্দ। সেইসাথে জান্তব গোঙানি। তারপরই কতোগুলো পায়ের শব্দ। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসছে।

ভড়কে গেলো জেফরি। এরা আবার কারা?

তুর্য আর মেয়েটাকে মেঝের এককোণে ঠেলে দিয়ে চাপাকণ্ঠে বললো সে, "চুপচাপ বসে থাকো। এই ঘর থেকে বের হবে না। আমি আসছি।"

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলো সে। একটু আগে যে লোকটা নীচে চলে গেছে তার হাতে কোনো পিস্তল দেখে নি, তাহলে গুলি করলো কে?

জেফরির মাথায় কিছুই ঢুকছে না। কয়েক পা সামনে এগোতেই দেখতে পেলো টর্চের আলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লো একটা সাধারণ কেবিনের গা ঘেষে। হাতের পিস্তলটা কক করে নিলো। কিন্তু ভালো করেই জানে একদল অস্ত্রধারীর সাথে কোনোভাবেই সে পেরে উঠবে না। তার মনে হলো ব্যাকআপ ছাড়া এখানে চলে আসাটা বিরাট বোকামি হয়ে গেছে। জামানের কথা মনে পড়ে গেলো। ছেলেটা ব্যাকআপ নিয়ে আসতে বলেছিলো তাকে। আক্ষেপে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করলো এখন।

হঠাৎ রেলিংয়ের শেষ মাথায় কতোগুলো সবুজাভ অবয়ব দেখতে পেলো নাইটভিশন গগলসে।

তাদের সবার হাতেই অস্ত্র, তবে সামনের লোকটার হাতে টর্চও আছে।

সবাই নিজেদের পিস্তল তাক করে রেখেছে সামনের দিকে আই লেভেল বরাবর।

জেফরি তার পিস্তলটা তুলে গুলি চালাতে যাবে অমনি একটা কণ্ঠ বলে উঠলো : "স্যার?"

"আমি জানি উমাকে তুই কোথায় আটকে রেখেছিস," অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললো বাবলু।

রঞ্জু চেয়ে রইলো তার দিকে, তবে কিছু বললো না। শুধু ঠোঁটের কোণে দেখা গেলো বাঁকা হাসি। কথাটা বিশ্বাস করছে না সে।

"বুড়িগঙ্গা নদীতে..."

রঞ্জু কিছুটা চমকে উঠলো কথাটা শুনে, তবে সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তি লুকিয়ে ফেললো।

"...একটা লঞ্চে।"

কথাটা বলেই স্থিরচোখে চেয়ে রইলো বাবলু। লঞ্চের কথা শুনে একটু চমকে গেলো বদশামটা। "মিনিস্টারের ছেলেকেও ওখানে রেখেছিস।"

মাথা দোলালো রঞ্জু। তার ঠোঁটে বাঁকা হাসি, যেনো বাবলু প্রলাপ বকছে।

"মারা যাওয়ার আগে ঝন্টু আমাকে সব বলে গেছে..."

ব্ল্যাক রঞ্জুর ঠোঁটে এখনও হাসিটা লেগে রয়েছে।

"ভেবেছিস উমা আর তুর্যকে কেউ বাঁচাতে পারবে না?"

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো রঞ্জু।

"ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ..." কথাটা বলে রঞ্জুর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য থামলো বাবলু।

ভুরু কুচকে গেলো পঙ্গু সন্ত্রাসীর। তার চোখেমুখে অবিশ্বাস।

"...সে তার দলবল নিয়ে এখন ঐ লঞ্চে আছে!"

"তুই ওকে বলেছিস?!" বিস্ময়ে জানতে চাইলো রঞ্জু।

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাবলু।

"তোর মতো খুনির কথা ওই লোক বিশ্বাস করবে?"

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"অসম্ভব-"

রঞ্জুর কথাটা শেষ হবার আগেই ল্যাপটপটা বিপ্ করে উঠলো। সেদিকে তাকালো বাবলু। ইয়াহু মেসেঞ্জারটা অনলাইনে চলে এসেছে আবার। সঙ্গে সঙ্গে ল্যাপটপের কাছে ছুটে গেলো সে।

ইয়াহু মেসেঞ্জারটায় নতুন একটা মেসেজ এসেছে। সেইসাথে চ্যাটবক্সের ওয়েবক্যাম ভিউয়িংয়ের ইনভাইটেশন। ওটা অ্যাকসেপ্ট করতেই ভেসে উঠলো জেফরি বেগের ছবিটা।

একটু দূরে মেঝেতে পড়ে থাকা রঞ্জু বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখছে। অসম্ভব একটি দৃশ্য।

জেফরি বেগ ক্যামেরার দিকে ঝুঁকে আছে। কিন্তু তারচেয়েও বড় কথা, ইনভেস্টিগেটরের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে উমা। একেবারে অক্ষত।

বাবলুর সারা শরীরে এক ধরণের শিহরণ বয়ে গেলো। তার ইচ্ছে করলো চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করতে।

পিস্তলটা ল্যাপটপের পাশে রেখে সঙ্গে সঙ্গে চ্যাটবক্সে টাইপ করলো সে।

.

জেফরি বেগ উপুড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ল্যাপটপের সামনে, তার পাশে উমা। ঘরে আরো আছে জামান, তুর্য, অজ্ঞাত পরিচয়ের এক তরুণী আর নৌপুলিশের কিছু সদস্য।

অনেকক্ষণ পর জেফরির কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে জামান অস্থির হয়ে উঠেছিলো। হঠাৎ করেই নদীতে নৌপুলিশের টহল দেখে তার মাথায় একটা আইডিয়া চলে আসে। টহলরত নৌপুলিশকে ডেকে জানায় ভয়ঙ্কর এক খুনি আছে লঞ্চটাতে। এক্ষুণি ওটা ঘিরে ফেলতে হবে। মিনিস্টারের ছেলে তুর্যকে যে আটকে রাখা হয়েছে এ কথা বলে নি।

নৌ পুলিশ লঞ্চে উঠতেই ভোটলালের সাথে গোলাগুলি হয়। অবশ্য ভোটলাল পিস্তল বের করলেও গুলি করতে পারে নি। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে সে।

একটু আগে জেনারেটরটা চালু করা হয়েছে, লঞ্চে এখন বাতি জ্বলছে।

জেফরি এখন যে রুমটায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা তিন নাম্বার কেবিন। এখানেই উমাকে আটকে রাখা হয়েছিলো। জামান চলে আসার পর এই কেবিন থেকে হাত-মুখ বাধা উমাকে উদ্ধার করে তারা।

থ্যাঙ্কস।

হাজার মাইল দূর থেকে বাবলুর লেখাটা চ্যাটবক্সে ভেসে উঠলো।

জেফরি বেগ দ্রুত টাইপ করলো :

সবাই ঠিক আছে। তুর্যকে উদ্ধার করা গেছে। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা উমা পর্দায় বাবলুকে দেখে আনন্দে কেঁদে ফেললো।

পর্দায় দেখা গেলো বাবলুর মুখে হাসি। হাত তুলে উমাকে অভয় দিলো

জেফরি বেগের মুখেও হাসির আভাস ফুটে উঠলো। শেষ পর্যন্ত সবাই অক্ষত থাকাতে তার অন্য রকম এক অনুভূতি হচ্ছে। জীবনে এতোটা সফল আর আনন্দিত বোধ করে নি।

হাজার মাইল দূরে, দিল্লির মাদার তেরেসা স্ট্রিটের বিরাণ এক বাড়িতে বাবলুর মধ্যেও একই রকম অনুভূতি হচ্ছে। ল্যাপটপের পর্দায় যখন হাত-মুখ বাধা উমাকে দেখলো তখন তার ভেতরটা কেমন করে উঠেছিলো সে বোঝাতে পারবে না।

ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগের প্রতি কৃতজ্ঞতার কোনো শেষ নেই। এই লোকটাই তাকে আগেভাগে খবর দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তারপর ব্ল্যাক রঞ্জুর ডেরায় ঢুকে শুধু মিনিস্টারের অল্পবয়সী ছেলেটাকেই উদ্ধার করে নি, সেইসাথে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে উমাকে।

রঞ্জু কোথায়?

ল্যাপটপের পর্দায় জেফরি বেগের লেখাটা ভেসে উঠলে বাবলুর ঠোঁটে মুচকি হাসি দেখা দিলো। সে জানে এই ইনভেস্টিগেটর এখন কি বলবে রঞ্জুকে যেনো খুন করা না হয়।

হাসিমুখে মাথা দোলালো সে। টাইপ করার আগে পেছন ফিরে তাকাতেই তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো।

ব্ল্যাক রঞ্জু নেই!

“বাস্টার্ড!” ফ্যাসফ্যাসে গলায় রঞ্জু বলে উঠলো তার খুব কাছ থেকে।

বাবলু ল্যাপটপের বাম পাশে তাকাতেই বুঝতে পারলো। পিস্তলটা ওখানে নেই। তার বাম পাশে, পায়ের কাছে ব্ল্যাক রঞ্জু বসে আছে। তার হাতে সাইলেন্সার পিস্তলটা। জঘন্য সন্ত্রসী সেটা তাক করে রেখেছে তার দিকে। মুখে ঝুলে রয়েছে কুৎসিত একটা হাসি।

ল্যাপটপে চ্যাট করার সময় বাবলু খেয়ালই করে নি তার অগোচরে পঙ্গু সন্ত্রাসী কখন হামাগুড়ি দিয়ে কাছে চলে এসেছে। হাতে তুলে নিয়েছে পিস্তলটা।

বাবলু বুঝতে পারলো মুহূর্তের অসতর্কতায় সব কিছু শেষ হতে চলেছে। নড়াচড়া করার শক্তি হারিয়ে ফেললো সে। রঞ্জুর চোখমুখ বলছে এক্ষুণি ট্রিগারে চাপ দিয়ে সব শেষ করে দেবে।

বিশ্রী একটা হাসি দিলো পঙ্গু লোকটি।

“গুডবাই বাস্টার্ড!” মৃত্যু থেকে এক মুহূর্ত দূরে দাঁড়িয়ে থেকে উমাকে দেখতে ইচ্ছে করলো তার। আস্তে করে ল্যাপটপের দিকে তাকালো। জেফরি বেগ আর উমা কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে।

তারপরই ক্লিক করে একটা শব্দ হলো শুধু।

.

জেফরি বেগ আর উমা কিছুই বুঝতে পারছে না। দিল্লিতে থাকা বাবলুর সাথে ভিডিও

চ্যাট করছিলো তারা। একটু আগে দেখতে পেয়েছে হঠাৎ করে বাবলুর হাসিমুখের অভিব্যক্তিটা বদলে গেলো। একপাশে তাকিয়ে আছে সে। তার দৃষ্টিতে আতঙ্ক।

জেফরি বেগ দ্রুত টাইপ করলো : কি হয়েছে?

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে বাবলু একপাশে তাকিয়ে আছে এখনও। জেফরি বেগের মনে হলো ছেলেটার দৃষ্টি মেঝের দিকে। কিন্তু তারা যে ভিডিওটা দেখছে সেটার ফ্রেমে বাবলু ছাড়া অন্য কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

কপালের বাম পাশটা চুলকালো জেফরি বেগ। দ্রুত ভেবে গেলো, ঘটনা কী।

তারপরই মনের ভেতর একটা আশংকা উঁকি দিলো। বাবলু এখন অস্ত্রের মুখে আছে। কেউ হয়তো তার দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছে। কিন্তু কে?

সঙ্গে সঙ্গে যে জবাবটা তার মাথায় এলো সেটা রক্তহিম করা।

ব্ল্যাক রঞ্জু?!

ক্লিক! ক্লিক! ক্লিক!

শব্দগুলো বাবলুর কানে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। একজন পেশাদার খুনি হিসেবে এ জীবনে অসংখ্যবার গুলি করেছে। ভালো করেই জানে যে গুলি করে আর যে গুলিবিদ্ধ হয় তাদের কেউই পিস্তলের ক্লিক শব্দটা শোনে না। শোনে কানফাটা একটি শব্দ।

কিন্তু ব্ল্যাক রঞ্জুর পিস্তলটায় সাইলেন্সর লাগানো। একটা থুতু ফেলার মতো শব্দ হবে। এর বেশি না। ল্যাপটপের পদ থেকে চোখটা সরিয়ে নিলো সে।

ব্ল্যাক রঞ্জু উদভ্রান্তের মতো পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত আগেও তার মুখে যে কুৎসিত হাসিটা লেগে ছিলো সেখানে এখন অবিশ্বাস আর পরাজয়ের আভাস।

রঞ্জুর সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলো তার। পঙ্গু লোকটার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে যেনো।

বাবলুর বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো না কি ঘটেছে। রঞ্জুর হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে নিলো সে। ছাদের দিকে তাক করে আরো দু'বার ট্রিগার চাপলো।

ক্লিক! ক্লিক!

তার মুখে ফুটে উঠলো হাসি। পিস্তলটার গুলি ফুরিয়ে গেছে।

এই পিস্তলটা সে নিয়েছে রঞ্জুর লোকজনের কাছ থেকে। ভেতরে কয়টা গুলি ছিলো সে জানতো না। পিস্তলটা হাতে পাবার পর কয়টা গুলি খরচ করেছে সেটারও হিসেব রাখে নি। এখন বুঝতে পারছে পিস্তলে যে কয়টা গুলি ছিলো সব শেষ হয়ে গেছে। আর এই ঘটনাটাই বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে।

পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাবলু। রঞ্জুর কলার ধরে টেনে হুইলচেয়ারের উপর বসালো তাকে। চেয়ারটা ঠেলে নিয়ে এলো ল্যাপটপের সামনে।

ল্যাপটপের পর্দায় দেখতে পেলো জেফরি বেগ আর উমা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে। তারা এখন কুখ্যাত ব্ল্যাক রঞ্জুকে দেখতে পাচ্ছে ওয়েবক্যামে।

বাবলু টেবিলের উপর তাকালো। ল্যাপটপের কাছেই একটা ম্যাচবক্স আর এক প্যাকেট সিগারেট রাখা ম্যাচবক্সটা তুলে নিলো সে।

ভয়ার্ত চোখে তার দিকে চেয়ে রইলো রঞ্জু। তার ঠোঁট জোড়া কাঁপছে কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না। বলার মতো কিছু নেইও। এই খেলাটায় সে হেরে গেছে। ভালো করেই জানে, জীবনের শেষ মুহূর্তে চলে এসেছে।

বাবলু চলে গেলো বড় বড় ফ্রেঞ্চ জানালাগুলোর সামনে। একটা জানালার পর্দা বাদে একে একে সবগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিলো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। যে পর্দাটা অক্ষত আছে সেটা হাতে পেচিয়ে জোরে একটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেললো।

রঞ্জুর চোখেমুখে মৃত্যু আতঙ্ক।

বাবলু চলে এলো হুইলচেয়ারের সামনে। ল্যাপটপের দিকে চকিতে তাকালো সে। যা ভেবেছিলো তাই। চ্যাটবক্সে ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগের লেখাটা দেখতে পেলো : ডু নট কিল রঞ্জু। প্লিজ!

মুচকি হাসলো সে। ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছে জেফরি বেগ আর উমা চেয়ে আছে তার দিকে। আস্তে করে তর্জনি তুলে না-সূচক ভঙ্গি করলো।

রঞ্জুর গায়ে জানালার পর্দাটা জড়িয়ে দিলো বাবলু। ভয়ার্ত আর কোণঠাসা সন্ত্রাসী জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে এখন। মৃত্যু আতঙ্কে তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে।

পর্দাটা ভালো করে রঞ্জুর গায়ে পেচিয়ে হুইলচেয়ারের পেছনে চলে এলো সে।

পেছন ফিরে তাকাতে গিয়েও তাকালো না রঞ্জু। তার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে। টের পেলো সারা শরীর কাঁপছে।

ফোঁস করে একটা শব্দ হলো পেছন থেকে। তারপরই পঙ্গু লোকটা টের পেলো আগুনের উত্তাপ।

“না!” গগনবিদারি চিৎকার দিলো ব্ল্যাক রঞ্জু।

ল্যাপটপের কাছ থেকে সরে গেলো উমা। এরকম দৃশ্য দেখার নার্ভ তার নেই। জেফরি বেগ স্থিরচোখে চেয়ে আছে ল্যাপটপের দিকে। জামান এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে হুইলচেয়ারে বসা রঞ্জু। তার গায়ে আগুন ধরে গেছে। দু'হাতে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে সে। মুহূর্তে পুরো হুইলচেয়ারটা পরিণত হলো জ্বলন্ত চিতায়। আর সেই চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হচ্ছে ব্ল্যাক রঞ্জু।

জেফরি বেগ আর দেখলো না। মুখটা সরিয়ে নিলো। জামানের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলো তার। ছেলেটা কিছু বললো না। বলার কিছু নেইও।

জেফরি আবারো ল্যাপটপের দিকে তাকালো। আগুন ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলো না। জ্বলন্ত হুইলচেয়ারটা এখন উল্টে পড়ে আছে। সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন।

মাদার তেরেসা স্ট্রিটের বাড়ি থেকে বের হয়ে কিছুটা পথ হেঁটে পেছনে ফিরে তাকালো বাবলু।

আগুন ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাড়িতে। দাউ দাউ করে জ্বলছে সেই আগুন। একটা হোস করে শব্দও শুনতে পেলো, তারপরই আগুনের লেলিহান শিখা উঠে গেলো আরো উপরে।

বুঝতে পারলো বাড়িতে মজুদ করে রাখা কেরোসিনের ড্রামগুলো একসাথে জ্বলে উঠেছে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো রঞ্জুর আর্তনাদ শোনা যায় কিনা। বাড়ি থেকে বের হবার সময় জ্বলন্ত দগ্ধ রঞ্জুর আর্তনাদটা এখনও তার কানে লেগে আছে। যেননা সেটাই আবার শুনতে পেলো।

বাবলু জানে পানি আর আগুনের মৃত্যু সবচাইতে ভয়ঙ্কর। এরকম ভয়ঙ্কর মৃত্যুই রঞ্জুর প্রাপ্য ছিলো।

আবার হাঁটতে শুরু করলো সে। আশেপাশে লোকজনের হৈহল্লার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এখন। দ্রুত এখান থেকে সরে পড়তে হবে। কারোলবাগে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। চলে যেতে হবে বহু দূরে।

না, মনে মনে বললো সে। খুব কাছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে সেন্ট অগাস্টিনের বাস্কেটবল কোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিলন। গভীর মনোযোগের সাথে কিছু ছাত্রের প্র্যাকটিস দেখেছে সে।

ছয়-সাতজন ছেলে বল নিয়ে কোর্টে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। আড়চোখে বার বার তাকাচ্ছে মিলনের দিকে। মিলন ব্যাপারটা আমলে না নিয়ে একমনে দেখে যাচ্ছে তাদের খেলা। ছেলেগুলো স্বভাবতই অবাক। তাদের স্কুলে যে কেউ যখন তখন ঢুকতে পারে না। এই বহিরাগত লোকটি কে?

মিলন আরো দেখতে পেলো খেলার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের মধ্যে চাপাকণ্ঠে কথা বলছে তারা। মনে মনে মুচকি হাসলো সে।

সে এখন অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ। খেলার প্রতিই তার সব মনোযোগ।

কোর্টে যেসব ছেলেরা প্র্যাকটিস করছে তাদের মধ্যে লম্বামতোন একটা ছেলে দারুণ খেলে, কিন্তু এই ছেলেটার প্রতি মিলনের কোনো আগ্রহ নেই। তার আগ্রহ তুর্য নামের একটি ছেলের দিকে। বাস্কেটবল খেলাটা মোটামুটি খেলে সে কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। এই ছেলেটাকেই তাদের দরকার।

কিছুক্ষণ আগে ছেলেগুলে মধ্য থেকে একজন এসে তার কাছে জানতে চেয়েছিলো সে কে। অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ শুনে ছেলেটা অবাক হয়েছিলো। বন্ধুদের কাছে ফিরে গিয়ে কথাটা জানাতেই সবার আচরণ বদলে যায়। খেলার প্রতি সিরিয়াস হয়ে ওঠে। কে কার চাইতে সেরা সেটা প্রদর্শন করার প্রতিযোগীতায় মেতে ওঠে তারা।

একটা সময় তুর্য তার কাছে চলে এলে হাত নেড়ে ছেলেটাকে কাছে ডাকলো। একটু কথা বলার সময় হবে কি?

তুর্য একটু অবাক হলেও কাঁধ তুলে জানালো, ঠিক আছে। নো প্রবলেম। মিলন নিজেকে অ্যাঞ্জেলস টিমের কোচ পরিচয় দিয়ে বললো তুর্যের খেলা দেখে তার খুব ভালো লেগেছে। কথাটা শুনে তুর্য যেমন অবাক হলো তেমনি গর্বে ফুলে উঠলো তার বুক।

পর পর দু'বার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন অ্যাঞ্জেলস টিমে হুট করেই কিছু প্লেয়ারের দরকার হয়ে পড়েছে। একেবারে জরুরি ভিত্তিতে দুএকজন প্লেয়ার না নিলেই নয়। তো, তুর্যের খেলা দেখে তার মনে হচ্ছে তাকে দলে নেয়া যেতে পারে।

আপনি শিওর? অবাক হয়ে জানতে চাইলো তুর্য।

অবশ্যই। কেন নয়। বাস্কেটবলটা তো সে ভালোই খেলে। যদিও স্কুলের সবাই ঐ লম্বু নাফিকেই সেরা মনে করে তবে তার খেলার ধরণটা কি নাফির চেয়ে একটু আলাদা নয়?

সবাই তো আর স্কোরার না। সে একটু পেছনে খেলে, আড়ালেই থাকে, তাই বলে তার পজিশনে কি তার চেয়ে ভালো কেউ আছে এই স্কুলে?

ওকে, নো প্রবলেম। অ্যাঞ্জেলস টিম তো তুর্যের ফেবারিটই। ওখানে খেলতে পারলে তার ভালোই লাগবে।

ব্যাপারটা খুব জরুরি। শুধু মুখে বললে তো হবে না, কাগজেকলমে সাইন করতে হবে। আজই অ্যাঞ্জেলস টিম কনফার্ম হতে চায়।

কথাটা শুনে তুর্যের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অ্যাঞ্জেলস টিম তাকে আজই সাইন করাবে!

ব্যাপারটা রীতিমতো অবিশ্বাস্য লাগলো তার কাছে। মনে মনে ভাবলো কথাটা শুনে তার বন্ধুরা কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে- বিশেষ করে নাফি হাজ্জাদ নামের বজ্জাতটা?

তুর্য খুশিমনে রাজি হয়ে গেলো। মিলন তার কাঁধে হাত রেখে বললো, গার্জিয়ানদের রাজি করানোর দায়িত্ব তুর্যের। সে যদি তার বাবা-মাকে রাজি করাতে পারে তাহলে আগামী সপ্তাহেই একটা ম্যাচে তাকে নামানো হবে।

বাবা-মা? ওটা কোনো সমস্যাই না। অ্যাঞ্জেলস টিমে চান্স পাবার কথা শুনে তার

ক্ষমতাধর মিনিস্টার বাবা বরং খুশিই হবে। মাকে নিয়ে তার তেমন একটা টেনশন নেই। ওকে, ডান।

মিলন খুব খুশি হলো। আড়চোখে চেয়ে দেখলো বাস্কেটবল কোর্টে যেসব ছেলে প্র্যাকটিস করছে তারা অবাক হয়ে চেয়ে আছে তাদের দিকে। মনে মনে হাসলো মিলন। নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান ভাবো, বাবারা।

আচ্ছা। তাহলে তো খুব ভালো হয়। সাইন করাতে আর কোনো বাধাই রইলো না। কিন্তু ফাইনাল কথা বলতে পারবে অ্যাঞ্জেলসের কর্মকর্তা। সে একজন কোচ। প্লেয়ার সিলেক্ট করা তার কাজ হলেও সাইন করার দায়িত্ব কর্মকর্তাদের।

তো এরকম একজন কর্মকতা স্কুলে এসেছে তার সাথে। উনি বসে আছেন গাড়িতে। তার সাথে কথা বললেই সব ফাইনাল হয়ে যাবে।

নো প্রবলেম, কাঁধ তুলে বললো তুর্য।

মিলনের সাথে চলে গেলো স্কুলের পার্কিংলটে। সেখানে একটা প্রাইভেটকারের সামনে এসে তুর্যের কাঁধে হাত রেখে মিলন বললো গাড়িতে বসে থাকা ভদ্রলোক হলেন তাদের ক্লাবের কর্মকর্তা। তুর্য যেনো তার সাথে কথা বলে নেয়। গাড়ির দরজা খুলে তুর্যকে ভেতরে আসতে বললো চাপদাড়ি। তুর্য কোনো কিছু না ভেবে ঢুকে পড়লো গাড়িতে।

মিলন দরজাটা বন্ধ করে আশেপাশে তাকালো। সে জানে চাপদাড়ি এখন কি করবে। ঠিক তখনই ঘটলো বিপত্তি।

দূর থেকে মিলনকে কেউ ডাকছে। সে চেয়ে দেখলো পার্কিংলটের পাশে একটা বিল্ডিংয়ের দোতলার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারই পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হাসান সাহেব। জেল থেকে বের হয়ে পলিকে বিয়ে করার পর মাত্র দু'মাস আগে আরামবাগের একটি বাড়ি ভাড়া নেয়। তার ঠিক পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে এই হাসান নামের লোকটি। তাদের মধ্যে অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। দুএকবার বাড়ির ছাদে সিগারেট খেতে খেতে কথাও হয়েছে। কিন্তু এই লোক যে সেন্ট অগাস্টিনে চাকরি করে সেটা মিলন ঘুণাক্ষরেও জানতো না। পরিচয়ের এক পর্যায়ে শুধু বলেছিলো একটা স্কুলে চাকরি করে। মিলন ধরে নিয়েছিলো শিক্ষক হবে হয়তো।

এখন হাসান নামের লোকটি জানালা দিয়ে বিস্মিত চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। মিলন বুঝতে পারলো না হাসান তুর্যকে দেখেছে কিনা।

হাসানের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লো মিলন, মুখে ফুটিয়ে তুললো কৃত্রিম হাসি। যেনো প্রতিবেশিকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হয়েছে।

হাসান হাত তুলে কিছু একটা ইশারা করেই জানালা থেকে সরে গেলো। মিলন বুঝতে পারলো লোকটা নীচে নেমে আসছে। দরজাটা একটু ফাঁক করে গাড়ির ভেতরে উঁকি দিলো সে। তুর্য অজ্ঞান হয়ে সিটের উপর পড়ে আছে। নিখুঁত দক্ষতায় চাপদাড়ি ক্লোরোফর্মে ভেজানো রুমাল ব্যবহার করে ছেলেটাকে অজ্ঞান করে ফেলেছে ধারণার চেয়ে দ্রুত সময়ে।

চাপদাড়ি তাকে গাড়িতে উঠে আসার জন্য বললে মিলন সংক্ষেপে জানালো ঘটনাটা। পেছনে ফিরে তাকালো হাসান আসছে কিনা। দ্রুত মাথা খাটাতে লাগলো সে। যে কাজটা করতে যাচ্ছে সেখানে কোনো ঝুঁকি নেয়া যাবে না।

চাপদাড়ি তাকে ইশারায় জানিয়ে দেয় কি করতে হবে। মিলন গাড়ির দরজা বন্ধ করে ঘুরে দেখে হাসান সাহেব তার কাছে এগিয়ে আসছে। স্কুলে মিলনকে দেখে লোকটা যারপরনাই অবাক হয়েছে।

গাড়ি থেকে একটু সরে দাঁড়ালো মিলন, যদিও গাড়িটার গাঢ় কালচে কাঁচ দিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখা সম্ভব নয়।

"আপনি এখানে?" হাসান কাছে এসে জানতে চাইলো।

"ইয়ে মানে..." কী বলবে বুঝতে পারলো না মিলন। কোনোমতে বললো, "একটা

কাজে এসেছি।"

"আমাদের স্কুলে?" মিলনকে চুপ থাকতে দেখে আবার বললো, "তুর্যকে দেখলাম আপনার সাথে...ওর সাথে কি কাজ?"

"ও," মিলন বুঝতে পারলো সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। তুর্যকে তার সাথে দেখে ফেলেছে এই লোক। "বাস্কেটবল প্লেয়ার হান্ট করতে এসেছি..." অন্য কোনো মিথ্যে বলার সময় পেলো না, আজকের ছদ্মপরিচয়টার কথাই মনে পড়লো শুধু।

"বাস্কেটবল প্লেয়ার হান্ট মানে?"

বিস্মিত হাসানের প্রশ্নে দাঁত বের করে হাসলো মিলন। "আমার এক বন্ধু অ্যাঞ্জেলস টিমের কর্মকতা...ওর সাথে এসেছি।"

"আপনি কি বাস্কেবল টিমের সাথে জড়িত নাকি?" জানতে চাইলো অগাস্টিনের জুনিয়র ক্লার্ক হাসান।

"না, মানে...আছি আর কি..." মিলন বুঝতে পারলো সে ঠিকমতো গুছিয়ে বলতে পারছে না। পকেট থেকে সিগারেট বের করে হাসানের দিকে বাড়িয়ে দিলো সে।

হাসান আশেপাশে তাকিয়ে মাথা দোলালো। "আরে না। এখানে সিগারেট খাওয়া যায় না। নো স্মোকিং জোন।"

"ও," মিলন জানে তাকে কি করতে হবে এখন কিন্তু কিভাবে করবে সেটা ভেবে পাচ্ছে না। "ট-টয়লেটটা কোথায়...হাসান সাহেব?" টয়লেটের কথাটা তার মুখ ফসকে বের হয়ে গেলো। কেন বের হলো সে নিজেও জানে না।

"ঐ তো, ঐ বিল্ডিংটায়," পার্কিংলটের ডান দিকে স্কুলের মূল ভবনের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বললো হাসান। "নীচতলায়, সিঁড়ির পাশে।"

মিলন চেয়ে দেখলো আশেপাশে কোনো লোকজন নেই। কেউ তাদেরকে দেখছে না।

"আপনি কি টয়লেটে গিয়ে স্মোক করতে চাচ্ছেন?" হাসান জানতে চাইলো।

"না, ইয়ে...মানে—"

"অসুবিধা নেই। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। এখন টয়লেটের ওখানে গিয়ে স্মোক করা যাবে। কেউ দেখবে না।"

হাসানের কথাটা শুনে লুফে নিলো মিলন। "তাহলে চলেন। খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। মাথাটা টন টন করছে, বুঝলেন।"

মিলনকে টয়লেটের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললো হাসান, "আসলে আমার রুমেই আপনাকে নিয়ে যেতাম কিন্তু ওখানে আমার বস বসে।"

"ও," বললো মিলন। "সমস্যা নেই, টয়লেটই ঠিক আছে। আমার খুব প্রস্রাব চেপেছে। ভালোই হলো...টয়লেটও করা যাবে সিগারেটও খাওয়া যাবে।"

"আপনি না বলেছিলেন ফিল্মে কাজ করেন?" মিলনকে নিয়ে স্কুলের মূল ভবনে ঢুকে পড়লো হাসান।

"হ্যাঁ। সেজন্যে প্রায়ই বাড়ির বাইরে থাকতে হয়।"

তারা এসে পড়লো টয়লেটের দরজার সামনে। থমকে দাঁড়ালো হাসান। "এখানেই সিগারেট খাওয়া যাবে...ভেতরে ঢোকার দরকার নেই। আপনি টয়লেট করতে চাইলে সেরে আসুন।"

মিলন একটু ভেবে নিলো। "ঠিক আছে।" বলেই একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলো হাসানের দিকে।

"না। আমি খাবো না। আপনি ধরান, হাসান বললো।

সিগারেটটা ধরালো মিলন। চকিতে চারপাশটা দেখে নিলো। একদম নিরাপদ একটি জায়গা। বাইরে থেকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না তাদেরকে। কাজটা খুব দ্রুত করতে হবে।

"তাহলে আপনি একটু দাঁড়ান, আমি টয়লেট সেরে আসি," বললো সে।

মাথা নেড়ে সায় দিলো হাসান। টয়লেটের ভেতরে চলে গেলো মিলন।

একটু পরই টয়লেটের ভেতর থেকে মিলনের কণ্ঠটা বলে উঠলো : “হাসান সাহেব?”

টয়লেটের ভেতরে ঢুকে পড়লো হাসান। দেখলো একটা কিউবিকলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিলন।

“কি হয়েছে?” অবাক হয়ে জানতে চাইলো সে।

“এটার ভেতরে একটা জিনিস...” দরজাটা দেখিয়ে বললো সে।

“কি জিনিস?” কথাটা বলেই হাসান এগিয়ে গেলো দেখার জন্য।

মিলনকে পাশ কাটিয়ে দরজার হাতলে যে-ই না হাত রাখবে অমনি পেছন থেকে তার মাথার চুল একহাতে খপ করে ধরে ফেললো মিলন। চট করে অন্য হাতে থুতনিটা ধরেই এক ঝটকায় ঘাড় মটকে দিলো।

পুরো ব্যাপারটা ঘটলো মুহূর্তে। প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায়, নিখুঁত দক্ষতায় কাজটা করলো মিলন। ডান আর বাম হাতের বিপরীতমুখী বলপ্রয়োগের ফলে ঘাড়টা ভেঙে দিয়েছে সে।

কোনো রকম শব্দ না করেই ঢলে পড়লো সেন্ট অগাস্টিনের জুনিয়র ক্লার্ক হাসান।

মিলন তাকে পেছন থেকে ধরে ফেললো। নিথর দেহটা রেখে দিলো সেই কিউবিকলের ভেতর। তারপর চারপাশে তাকিয়ে দেখলো। না। কেউ নেই। দ্রুত বের হয়ে গেলো টয়লেট থেকে। পার্কিংলটে তাদের গাড়িটার কাছে এসে আরেকবার আশেপাশে তাকালো। পুরো স্কুল ফাঁকা। শুধু বাস্কেটবল কোর্টে কিছু ছেলে এখনও দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

গাড়ির ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলে ঢুকে পড়লো সে।

“শেষ?” পেছনের সিট থেকে চাপদাড়ি বললো তাকে। তার পাশেই অচেতন হয়ে পড়ে আছে হোমমিনিস্টারের ছেলে তুর্য।

মাথা নেড়ে সায় দিলো মিলন। হাসানকে মারার কোনো ইচ্ছে তার ছিলো না , কিন্তু কিছু করার নেই। তাদের পরিকল্পনায় কোনো রকম ঝুঁকি নেয়া যাবে না। এটা বাস্তবায়ন করার জন্য যা যা করার দরকার সবই তারা করবে।

গাড়িটা কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই স্কুল থেকে বেরিয়ে গেলো।

বাস্কেটবল কোর্টে তুর্যের সহপাঠীরা যদি জানতো তুর্যের এমন পরিণতি তাহলে তারা তাকে মোটেও ঈর্ষা করতো না।

উপসংহার

তুর্যকে উদ্ধার করার পরদিন সন্ধ্যার পর একটা বিশেষ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া সারাটা বিকেল রেবার সাথে কাটিয়ে দিলো জেফরি বেগ। মেয়েটা যে ট্রমার মধ্যে পড়ে গেছিলো সেটা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে এখন। তবে মিনিস্টারের ছেলেকে উদ্ধার করার অভিযানের কথা কিছুই জানে না।

তুর্যের অপহরণ ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেলেও মিডিয়া জানতে পারে নি কিভাবে ব্ল্যাক রঞ্জু হোমমিনিস্টারের ছেলেকে কিডন্যাপ করে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। একদল লোক হোমমিনিস্টারের ছেলেকে অপহরণ করার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছিলো, কিন্তু হোমিসাইডের ইভেস্টিগেটর জেফরি বেগের বুদ্ধির কল্যাণে ছেলেটা উদ্ধার পায়- মিডিয়াসহ বাকিরা এই গল্পটাই জানে।

লঞ্চ থেকে ব্ল্যাক রঞ্জুর একজন ঘনিষ্ঠ লোক এরফানকে জীবিত গ্রেফতার করা হয়েছে। অজ্ঞাত পরিচয়ের যে মেয়েটাকে এরফানের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলো জেফরি সে আর কেউ নয়, হোমমিনিস্টারের পিএস আলী আহমেদের বড়মেয়ে আনিকা।

ব্ল্যাক রঞ্জু দারুণ একটি কৌশল খাঁটিয়েছিলো। হোমমিনিস্টারের ছেলেকে কিডন্যাপ করার পাশাপাশি তার ঘনিষ্ঠ সহচর আলী আহমেদের মেয়েকেও জিম্মি করে। উদ্দেশ্য মিনিস্টারকে তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নিতে বাধ্য করা। সত্যি বলতে কি, রঞ্জুর এই কৌশল ভালোই কাজে দিয়েছিলো। ভদ্রলোক মেয়ের জীবনের কথা ভেবে রঞ্জুর হয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। অবতীর্ণ হয় রঞ্জুর এজেন্ট হিসেবে।

জেল থেকে মুক্ত হয়েও শুধুমাত্র প্রতিশোধ নেবার জেদের কারণে ব্ল্যাক রঞ্জুকে নির্মম ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে। সে যদি বাবলুর পেছনে না লাগতো, দিল্লিতে গিয়ে নিজের হাতে তাকে হত্যা করার মতো বাড়াবাড়ি না দেখাতে তাহলে বহাল তবিয়তে বিদেশের মাটিতে বেশ আরাম আয়েশের সাথে দিনাতিপাত করতে পারতো। হয়তো নিকট ভবিষ্যতে, দেশে ফিরে না এলেও, দূর থেকেই দলটা পরিচালনা করে অসংখ্য মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে আবার।

জেফরি বেগ জীবনেও ভুলবে না ঐ দৃশ্যটা : হুইলচেয়ারে বসা ব্ল্যাক রঞ্জু আগুনে পুড়ে মরছে।

বাবলুকে সে অনুরোধ করেছিলো বদমাশটাকে না মারতে কিন্তু সেও জানতো, এরকম জঘন্য সন্ত্রাসীকে জীবিত রাখাটা কতো বড় ঝুঁকিপূর্ণ আর বিপজ্জনক কাজ হতো।

হোমমিনিস্টারের সাথে গতকাল তার দেখা হয়েছিলো। ভদ্রলোক নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার পিএস আলী আহমেদ তো রীতিমতো দু'হাত ধরে কেঁদেই ফেলেছিলো। এই দু'জন ক্ষমতাবান মানুষের এমন আচরণে বিব্রত বোধ করেছে সে। কিন্তু এমনটি যে হবে সেটা মিনিস্টারের বাড়িতে দ্বিতীয়বারের মতো যাবার আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলো।

মিনিস্টারের সাথে দেখা করার সময় তার সঙ্গে ছিলো মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ। জেফরির জন্য গর্বিত বোধ করেছে ভদ্রলোক।

মিনিস্টার মাহমুদ খুরশিদ বিদায়ের সময় একটি অদ্ভুত কথা বলেছেন তাকে। শীঘ্রই তিনি হোমমিনিস্টারের পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। এরকম পদে থাকার নৈতিক অধিকার নাকি হারিয়ে ফেলেছেন।

মহাপরিচালক ফারুক আহমেদকে অবাক করে দিয়ে জেফরি সায় দিয়ে বলেছে, সেও মিনিস্টারের সাথে একমত পোষণ করে।

নিজের ঘরে বসে যখন এসব ভাবছে তখন রাত প্রায় বারোটা বাজে।

অনেকদিন পর আজকের রাতের ঘুমটা ভালো হবে আশা করলো। তবে এটাও ঠিক, বিরাট কোনো সফলতার পরও ঘুম চলে যায়।

হঠাৎ তার মোবাইলফোনটা বিপ করে উঠলো। হাতে তুলে নিলো সেটা। অজ্ঞাত এক নাম্বার থেকে একটা এসএমএস এসেছে। মেসেজটা ওপেন করে পড়লো :

থ্যাঙ্কস, মি: বেগ!

বাবলু!

ব্ল্যাক রঞ্জুকে আগুনে পুড়িয়ে মারা পর থেকে বাবলুর কোনো খবর নেই। জেফরি ভেবেছিলো সে হয়তো অন্য কোথাও চলে গেছে। কিন্তু এখন সে নিশ্চিত দেশে ফিরে এসেছে বাবলু। মনে মনে আশা করলো, সে যেখানেই থাকুক ভালো থাকুক। খুনখারাবির মতো কাজ থেকে যেনো বিরত থাকে। একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন তারও প্রাপ্য।

তবে বাবলুর সাথে তার কখনও দেখা হয়ে গেলে সে কী করবে ভেবে পেলো না। এখনও বাবলুর বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা রয়ে গেছে। তার পক্ষে কোনো খুনিকে ছাড় দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এটাও অস্বীকার কার করার উপায় নেই, বাবলু তিন তিনজন মানুষের জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছে, সেইসাথে চিরতরের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছে এক ভয়ঙ্কর খুনিকে।

বাবলু এখন দেশে!

জেফরির খুব ইচ্ছে করলো সবকিছুর জন্য তাকেও একটা ধন্যবাদ জানাতে, কিন্তু কিছুই করলো না। মোবাইলফোনটা বেডসাইড টেবিলের উপর রেখে সুইচটিপে বাতি বন্ধ করে দিলো সে। কিছুক্ষণ বসে থাকলে বিছানায়। চোখে ঘুম নেই। উঠে জানালার সামনে গিয়ে বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে থাকলো শূন্য দৃষ্টিতে।

হুডি পরা এক যুবক পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ফাঁকা রাস্তাটা দিয়ে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সে একদম নিশ্চিত এটা....

অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো জেফরি বেগ, "বাবলু!"

তাকে অবাক করে দিয়ে হুডি পরা যুবক থেমে গেলো। কিন্তু জানালার কাঁচ ভেদ করে সেই আওয়াজ পৌঁছানোর কথা নয়। আস্তে করে পেছনে ফিরে তাকালো, তারপর আবার হাঁটতে শুরু করলো সে।

রাতের কুয়াশায় অবয়বটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো মুহূর্তে।

ফাঁকা রাস্তাটার দিকে চেয়ে রইলো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর। এটা কি তার হেলুসিনেশন ছিলো নাকি সত্যি সত্যি...

জেফরি বেগ নিশ্চিত হতে পারলো না।